সপ্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৪ হইতে পৌষ, ১৩৪৪

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
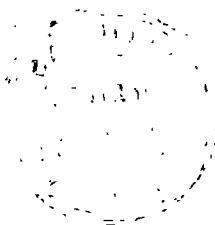
পরিচয়

সূচিপত্র

৭ম বর্ষ—১ম খণ্ড; শ্রাবণ, ১৩৪৪—পৌষ, ১৩৪৪

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪৪

পরিচয়

ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্ব্ব দিগন্তের কাছে।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।
ভগ্ন গৃহে লগ্ন ঐ অর্দ্ধেক প্রাচীর;
আশাহীন পূর্ব্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্ত্তমান কাল।
আকাশে তাকায় শিলা-লেখ,
তাহার প্রত্যেক
অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে
ক্লান্তস্বরে প্রশ্ন করে
আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা,
শেষ হয়ে যায় নি বারতা?

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তিপরে
করে আছে চুপ
অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার অসম্পূর্ণরূপ।
অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারিভিতে
নীরবতা উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক।
একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত,
অন্য পথে গেছে অকস্মাৎ,
তাদের চকিত আশা,
স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয়নি চলা সারা,
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইসারা।
আজিও কালের সভামাঝে
তাদের প্রথম সাজে
পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো তাই
সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হোতে,
শৈবালে ঢাকে নি তারে বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে;
স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ,
কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ
তারে-নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল,
না দেয় নীরস হোতে মজ্জাগত গুপ্ত অশ্রুজল।

যাত্রাপথ পাশে
আছ তুমি আধো ঢাকা ঘাসে,
পাথরে খুদিতেছিনু, হে মূর্ত্তি, তোমারে কোন্‌ক্ষণে
কিসের কল্পনে ?
অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর।

মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি,
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।

সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্ম্মমাঝে রয়েছে আমার,
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোম-লতা

কার্ত্তিকের সংক্রান্তি।

তখনও ভালো ক'রে ভোর হয়নি। কেবল ভোরের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। ছু'একটি কাক ডাকছে। শুকতারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। গাছের পাতাগুলির ঘুমের জড়তা ভালো ক'রে কাটেনি। একটুখানি কুয়াসাও ক'রেছে।

বিনোদিনী অনেক আগে থেকেই গোবর দিয়ে উঠান লেপছিল। তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটুখানি বাকি। নয়নতারা চালের গুঁড়ো গুলে আলপনা দিচ্ছিল। উঠানের মাঝখানে এঁকেছে মস্ত বড় একটি পদ্মফুল। সেখান থেকে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন তাদের বড় ঘরের সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত এসেছে। আর ক'টি পদচিহ্ন আঁকলেই তার কাজ শেষ হয়।

আলপনায় নয়নতারার হাত আছে। লক্ষ্মীর ঘরের দেওয়ালে এবং পিঁড়িতে যে আলপনা সে কেটেছে তার সুখ্যাতি জনে জনে এসে ক'রে গেছে। দেওয়ালের আলপনায় আছে ছুটি পেঁচা, ছুটি ধানের গোলা, লক্ষ্মীর কৌটা, ধানের শিষ আর অসংখ্য লতা-পাতা-ফুল, তার নীচে বসুধারা। সমস্তগুলি এমনি সুসমঞ্জস এবং সুসন্নিবিষ্ট যে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখতে হবে। এই অত্যন্ত সাধারণ অশিক্ষিতা পল্লী-বধূ কোথায় পেলে এমন শিল্পীর চোখ এবং শিল্পীর দক্ষতা ভাবতে বিস্ময় লাগে।

ঘরের ভিতরে নিতাইপদর মা পূজার জিনিষগুলি আর একবার ঠিক ক'রে দেখে রাখছিল।

বললে, তোমার হ'ল বৌমা ?

নয়নতারা বললে, আর হ'ল মা।

—গোলার নীচে আলপনা দিয়েছ ?

—দিয়েছি।

—তুলসীতলায় ?

—দিয়েছি, কেবল ফুলগাছের নীচেটুকু বাকি আছে।

— ওটুকু আবার বাকি রাখলে কেন ?

—বাকি কি আর রাখব ? ঠাকুরঝি এখনও ওখানটায় গোবর দেয়নি যে।

বিনোদিনী কুলগাছের কাছ থেকে বললে, এই আমার হ'ল বৌ, এইবার তুমি এস।

অকস্মাৎ নিতাইপদর মা চেঁচিয়ে বললে, ও বিনোদিনী, কাঁসর কোথায় গেল ? কাঁসর দেখছি না যে !

বিনোদিনী হেসে গোলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই দেখ !

গোলার পাশে হাবল কাঁসরটাকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেটিকে হারাবার ভয়ে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

নিতাইপদর মা হেসে বললে, কাঁসর নিয়ে ওখানে দাঁড়ালি কেন ? লক্ষ্মী ভাই, দিয়ে যা। পূজোর কাঁসর !

হাবল ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, আমি বাজাব না ?

—তুই আবার বাজাবি কি ! তুই মুঠ আনবি যে।

—মুঠ গোপাল আনবে।

ব'লেই হাবলের কি যে হ'ল, সে কাঁসরটাকে ঝন ঝন ক'রে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুম দুম ক'রে বাইরের দিকে ছুট দিলে।

কিন্তু বিনোদিনী তাকে ধ'রে ফেললে। হাবলের চোখ দিয়ে তখন টপ টপ ক'রে জল পড়ছে। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলছে না, কেবল মায়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে দাপাদাপি করছে।

নয়নতারা যেমন নিরীহভাবে আলপনা দিচ্ছিল, তেমনি দিতে লাগল।

বিনোদিনী হাবলকে ধমক দিয়ে বললে, হতভাগা ছেলে, তোমার পেটে পেটে হিংসে ! ফের যদি গোপালের ওপর হিংসে কর ! ভাই হয় না ?

মা দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, গোপাল আবার মুঠ আনবে কি বৌমা ? অতটুকু ছেলে মাথায় ক'রে মুঠ আনতে পারে মাঠ থেকে ?

নয়নতারা মুখ না তুলেই জবাব দিলে, কি জানি মা। তাই তো বললে।

—কে বললে ? নিতাইপদ ?

অনাবশ্যক বিবেচনায় নয়নতারা এ প্রশ্নের আর জবাব দিলে না। একটুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মা অন্ধকার মুখে ঘরে ঢুকল। দেখতে দেখতে চারিদিক

থেকে উঠল অগণিত কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খধ্বনি। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে পল্লী ছিল ঘন ছায়ায় গুণ্ঠিত, সে যেন অকস্মাৎ চরণে মঞ্জীর বেঁধে উৎসবে মেতে উঠল।

ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ। ঢং ঢং ঢং।

নিতাইপদ হন্ত দন্ত হয়ে এসেই চীৎকারে বাড়ী মাথায় তুললে ঃ

এখনও আলপনা দেওয়াই হ'ল না তো? ও আর হবে না। রাজ্যের লোকের মুঠ এসে গেল, আর তোরা সমস্ত দিন ধ'রে আল্‌পনাই দে। লক্ষ্মীছাড়ায় ধরলে যা হয়!

নয়নতারা ঘোমটার ফাঁক থেকে বললে, মুঠ এল না তা আমরা কি করব? মুঠ কি আমরা আনব না কি?

মুখ ভেংচে নিতাইপদ বললে, আজ্ঞে না। কিন্তু আল্পনা না দিলে মুঠ এনে কি মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে? এই হারামজাদা, কাপড় কই তোর? কাপড় কি আমি পরিয়ে দোব না কি?

হাবল মামাকে দেখা মাত্র কান্না থামিয়ে একপাশে স'রে দাঁড়িয়েছিল। মামার সুমধুর আহ্বানে সে শুধু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিতাইপদর মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, ওকে বকছিস কেন? মুঠ তো গোপাল আনবে।

—গোপলা! তাহ'লে একটা পালকী দেখে আসি।

মা মুখ কালো ক'রে বললে, পালকী দেখবি, কি চতুর্দ্দোলা দেখবি···

দুই হাত আকাশে তুলে নিতাইপদ বাধা দিয়ে বললে, আরে বাবা, যা হোক একটা দেখতে তো হবে। ও তো আর সেই বাগানপুকুরের মাঠ পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না। আসতেও পারবে না।

ঘোমটার ভিতর থেকে নয়নতারা ঝঙ্কার দিলে, কেন, তুমি কোলে ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না?

—না। আমার বাবাও পারবে না।

গোল গোল ভাঁটার মত চোখ পাকিয়ে নিতাইপদ আবার হাঁকলে, এই হারামজাদা, ইদিকে আয়।

হাবল ভয়ে ভয়ে দাওয়ায় উঠে এল।

নিতাইপদ ঘর থেকে একটা লাল চেলির কাপড় বার ক'রে এনে ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিলে।

—কাঁসরটা ওখানে প'ড়ে কেন? আরে, এই আপদগুলোকে না তাড়ালে এ বাড়ীর মঙ্গল নেই।

নিতাই উঠান থেকে কাঁসরটা তুলে নিয়ে এল। ঘরের ভিতর থেকে মেনী আর গোপাল বাইরে এসে দাঁড়াল। দুজনেরই সাজসজ্জার ঘটা আছে। মেনী তার পুজোর বাসন্তী রঙের কাপড়টা পরেছে এবং খোঁপার অভাবে কানেই গুঁজেছে একটা জবাফুল। আর একটা ভারি চাবির রিং বেঁধেছে আঁচলে। গোপাল শুধু একটা চেলীর কাপড় মালকোচা দিয়ে পরেছে। বোধ হয় ওর মা পরিয়ে দিয়েছে। গলায় দুলছে একটা রূপার তক্তি। দু'হাতে দুগাছি বালা। কোঁকড়া কোঁকড়া বড় বড় চুলে পরিপাটি সিঁথি। নয়নতারা কখন যে এরই মধ্যে ওর বড় বড় চোখে কাজল এবং কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে সেই জানে।

এ পরিবারে নিতাইপদকে ভয় করে না একমাত্র গোপাল। নিতাইপদর একটা আঙুল চেপে ধরে বললে, আমি মুঠ আনতে যাব বাবা।

—চল্।

নিতাই তাকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁসর বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলল। পিছনে হাবল। তার পিছনে মেনী। সে ঘণ্টা বাজাবার ভার পেয়েছে। মনের আনন্দে তাই বাজাতে বাজাতে চলেছে।

পাকা পাকা লঘু ধান মাঠে ঢলে পড়েছে। কাল নবান্নের জন্যে কিছু কিছু কাটা হবে। তার আগে আজ মুঠি পূজা। যে মা-লক্ষ্মী অন্নরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করছেন, তারই আড়াই মুঠি গৃহস্থ আজ নিজের হাতে কেটে, নিজের মাথায় ব'য়ে ঘরে আনবে। তারই হবে পূজা। তারই উৎসব।

গ্রামের কোলে কোলে সমস্ত মাঠ শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের ধ্বনিতে যেন গান গেয়ে উঠল। হেথা হোথা লাল-নীল-বেগুনী রঙের পট্টবস্ত্র প'রে দলে দলে গৃহস্থের ছেলেরা এসেছে মুঠ আনতে। যেন সোনালী মাঠের স্থানে স্থানে গুচ্ছে গুচ্ছে,

স্তবকে স্তবকে হরেক রঙের ফুল ফুটেছে। এরই উপর পা ফেলে ফেলে মা-লক্ষ্মী আসবেন গ্রামের মধ্যে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে।

নিজের হাতে ধান কাটায় সামাজিক অসম্মান আছে। আরও অসম্মান নিজের মাথায় ধান বহায়। কিন্তু সে আজ নয়। ধান আর আজ ধান নয়, মা-লক্ষ্মী। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র আজ আনবে জমির ঈশান কোণ থেকে আড়াই মুঠি ধান নিজের হাতে কেটে, নিজের মাথায় বয়ে। যে পারবে না, যার জমি নেই, আজ আর তার দুঃখ রাখার ঠাঁই নেই।

নয়নতারার ইচ্ছা ছিল না হাবল মুঠ আনে। তার বহু দেবতার দ্বারে ধর্ণা-দেওয়া অনেক আরাধনার গোপাল এই চার পেরিয়ে পাঁচে পা দিয়েছে। অত দূর থেকে মুঠ আনা তার হয়তো একটু কষ্টকরই হ'ত। হেঁটে হয়তো আসতে পারত না। কিন্তু তার মাথায় মুঠ চাপিয়ে তাকে কোলে করে কি নিতাইপদ আসতে পারত না? বিশ্ব-সংসারে এমন কি কেউ করে না? যার হাবলের মতো ভাগনে নেই সে কী করে?

গত রাত্রে এই নিয়ে সে স্বামীর কাছে দরবারও করেছিল। কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিতাইপদর শরীর তখন নিদ্রায় এবং শ্রান্তিতে ভেঙে আসছিল। তন্দ্রার ঘোরে হয়তো সে নয়নতারার কথায় সম্মতিই দিয়েছিল। তা নইলে গোপালকে এমন ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে কখনও সে লোকসমাজে অপদস্থ হ'ত না। কিন্তু গত রাত্রের আলোচনার বিন্দু বিসর্গও নিতাইপদর স্মরণ নেই। গোপালের সাজ সজ্জা দেখে অনুমান করতে পারলে মাত্র। কিন্তু হাবল থাকতে গোপালকে দিয়ে মুঠ আনা? তা কি হয়?

তা হ'ল না। ফলে সত্যই লোকসমাজে নয়নতারার অবস্থা কঠিন হয়ে উঠল।

আহারাদির পর নিতাইপদর মা ঘাটে গিয়ে কথাটা তাঁতি বৌকে গোপনে ব'লে এল। বিশেষ কিছুই নয়, শুধু তার অবর্ত্তমানে পতিত্যক্তা বিনোদিনীর কি যে অবস্থা হবে তারই প্রতিকারের পরামর্শ চাইলে। তারপরে ধীরে ধীরে সুতোর এক প্রান্তে টানলে যেমন অপর প্রান্ত বেরিয়ে আসে, তেমনি করে মুঠ আনার ইতিহাসও বেরিয়ে এল।

তাঁতি বৌ সরল লোক, শুনে গালে হাত দিলে।

বললে, ওমা, ওইটুকু ছেলের ওপর হিংসে!

নিতাইপদর মা ছল ছল চোখে বললে, আমি আর কি বলব মা, তোমরা পাঁচজনেই দেখ।

—আর সে পর নয়, নিজের ভাগনে।

—তবেই বল মা!

—এদিকে তো সাত হাত ঘোমটা টেনে ক'নে বৌটি সেজে থাকেন। দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। তার পেটে পেটে এত! কিন্তু এ আমি আগেই জানতাম রাঙা খুড়ী। বিশ্বাস না হয় ঘোষেদের ন'বৌকে জিগ্যেস করতে পার।

নিতাইপদর মা মনের দুঃখে বাড়ী চ'লে আসছিল। কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে গিয়ে বললে, আবার তাও বলি মা, বৌ বলে বটে, কিন্তু নিতাই তার একটি কথাও কানে তোলে না।

একটা চুমকুড়ি কেটে তাঁতি বৌ বললে, তুলতে কতক্ষণ মা! পুরুষ মানুষের মন তো!

কিন্তু নিজের ছেলেকে পুরুষ মানুষের মধ্যে ফেলতে হয়তো নিতাইপদর মার মন সরছিল না। মুখ ভার ক'রে বললে, কি জানি মা! পরচিত্ত অন্ধকার!

—এই কথা!

নিতাইপদর মা চ'লে গেল।

তাঁতিবৌ ঘাট থেকে বরাবর গেল ঘোষেদের ন'বৌ-এর কাছে। সব কথা শুনে তাকে স্বীকার করতে হ'ল তাঁতিবৌ-এর দূরদৃষ্টি আছে। কথাটা তাঁতি-বৌ অবশ্য তাকে গোপনেই বললে।

ফলে সন্ধ্যার সময় নয়নতারা যখন ঘাটে গা ধুতে গেল লোকের মুখে সকালের বৃত্তান্ত শুনে বেচারা কেঁদে আর বাঁচে না। সে আত্মদোষস্খালনের যথেষ্ট চেষ্টা করলে। কেউ বুঝলে, কেউ বুঝলে না।

নয়নতারা রাত্রে স্বামীকে বললে, হ্যাঁগা, আমি কখনো তোমাকে বলেছি যে, হাবলকে মুঠ আনতে হবে না?

এ প্রসঙ্গে নিতাইপদ অপ্রতিভ বোধ করলে। সেইটে ঢাকবার জন্যে মুখ বিকৃত ক'রে বললে যাও, যাও। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'র না।

নয়নতারা আর কিছু বললে না। পাশে ফিরে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিনোদিনী সম্বন্ধে নয়নতারার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আগে সংসারের বাসি-পাট থেকে আরম্ভ ক'রে রান্না-বাড়া সমস্ত ছিল তার উপর। বৃদ্ধা শাশুড়ী ভাঁড়ার এবং নাতিটিকে নিয়ে পাড়া বেড়িয়েই দায়িত্ব শেষ করত। এ বয়সে এর বেশী করার সাধ্যও তার ছিল না। অথচ ভগবান নয়নতারাকে শ্রমসহিষ্ণু ক'রে তৈরি করেন নি। শরীর তার দুর্ব্বল, এবং প্রায়ই একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে। তার উপর শিল্পিসুলভ অলসতাও কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করেছে। বিনোদিনী এসেই তার হাতের মোটা কাজগুলো সব নিয়ে নিলে। যে কাজে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম দরকার সেই কাজেই তার আনন্দ এবং উৎসাহ বেশী। সত্য কথা বলতে কি, সূক্ষ্ম কাজে বিনোদিনীর হাত আসে না। ভালোও লাগে না। সে যে পরদুঃখে বিগলিত হয়ে এই ভার মাথায় নিয়েছে তা নয়। কিন্তু তার ফলে, নয়নতারা দু'দিক থেকে বেঁচে গেছে। এক, তিন ভাগ বোঝা তার মাথা থেকে নেমে গেছে। তার হাতে এখন শুধু রান্নার ভার। দুই, এর জন্যে তার বিনোদিনীর কাছে কৃতজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই। বরং এই সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ যদি সে বিনোদিনীর হাতে ছেড়ে না দিত তা'হলে বিনোদিনীই পড়ত বিপদে। কেন, বলছি।

প্রথমত, শুধু বিনোদিনী নয়, এরা সকলেই, ব'সে খেতে লজ্জা এবং ঘৃণা বোধ করে,—তা সে অন্ন স্বামীরই হ'ক, আর যারই হ'ক। গতর খাটিয়ে খাওয়ার চেয়ে বড় গৌরব আর নেই। সুতরাং কোনো কাজ না ক'রে ব'সে ব'সে দাদার অন্ন ধ্বংস করতে বিনোদিনী লজ্জায় ম'রে যেত। সে অন্ন কিছুতে তার গলা দিয়ে নামতে চাইত না।

দ্বিতীয়, তার সঙ্গী সাথী বলতে কেউই এখানে নেই, যার সঙ্গে দু'দণ্ড মনের

কথা ব'লে শান্তি পেতে পারে। সকলেই শ্বশুর বাড়ীতে। তার মত এমন দুর্ভাগ্য আর ক'জনের হয় ?

সুতরাং সহস্র কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়ে সে যেন বেঁচে গেল। এ ছাড়া প্রতিবেশিনীর সহানুভূতি থেকে আত্মরক্ষা করবার আর তার কোনো উপায়ও ছিল না।

কিন্তু তারও দোষ আছে। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি একেবারে তার মজ্জার মধ্যে। এখানে চালের কারবার করার সুযোগ নেই। কিন্তু যে খেলতে পারে সে কানা কড়ি নিয়েই খেলে। বিনোদিনীর সঙ্গে যে পঁচিশটি টাকা ছিল তাই দিয়েই খেলা আরম্ভ হ'ল। অবশ্য অত্যন্ত গোপনে। কারণ দাদা কিম্বা নয়নতারা জানতে পারলে চক্ষের নিমিষে তা শোষণ ক'রে নেবে। নিক, না নিক, অন্তত বিনোদিনীর সেই রকমই আশঙ্ক।

ফলে ঃ

তাঁতি-বৌ চুপি চুপি এসে ঢেঁকীশালে বসল। বিনোদিনী একটা কুলোয় ক'রে চাল পাছড়াচ্ছিল। তাঁতি-বৌ বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। সম্পর্কে বৌদি।

বিনোদিনী বললে, এস বৌ।

তাঁতি-বৌ ওর সুনিপুণ কর্ম্মপদ্ধতি অনেকক্ষণ ধ'রে মনোযোগ দিয়ে দেখলে। বিনোদিনী কাজে যেমন ক্ষিপ্র তেমনি গোছালো। একটি দানা চাল নষ্ট হবার উপায় নেই। আর ধান ভানাও হয়েছে তেমনি সুন্দর। এমন সুন্দর চাল তৈরি করতে এখানে খুব কম মেয়েই পারে।

তাঁতি-বৌ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তোমার মতো একটি ননদ যদি পেতাম ভাই, দুবেলা তার পা ধুয়ে জল খেতাম।

বিনোদিনী হেসে ফেললে। বললে, কেন, পা-ধোয়া জলের তোমার আকাল পড়ল নাকি ?

তাঁতি-বৌ গম্ভীর হয়ে বললে, হাসি নয় ভাই, সত্যি কথা। কাজের এমন লক্ষ্মীচ্ছিড়ি আমি তো দেখিনি।

সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে বিনোদিনী বললে, আহা !

তাঁতি-বৌ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে,- ভগমানের কি চোখ আছে ? নেই। থাকলে এমন সোনার পিরতিমে ধুলোয় গড়াগড়ি যায় ?

বিনোদিনীর ইচ্ছা করছিল পালিয়ে যায়। কিন্তু পারলে না। যন্ত্রের মত তার কাজ যেন আপনি চলতে লাগল।

তাঁতি-বৌ বলতে লাগল ঃ

—তিনি নিজেই এমনি ক'রেছেন যে! দয়াধর্ম্ম থাকলে কি সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে পারতেন? সত্যি ভাই, তোমাকে দেখলে আমার মা-জান্নকীকে মনে পড়ে।

বিনোদিনীর চোখে জল এসে প'ড়েছিল। তাই ঢাকবার জন্যে সে মুখ আড়াল ক'রে বসল।

তাঁতি-বৌ দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, সেই মিন্‌ষেকে এবার কোনো রকমে আনতে পারিস? তার কান ধ'রে ঘোড় দৌড় করিয়ে ছাড়ি। তবে গায়ের ঝাল মেটে।

এবারে বিনোদিনী অতি দুঃখেও হেসে ফেললে।

তাঁতি-বৌ জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে, তা নিতাই ঠাকুরপো সেই মুখপোড়া মিন্‌ষেকে একখানা চিঠি দিলে না কেন?

—চিঠি দিয়ে আর কি হবে?

চোখ কপালে তুলে তাঁতি-বৌ বললে, বলিস্ কি লো! নিজের চোখে তার কীর্ত্তিটা একবার দেখে যাবে না?

রাগে সে জ্বলন্ত উনানের মতো গম্ গম্ করছিল। বললে, তার বড় কপাল জোর যে তোর মতো ভালোমান্‌ষের হাতে পড়েছিল। পড়ত আমার পাল্লায়, তো তাড়িয়ে দেওয়া বার করতাম।

অস্ফুট স্বরে বিনোদিনী বললে, কি করতে তুমি?

—কি করতাম?—তাঁতি-বৌ বাঘিনীর মতো লাফিয়ে উঠল। বললে,—কি করতাম? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতাম না? আমি ঘরণী-গিন্নি-বেটার মা না? কার ঘাড়ের উপর দুটো মাথা যে আমাকে 'স'রে বস' বলে?

উত্তেজনায় তাঁতি-বৌ হাঁফাতে লাগল। নির্নিমেষ চোখে ওর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে বিনোদিনী কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে যে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবলে কে জানে?

অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বললে, ওর দোষ নেই বৌ।

মুখ বিকৃত ক'রে তাঁতি-বৌ বললে, তুই থাম বিনোদিনী। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকিস না।

ধমক খেয়ে বিনোদিনী চুপ ক'রে গেল। বলতে পারলে না, তার সুখনীড় সে নিজের হাতেই ভেঙেছে। কেউ তাকে তাড়িয়ে দেয়নি। সে নিজেই এসেছে চলে। কিন্তু সে একটা মস্ত বড় ইতিহাস। এখানে এতদিন সে এসেছে কিন্তু ধৈর্য্যের এবং মানসিক শান্তির অভাবে কাকেও তার সকল কথা বলা হয়নি। মাকে পর্য্যন্ত না। কাজেই পল্লীসমাজের তীব্র সমালোচনা থেকে সে কিছুতে রেহাই পায় না। কিন্তু বিনোদিনী সাধারণত জনসমাজ থেকে দূরে দূরে থাকে। সুতরাং সকল কথা তার কানে আসে না। যেটুকু আসে তা সে শুনেও শোনে না।

তাঁতি-বৌ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এইবার আসল কথা পাড়ল। পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে একটি টাকা চুপি চুপি বিনোদিনীর হাতে গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে ঃ

—তোমার দাদার কাছে হাত লুকিয়ে লুকিয়ে মরি ভাই। কাল ঠিক ধরেছে। বললে, তোমার হাতের বালা-কাটা দেখছি না যে! বললাম, খুলে রেখেছি। কি ভাবলে কে জানে ভাই, কিছু তো বললে না। আজ হাত বার করে বাঁচব।

—আর সুদের চারটে পয়সা ?

তাঁতি-বৌ একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে বললে, মরি মরি! সাতদিন না আটদিন তো হয়েছে, তার আর সুদ নিতে হয় না, নাও।

মুখ ভার করে বিনোদিনী বললে, আটদিন কেন হবে বৌ। আজ মাসের তেসরা। তেরো দিন হ'ল তাহ'লে।

—তা সে তাই না হয় হল। তেরো দিনের সুদ আমি দোব না। হ'ল তো ? নিয়ে এস ভাই, বালাকাটাটা। আমি কাজ করতে করতে ছুটে এসেছি। ধারে আমার বড্ড ভয় ভাই। শোধ না করা পর্য্যন্ত আর কিছুতে সোয়াস্তি পাই না।

বিনোদিনী কিন্তু ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখালে না। বললে, তা তুমি আপনার লোক, না হয় ছুটো পয়সা দাও।

অধীর কণ্ঠে তাঁতি-বৌ বললে, দুটো পয়সা সুদও আমার কাছে চাইতে পারলি বিনোদিনী ? তোর লজ্জা হ'ল না ? ধন্যি মেয়ে যা হ'ক !

ওর উচ্চ কণ্ঠে বিনোদিনী শশব্যস্তে বললে, আস্তে। তাঁতি-বৌ, আস্তে।

সে আর বাক্যব্যয় না ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বালাকাটাটা এনে দিলে। ক্ষুণ্ণভাবে বললে, অন্তত একটা পয়সাও সুদ দেওয়া তোমার উচিত ছিল বৌ।

তাঁতি-বৌ বালাকাটা তাড়াতাড়ি হাতে পরতে পরতে বললে, হয়েছে। আর অত রসে কাজ নেই।

সে আর তিলার্দ্ধ দাঁড়াল না। হন হন করে চলে গেল।

গোলযোগের ভয়ে বিনোদিনী আর তাঁতি-বৌকে ঘাঁটাতে সাহস করলে না বটে, কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হল। নাহ'ক অন্তত দুটো পয়সা তার নির্ঘাত লোকসান গেল। সে প্রতিজ্ঞা করলে মরে গেলেও আর কখনও তাঁতি-বৌকে একটি পয়সাও ধার দেবে না।

হাবল গোচারণ শিক্ষা করছে। নিতাইপদর গোয়ালঘরটি নিতান্ত ছোট নয়। গরুতে মহিষে প্রায় ত্রিশটি। এতগুলি প্রাণীকে চরাতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে হাবল নিতান্তই ছোট। সেজন্যে একটা ঠিকা রাখালও আছে। কিন্তু হাবলও সঙ্গে যায়। নিতাইপদর ভরসা আছে আর বছরখানেক পরে হাবল একাই চরাতে পারবে। ঠিকা রাখালটির প্রয়োজন হবে না এবং এই অভাবের সময়ে মাসিক চার আনা পয়সার সাশ্রয় হবে। সে বড় কম নয়।

হাবলকে দিনকতক পাঠশালায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তার মেধা মাতুলকুল কিম্বা পিতৃকুল কোন্ কুলের অনুসরণ করছে বলা কঠিন। হয়তো তার মধ্যে উভয় কুলের ধারাই সম্যক বজায় থাকবে। কারণ অন্তত এই একটি বিষয়ে উভয় কুলের ধারা একই খাতে বইছে।

বৃথা কালক্ষেপ নিতাইপদ পছন্দ করে না। সুতরাং অবিলম্বে তাকে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত লাভজনক গোচারণে নিযুক্ত করলে। দেখা গেল, এ বিষয়ে হাবলের উৎসাহ সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। বেলা দশটার

কাছাকাছি তার যে শিরঃপীড়ার বেদনা অসহ্য হয়ে উঠত, সেটা একেবারেই সেরে গেল। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের অভ্যাসটাও আবার ফিরে এল। এক কথায় তার সমগ্র রূপই বদলে গেল।

এখন সকাল বেলাটা যেখানেই থাক দশটা বাজবার আগেই বাড়ী ফিরে হাঁক দেবে, মামী গো, জলখাবার দাও। গরু ছেড়ে দিতে হবে।

তার যেন আর ত্বর সয় না।

নয়নতারা ধমক দেয়, দাঁড়া। সাহেব যেন ঘোড়ায় চ'ড়ে এলেন। হাত ধোব, কাপড় ছাড়ব, তবে তো দোব।

—গরু ছেড়ে দেবার বেলা হয়েছে যে!

ওর পা দুটো লড়ায়ের ঘোড়ার পায়ের মতো অস্থির হয়ে ওঠে।

—হ'ক বেলা।

বুড়ো বটগাছের কি যে মায়া, কি যে তীব্র টান মামী তা বুঝবে না। বোঝে নিতাইপদ। তারও শিশুকাল থেকে কৈশোর কেটেছে ওই গাছটির ছায়ায়। আজও মনে করলে শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নের মতো প্রত্যেক দিনের সুখস্মৃতি চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। অতিক্রান্ত সেই দূর কালের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তবু তো তত বড় গরুর পাল এখন আর নেই। আগে শুধু ওই মাঠটিতেই জমা হ'ত অন্তত পাঁচশো গরু মহিষ। এখন কতই বা হবে! একশোর বেশী নয়। আর দশ বৎসর পরে এও থাকবে না হয়তো। গোচারণের মাঠই ছিল কত! সেগুলি ধীরে ধীরে কেমন ক'রে ধানের জমিতে পরিণত হ'ল সে তো নিতাইপদ নিজের চোখেই দেখেছে। রাখালই কি কম ছিল! তার সিকিও এখন নেই।

আর খেলা?

নিতাইপদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ে!

খেলার ওরা জানেই বা কি, আর ওই রোগা-পটকা শরীর নিয়ে কি খেলাই বা খেলতে পারে? ঝাল-ঝুল খেলতে খেলতে রামহরি ওই বট গাছেরই মগ্‌ডাল থেকে এমন একটি লাফ দিলে যে জন্মের মতো ডান হাতখানির দফা রফা হয়ে গেল। পারে ওরা? কিন্তু হাবলের দিকে চেয়ে তখনই আপন মনে বলে, আর পেরেও কাজ নেই বাবা!

সেকালে কি ছিল হাবল তা জানে না, তার বিচারও করে না। ওদের নিজেদের কালে যা ওরা পেয়েছে তাতেই ওদের মন ভ'রে আছে। সেই পাঁচশো গরুর পাল আর নেই। অত রাখালও নেই। কিন্তু এই একশো গরু নিয়েই ওরা ঠিক সেই আগেকার কালের মতো আনন্দেই হৈ হৈ করতে করতে মাঠে গিয়ে জমা হয়, সেই বুড়া বটগাছটার নীচে। সকলেরই মলিন বস্ত্রাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মুড়ি। আর একখানি মলিন বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধা। বগলে পাঁচনবাড়ি। শুয়ে-পড়া ধানের ফাঁকে ফাঁকে মটর-তেওরার কচি কচি পাতাগুলি অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। আর ক'দিন পরে তাতে যখন শুঁটি ধরবে তখন ওদের মুড়ি খাওয়ার কি জুৎই যে হবে সে ওরাই জানে।

মাঠে গিয়ে পালা ক'রে এক এক দল যায় গরুর পাহারায়। আর বাকি সব খেলতে লেগে যায়। হরেক রকমের খেলা। কোথাও ঝাল-ঝুল, কোথাও হা-ডু-ডু, কোথাও বিয়ে-নড়ি, কোথাও বা কড়ি খেলা। আবার কেউ বা একটা ছায়াচ্ছন্ন নিরালা কোণে ব'সে আপন মনে বাঁশী বাজায়। সে সুর লোকালয়ের কোলাহলে এসে পৌঁছয় না। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। কিন্তু মাঠের পথে যে হাঁটে সে জানে ওই সুর ঢিলে-বোনা অলস মধ্যাহ্নের ফাঁকগুলি নিবিড় ক'রে ভরাট ক'রে দেয়।

এ আহ্বান অগ্রাহ্য করা হাবলের পক্ষে অসম্ভব। জলখাবার দিতে একটু দেরী হ'লে তাই সে অস্থির হয়ে উঠে।

—মামী গো! মামী কই?

বিনোদিনী সে ডাক শুনতে পেলে না। তাঁতি-বৌ চ'লে গেছে। হাতের কাজ বন্ধ রেখে বিনোদিনী ভাবছিল, সত্যই তো। হারাণকে একটা খবর দিতে দোষ কি? সে জানে বিনোদিনী ম'রে গেছে। ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবে সকল জ্বালা জুড়িয়েছে। যদি খবর পায় মরেনি, সে আছে, বেঁচেই আছে···

অকস্মাৎ বিনোদিনীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার। এক মুহূর্ত্তের জন্যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন বুদ্‌বুদের মতো তার চোখের সুমুখে ভাসতে লাগল। কিন্তু তখনই সম্বিৎ ফিরে এল। আবার শ্বাস বইতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে আবার কুলোখানা হাতে নিয়ে কাজে মন দিলে। মন তখন সন্দেহ-দোলায় তুলছে,—কে জানে সে আসবে কি না।

যদি না আসে? যদিই না আসে?

—মামী কোন চুলোয় গেল মা?

হাবল মালসাট দিয়ে কাপড় পরেছে। বগলে পাঁচনবাড়ি। বিনোদিনী অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলে, হাবল তার বাপের বলিষ্ঠ গঠনই পাবে। তার সমবয়সীদের চেয়ে সে এখনই অনেকখানি লম্বা। তবে আর বিনোদিনীর ভয় কি? হাবলের বড় হ'তে আর ক'দিনই বা!

—অমন ক'রে দেখছিস কি? আমাকে মুড়ি দিতে হবে না?

—মুড়ি পাসনি এখনও? তোর মামী বুঝি ঘাটে গেল। চট ক'রে ডেকে নিয়ে আয়!

বিরক্ত মুখে হাবল বললে, অত আমি পারব না। তুই দিবি তো দে, নইলে গরু খুলে দিয়ে চললাম।

বিনোদিনী হেসে বললে, আমি কি কোনো দিন মুড়ি দিই যে, আজকে দোব? তোর বাপু সবেতেই তাড়াতাড়ি।

—তবে থাক, আমি গরু নিয়ে চললাম।

ব'লে বীর দর্পে দু'পা বাড়িয়েই হঠাৎ থমকে গেল। সামনেই নিতাইপদ।

—কি রে, গরু ছেড়ে দিতে হবে না?

গুণ গুণ ক'রে হাবল বললে, মামী নেই। জলখাবার নিতাম।

নিতাইপদ স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ কণ্ঠে বললে, নেই তো তাকে ডেকে আনতে হবে, না এইখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে!

হাবল ভালোমানুষের মতো মামীকে ডাকতে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী।

মহামিলন

২

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা মহামিলনের কথা বলিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, যদি একান্ত ভাবে বিরহের হাত এড়াইতে হয় তবে মিলন যথেষ্ট নয়—মিশ্রণ চাই—"The soul has to be oned with Bliss—সেই আনন্দ-ঘনের সহিত একীভূত হওয়া চাই ; অর্থাৎ দ্বৈত ছাড়িয়া অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ইহা অনুভূতির বিষয়, আস্বাদনের বিষয়—তর্ক-যুক্তির বিষয় নয়। অতএব এ সম্পর্কে বাদবিবাদ করা খুবই অসঙ্গত। সেই জন্য আমরা বলিয়াছিলাম, এই মহামিলন যাঁহারা আংশিক ভাবেও আস্বাদন করিয়াছেন, বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিয়া ঐ সকল মিষ্টিকদিগের অনুভূতির সহিত পরিচয় করা আবশ্যক। সেই জন্য আমরা প্রথমতঃ বৈষ্ণবদিগের এবং পরে সুফিদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, কি বৈষ্ণব কি সুফি—ভগবানের সহিত গভীর একত্বের অনুভূতিই তাঁহাদের আস্বাদনের সার কথা।

এইবার খৃষ্টান মিষ্টিকদিগের কথা বলিব। প্রথম সেণ্ট অগাষ্টাইনের কথা শুনুন। তিনি বলেন প্রেমভক্তির লক্ষ্য কি ? (তাঁহার পরিভাষায় প্রেমভক্তির নাম 'Faith')

By Faith to love Him, by Faith to be devoted to Him, by Faith to enter into Him—to be incorporated in His members.

সেই গীতার প্রাচীন কথা—'ব্রহ্মভূত' সাধক সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়া ভগবানে পরাভক্তি লাভ করতঃ —

> ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্—গীতা, ১৮।৫৪
> —ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্

—ভগবান্‌কে যথার্থ ভাবে জানিয়া তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তাঁহার সহিত একীভূত হন।

জার্ম্মান মিষ্টিক মাইষ্টার একার্ট (Meister Eckhart) যেন এ কথার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—(তিনি গীতার একবর্ণও জানিতেন না)—

'If I am to know God directly, I must become completely He and He I : so that this He and this I become and are *one* I.'

আরও দুই জন খৃষ্টীয় মিষ্টিকের কথা শুনুন ঃ—

Perfect love makes God and the Soul to be as if they both together were but one thing.—Hilton's Scale of Perfection.

In this embrace and essential unity with God, all devout and inward spirits are one with God, by living immersion and melting away into Him···In this highest stage, the Soul is united to God without means, it sinks into the vast darkness of the Godhead.—Ruysbroeck

কোন কোন খৃষ্টান মিষ্টিক ইহারও ঊর্দ্ধে উঠিয়া মহামিলনের একাকারতায় অভিভূত হইয়া বুদ্ধদেবের শূন্যতাসিদ্ধির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

Some even go a step further and speak of the "fathomless sinking of the Soul into a fathomless Nothing" (Tauler), of "the Soul being rapt into the nakedness of Nothing" (Henry Suso),"of the Self being annihilated in some mighty Life, that overpasses his own" (Underhill). Hear Ruysbroeck :—"Having obtained the immediate contact of the Divine, we are immersed in *Nothingness.*"

এই Nothingnessই কি বুদ্ধদেবের 'শূন্য' নহে? যে জন্য তাঁহার এত নাস্তিক্য অপবাদ! অথচ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যাহা শূন্যবাদীর শূন্য, তাহাই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ তৎ

কারণ, একদিকে তিনি পূর্ণ (Plenum) পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্—অন্য দিকে তিনি শূন্য (Nihilum)—শূন্যং শূন্যং মহাশূন্যং। বস্তুতঃ উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম (অথাত আদেশো নেতি নেতি) শূন্য বই আর কি?

সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের 'immersion in the Nothingness' প্রভৃতি মহামিলনের বিশেষণে, বুদ্ধদেব কেন নির্ব্বাণকে শূন্যতাসিদ্ধি * বলিয়াছেন, আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইলাম।

---

* শূন্যতো অনিমিত্তো বৈ বিমোক্ষো যস্য গোচরঃ—ধর্ম্মপদ

শূন্যে চ নিধনম্ এতি—উপনিষদ্

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মিষ্টিক প্রেমের ভাষায় (using more personal and intimate language) যাহাকে মহামিলন বা Mystic Marriage বলেন—('a perfect uniting and coupling together of the Lover and the Beloved into One' * (Hilton)—বৈদান্তিকের প্রজ্ঞার বচনে (sounding an impersonal metaphysical chord) তাহাই ব্রহ্মসাযুজ্য বা self-identification with God in মোক্ষ or নির্ব্বাণ।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—ইহাকেই ত' মিষ্টিক "Immersion in the Absolute, Amalgamation with God, Self-loss in the All, বলিলেন। অতএব নাম লইয়া বিবাদ করি কেন? What is in a name?

সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে কেহ সত্যরূপে, কেহ সুন্দর রূপে দর্শন করেন ঃ—

Everywhere he sees, according to his temperament and mood, Rhythm, Order, Beauty, Love and benificient Law.

—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism.

যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্কর, হেগেল, প্লেটো, প্লোটাইনাস্-এর দৃষ্টিতে তিনি সত্যস্বরূপ। প্লোটাইনাসের ভাষায় মুক্তির নাম The flight of the alone to the Alone। তখন মানুষ 'becomes one with the Godhead'। প্লোটাইনাস্ বলেন—

I believe then that I verily belong to a higher and better world, and strive to develop within me a glorious life, and become one with the Godhead.

ইহা সাধনের অবস্থা—কিন্তু যখন সিদ্ধি সাধকের করতলগত হয়, তখন—

What then must he experience who now beholds the absolute beauty in and for itself in all its purity, without corporeal shape, freed from all bondage to time and space? And this therefore is the life of the gods and of divine and happy men, a liberation from all earthly concerns, a life unaccompanied with human pleasures, and the *flight of the alone to the Alone.*

ইহাই বৈদান্তিকের মোক্ষ বা সোহং সিদ্ধি—উপনিষদের—'অহং ব্রহ্মাস্মি' —অহম্ এব পরম্ ব্রহ্ম', গীতার 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ' (Divine similitude),

* In this 'one-ing' consists the marriage which passeth between God and the Soul that shall never be dissolved or broken.—Hilton

সুফির 'অয়েনউল হ'ক', ক্রাইষ্টের 'I and my Father are one'। এ সম্বন্ধে মিষ্টিকের উক্তি এই :—

When I love God with my will, I transform myself into Him."

St. Bernard

'My Being is God, not by simple participation but by a true *transformation* of my Being.'—St. Catherine of Genoa.

"Our Lord says to every living soul, 'I became man for you. If you do not *become* God for me, you do me wrong.'—Eckhart

বস্তুতঃ ইহাই ত' জীবের প্রকৃত নিয়তি। তাঁহার সন্ধানে লোক লোকান্তরে, দূর দূরান্তরে যাইতে হয় না। তিনি দূরাৎ সুদূরে নন—অতি সন্নিকটে—

'Closer is He than breathing, nearer than our hands and feet.'

অতএব—

To mount to God is really to enter into one's self.

কারণ, তিনিই ত' 'হৃদি অয়ম্'—তিনিই ত' 'গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' —তিনিই ত' 'হৃদ্‌পদ্মকোশে বিলসৎ তড়িৎপ্রভম্'—তাঁহারই চকিত চমৎকৃতিতেই ত' আমাদের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত।

অতএব—

'Dive into the temple-cave of thine own self (Tennyson)—কারণ, 'the road to truth and thus to God is shortest when we search for Him within ourselves'. (Rom Landau).

Oh Lord ! I thought you hidden
Most secret and apart
But I found your dwelling
Is here within my heart.

অতএব আত্মানম্ অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্—কারণ, তাঁহার সহিত মহামিলনই জীবের চরম-পরম পুরুষার্থ।

এই মর্ম্মে খৃষ্টান মিষ্টিকও বলিয়াছেন—

'Heaven is within you and whoever shall know *himself* shall find it'. For 'individual man is one with God and is of His very nature—in essence and existence.'

The Great Self and man's little self are *one*, for is not man a particle

of what Emerson has called the 'Oversoul', from whom he is separated only by the intervening barrier of *Maya.* *

কিন্তু

'He who inwardly entereth and intimately penetrateth into himself, gets above and beyond himself,and truly mounteth up to God."—From a Tract attributed to Albert the Great and cited by Underhill on page 364.

সেইজন্য মানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—'অসতো মা সদ্ গময়'—মিষ্টিক কবি Blake-এর প্রার্থনা—

O Saviour, pour upon me thy Spirit of meekness and love,
Annihilate the Selfhood in me : be thou all my life.

বস্তুতঃ—

Everything seems to be full of God's reflex—if we could but see it (Charles Kingsley) । অতএব আমাদের উচিত—to induce that serene and blessed mood in which we become a living soul and see into the life of things (Wordsworth).

এইরূপে যদি আমরা—

May become one of those organic harps divinely framed
—আমারে কর তোমার বীণা—
'That tremble into thought, as o'er them sweeps
Plastic and vast, one intellectual breeze,
At once the soul of each, and God of all. (Coleridge)

—তাহা হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিব—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ (গীতা) ।

---

* সেই জন্য Christian Science বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—What is the Ego, whence its origin and what is its destiny ? The Ego-man is the reflection of the Ego-God ; the Ego-man is the image and likeness of perfect Mind, Spirit, Divine principle.

He is the Infinite Spirit including us as well as all else beside, yet in essence the life of God and the life of man are identically the same, and so are *one.*

তখন—

'Raise the stone and there thou shalt find Me ; cleave the wood and there am I.' (Logia of Christ)

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে

তখন অনুভূতি হইবে—

God is all and all things are God—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—'All life and force and matter are modes of His existence.'

Within man is the soul of the whole, the wise Silence, the eternal One. And this deep power in which we exist, and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing and perfect in every hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object are one.—Emerson's 'The Over-Soul'

অপরে—যেমন বুদ্ধদেব, সক্রেতিস, কন্‌ফুচি—তাঁহার শিব-স্বরূপ দর্শন করেন—যে ভাবে তিনি 'ধর্ম্ম', Law, Order, Harmony।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ উপনিষদ্

অর্থাৎ sweetly and mightily ordereth all things.

বুদ্ধদেবের উক্তি শুনুন ঃ—

Through life, till I reach Nirvana, I will put my trust in the Law (ধর্ম্ম)—

The Law as it has been in the ages that are past
The Law that will be in the ages that are to come
The Law as it is in this present age,
I worship continually.
I have no other Refuge,
The Law is my best Refuge ;
By the truth of these words
May I conquer and win the victory.—পতিমোক্‌খ সুত্ত

স্মরণ রাখিবেন, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে এই 'ধর্ম্ম' is not a mere abstraction ; it is a mighty Power that permeates the whole universe and 'the heart of It is Love, the end of It is peace and consummation sweet.'

সক্রেতিসের মতানুসারী প্লেটোর দৃষ্টিতে বিশ্বের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, harmony, order, plan।

Every particular thing is related to a general concept, whose essence is an Idea of the Divine Mind.

'For he who hath thus far had intelligence of love and hath beheld all fair things *in order and aright*—he, drawing near to the end of things lovable, shall behold Being marvellously fair : One who is from everlasting, and neither is born nor perisheth, nor can wax nor wane nor hath change or turning or alteration of fair or foul…but Beauty only, and alone and separate and eternal, which, albeit, all other fair things partake thereof and grow, and perish, itself without change or increase or diminution endures for everlasting—Plato's Symposium

ইহা হইতে সেই সত্যং-শিবংকে সুন্দরংরূপে দর্শন করা অ-বিদূর—যে ভাবে যিশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব, বিল্বমঙ্গল, সুফিরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। সুফি কবি জামী-র একটি উক্তি শুনুন—

Each speck of matter did He constitute
A mirror, causing each one to reflect
The beauty of His visage. From the rose
Flashed forth His beauty and the nightingale
Beholding it, loved madly.
From that fire
The candle drew the lustre, which beguiles
The moth to immolation. On the sun
His beauty shone, and straightway from the wave
The lotus reared its head.
Each shining lock
Of Leyli's hair attracted Majnun's heart
Because some ray divine reflected, shone
In her fair face.
His beauty everywhere doth shed itself,
And thro' the forms of earthly beauty shines,
Obscured as thro' a veil.*

* The nature-mystic senses the hidden divine axes of structure in the ferns of wave and peak and cloud, in the delicacy and grace of fern and flower, in the beauty of the human face, in the flowering of love in the heart of man.—C. Jinarajadasa's Nature of Mysticism, p 44.

That heart which seems to love
The fair ones of this world loves Him alone.
He alike
The treasure and the casket. I and Thou
Have here no place and are but fantasies
Vain and unreal. Silence !

প্রেমধর্ম্মের আলোচনায় এই চির-সুন্দরের কথা আমাদের অনেকবারই বলিতে হইয়াছে—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার
তুমি অনন্ত চির বসন্ত অন্তরে আমার !—রবীন্দ্রনাথ

অন্যভাবে এই মহামিলনকে জীবের স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন (the Return *Home* of the Exiled Native) বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি এবং বুদ্ধদেব ঐ ভাবেই মোক্ষ ও নির্ব্বাণের বর্ণন করিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধাম (home) বলি, তাহার প্রাচীন নাম 'অস্ত'—

ঋণাভা বিভ্যদ্‌ ধনমিচ্ছমানঃ
পরস্য অস্তম্‌ উপনক্তম্‌ এতি—ঋগ্‌বেদ

'ঋণ ভয়ে ভীত অধমর্ণ ধনের ইচ্ছায় রাত্রিতে পরের অস্তে (গৃহে) প্রবেশ করে।'

ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিতেছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্‌ এহি—১০ম মণ্ডল

'হে জীব ! সমস্ত মলিনতা পরিহার করিয়া আবার অস্তে ফিরিয়া আইস।' নির্ব্বাণী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের উক্তি এই—

অত্‌থং গতস্‌স পমানং নত্থি (অস্তং গতস্য প্রমাণং নাস্তি)

যিনি 'অস্তংগত', কে তাঁহার ইয়ত্তা করিবে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ এই—
'Of him who has gone *home* there is no measure'

আমাদের প্রকৃত 'অস্ত' কি ? What is our true home ? আমরা পান্থ—প্রবাসী, 'Pilgrims of an inward Odyssey'

শুন পান্থ ! পুরাতন বাত
কোন মুলুকসে আয়সি হংসা
উৎরঙ্গে কোন ঘাট ?—কবীর

সেইজন্য মিষ্টিকেরা বলেন 'the *homeward* course of pilgrim-man'—সেইজন্যই তাহার Nostalgia (home sickness)—ওকঃ-লালসা—

Rapture is a great help to recognise our *true home* and to see we are pilgrims here.—St. Teresa

The goal is no mere vision but a *home*.—St. Augustine.

আমাদের প্রকৃত 'অস্ত' বা ধাম কি ? ব্রহ্মই আমাদের ধাম—বিশতে ব্রহ্ম-ধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

For, we, having been emanated from God, as sparks from the flame, God is our true home—our *asta* or *dhama*.

Trailng clouds of glory do we come
From God who is our home.
—Wordsworth

'And man reaches *home* when he is unified with God.'

God is near us but we are far from Him ; God is within, we are without ; God is *at home*, we are in the far country.—Eckhart

God, says St. Augustine, is the country of the soul, its *home*
—Ruysbroeck

এই অস্তে প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় কি ? এক কথায়, প্রেম অথবা প্রণিধান—

This he does by the love-magic used in Mysticism or by the wisdom-stairway built by Vedantism.—God as Love

বৈদান্তিক প্রণালীর সার কথা—অন্বয়-ব্যতিরেক—twofold Affirmation—'সোহং' এবং 'অহং এতৎ ন'। বেদান্তের অভিমত প্রণিধানের ফলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য—self-mergence in the Principle of Life—Flight of the alone to the Alone'। আর বৈষ্ণবের অভিমত প্রেমের ফলে মহামিলন—supreme communion—Mystic union—যে মিলনে বিরহ নাই—যাহা অচ্ছেদ্য, অশ্লেষ্য, অবিকার্য্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝোট্টন ও লোট্টন

[১]

যে কালের কথা বলছি, তখন আমি বাংলাদেশের কোন একটি সহরে বাস করতুম,—কলিকাতায় নয়।

পাড়াগাঁয়ে সহরের নানা অভাব থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষের অভাব নেই অর্থাৎ,—জমির। সহরের ভিতরে না হোক বাইরে দেদার জমি পড়ে আছে,—জঙ্গল নয়, ধানের ক্ষেত। আর সেই সব ধান-ক্ষেতকে কেউ কেউ প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়ীতে পরিণত করেছেন। আমি যে বাড়ীতে বাস করতুম, সেটা ছিল সেই জাতের বাড়ী।

সে বাড়ীতে বারো হাত কাঁকুড়ের বীচি-গোছ একটা মস্ত আস্তাবল ছিল,—বসতবাড়ীর গা ঘেঁসে নয়, হু'তিন রসি দূরে বড় রাস্তার ধারে। সে আস্তাবলে ছিল মস্ত একটা গাড়িখানা, তার হু'পাশে হু'টি ঘোড়ার থান, আর তার ওপাশে সইস-কোচমানদের সপরিবারে থাকবার ঘর। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন সেখানে গাড়িও ছিলনা ঘোড়াও ছিল না, মানুষও থাকৃত না। ছিল শুধু ইঁদুর ও ছুঁচো, টিকটিকি ও আরসোলা; আর সেখানে যাতায়াত করত গো-সাপ ঢোঁড়াসাপ আর গিরগিটি,যাদের দেখবা মাত্র আমাদের নীরব ও নিরীহ বিলিতী শিকারী কুকুরটা তন্মুহূর্ত্তে বধ করত; অথচ তাদের মাংস খেত না। সে ছিল ইংরেজরা যাকে বলে real sportsman। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন," এ উপদেশ তাকে দেওয়া ছিল নিষ্প্রয়োজন; কারণ ফলনিরপেক্ষ হত্যাই ছিল তার স্বধর্ম্ম।

[২]

একদিন সকালে আমাদের বাড়ীর বারান্দায়-বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলুম সেই পোড়ো আস্তাবলে কে মহা চীৎকার করছে। কানে এল আমা-দের মালী চিনিবাসের গলার আওয়াজ। সে তারস্বরে "নিকালো নিকালো" বলে চেঁচাচ্ছে। বুঝলুম যার প্রতি এ আদেশ হচ্ছে, সে পশু নয়—মানুষ।

এই গোলমাল শুনে আমি ও আমার এক আত্মীয় উপেনদাদা হুজনে সেখানে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি আস্তাবলে গাড়িখানার মেঝেয় হুটি লোক বসে আছে। হুজনেই সমান অস্থিচর্ম্মসার, আর হুজনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই

হোক, তারা শুকিয়ে মুকিয়ে আমচূর হয়ে গেছে। তারা যে চিনিবাসের কথা অমান্য করছে, তার কারণ তাদের নড়বার চড়বার শক্তি নেই। এমন কঙ্কালসার মানুষ জীবনে আর কখনো দেখিনি। তারা যে এখানে চলে এল কি করে, তা' বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় আকাশ থেকে পড়েছিল।

উপেনদা এদের দেখবামাত্র চিনিবাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বেরিয়ে যাও" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। আমি ও-দুজনকেই থামালুম। আমি মনিব, সুতরাং আমি এক ধমক দিতেই চিনিবাস চুপ করলে। আর যদিও আমি তখন 4th Class-এ পড়ি, আর উপেনদা বি-এ পড়েন, তবু তিনি জানতেন যে মা আমার কথা শোনেন, তাঁর কথা উপেক্ষা করেন। তিনি ভাবতেন তার কারণ অন্ধ মাতৃস্নেহ, কিন্তু আসলে তা' নয়। তার যথার্থ কারণ, মা ও আমি উভয়েই এক প্রকৃতির লোক ছিলুম। অপর পক্ষে, উপেনদার মতে, নিজের তিলমাত্র অসুবিধে করে' অপরের জন্য কিছু করা অশিক্ষিত নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

সে যাই হোক, আগন্তুক দুটিকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম যে, তারা দুজনে ভাই। কিন্তু কোন দেশ যে তাদের দেশ তা' তারা বলতে পারে না, কারণ তাদের নাকি "কুছ্ ইয়াদ নেই"। তাদের আছে শুধু পেটে ক্ষিধে আর মনে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে। তারা আসছে বহুদূর থেকে, আর দু'দিন আমাদের এখানে থাকতে চায়। আর তাদের নাম ঝোট্টন ও লোট্টন। আমি সব দেখেশুনে বল্লুম—"আচ্ছা, তুম-লোক হিঁয়া রহেনে সক্‌তা"। তার পর মার কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিলুম। উপেনদা মাকে ভয় দেখালেন যে ও-দুজন ডাকাত, আর এসেছে আমাদের বাড়ী লুটে নিয়ে যেতে। মা হেসে বল্লেন—"যে রকম শুনছি তাতে ওরা ভূত হতে পারে, কিন্তু ডাকাত কিছুতেই নয়।"

[৩]

ফলে ঝোট্টন ও লোট্টন আমাদের আস্তাবলেই থেকে গেল। মা ওদের দুবেলা খাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন ও দুদিন পরে ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বল্লেন এদের চিকিৎসা করতে অনেক দিন লাগবে, তাই হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। চিনিবাস পরদিনই তাদের দুজনের হাত ধরে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু হাঁসপাতাল তখন ভর্ত্তি, তাই সেখানে তাদের স্থান হল না। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু চিনিবাসকে বল্লেন—রোজ সকালে

একবার করে এদের নিয়ে এস, নিত্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেব। ঝোট্টন রোজ যেতে রাজি হল, কিন্তু লোট্টন বল্লে সে রোজ অতদূর হাঁটতে পারবে না। চিনিবাস তখন প্রস্তাব করলে যে সে লোট্টনকে পিঠে করে রোজ হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে ও ফিরিয়ে আনবে। আর বাস্তবিকই দিন পোনেরো ধরে সে তাই করলে। লোট্টন দু'পা দিয়ে চিনিবাসের কোমর জড়িয়ে ধরত, আর দু'হাত দিয়ে তার গলা। চিনিবাসের এই কার্য্য দেখে আমরা সকলেই অবাক হতুম! মা বলতেন—চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা।

এত করেও কিন্তু কিছু হল না। লোট্টন একদিন রাত্রে শুয়ে সকালে আর উঠল না। চিনিবাসই তার সৎকারের সব ব্যবস্থা করলে। লোট্টনকে মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে, সে পোড়াতে নিয়ে গেল। একা নয়, আর জন তিনেক জাত ভাই জুটিয়ে। মা তার খরচ দিলেন এবং চিনিবাসকে ভাল করে বক্‌শিস্ দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু এ বিষয়েও উপেনদা তাঁর আপত্তি জানালেন। তাঁর কথা এই যে, লোট্টনের সব খাবার চিনিবাস খেত, আর লোট্টন না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি চিনিবাসকে লোট্টনের খাবার খেতে দেখেছ?" তিনি বল্লেন, "না, ঝোট্টনের মুখে শুনেছি।" মা আর কিছু বল্লেন না।

[৪]

তারপর সন্ধ্যেবেলায় চিনিবাস লোট্টনের মুখাগ্নি করে ফিরে এল; এসেই ঝোট্টনের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। চিনিবাসের চীৎকার শুনে আমি আর উপেনদা আস্তাবলে গেলুম। গিয়ে দেখি চিনিবাস এক একবার তেড়ে তেড়ে ঝোট্টনকে মারতে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। তার চেহারা ও রকম-সকম দেখে মনে হল, চিনিবাস শ্মশান থেকে ফেরবার পথে তাড়ি খেয়ে এসেছে। শেষটা বুঝলুম যে ব্যাপার তা নয়। লোট্টনের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, তাই নিয়ে হচ্ছে ঝগড়া। ঝোট্টন বলছে যে, সে যখন লোট্টনের ভাই, তখন সে-ই ওয়ারিশ। আর চিনিবাস বলছে যে, লোট্টন মরবার আগে তাকে বলে গিয়েছিল যে,—আমার যা কিছু আছে তা তোমাকে দিয়ে গেলুম।

লোট্টনের থাকবার ভিতর ছিল একখানি কম্বল আর একটি লোটা। ঝোট্টন কম্বল দিতে রাজি ছিল, কিন্তু লোটাটি কিছুতেই দেবে না বল্লে। কম্বলটি

বেজায় ছেঁড়া-খোঁড়া, তবে লোটাটা ছিল ভাল। আমি ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলুম। তবে এ মামলার বিচারটা একদিনের জন্য মুলতবি রাখলুম।

[৫]

তার পরদিন সকালে চিনিবাস এসে বল্লে যে, কাল রাত্তিরে ঝোট্টন লোটাটা নিয়ে ভেগেছে, আর ফেলে গিয়েছে সেই ছেঁড়া কম্বলখানা। চিনিবাস রাগের মাথায় আরও বল্লে—"ও শালা চোর হ্যায়, উস্‌কো রাস্তামে পকড়কে মারকে ও লোটা হাম লে লেগা।" এ কথায় উপেনদাও রেগে তাঁর হিন্দীতে জবাব দিলেন—"তুমি চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়া থা, না পেরে এখন ঝোট্টনকে খুন করতে চাতা হ্যয়। ঐ লোটার লিয়ে তুমি লোট্টনকো পিঠে করে হাঁসপাতাল যাতা আতা থা। আর তার মরবার পরও লোট্টনের জাতবিচার নেই করকে তার মড়া কাঁধে করেছ। তোমি মানুষ নেহি হ্যয়,—পশু হ্যয়।" চিনিবাস জিজ্ঞেস করলে—"মুর্দ্দা কোন জাত হ্যয় বাবুজি ?"

এর পর চিনিবাস ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল—উপেনদার কটু কথা শুনে নয়, হারাধন লোটার দুঃখে। ইতিমধ্যে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন—এত দুঃখ কিসের ? চিনিবাস বল্লে—"হমারা জরুকো বোল্‌কে আয়া যো একটো আচ্ছা লোটা লা দে গা। বেগর লোটা ঘর যানেসে উস্‌কা সাথ লড়াই হোগা। ও ভি হামকো মারে গা, হাম ভি উস্‌কো মারে গা। ওঠো ছোটা জাতকে ওউরৎ হ্যয়, উস্‌কো মারনে সে ও ভাগে গা। তব্ হামরা ভাত কোন পাকায় গা ? হাম ভুকসে মরে গা।"

এ বিপদের কথা শুনে মা বল্লেন—"আমি তোমাকে একটা নতুন ঘটি কিনে দেব।" আশা পেয়ে চিনিবাস শান্ত হল।

সমস্যা

এ অকিঞ্চিৎকর ঘটনার গল্প আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এই যে, মা বলেছিলেন চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা। আর উপেনদা বলেছিলেন যে, সে মানুষ নয়, পশু। আমি বহুকাল বুঝতে পারি নি, এঁদের কার কথা সত্য। এখন আমার মনে হয় যে, চিনিবাস দেবতাও নয়, পশু ও নয়,—শুধু মানুষ। যে অর্থে ঝোট্টন লোট্টনও মানুষ, আমি আর তুমিও মানুষ।

—আপনারা কি বলেন ?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শিল্প ও স্বাধীনতা

স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে অহৈতুক গৌরববোধ সকল মানুষের স্বভাবগত; এবং আবাল্য অকর্ম্মণ্যতা সত্ত্বেও আমাকে যদিও গুরুজনেরা চিরকাল ধ'রে কোনো এক পরোপকারী পশুর সমপর্য্যায়ে ফেলে আসছেন, তবু অন্তত আকারে-প্রকারে সেই স্বনামধন্য জীবের বিজাতীয় হওয়ায় আমিও নিজের মেধা আর ব্যুৎপত্তির উপরে মানবোচিত আস্থা রাখি। কিন্তু বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, তার কাছে আত্মপ্রসাদও প্রশ্রয় পায় না; এবং গণিতব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের মুখে যখন শুনি যে বস্তুবিশ্বের আদিম ও ক্ষুদ্রতম অধিবাসী পরমাণুর বিস্তার একেবারে অনন্ত, তখন আর এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে আমার মতো নির্ব্বোধের পক্ষে পরাবিদ্যা আর পদার্থ-বিদ্যা দুইই অনধিকার চর্চ্চা এবং নেতিবাদের স্থানে অনিশ্চয়বিধিকে বসিয়ে আমি ধীশক্তির পরিচয় দিচ্ছি না, আমার মর্ম্মান্তিক অবিদ্যাই ফুটিয়ে তুলছি। অবশ্য আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রে অনেকেরই প্রবেশ ব্যাহত; এবং আমাদের আত্মশ্লাঘা সচরাচর এত দুর্মর যে পারিভাষিকের ধাক্কায় তা শুধু মচ্‌কায়, ভাঙে না। কিন্তু সম্প্রতি এই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি; এবং আপেক্ষিক বা বৈশেষিক তত্ত্ব দূরের কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ্যেও আমার দৃষ্টি প্রতিষিদ্ধ। উদাহরণত পাশ্চাত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য; এবং গত বিশ বছর যাবৎ সে-অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা যেহেতু আগামী প্রলয়ের নিরন্তর বিভীষিকা দেখছে, তাই সেই অমোঘ সর্ব্বনাশের অভ্যর্থনায় তাদের প্রাণপাত প্রযত্ন আমার অনুসারে নিছক পাগলামি। কিন্তু অর্দ্ধেক পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত—এমন ধারণাও অন্যায়, এবং এ-রকম সিদ্ধান্ত আরো অমূলক যে আত্মম্ভরি সমাজপতিরা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে স্বদেশীয়দের ক্ষেপিয়ে অহরহ নিজের আর পরের যথাসর্ব্বস্ব খোওয়াবার মৎলব আঁটছেন। কারণ ধনিক শ্রেণী আর যাই হোক, একেবারে মূঢ় নয়; যে-কুলি-মজুরদের তারা চরিয়ে খায়, তাদের সমান বিবেচনা বোধহয় ফোর্ড্‌-রকিফেলার-এরও আছে; ধনকুবেররাও নিশ্চয় ভোগের জন্যেই টাকা জমায়, প্রভাব-ও প্রতাপ-অর্জ্জনের আশাতেই অনুগতদের পিষে মারে। সুতরাং পৃথিবীকে

শ্মশান বানানোর জন্যে শ্রেষ্ঠীদের বহুবিজ্ঞাপিত ষড়যন্ত্র আমার অবিশ্বাস্য লাগে ; আমি বুঝতে পারি না যে নগর-গ্রাম উড়িয়ে পুড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের গলা কেটে, মানবসভ্যতার উচ্ছেদ সেধে দু-চারজন অতিজীবিত শক্তিশালীর কি লাভ। কিন্তু এ ধরণের প্রশ্নই হয়তো ছেলেমানুষি ; হয়তো জীবন্মুক্তেরাই নির্ব্বাচনক্ষম এবং মানুষ ফ্রয়েডী মুমূর্ষার পদানত ; হয়তো রাজনীতি কার্য্যকারণের ধার ধারে না ব'লেই হাল আমলে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পদবাচ্য। অথবা হিতৈষীদের অনুমানই ঠিক : কানের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক সর্ব্বত্র বিষমানুপাতিক নয় এবং আমার মতো দ্বিপদ জন্তুর মধ্যেও চতুষ্পদী মস্তিষ্ক সুলভ।

সৌভাগ্যবশত রাসভরাজ্যে সোঽহংবাদের প্রচলন নেই ; এবং অস্থিলোভী কুকুরের গতিবিধি যদি গাধার সম্বন্ধেও খাটে, তবে সে নিশ্চয় আত্মধিক্কারের আক্রমণে আত্মহত্যার শরণ নেয় না, নিঃসঙ্গ শূন্যে আর কিছু না পেলে, নিজের প্রতিবিম্বে প্রতিপক্ষ দেখে জীবোচিত প্রতিযোগ বাহাল রাখে। বোধহয় সেইজন্যেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের রহস্যকথনে নেমে হেগেল্ এক আর বহুর মধ্যে প্রভেদ করেন নি ; এবং ঘাত-প্রতিঘাতের চক্রবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁর শিষ্য মার্ক্স্ অরক্ষণীয় কৈবল্যকে প্রগতির চূড়ান্তে ঝুলিয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোকত স্বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতায় তাঁর বিন্দুবিসর্গ সংশয় ছিলো না। আমার বিশ্বাস, আধুনিক মনোবিজ্ঞান মার্ক্স্-এর অনুগামী ; এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের ইতিহাসে পরিণামী প্রকর্ষের পদধ্বনি শুনুন বা না শুনুন, অন্তত এ-বিষয়ে তাঁদের মতান্তর নেই যে ব্যক্তি যেকালে সমাজব্যবস্থার দাস আর সমাজব্যবস্থা ভূতপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী, তখন নিরঞ্জন বিবেক কবিকল্পনার পরাকাষ্ঠা এবং নির্লিপ্ত বিবেচনা আবশ্যিক পক্ষপাতের নিমিত্তমাত্র। অবশ্য এ-সিদ্ধান্তে সায় দিলেও সংসারযাত্রার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনিবার্য্য নয় ; বরং তার পরেই ঊর্দ্ধশ্বাস স্বর্ণমৃগের অনুধাবন ছেড়ে সনাতন সত্যসমূহের ধ্যান-ধারণা আমাদের আশুকৃত্য ; এবং অনেকে তাই উল্লিখিত বুদ্ধিবিভ্রাটের জন্যে আমার মতো দীর্ঘশ্বাস না ফেলে, শিল্পের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শান্ত, শিব, সুন্দরের আশাপথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু ক্রোচে-র আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও তাঁদের প্রতীক্ষা প্রায়ই বিফলে যায় ; অনির্ব্বচনীয় উপাদানে তাঁরা যে-'স্প্যানিশ্ দুর্গ' গড়েন, তার উপরে কদাচিৎ অনধিগম্য ভূমার ছায়া পড়লেও, তার ভিতরে মনুষ্যধর্ম্ম বাসা বাঁধে না, সংস্কৃতিবিনাশীরাই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকোয় ; এবং সে-শত্রু তাড়াতে

গেলে মায়াপুরী তো ধূলায় মেশেই, এমনকি স্থপতির জিজীবিষাও টি'কে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমার তুল্য নির্ব্বিবাদীর পক্ষেও শ্রেণিবিরোধের অস্বীকার অসাধ্য; এবং জন্মান্তরীণ জড়বাদের প্রকোপে আমি একদিকে যেমন সকল মানুষের নির্ব্বিকার সামান্যতায় আস্থাবান, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠার খাতিরে আমি অন্য দিকে মানতে বাধ্য যে আজকের অস্বাভাবিক অধিকারভেদ না ঘুচলে সে-মৌল সৌসাদৃশ্যের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। ফলত আজ ঐতিহ্যবিলাসী ই-এম্ ফর্ষ্ট'র সুদ্ধ সাধারণস্বত্বের দিকে ঝুঁকেছেন; কারণ তিনি উক্ত সংঘর্ষকে কেবল উত্তরসামরিক য়ুরোপের আধিদৈবিক ট্র্যাজেডি ব'লে চেনেননি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও হয়তো বুঝেছেন যে ট্র্যাজেডির উপসংহারে এরিষ্টটেলী চিত্তশুদ্ধি সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যে কলাকুশলীর তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যে তিনি বীতশ্রদ্ধ;—রূপকারেরাও কিছু না খেয়ে বাঁচে না, এবং খাদ্যসংগ্রহ ব্যয়সাপেক্ষ, অর্থাৎ পাকে-প্রকারে বিত্তবানেরই আয়ত্তে।

বলাই বাহুল্য যে উপরে যা বল্‌লুম, তাতে সাম্যবাদের নাম-গন্ধ নেই; বরং এতক্ষণ যে-মনোভাবের পরিচয় দিয়েছি, হয়তো একদিন তারই সাক্ষ্যে বামাচারীরা আমাকে দণ্ডনীয় ভাববে। তাহলেও ভারত ও স্পেনের মধ্যে সাত সমুদ্র, তেরো নদীর ব্যবধি বর্ত্তমান জেনেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে অপারগ; আমি আজ মানতে অক্ষম যে পশ্চিমের শ্রেণিবিচার আর প্রাচ্যের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিষম ধাতুতে গঠিত এবং প্রথমটার ভিত্তি যেমন অপ্রাকৃত বিসংবাদে, শেষোক্তের মূলে তেমনি অতিপ্রাকৃত অধিকারভেদ। অবশ্য শ্রমবিভাগের সুবিধা আমি বুঝি; এ-কথাও একাধিক বার শুনেছি যে বিশ্বের প্রাণ বৈচিত্র্য; দেহাত্মবাদী পাভ্‌লোভ্ যে শেষ পর্য্যন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর ভিতরে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন, তা সুদ্ধ আমার অবিদিত নয়। কিন্তু সে-পার্থক্যের গুণে উকিলের ছেলে ডাক্তারি পড়ে অথবা বৈজ্ঞানিকের ভাই কবিতা লেখে, মানবীর গর্ভে দেবতা জন্মায় না; এবং আসলে এ-রকম নানাত্ব আমাকে নিরবধি টানে ব'লেই রুষদেশী মধুচক্র আমার মতে হুলে ভরা। সম্ভবত সেইজন্যেই আমি সমাজব্যবস্থায় ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিতে অসম্মত; সেইজন্যেই আমি নিঃসংশয়ে বুঝি যে মানুষমাত্রেই যদি স্বকীয়তাবিকাশের সমান সুযোগ না পায়, তবে অচির ভবিষ্যতে দেশে দেশে তো রক্তগঙ্গা বইবেই, এমনকি তার পরে হয়তো যোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্য লুটে খাবার লোকও আর মিলবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ-আশঙ্কাতেও শুদ্ধ শিল্পীরা বিচলিত নন; এখনো তাঁরা স্বার্থসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর;

এবং উপস্থিত নিগ্রহনীতি তাঁদের কোনো প্রত্যাশাই না মেটালেও, অবস্থান্তরে পাছে আত্মরতিতে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁরা শশকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। অথচ লক্ষ্মীমন্তদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত ; সেই অধমেরা নাকি নিছক টাকার লোভে খেটে মরে, পুত্রার্থে পত্নী খোঁজে, পারিবারিক পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাকল্পে বর-রুচিদের অজ্ঞাতবাসে পাঠায়। কিন্তু রূপকারী বিবেক থেকে এ-সব আপদ-বালাই ইতিপূর্ব্বেই ঘুচলেও লোকোত্তর প্লেটো তাঁর আদর্শ গণতন্ত্রে কবিদের স্থান দিতে চাননি ; এবং তিন হাজার বছর ধ'রে অনেক ঠেকে লোকনায়কেরা সম্প্রতি শিখেছেন বটে যে প্লেটোনিক তিতিক্ষা অতিশয় অনাবশ্যক, তবু আধুনিকদের নিরাসক্ত সরস্বতীপূজা আজও শাসক সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল। তবে এই চিরকালীন মনোমালিন্যের জন্যে দায়ী স্বয়ং বাণীসেবকেরা ; কারণ নিজেদের সম্বন্ধে যে-কিংবদন্তী তাঁদের নিতান্ত প্রিয়, তা এই যে কাগজ-কলম একবার নজরে পড়লে আত্মপ্রকাশের প্রলোভনে তাঁরা একেবারে আত্মহারা হন।

পক্ষান্তরে প্রবাদ ও প্রমিতির প্রভেদ সর্ব্ববাদিসম্মত ; বরং প্রমাদের সঙ্গেই কবিপ্রসিদ্ধির সম্পর্ক নিকট ; এবং এ-কথা যদি মানি যে লেখকেরা আত্মপ্রকাশের গরজেই বই লেখেন, তবে এ-অনুমানও অস্বীকার্য্য যে মহাজন টাকা সুদে খাটিয়ে আত্মপ্রকাশের সুরাহা করেন। অবশ্য কর্ত্তা-ব্যতিরেকে কর্ম্ম দুর্ঘট ; অতএব কর্ম্মের উপরে কর্ত্তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। কিন্তু তাই ব'লে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা আর ব্যক্তিবাদের সমীকরণ সম্ভবপর নয়। একদল লোক যখন একটা গোখরো সাপের তাড়ায় দিগ্বিদিকে ছোটে, তখন তাদের প্রত্যেকের চাল-চালন নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু দূর থেকে তাদের চাঞ্চল্য দেখে যিনি ভাববেন যে তারা ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিশ্রমেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, তিনি হয় অন্ধ নয় ভাষাব্যবহারে অপটু। কারণ মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত, তেমনি শ্রুতি-স্মৃতির বশবর্ত্তিতা প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল ; এবং সত্যসত্যই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য থাকলে সে নিশ্চয় এমন কোনো অতিমর্ত্ত্য সত্তার অধীশ্বর, যার হ্রাস-বৃদ্ধি পার্থিব প্রয়োজনের প্রভাবমুক্ত। কিন্তু জন্মাবধি সেই রকম অদ্বয়,অব্যয় আত্মার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন শুনে শুনে আমার কর্ণপটাহই আজ বিদীর্ণপ্রায়, সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয়ে আমার দর্শনেন্দ্রিয় এখনো ধন্য হয়নি ; এবং দৈনিক পত্রে পড়ি বটে যে ভূতজগতের দিগ্বিজয় সেরে বিজ্ঞান ইদানীং প্রেতলোকে অভিযান পাঠাতে ব্যস্ত,

তবু দু-একজন বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে সে-দুর্ভেদ্য রাজ্যের যে-সংবাদ ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি, তাতে সে-দেশবাসীর অফুরন্ত আয়ুর প্রমাণ থাক বা না থাক, অন্তত এটুকু বোঝা গেছে যে সেখানে প্রতিভার চেয়ে মতিভ্রমের আদর বেশী। বুঝি বা সেইজন্যেই সর্পাঘাত আসন্ন জেনে আর্ত্তেরা অমর আত্মার আশ্বাসে বুক বাঁধতে পারে না এবং অন্তর্যামীর আশীর্ব্বাদে শাশ্বত সৌন্দর্য্য নখদর্পণে এলেও সৎ শিল্পী লোকরঞ্জনের অভিলাষেই আলস্য ভোলে। তবে সমষ্টিগণিতের মতে সঙ্কল্প-সিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্ব্বিপাক সংখ্যাভূয়িষ্ঠ; এবং পলাতকেরাও যেহেতু কালেভদ্রে অপঘাতে মরে, তাই মন যোগাতে গিয়ে কেউ কেউ কেবল বিরাগ জাগায়। তখন হতভাগ্যেরা অগত্যা আত্মসমাহিতি সাধতে বসে; কিম্বা উচ্চকিত ঐকতানে পান-বৈরী শৃগালদেরও ছাপিয়ে তারা অহরহ রটায় যে স্বকীয়তার নিষ্পেষণ চিরপ্রথার মৌরসী অভ্যাস। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস এ-রূপকথার প্রতিবাদী; এবং মৌখিক আলাপে মালার্মে-কে যতই স্বাবলম্বী লাগুক না কেন, খুঁজলে তাঁর জীবনবৃত্তান্তেও প্রচুর বিষয়াসক্তি বেরোবে। নচেৎ আপন কাব্যকলার ব্যাখ্যায় তিনি দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন না, নতুবা প্রতীকী কাব্যের সঙ্গে ভাগ্নারী সঙ্গীতের তুলনা হাস্যকর ঠেকতো, নয়তো তাঁর জটিলতার আড়ালে হেগেলী উৎক্রান্তির কম্বুরেখা ধরা পড়তো না, ভালেরি-র স্বপুচ্ছজীবী বাসুকিই উঁকি পাড়তো।

আসলে শিল্প আর অবচেতনার আদান-প্রদান বিংশ শতকী অপবিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, প্রাচীনেরাও বোধহয় তাকেই প্রেরণা বলতেন; এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সাত্ত্বিক ভাবচ্ছবির মধ্যে যৌন বিকারের সন্ধান যদি বা আধুনিক কুরুচিরই নমুনা হয়, তবু মনস্বী এলিয়ট্-ও মুক্তকণ্ঠে মেনেছেন যে বিষয়নির্ব্বাচন কবিদের অধিকারবহির্ভূত। হয়তো এইজন্যেই রসসৃষ্টির লক্ষণবিচারে তাঁর সঙ্গে এরিষ্টটল্-এর মতদ্বৈত নেই এবং সৎসাহিত্যের মায়া মুকুরে তিনিও ম্যাথ্যু আনল্ড্-এর মতো সাময়িক জীবনযাত্রার প্রতিবিম্ব দেখেন। কারণ অবচেতনার মূলে সহজাত প্রবৃত্তি থাকিলেও তার অতিজটিল শাখা-প্রশাখা আহত আকাঙ্ক্ষার গুপ্তি; এবং আকাঙ্ক্ষা এমনই একনিষ্ঠ যে অনর্থের মাঝখানেও সে অর্থকেই চায়। আড্লার-প্রমুখ ভূয়োদর্শীরা আবার প্রাক্তন প্রবৃত্তিতে বীতশ্রদ্ধ। তাঁদের মতে মানুষমাত্রেই একটা কোনো দৈহিক অভাব নিয়ে জন্মায়, যার ক্ষতিপূরণে তার সারা জীবন কাটে; এবং সাধারণত কানা-খোঁড়াই যেহেতু একগুণ বাড়া, তাই কবিসুলভ সংবেদনশীলতা

অনেক সময়েই নাকি অঙ্গহানির ফল। তবে সকল অভাব সমান লজ্জাকর নয় ; এবং মালার্মে-র মতো আগামী ক্লৈব্যে ভয় পেলে শূন্যবাদই অনন্য আশ্রয় বটে, কিন্তু বোদ্‌লেয়র-এর মতো বিধেয় হবির ভোক্তাকে আমরণ খুঁজলে অশুচি কবিতা লিখেও অবশেষে ধর্ম্মাত্মা উপাধি মেলে। অবশ্য মহৎ কবিদের চৈতন্য স্বভাবতই সুবিস্তীর্ণ এবং অবদমিত কামনা-বাসনার অত্যাচার তাঁদের ভাগ্যে হয়তো অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা পারিপার্শ্বিকের তোয়াক্কা রাখেন না, এ-রকম দাবি পোষণীয় নয় ; বরং শেক্‌স্‌পীয়র-এর লেখায় তদানীন্তন ঘটনাঘটনের উল্লেখ এত বেশি যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত পরিশ্রমী পাঠকও সেখানে দিশাহারা। উপরন্তু সনেট্‌-সমূহের দৌলতে তিনি যতই অন্য কবিদের উপরে উঠুন না কেন,তবু সেগুলির রচয়িতা একজন উমেদার যিনি আশু অবস্থাপরিবর্ত্তনের লোভে অল্প বয়সে লণ্ডনে এসে, ক্রমশ সমস্ত আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে, বহু বৎসর ধ'রে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত দর্শকদের মন জুগিয়ে চ'লে, শেষকালে আশানুরূপ টাকা জমিয়ে গ্রামে ফিরে, উইল বানিয়ে সহধর্ম্মিণীকে সেরা খাটখানার ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। দান্তের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই ; কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে তিনিও প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যাকে ছন্দে বাঁধতে বাঁধতে ভূতপূর্ব্ব বন্ধুদের অক্ষয় নরকে পাঠিয়ে অসংখ্য দৈন্যগ্রন্থির গেরো খুলেছিলেন।

এইখানে একটা সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান আবরণীয়। নিরপেক্ষ শিল্প, নিরাসক্ত সাহিত্য যদি সোনার পাথরবাটি বা আকাশকুসুমের মতো নিরুপাখ্য পদার্থ হয়, তবে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আবেদন যুগে যুগান্তরেও ফুরোয় না কেন ? কিন্তু প্রশ্নটাকে এ-আকার দিলে সদুত্তরের আশা বিড়ম্বনা ; তার আগে বরঞ্চ এই কথাই জিজ্ঞাস্য যে শেক্‌স্‌পীয়র-এর গুণগ্রাহী পরম্পরার মধ্যে মিল কোথায় ও কতখানি। আমার বিবেচনায় সে-মিল শুধু শেক্‌স্‌পীয়র-এর নামে আর অভি-ধানে যথাযোগ্য শব্দের অভাববশত প্রত্যেকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে উপ-ভোগ-আখ্যার আরোপে। কিন্তু আসলে তাঁর সম্বন্ধে বেন্‌ জন্সন্‌-এর অবজ্ঞা বা স্যামুয়েল্‌ জন্সন্‌-এর উন্নাসিকতাই আজ আমরা বর্জ্জন করিনি, সুইন্‌বর্ন্‌-এর উচ্ছ্বাস বা সাইমন্স্‌-এর নার্সিসাস্‌-বৃত্তিও আমাদের কাছে সমান অসহ্য। এ-যুগ আজকালকার পরকলা প'রেই শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে, তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতরে আধুনিক সুখ-দুঃখই খোঁজে, হয়তো বোঝে যে টুডর রাজ্যের প্রজা ন্যায়ত

এলিজাবেথী সভ্যতার মুখপাত্র, তবু ভাবে ষোড়শ শতাব্দী যেহেতু উপস্থিত স্মৃতিরই অংশভাক্, তাই সাম্প্রতিক বিশ্ববীক্ষা-ব্যতিরেকে প্রত্নতত্ত্বেরও মর্ম্মগ্রহণ অসাধ্য। আমার বিশ্বাস, সাহিত্যিক অমরতার এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই এবং বোধহয় এইজন্যেই উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক। অবশ্য শিল্পীই শিল্পের জন্মদাতা; এবং শিল্পবিষয়ের নির্ব্বাচন হেতুপ্রভব বটে, কিন্তু মনোজগতে আমরা এখনো এত অপ্রতিষ্ঠ যে সেখানকার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা আজও আমাদের আয়ত্তে আসেনি। তাহলেও জন্মের পরে শিল্পসামগ্রী বস্তুজগতেরই অধীন; এবং অনেক দার্শনিকের মতে বস্তু যখন সকল সম্ভবপর প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র, তখন কলাবিচারে বিষয় গৌণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কলাবিতের সংঘটনীয় উপলব্ধিই মুখ্য। অর্থাৎ মহাকবিদের রচনা জড়প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয়; এবং আমাদের নিসর্গনিরীক্ষার দ্রুত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন বদলায় না, তেমনি নানা পাঠকের হৃদয়ে বিবিধ প্রতিঘাত জাগালেও কাব্যবিশেষের স্বরূপ অবিকার থাকে। কিন্তু এ-প্রকারভেদের একটা সীমা আছে; সংসারের বৈচিত্র্য শুধুই অমেয়, একেবারে অনন্ত নয়; এবং যে-ক্ষেত্রে অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে একাধিক পাঠকের মতিগতি মোটের উপরে এক রকম, সেখানে তাদের রসবোধও প্রায় অভিন্ন। সুতরাং প্রগতিসেবীরা সুদ্ধ মানবেন যে শেক্স্পীয়র সম্পর্কে ল্যাম্ব্-এর ভাববিলাস আজ নিতান্ত অপরাবর্ত্তনীয় নয় এবং দৈবাৎ তেমনিতর অবস্থায় পড়লে স্বয়ং ব্র্যাড্লে-ও হয়তো জীবনব্যাপী ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে শেক্স্পীয়রী নায়ক নায়িকার তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভুলে নিজেকে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেল্তেন।

উপরন্তু ধ্রুপদী কবিরাও কিছু জ্ঞাতসারে ঐকান্তিক একদেশদর্শিতা কাটিয়ে ওঠেন্ নি অথবা নৈরাত্ম রূপের প্রাণপণ ধ্যানে অমর বর পাননি, সেকালের উপসর্গও ছিলো আমাদের চেয়ে অনেক কম; এবং মার্ক্স্-এর ব্যাপক সিদ্ধান্ত অপ্রমাদ হোক বা না হোক, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্রও যখন ধনুর্ব্বেদের জোরেই দুর্ব্বৃত্ত দমন করেছিলেন, তখন সাধারণ জীবযাত্রার সঙ্গে প্রবর্দ্ধমান যন্ত্রশিল্পের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। উদাহরণত ব্রুনো আর আইন্ষ্টাইন্ তুলনীয়; এবং আমার মতো অবৈজ্ঞানিকের কাছে তাঁদের মূল বক্তব্য যদিও সমার্থবাচক, তবু এ-সত্য আমিও জানি যে প্রথমোক্তের নিষ্প্রমাণ জল্পনা-কল্পনা আধুনিক জোতির্বিজ্ঞানের আকার ধরেছে দূরবীক্ষণের গুণে, নব্য গণিতের প্রসাদে, বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় সাবকাশ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। অবশ্য

সাহিত্যের সাজ-সরঞ্জাম স্বভাবতই অল্প; এবং সেইজন্যে কণাদ ও প্লাঙ্ক্-এর মধ্যে যে-ব্যবধান দেখি, শেক্স্পীয়র-এর সনেট্ আর প্রুস্ৎ-এর 'সদম্ এ গমর' তদ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত নয়। কিন্তু শার্ল্স্-এর জন্ম যেহেতু অনুবীক্ষণ আবিষ্কারের পরে, তাই তার আর মিষ্টার ডব্ল্যু-এইচ্-এর পার্থক্য 'গ্র্যাণ্ড্ ক্যানিয়ন্' ও 'ফিফ্থ্ এভিনিউ'-এর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ মানবচৈতন্যের ধারা বরাবরই ঠিক আছে বটে, কিন্তু তার জটিলতা নিরন্তর বাড়ছে; এবং এর ফলে আজকালকার সমাজ শুধু শ্রমবিভাগেই বাধ্য নয়, এমনকি 'এণ্ট্রোপি' অনিবার্য্য ব'লে প্রাক্কালীন ব্যবস্থার স্থৈর্য্যও এখন অসম্ভব। সুতরাং শেক্স্পীয়র তো দূরের কথা, টেনিসন্-এর আমলেও দেশভক্তি, প্রেম, ঈর্ষ্যা,দম্ভ ইত্যাদি অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে যত সহজে কবিতা লেখা চলতো, সাম্প্রতিক কবিযশ আর তত অনায়াসলভ্য নয়; এবং ইদানীং সাবেকী বিলাসবস্তু যেমন নিত্যব্যবহার্য্য আসবাবের কোঠায় নেমেছে, তেমনি প্রাচীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য আবেগ আর কারো মুখে রোচে না, পাঠকমাত্রেই খোঁজে অনুভূতিবৈচিত্র্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে আবেগ অথবা 'ইমোশন্' অবিনশ্বর এবং অনুভূতি অথবা 'ফীলিং' ক্ষণভঙ্গুর; কারণ আবেগ দেহধর্ম্মেরই নামান্তর এবং দেহধর্ম্মের পরিবর্ত্তন এত মন্থর যে, তাকে অমর না-বল্লেও, দুর্ম্মর বল্‌তে আপত্তি নেই। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক আবার এখানে থামতেও অনিচ্ছুক। তাঁদের বিবেচনায় আবেগের শ্রীক্ষেত্রে জাতিবিচার নেই, একই আবেগ বহিরাশ্রয়ের তারতম্যে কদাচিৎ প্রণয়-নামে আত্মপরিচয় দেয়, কখনো বা ভয়ের আকার ধরে। এ-অনুমানে আস্থা থাকলে শেক্স্পীয়র-এর প্রবহমাণ প্রতিপত্তি আর বিস্ময়কর ঠেকবে না; বরং বোঝা যাবে যে মনুষ্য-প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত শেক্স্পীয়র-এর মর্য্যাদাক্ষয় অভাবনীয়; এবং তার পরেও হয়তো হৃদয়বীণার সব তার বদলাবে না, তিনি তখনো দু-একটাতে সনাতন ঝঙ্কার জাগাবেন।

কিন্তু সব কটাতে নয়; কারণ আমার প্রগতিক বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে তাঁরা নাকি ষড়রিপুর মধ্যে অন্তত মাৎসর্য্য জয় করেছেন। সুতরাং ওথেলো দেখে তাঁদের বোধহয় আর চিত্তশুদ্ধি ঘটে না, তাঁরা হাসতে হাসতে ট্র্যাজেডিখানাকে প্রহসনের পংক্তিতে ফেলেন। দুঃখের বিষয়, আমি এখনো সাধনার অত উর্দ্ধে উঠি নি; কাজেই আমার পক্ষে অমন দাবি অমার্জ্জনীয়। তবে আমিও হেন্‌রি জেম্স্-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের 'স্নবারি'

তাঁর আভিজাতিক অহঙ্কার, একটু কম্‌লে আমার উপভোগ নিশ্চয়ই অনেকখানি বাড়তো। জেম্‌স্ নিজে টুর্গেনিভ্-এর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন; এবং কলাকৈবল্যের অন্যান্য পুরোধারা এ-প্রসঙ্গে কখনো একমত নন বটে,তবু আমার পরিচিতেরাও 'শ্মোক্'-এর পাতা পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে বুঝেছেন যে এখানে লেখকের তথাকথিত নিরপেক্ষতা একটা ছদ্মবেশমাত্র; আসলে উদারনীতির প্রকাশ্য অবমাননা নিন্দনীয় জেনেই তিনি এই চাতুরী দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ঢাকতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এর বিপরীত পথে চলেন ব'লে লোকে ইতিমধ্যেই বর্নার্ড্ শ-এর নামে নাক সিঁট্‌কোয়। কিন্তু সুপ্রকট হিতৈষণা সত্ত্বেও ইব্‌সেন্ এখনো নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয়; এবং কিপ্লিং-এর নিঃসন্দেহ প্রতিভা যদিচ সাম্রাজ্যবাদীদেরই আবিষ্কার, তবু অলৌকিক গজদন্তমিনারে থেকেও ফ্লোবেয়র বুভার ও পেক্যুশে-র সংক্রাম এড়াতে পারেন নি। অর্থাৎ লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার সীমাসন্ধি অত্যন্ত অনিশ্চিত; এবং সাম্প্রতিক রুচিতে সংস্কারক যতই অনাচরণীয় ঠেকুক না কেন, স্বকীয়তা যেহেতু সকল রূপকারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই অল্প-বিস্তর বিজ্ঞাপনব্যতিরেকে কোনো উদীয়মান শিল্পীই অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা পান নি। বুঝিবা এইজন্যেই প্রথিতযশা কবিরা সমসাময়িকদের সমালোচনায় নেমে সাধারণত শোকাবহ অবিচারের প্রশ্রয় দেন; এক রকম সিদ্ধির সাধনায় জীবন কাটিয়ে তাঁরা সচরাচর ভুলে যান যে সৌন্দর্য্য যখন বহুরূপী, সত্য বহুভাষী ও কল্যাণ বহুব্যবসায়ী, সেকালে মহাজনের পদানুসরণ কীর্ত্তিকামীর প্রকৃষ্ট পন্থা নয়, গতানুগতিক রসধারার প্রণালীপরিবর্ত্তনেই সে সফলমনোরথ। কেননা আজকের প্রচারসাহিত্যে কালকের রসসামগ্রী; এবং মানুষ অভ্যাসের দাস হলেও, অবিকার উত্তেজনা এমনি নিদ্রাজনক যে নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ-এর মতো রক্ষণশীলও জ্ঞানত পিতৃ-পিতামহের ছিদ্রান্বেষণে বাধ্য। তবে বাঁচার জন্যেও হাসিমুখে শয্যাত্যাগ আমাদের ধাতে নেই; তাই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্-আদির আবশ্যিক বিদ্রোহ প্রথম প্রথম ভয়াবহ লাগে; এবং তখন আর পোপ্-ড্রাইডন্-কে ডেকেও কাব্যবিবেচকদের ঘুম আসে না, তাঁরা সারা রাত জেগে বজ্রকণ্ঠ প্রোপ্যাগ্যাণ্ডিষ্ট্‌দের যমালয়ে পাঠাবার মৎলব আঁটেন। কিন্তু সে-সময়ে কেউ মনে রাখে না যে একদা ঠিক উল্‌টো অপরাধেই ড্রাইডন্-এর ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা জুটেছিলো এবং সে-দিনে যে-এলিজাবেথী নাট্যকারেরা উক্ত নিগ্রহের উপলক্ষ্য জুগিয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের সাহিত্যসেবার প্রারম্ভে স্বাধিকার-

প্রমত্তদের সাধুবাদ কুড়োন নি, ধ্রুবপদী আদর্শের মানহানি-ব্যপদেশে রসিকের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন্।

অবশ্য আত্মপ্রচার আর প্রতিধ্বনিপরায়ণতা এক নয়; এবং স্বপ্রাধান্যের গুণগান যদিও বৈদগ্ধ্যসম্মত, তবু শ্রুতিধরের শিল্পসৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টিরই নামান্তর। কিন্তু কলাবিদ্যার ইতিহাসে এ-ধারণার সমর্থন নেই; এবং বড় চিত্রকর যেমন রাজন্যবর্গের ছবি এঁকেও স্বাধীনতা খোয়ান না, তেমনি বড় কবি অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গে আটকে প'ড়েই মুক্তিমন্ত্রের সাড়া পান। আসলে এইখানেই কলাকৌশলের সার্থকতা; এবং এই পরস্মৈপদী প্রকরণ কেবল ইস্কিলাস্, সফোক্লিস্, মলিয়ের, রাসিন প্রমুখ ধ্রুপদী লেখকের একচেটে নয়, ডান্-এর মতো উৎকেন্দ্রিক কবিও ব্যঞ্জনাপদ্ধতিকে ততখানি আয়ত্তে এনেই কাব্য ও ধর্ম্মযাজনার দোটানায় অবৈকল্য অক্ষুণ্ণ রেখে-ছিলেন। কারণ পুরাতন প্রবচনের মতে রচনারীতিই ব্যক্তিস্বরূপের অভিজ্ঞানপত্র; এবং মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু এ-বৈশিষ্ট্য এতই ভৌতিক, এমন গা-সওয়া যে, অন্যেরা কোন্ ছার, সে এজন্যে নিজেও নিজেকে অনুভব করে না, তার আত্মবেদ জাগে অনাত্মীয় সংসারের সংঘর্ষে; এবং যখন সেই ঘাত-প্রতিঘাত ফুরোয়, তখন ব্যক্তিত্ব বাহাল থাকলেও শুধু তার আত্মবিস্মরণই ঘটে না, এমনকি অনুকূল আবেষ্টন তাকে একেবারে ভুলে যায়। সুতরাং স্বনির্ব্বাচিত বিষয় আত্মো-পলব্ধির অন্তরায় বই সহায় নয়, এবং সেইজন্য যে-কবি প্রতিনিয়ত অন্তঃপ্রেরণার মুখাপেক্ষী, শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে তিনি চারিত্র্যকেই আঁকড়ে ধরেন আর ফলে তৎপ্রণীত সাহিত্যের স্বয়ংসিদ্ধি তো ঘোচেই, মনুষ্যোচিত স্বায়ত্তশাসনের দাবিও টিঁকে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষম মানুষ অব্যাহত বিচারবুদ্ধির ধার ধারে না; সে যেহেতু জানে যে নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন প্রায়োপবেশনের প্রকারভেদ, তাই সে হয় প্রবৃত্তির পরামর্শ শোনে নয় অভিজ্ঞের উপদেশ মানে; এবং আশ্চর্য্য এই যে এতেই তার স্বকীয়তা ফুটে ওঠে, স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকলে প্রতিকূল প্রতিবেশ পদে পদে তার বাদ সাধে। আমার বিশ্বাস, প্রাক্সামরিক রুষ সাহিত্যই এ-সত্যের একমাত্র সাক্ষ্য নয়, বিনিদ্র সরকারের অগণ্য বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও ভারতীয় লেখক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক পক্ষপাত আজ দেশবাসীর সুবিদিত; এবং এই সমস্ত আইন-কানুনের আগে কলম চালিয়েও বঙ্কিম রাজদ্রোহের উদ্গাতা হন নি, রাজভক্তিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। অতএব এ-রকম সিদ্ধান্ত হয়তো সমীচীন যে নির্ব্যূঢ় নিরা-

সক্তি নিতান্ত নিরর্থক, যে-সকল প্রত্যয় আমাদের ভাববিলাসের ভরণপোষণ ছাড়া অপর কোনো কাজে লাগে না, বোধহয় সেগুলোর সম্বন্ধেই বিবেক-বিবেচনা খাটে, অন্যত্র রাবণে না মারলে আমরা নিশ্চয়ই রামের হাতে মরি।

তথাচ নিজেকে অতটা পরজীবী ভাবলে শুধু মানুষের আত্মসম্মানেই ঘা লাগে না, হয়তো লোকযাত্রাও থেমে যায়; এবং সেইজন্যেই প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে মনের মৌল অখণ্ডতা হারিয়ে আমরা এখন চৈতন্যকে মোহমুগ্ধ মমত্ববোধের আধার বানিয়েছি। কিন্তু তাতেও আপদ চোকে নি; অনিকাম প্রতিবন্ধকের বৃদ্ধিবশত ব্যাপার সম্প্রতি এত দূর গড়িয়েছে যে আধুনিক জড়বিজ্ঞান আর কাকতালীয় ন্যায় ঝেড়ে ফেলে সন্তুষ্ট নয়, পদার্থবিদেরা ইদানীং এই সত্যপ্রচারে শতমুখ যে নিউটনী আপেলও মাধ্যাকর্ষণের অবশ। তাহলেও সাধ আর সাধ্যের বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচে নি; সভ্যসমাজে আমার মতো চিরবিফল ব্যক্তি এখনো সুলভ; এবং আমরা যেহেতু কার্য্যোদ্ধারে অক্ষম হলেও আত্মধিক্কৃত মুমূর্ষার উপাসক নই, তাই আমাদের পক্ষে কৃতী পুরুষের বিদূষণই অগতির একমাত্র গতি। অবশ্য প্রথম প্রথম এই পণ্ডশ্রম আমার কাছেও লজ্জাকর ঠেকতো; কিন্তু বয়সে আমি তখনো চল্লিশের উপান্তে পৌঁছোই নি। ফলত ভবিষ্যতের স্তোকবাক্যে ভুলে সেদিন নিজেকে সহজেই বোঝাতে পারতুম যে কেবল মনোবিকলনেই য়িহুদী অদৃষ্টবাদের ছায়া পড়ে নি, এমনকি মার্ক্‌স্‌-ও জন্মের গুণে অন্ধ নিয়তির অঞ্চলধারী। কিন্তু আমার অপদার্থতা আর নিজের কাছেও চাপা নেই, নষ্ট সুযোগের তেরিজ ক'ষে আজ আমি মানতে বাধ্য যে আমার সাহিত্যজীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে, তবু সেই অনুপকারী সঙ্কল্পের পিছনে কোনো চিন্ময় প্রেরণা ছিলো না, নৈমিত্তিক সংসারের নিষ্ঠুর প্রতিযোগে দুর্ব্বলের উচ্ছেদ অনিবার্য্য ব'লেই আমি শিল্পশুদ্ধির আওতায় আত্মরক্ষা করছিলুম। অতএব আজ মার্ক্‌স্‌ও আমার বিবেচনায় যথেষ্ট জড়বাদী নন; আমি এখন জানি যে সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমন্ত্র, তবু মনীষা আর অনুকম্পা অভিন্নহৃদয় এবং সর্ববগ্রাহ্য সমবেদনা অমানুষিক ও স্বতোবিরোধী; সম্প্রতি আর আমার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নেই যে রূপকার সমাজভুক্ত জীব, তার ব্যবসায় সমাজসেবার অঙ্গীভূত, যে-শক্তি সামাজিক পরিস্থিতির নিয়ন্তা, তাই সাহিত্যের প্রাণবস্তু, এবং নিরালম্ব কল্পনা নির্গুণ ব্রহ্মের চেয়েও নঙর্থক। কিন্তু আমি প্রগতিক বা সাম্যবাদী নই, একেবারে বুর্জ্জোয়া; সেইজন্যে শ্রেণিস্বার্থে আমি সকল

কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার উৎস খুঁজে পাই না, বুঝি যে মানুষী অভিজ্ঞার উৎপত্তি আরো নিম্নে, স্থূলতার সর্ব্বশেষ স্তরে। উপরন্তু গত পঞ্চ সহস্র বৎসরে এমন সিদ্ধান্তের অনু-মোদন নেই যে মনুষ্যজাতির মৌলিক স্বার্থসমূহ যুগে যুগে বদলায় ; বরঞ্চ তারপরে এই আশাই স্বাভাবিক যে বর্ত্তমান সমাজের ডায়ালেক্‌টিক্ পরিবর্ত্তন ঘটলেও মানুষ মানুষই থাকবে, আজ যা তার মর্ম্মে আলোড়ন জাগায়, কালও তা তাকে মাতিয়ে তুলবে। তবে তার নির্ব্বিকার চিত্তবৃত্তি সত্য, শিব, সুন্দরের নির্ব্বিকল্প নির্দ্দেশ নয়, এই চিরন্তন বিশ্বমানবিকতার আশ্রয় জাতিগত অচৈতন্যের অতলে ; এবং সেখানে ডুব দিলে কৈবল্যের সন্ধান মেলে না, পাশবিক প্রতীক, প্রাক্তন উৎকণ্ঠা, নিমজ্জিত অভিজ্ঞতার কঙ্কাল ইত্যাদির বিভীষিকা দেখে অসমসাহসিক কৌতূহলীরা সুদ্ধ চোখ বুজে দূরে পালায়, অন্যে পরে কা কথা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১২

খগেন বাবু পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মাসীমার সঙ্গে না দেখা করে থাকতে পারলেন না।

'তুমি আমাকে ডেকেছ ?'

'না ডাকলে আসতে নেই ?'

'তোমার শরীর কেমন ?'

'এ বয়সে যেমন থাকে।'

'কাল রাতে মাসীমা তোমাকে মনে পড়ছিল। অমনি! কোনো কারণে নয়।'

'এলেই পারতে। ছেলেটি কাল এসেছিল।'

'ওঃ, সুজন বুঝি! আমার কথা হচ্ছিল ? নিশ্চয়, না হলে আমার অত ভাবনা হবে কেন ? কি কথা ?'

'তোমাদেরই। শুনলাম মেয়েটি বৌমার বন্ধু ছিলেন, তোমারও। আজকালকার মেয়ে, বেশ লেখা পড়া জানে, খুব ভাল লোক।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে খগেন বাবু মাসীমার মুখ নিরীক্ষণ করেন, মন্তব্যের অন্তরালে কোনো অভিসন্ধি ধরা পড়ে না। সুজন কখনও কুৎসা করতে পারে! মুকুন্দই নিশ্চয়। খগেন বাবু অপেক্ষা করেন। মাসীমা অন্য দিকে মুখ সামান্য ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল নিয়ে কি করবে মনে করেছ ?'

'মাসীমা, তুমি কি ভাবছ জানি না!'

'ভাববার কি আছে! মেয়েটি বিধবা ?'

'না।'

'স্বামী আছে ?'

'আছেন।'

'তবে বিয়ে হয় না, হিঁদুবাড়ীতে।' খগেন বাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। মাসীমা বলেন, 'তবে, কিছুই করা যায় না যেকালে, তখন ? তার চেয়ে তুই যেমন

ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তেমনই দেশ বিদেশে বেড়াগে যা। ও দুদিন পরেই চলে যাবে—যে চুলোয় ইচ্ছে যাক, স্বামী না নেয়,মাষ্টারি করুক। তুই এখন বড় হয়েছিস তোকে তাই বলছি, তোর মেসোমশাই-এর এমনি হয়েছিল, তাকে তার স্বামী অত্যাচার করত, তাড়িয়ে দেয়—সামলাতে পারলে না, নিজেকে মেরে ফেল্লে। তার চেয়ে ধর্ম্ম করা ভাল। তুইও সামলাতে পারবি না। সেবার গেল বৌমা, এবার তোর জীবন নিয়ে টানাটানি। আমার শরীরে সামর্থ্য নেই, বুক ধড়ফড় করছে আবার, নইলে, তোর মেসোর জন্যে যা পারিনি, তোর জন্য করতাম, বলতাম গিয়ে মেয়েটিকে—বাছা, তুমি চলে যাও, অনেক অশান্তি এনেছ, আর দিয়ো না। বলিস ত' যাই ?'

'তোমার যেতে হবে না। তোমার আবার বুক ধড়ফড়ানি সুরু হল ? ছিল না ত !'

'না ভুগিয়ে মরাই ভাল রে ! ভয় নেই, এখন মরছিনা। কি বল্, যাই ?'

'তুমি ওষুধ খাচ্ছ ?'

'না। তার বদলে···তুই কি বলিস ?'

'তোমাকে কে ভুল বুঝিয়েছে ?'

মাসীমা হেসে উত্তর দিলেন, 'কেউ লাগায়নি।...মিথ্যে কথা আগে ত' কইতিস না !'

'এখনও কই না। কথাটাই বড় হল ? আচরণটা বাদ পড়ছে দেখলে না ! পূজোআচ্ছা করে আবরণটাকেই প্রধান করলে, সেইটাই আসল, কেমন ? ভেতরে ছাই-পাঁশ যাই থাক না কেন !'

'আসলটা কি শুনি ! যা ইচ্ছে তাই করা ?···আচ্ছা, তুই এখন যা। ··কাশী ছেড়ে যাবার সময় পার যদি দেখা কোরো। গঙ্গাজলের ঘটিটা মাজলে কি না দেখি, কাল ভোরেই চাই।' মাসীমা ঘর থেকে চলে গেলেন।

খগেন বাবু রমলা দেবীর বাড়ি না গিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসেন। অন্ধকারে চৌকাঠে হোঁচট খান···মুকুন্দ···মুকুন্দ···কালা···নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে, ঘুমুচ্ছে সন্ধ্যাবেলা, বদমায়েসী করে উত্তর দিচ্ছে না। মুকুন্দ আসবেনা···মাসীমার চাকর। খগেন বাবু ঈজী চেয়ারে শুয়ে পড়েন।

মাসীমাকে কখনও বোঝা গেল না, ধরা ছোঁয়া গেলনা, বাঁধা গেল না।

স্নেহের একী রূপ! যেন বিপ্রযুক্ত রণবাহিনী, সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করা যায় না, আছে কোথাও না কোথাও—আততায়ী সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে, পিছন থেকে কারা এসে লণ্ডভণ্ড করে গেল।

শাঁস নেই, ঝুনো নারকেল, বোঁটাটি পর্য্যন্ত খসেছে, ছোবড়া, জল শুকিয়েছে এই সংস্কারের। ভালবাসেন নি মাসীমা তাঁর স্বামীকে...তাঁর জন্য যা করেন নি আজ তাও করতে প্রস্তুত! কেন! মৃত্যুর পানে যত অগ্রসর হচ্ছেন ততই সংস্কারের বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কেন বুক ধড়ফড়ানি!

মাসীমার আছে অভ্যাস, যে অভ্যাস নেতি দিয়ে গড়া। জীবনের অভাব, গতিহীনতা, চারপাশে না'র বেড়া। অভাব কেবল—ভাবশূন্যতা, কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু বাধা দেয় কিসে? নিষেধ, অভাব কি সদর্থক? নচেৎ দেওয়ালে মাথা ঠোকে কেন? গৌরীশৃঙ্গে দম বন্ধ হয় কেন? এক ঘণ্টায় মাত্র তিন গজ...বুকে হাঁপ লাগে। মাসীমা যদি মারা যান! খগেন বাবু উঠে জানালার পাশে দাঁড়ান।

মাসীমার সংস্কারে অনুবিষ্ট হতে চেষ্টা করেন। সেই বহু পুরাকালে বুদ্ধদেব আনন্দকে বলেছিলেন, মত্তহস্তী ইক্ষাকুবনে প্রবেশ করলে যেমন সর্ব্বনাশ হয় তেমনই আশ্রমে স্ত্রীলোক প্রবেশ করলে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হবে, তার আয়ু কমবে। বৌদ্ধযুগে কাশীর এক শ্রেষ্ঠী তাঁর সুন্দরী কন্যার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রাসাদের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে তাকে বন্দী রেখেছিলেন, রাস্তা দিয়ে চোর ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, কন্যা দেখলেন সুদর্শন পুরুষ, প্রেম হল...তারপর বিদ্যাসুন্দরের পালা। কিন্তু নিশ্চয় শূলে দেওয়া হল চোরকেই। শ্রেষ্ঠীকন্যা ওপরতলার জীব। রূপমতিকে তাঁর পিতাই বিষ খেতে আজ্ঞা করেন, কারণ গরীব গৃহস্থের বাগদত্তা কন্যাকে প্রবল যবন রাজকুমার দেখে ফেলেছেন! সতীদাহের আগুন জ্বলে ওঠে, সতীর শাশুড়ি বৌমাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুর মাখিয়ে, গলায় রক্তজবার মালা দিয়ে চিতায় পাঠিয়েছেন, সঙ্গে দিয়েছেন জোয়ান ছেলেদের, দেবর-বৃন্দের হাতে লাঠি, বৌমা যদি কাতর হন...তার পর, জব চার্ণকের উদ্ধার, সমাজ থেকে বহিষ্কার, সাহেবের সঙ্গে ঘর-কন্না, আবার মাতৃত্ব, একটি আধটির নয়, পঙ্গপালের। চাঁড়াল বামুনের বিধবা মেয়েকে দুর্ব্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেল নৌকা করে, এ-গঞ্জে ও-গঞ্জে রাখলে, পুলিশে উদ্ধার করলে, দুর্ব্বৃত্তদের জেল হল কয়েক মাসের জন্য...মেয়েটাকে ঘরে নিলে না কেউ। কোথায় যাবে সে? যাক সে

আশ্রমে। একজন স্ত্রীলোকের স্বামী মাতাল, সর্ব্বাঙ্গে রোগের চিহ্ন, মা-শাশুড়ি দুজনেই বলছেন, তবু ত স্বামী! আবার,…বড় লোকের আদুরে মেয়ে স্বামীর ঘর করে না, স্বামীকে অবহেলা করে, নীচ, স্বার্থপর, কলহপ্রিয়, স্বামীর জীবন দুর্ব্বিষহ করেছে…তবু স্বামীকে সৎ থাকতে হবেই হবে, নচেৎ শ্বশুর-শাশুড়ি জামাই-এর মুখ দর্শন করবেন না। স্মৃতিরত্ন মশাই-এর বিধবা ভগ্নীর কলেরা হয়েছে, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সেদিন একাদশী, 'মামা, জল' বলতে বলতে দম আটকে গেল, আর চায় না, স্মৃতিরত্ন মশাই-এর দ্বিতীয়া গৃহিণী তখন আঁতুড়ঘরে, গিয়ে বল্লেন,…'সব দিকেই অশৌচ নতুন বৌ! মেয়েটা অকল্যাণ করে গেল অসময়ে।' পাঁজি নিয়ে বসলেন ঠাকুর নবজাত কন্যার ঠিকুজি গুণতে। ইনিই কিছু দিন পূর্ব্বে জমিদার মহাশয়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূর জন্য বৈশাখী একাদশীর দিন বরফ্ বন্দোবস্ত করেছিলেন, বরফটা পানীয় নয়, চর্ব্ব্য। কে বলে হিন্দু সমাজ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-বিচারে পক্ষপাতদুষ্ট! অন্য যে দোষ তার, সে দোষ সব সমাজেরই আছে! বিশেষত্ব এই কেবল, তার জীবন নেই, তাই সংস্কারই আছে। তবু সেটা আছে, ভীষণ ভাবেই আছে…জিজ্ঞাসা কর রমাকে।

মাসীমার সংস্কার আছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের একটানা বারিধারার ঘুমপাড়ানির শব্দের মতন তার ভাষা। তবু পয়ারের পাড়াগেঁয়ে একঘেয়েমি নয়। কোথায় যেন খানদানী গাম্ভীর্য্য রয়েছে সন্দেহ হয়। এর জোরে কত রাজকুমার সংসারত্যাগী হল—বুদ্ধ থেকে সেদিনকার ছাতু বাবু পর্য্যন্ত। ব্রহ্মচারিণীর কাঠিন্য, বিধবার সতীত্ব লোপ পায় নি এখনও এরই কৃপায়। তা ছাড়া, শান্তি চায় লোকে। মাসীমার মুখে চোখে দীপ্তি নেই, তবু, ব্যবহারে প্রশান্তি, আভিজাত্য রয়েছে। তাঁর পায়ের তলার মাটি কাঁপে না, তাঁর আকাশ নির্ম্মল।

কিন্তু সে-শূন্যে নক্ষত্র নিশ্চল, বাতাস নিষ্পন্দ। প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে। মাসীমার ধর্ম্ম মাসীমার, অন্যের নয়। এই সেদিন একজন ইংরেজ ছোকরা আরবদের জাতীয় নিয়তিকে আপন করে নিলে। আরব-স্বাধীনতা যেন তারই আত্মার বিকাশ, পোষাক বদলালে, গ্রহণ করলে তাদের শোওয়া বসা খাওয়া, তাদের ভাষা। তবু পারলে না আপন হতে। জীবনটাই অসার্থক হল। কি ভীষণ একাকিত্ব! অন্যের ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করতে করুণভাবে মানা করেছেন। পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করা বেশ্যাবৃত্তিরও অধম, ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাট্কা, নিজেরও নয়, পরেরও নয়,

কারুর আপন নয়, কেউ আপন নয়, ঘৃণা হবে শেষে নিজের ওপর। অনাত্মিকতায় দেহ অবশ হয়, অভ্যাসের আদেশটুকু পালন করতে পারে। চিত্ত ভাসে ওপরে, নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে লক্ষ্মীর মতন, শবের ওপর বিদেহী আত্মার মতন। দেহ ও চিত্তের সমন্বয় হয় না, সংস্কার ও সৃষ্টিতে রফা চলে না। স্বধর্ম্মত্যাগই সব চেয়ে বড় মিথ্যা, মিথ্যায় মানুষ বাঁচেনা···না মাসীমা, সত্যি বলছি, মিথ্যা কথা কই নি।

অন্তর্মুখী হওয়ার চেয়ে বাইরে আসাই ভাল। দেহেই সকল চিত্ত সঞ্চারিত হোক্। প্রতি রোমকূপে বৃষ্টি পড়ুক, আলো পড়ুক, হাওয়া প্রবেশ করুক, সমুদ্রের বালুতটে নগ্নগাত্রে রোদ পোয়াচ্ছে স্ত্রীপুরুষ, কোনো লজ্জা নেই, যারা চিত্তসর্ব্বস্ব নয়, আপন নিয়ে উন্মাদ নয়, তাদের আবার কি লজ্জা। তাদের দেহমন শব্দের যুগ্মধ্বনি, ভাষার যুক্তবর্ণ, ভূতবিদ্যার ক্ষেত্রকাল।

খগেন বাবু রমলা দেবীর বাড়ি এলেন। আলো ঘরের কোণে সঞ্চিত রয়েছে। রমলা দেবীর ডেক্ চেয়ারের সামনে চেয়ার টেনে খগেন বাবু বসলেন। তাঁর মুখে চঞ্চলতা লক্ষ্য করে রমলা দেবী বল্লেন,

'মাসীমার ওখানে···?'

'কথা হোলো।'

কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। রমলা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'তুমি তা হলে কি করবে? তিনি কি করতে বলেন?'

'কাশী ছেড়ে যেতে।'

খগেন বাবু ও রমলা দেবী অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। রমলা দেবীর জিজ্ঞাসু নয়নের উত্তরে খগেন বাবু বল্লেন, 'আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করতে···'

'পারছিনা, সময় চাই, সময় চাই, কেমন?'

'কোলকাতা ঘুরে আসি একবার। তুমিও চল।'

'আমি যাব না কোলকাতায়। এই যে বল্লে কাশীতেই থাকবে। কোল-কাতা কেন?'

'চল না। বিজনের সঙ্গে দেখা হবে।'

'আমি যদি বলি বিজনকেও দেখতে চাই না?'

খগেন বাবুর মুখে হতাশার চিহ্ন উঁকি দেয়। 'তুমি জান না, মাসীমার সমাজে স্থান নেই, কিন্তু বিজনেরই সমাজে তোমার আমার স্থান, অন্য কোথাও নেই।'

'আগে তৈরী হোক, তখন যাব। আপাতত, কাশী থাকব। পারবে না?'

খগেন বাবুর ইচ্ছা হয় বিজনের সমাজের প্রকৃতি বোঝাতে,তার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে, রমলাদেবীর সামনে সে-সমাজের মনোজ্ঞ রূপ ফোটাতে। কিন্তু বাধা আসে। রমলা বুঝবে না কিছুতে। তার স্বার্থে আঘাত পড়বে। বিচ্যুত-বর্ত্তমানের প্রাণী রমলা, তার অতীত নেই, ভবিষ্যত নেই। খগেনবাবু সংযত হয়ে বসে থাকেন। রমলাদেবী তাঁর চিন্তাস্রোত অনুসরণ করে বলেন,

'সেটা পরলোক। পরলোকে যেতে চাই না। পাষাণের মতন ধৈর্য্য আমার নেই। কেউ জ্যান্ত থাকবে না বিজনের দেশে, সেখানে ইচ্ছাই কেবল, কর্ত্তা নেই, কর্ম্ম নেই। প্রেতপুরী…ভুতপত্রীর দেশ…আমার ভয় করে, ওগো…পারব না, তুমিও পারবে না।'

রমলাদেবীর সর্ব্বাঙ্গে ত্রাস পরিব্যাপ্ত হয়। বয়স কমে যায়, দেহ সঙ্কুচিত হয়, শৈশব ফিরে আসে। খগেন বাবুর চোখে করুণা ফোটে। রমলাদেবী অভয় পেয়ে বলেন,

'তুমি বোঝ না। স্বর্গ তৈরী করছ, কর, কিন্তু কার জন্যে? আমি মাটিরই মানুষ। কেন যাব স্বর্গে? তুমি চাও আমি মরে যাই? তুমি ছুতো খুঁজছ। তার চেয়ে সোজা বল যে ভয় করছে, মাসীমার আদেশ অমান্য করবার সাহস নেই। কিন্তু সে আদেশের মানে জান? জান না। তুমি সুখই চাইছ।'

'আমি বিরোধকে স্বীকার করেছি।'

'কর নি, কর নি। সংস্কারকেই গ্রহণ করেছ। তুমি মিথ্যে কথা কও না, তুমিই বল? পরে কি হবে তার জন্য মাথাব্যথা—সেটা কি এখনই যা হতে পারে তার সম্ভাবনাকে স্থগিত রাখা নয়? কবে হবে, কি আসবে—কে জানে! কেন অপেক্ষা করব? কাদের জন্যে? তারা আমার কে বল! কে ভোগ করবে? তাদের জন্য থোড়াই কেয়ার করি! তুমি আজকের কাজ ভুলে গিয়ে আসছে কালের জন্য ভাবছ…।'

'ঠিক তা নয়। ভবিষ্যতের কথা না হয় নাই ভাবলাম। তাকে পৃথক করে, দূরে রেখে যারা কাজ করে, তাদেরই উপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, রমা। কিন্তু অন্য দিক থেকে ভবিষ্যতকে পৃথক ও দূরে রাখা যায় না। যে-পথে সৃষ্টি অসম্ভব সে-পথ গ্রহণ করতে আমি অনিচ্ছুক।'

রমলা দেবীর অবশ দেহ ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে। সাবিত্রী অমনি মাঝে মাঝে চুপ করে শুয়ে থাকত। তার মুখে বিরক্তি ও অধীরতার ছাপ পড়ত। রমা যেন পাথরের মূর্ত্তি। বড় করুণ…দেখলে দুঃখ হয়, অনেক সহ্য করেছে, তার অধীরতা মার্জ্জনীয়। খগেন বাবু উঠে এসে তার মাথায় হাত দেন।

'এত গরম কেন কপাল?' রমলা দেবীর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আমি বসছি। মাসীমার বাড়ি যাব না। আমি সোয়াস্তি চাই না। চাইলে, কাশী ফিরতাম না, দেশ বিদেশে ভেসে ভেসে বেড়াতাম। এ-টুকু তুমি বুঝবে, রমা? মাসীমা আমাকে বলছিলেন কাশী ছেড়ে চলে যেতে। তাঁর কথায় যাব না। তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি ছাড়া আমার কে রইল!' রমলা দেবী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন,

'আমি জানি, তোমার বিজন আছে।…হার মানলাম। কিন্তু, দুর্ব্বলের কাছে।'

'স্বীকার করছি দুর্ব্বল। কিন্তু শক্তি দেবে না?'

'আমি দেব! কোথায় পাব! সব গেছে চেয়ে চেয়ে। সকলের সঙ্গে মিশে শক্তি পাবে বলছিলে সে দিন, তাই ভাল। আমার ভাঁড়ার খালি।'

'তা নয় গো, তা নয়। চল, দুজনে কোলকাতায় যাই।'

'কোলকাতা আমি যাব না।'

খগেন বাবু বাড়ি ফিরে এসে ছাতে একলা বসে থাকেন। মুকুন্দ এখনও এলনা। দুজনের মিলন অসম্ভব। ব্যর্থতায় চোখে জল আসে। দুরপণীয় পার্থক্য। যাকে জানতেন, যাকে আপন ভেবেছেন তার সঙ্গে মিলন হয় না যখন, তখন কি উপায়ে সাধারণ জীবনের ভাগী হবেন? দুজনে মিলে সৃষ্টি-পথের পথিক হওয়া যেত না? সাবিত্রী, মাসীমা, রমলা…পর পর এল, গেল…কে রইল সামনে? বড় একলা…অথচ মিলতে হবে…এ কী অভিশাপ! হতাশা উপদেশ দেয়…ভাসিয়ে দাও নিজেকে। কিন্তু স্রোতের বিপক্ষেই পুরুষে এতদিন সাঁতার কেটেছে। কিসের জন্য? পারে উঠতে হবে? অন্ধকারে কূল দেখা যায় না। চোখের জলে দৃষ্টি ক্ষীণ…সকাল কখন হবে!

মাত্র বারোটা বাজল। সেই কখন সন্ধ্যা হয়েছে! মুকুন্দ এখনও এল না

কেন! মাসীমার ওখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, মাসীমা জানেন না, না হলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিতেন।

খগেন বাবুর ইচ্ছা হয় বিজনকে চিঠি লিখতে। কি লিখবেন? সুজনকে লেখা যায়, কিন্তু বিজনকে তিনি পারেন না। অভ্যাস নেই, তবু লিখলে হয়। খগেন বাবু চিঠির কাগজ খুঁজতে লাগলেন। ফাউনটেন পেনে কালি নেই।

মুকুন্দ কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিলে, মাসীমা মারা গেছেন। জল খেতে গিয়েছিলেন, পড়ে যান, আর উঠলেন না।

সে তখনি খগেন বাবুকে ডাকতে এসেছিল, পায় নি, মাসীমার পাশে বসেছিল···ভাবলে এতক্ষণে নিশ্চয় মেমসায়েবের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। তাই মড়া ছেড়ে এসেছে। যা ইচ্ছে হয় করা হোক। ডাক্তার আনতে হবে না···সব শেষ হয়ে গেছে···।

মাসীমার, রমলার ওপর রাগ আসে। কিন্তু কি দোষ! বেচারিরা! যার যা স্বভাব!

(শেষ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমি ত পেয়েছি স্বর্গ

ভেবেছিনু মোহ মোর কেটে যাবে দু'দিন না যেতে,
মোহ,—তাই আকর্ষণ এমনি প্রবল অবিশ্রাম
আমারে টানিয়া রাখে। বার বার তাই আসিলাম
তোমার দুয়ারে সখী; বাসর-শয়ন পেতে
তুমি মোরে সযতনে বসাইলে আপনার পাশে;
চাহিলে মুখের পানে, দুটি হাত ধরিয়া কখন
আমারে টানিয়া নিলে, জানাইলে প্রেম-সম্ভাষণ;—
সে কথা পড়ে না মনে, শুধু জানি, কভু নিরাশ্বাসে
ফিরি নাই; আমারে বিমুখ করি' অবনত মুখে
বল নাই কোনও দিন,—"একেলা আমার লাগে ভালো
ছিলাম একেলা আমি, নেবা দীপ কেন তুমি জ্বালো?
যাও বন্ধু ফিরে যাও, নিজেরে লইয়া থাক সুখে।"

ভেবেছিনু,—তুমি মোরে গোপন করিয়া চলিয়াছ;
লীলাছলে প্রেম দাও, আমারে লইয়া কর খেলা,
লীলা সাঙ্গ হয়ে গেলে, তোমার নিষ্ঠুর অবহেলা
আমারে রাখিবে দূরে; ভালবাস বলে' ছলিয়াছ।
এ ছলনা কতদিন? তুমিই আমারে মুক্তি দিবে
আমার নয়ন হতে মুছে যাবে মোহের অঞ্জন
মায়া আর কতদিন করিবেরে হৃদয় রঞ্জন?
যে মালা দিয়েছ গলে, তুমিই তা' ফিরাইয়া নিবে।

কিন্তু তা' হলনা সখী, মায়া সে যে কায়া নিল শেষে
মোহ যে মধুর হয়ে দুর্দ্দম প্রেমের আকর্ষণে
রাত্রিদিন টানিতেছে। দেহে মনে প্রাণে তোমা সনে
এক হয়ে আছি প্রিয়ে, তুমি নিত্য নব নব বেশে

বাহুপাশে দাও ধরা, আমার এ মধুর বন্ধনে
স্বর্গের অমৃত ওঠে ; ফেনায়িত উল্লাস উচ্ছ্বাস,
পরমা তৃপ্তির মাঝে তোমা সনে মাধবী বিলাস,
আমি ত পেয়েছি স্বর্গ,—হেরিয়াছি আনন্দ নন্দনে।
তুমি কিছু পাও নাই ?—দুই হাতে দিয়েছ কেবলি ?
নিজেরে বিলায়ে দিয়ে রিক্ততায় ভরিয়াছ বুক ?
নিজেরে বঞ্চনা করি, কর নাই আমারে বিমুখ ?
আমি ত হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করি দিয়েছি অঞ্জলি।

তুমি যদি পানপাত্র অলক্ষ্যে উজাড় করি প্রিয়া
তৃষ্ণারে লালন করি রেখে থাক অধরে তোমার,
—সে আমার পরাজয়, সে দুঃসহ অপমান-ভার
কেমনে সহিব আমি বিষদাহ দেহে সঞ্চারিয়া ?

তুমি বল একবার বঞ্চিত করনি আপনারে,
মম প্রেম-উপায়নে তৃষ্ণা তব মিটিয়াছে রাণী।
আমার তৃষ্ণার জ্বালা করিয়াছে তোমারে সন্ধানী,
নব অনুরাগে তুমি আমারে চেয়েছ বারে বারে।
শুধু বল একবার ভালবাসা হয়েছে সফল
আমার বিরহে একা ফেলিয়াছ নয়নের জল।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

চীনদেশের ভাষা

(১)

ভাষার ভিতর জাতীয় সভ্যতার একটা বড় বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতির শিল্প, কলা, দর্শন প্রভৃতি যখন উন্নত হয় তখন তার ভাষাও সমৃদ্ধি লাভ করে। ভাষার উপর তার সমস্ত উন্নতির ছায়াপাত হয়। তাই যে-জাতিই সভ্যতার খুব উচ্চস্তরে উন্নীত হ'য়েছে, বুঝতে হবে তার ভাষাও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। চীনদেশের সভ্যতা খুব প্রাচীন। তার শিল্প, কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি জগতের প্রতি সভ্যজাতির নিকটেই সমাদর লাভ করেছে। তার ভাষা নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করেছেন এবং সেই ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস যথাসম্ভব উদ্ধার করেছেন।

চীনা ভাষা প্রায় ৪০ কোটী লোকের কথ্য ভাষা। সমগ্র চীনদেশে, মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে এবং চীনাদের উপনিবেশগুলিতে এই ভাষা কথিত হয়। তা ছাড়া জাপান, কোরিয়া ও আনামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁদের সভ্যতার সঙ্গে এই ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যূন চারহাজার বছর ধরে এই ভাষার অনুশীলন চলে আস্‌ছে। যে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই ভাষা পরিপুষ্টিলাভ করেছে তাও খুব প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বেই যে সে সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বেকার খোদিত লিপিও চীনদেশে পাওয়া গিয়েছে।

চীনা ভাষা মোটেই আমাদের ভাষার অনুরূপ নয়। আমাদের ভাষা বহুবর্ণাত্মক (Poly-syllabic), কিন্তু চীনাভাষা একবর্ণাত্মক (Mono-syllabic)। ভারতের সীমান্ত দেশে অনেক সমজাতীয় ভাষা আছে—যেমন তিব্বতী; তিব্বতী থেকে উদ্ভূত নানা ভাষা—লেপ্‌চা, লিম্বু প্রভৃতি; নেপালী, অহোম, বর্ম্মী ইত্যাদি। সংস্কৃতে এই সব ভাষাকে "একাক্ষর সমুল্লাপ" বলা হ'য়েছে। কোন চীনা শব্দই এক বর্ণের বেশী নয়—যেমন, আগুন = **হুও**, গাছ = **কি**, জল = **শুই**, বাতাস = **ফেং**। অনেক সময়ে একাধিক শব্দ একত্রিত হ'য়ে বহুবর্ণাত্মক শব্দের

সৃষ্টি করে—যেমন **শুইফেং**=বাতাস ও জল। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সংযুক্ত শব্দ।

চীনা ভাষার আর একটি বিশেষত্ব যে সে ভাষা বিভক্তিযুক্ত (inflexional) নয়। আমাদের ভাষায় যেরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বাচক শব্দ প্রয়োগ বিশেষে বিভক্তিযুক্ত ও বিকৃত হয় চীনা ভাষায় শব্দের সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করতে হ'লে অন্য শব্দ যোজনা করতে হয় না। লিঙ্গ ও সংখ্যার পরিবর্ত্তনেও শব্দের কোন বিকৃতি হয় না। সুতরাং চীনা ভাষায় বাক্যরচনা অনেক সহজসাধ্য। বাক্যরচনায় শব্দবিন্যাস খুব সরল। প্রথমে কর্ত্তা, তারপর ক্রিয়া এবং শেষে কর্ম্ম। যেমন—আমি এ বই দিব না=**ঙ্গো পু চে চে শু** (আমি না দিব এ বই)। তা ছাড়া আমাদের ভাষায় যেমন বিভক্তিযোগে ক্রিয়ার পরিণতি হয় এবং বর্ত্তমান অতীত প্রভৃতি কাল নির্দ্দেশ করা চলে, চীনা ভাষায় তা চলে না। 'আমি করি, করিয়াছি, করিব' চীনা ভাষায় অনূদিত হ'লে দাঁড়াবে=**ঙ্গো ৎসা**। **ৎসা** ক্রিয়ার কালনির্দ্দেশে কোনই পরিবর্ত্তন হবে না। কথিত ভাষায় কখন কখন অন্য শব্দ যোজনার দ্বারা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল নির্দ্দিষ্ট হলেও সাহিত্যের ভাষায় কালভেদে ক্রিয়ায় অন্য শব্দ যোজনা কখনই করা হয় না। বিষয় অবতারণা থেকে অর্থ বুঝে নিতে হয়। কর্ত্তৃপদের সংখ্যা বা লিঙ্গের পরিবর্ত্তনেও ক্রিয়ার কোন পরিণতি হয় না। 'আমি, আমরা দু'জনে বা আমরা সকলে করি' চীনা ভাষার অনূদিত হ'লেও ঐ **ঙ্গো ৎসা** হবে।

এই স্থানে চীন দেশের কথিত ও সাহিত্যের ভাষার ভিতর কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে সাহিত্যের ভাষায় সংখ্যা বা কাল বাচক কোন শব্দের ব্যবহার হয় না। কিন্তু কথিত ভাষায় সেগুলি চলে। যেমন—

আমি=**ঙ্গো**। আমরা=**ঙ্গো মেন্**।
তুমি=**নি**। তোমরা=**নি মেন্**।
করি=**ৎসা** করিয়াছি, করিয়াছিলাম=**ৎসা লিয়াও**।
করিব=**ইয়াও ৎসা**।

চীনা ভাষা একবর্ণাত্মক ব'লে বিদেশীর জন্য আর এক গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে। সে হ'চ্ছে উচ্চারণের। অনেক শব্দের উচ্চারণ একপ্রকার, প্রভেদ হচ্ছে শুধু ঝোঁকে বা accent-এ। চীনা ভাষায় সাধারণতঃ চারটি ঝোঁক আছে। এই ঝোঁক

বাদ দিলে চীনা ভাষা শিক্ষায় নানা বিপদ উপস্থিত হয়, অথচ বিদেশীরা এই ঝোঁক ভাল ক'রে ধরতেও পারে না। একটি উদাহরণ থেকেই ঝোঁকের আবশ্যকতা ধরা যাবে। যেমন—ক্রয় করা = **মাই-ই** এবং বিক্রয় করা = **মা-ই**।

মোটামুটি এই হ'ল চীনা ভাষার বিশেষত্ব। কিন্তু চীনা ভাষা চিরকালই এরূপ ছিল না। বহুযুগের ক্রমবিকাশের ফলে রূপান্তর গ্রহণ করতে করতে এক-বর্ণাত্মক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষাবিৎরা মনে করেন যে, দু'তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনা ভাষা বহুবর্ণাত্মকই ছিল। তখন ভাষার রূপ কি ছিল তা' এখন ঠিক ক'রে বলা যায় না; তবে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাষার যে রূপ ছিল তা' নির্দ্ধারিত হয়েছে। ক্রমবিকাশের এই দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান্ কালে যে সমস্ত শব্দের উচ্চারণ একপ্রকার তাদের মধ্যে অনেকের উচ্চারণই সেকালে পৃথক ছিল। যেমন—

ছয়—**লিউ**, 六 — . . . প্রাচীন—**লিউক্**
বহিয়া যাওয়া—**লিউ** 流 — . . . প্রাচীন—**লিঅউ**
বন—**লিন্**, 林 — . . . প্রাচীন—**লিঅম্**
প্রতিবাসী—**লিন্**, 鄰 — . . . প্রাচীন—**লিঅন্**

এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস ধরা পড়েছে নানাদিক দিয়ে। প্রথমতঃ চীন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ভাষার যে উচ্চারণ চল্‌তি আছে তার থেকে প্রাচীনকালের উচ্চারণ অনেকটা ধরা যায়। উদাহরণ দিলেই একথা বোঝা যাবে। বাংলা শব্দগুলি বাংলা দেশের নানাস্থানে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। এই স্থানীয় উচ্চারণগুলি তুলনা করলে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে মূল বাংলা ভাষার উচ্চারণ কি ছিল অনেকটা ধারণা করা যায়। তেমনি ক্যাণ্টন, ফুকিয়াং, এবং পেকিং প্রভৃতি স্থানের উচ্চারণের ভিতর অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন **ইন্** (অর্থ—স্বর) পেকিং-এর উচ্চারণ। কিন্তু ক্যাণ্টনে এই শব্দের উচ্চারণ হচ্ছে—**ইঅম্**। এর থেকে ভাষা-তত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, ঐ শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল **ইএম্**। নানাস্থানে উচ্চারণের খুব প্রভেদ থাকলেও পেকিং বহুদিন ধরে চীন দেশের রাজধানী ছিল বলে পেকিং-এ উচ্চারিত ভাষা চীন দেশের সমস্ত প্রদেশের শিক্ষিত সমাজই জান্‌তেন। পেকিং-এর উচ্চারিত ভাষাকে বলা হয় মান্দারিণ। মান্দারিণ কথার মূল অর্থ হচ্ছে রাজপরিষদ—সংস্কৃত মন্ত্রী শব্দেরই রূপান্তর।

প্রাচীন উচ্চারণ উদ্ধার করিবার আর একটি উপায় হচ্ছে কোরিয়া, জাপানী, ও আনামী ভাষার আলোচনা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এই তিন ভাষার উপর চীন ভাষা তার প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিন জাতিই চীনা সভ্যতার নানা উপাদানের সঙ্গে চীনা ভাষার বহু শব্দ ধার করেছিল এবং যে যুগে ধার করেছিল সেই সব শব্দের সেই যুগের উচ্চারণই আজও বহাল রেখেছে। যেমন **পু** (অর্থ—ভৃত্য) হচ্ছে বর্ত্তমান কালের উচ্চারণ। কিন্তু ঐ শব্দই আনামিতে **বোক্**, জাপানীতে **পোকু** এবং ক্যান্টনের ভাষাতে **ফোক্** উচ্চারিত হয়। এর থেকেই ধরা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঐ শব্দের উচ্চারণ ছিল **বোক্**। আনামী ও জাপানীরা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ঐ শব্দ ধার করেছিল।

আর প্রাচীন উচ্চারণ ধরা পড়ে যে-সব বিদেশী শব্দ চীনা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল তার ভিতর দিয়ে। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য সে কালে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। সেই সঙ্গে বহু সংস্কৃত শব্দ, বিশেষতঃ ব্যক্তি বা স্থানের নাম, চীনা অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছিল। যেমন "বুদ্ধ" শব্দটিকে যে চীনা শব্দের দ্বারা রূপান্তরিত করা হ'য়েছিল তার বর্ত্তমান উচ্চারণ **ফো** (পেকিং), কিন্তু ক্যাণ্টনীতে **ফুৎ** এবং জাপানীতে **বুৎসু**। এই থেকেই ধরা যায় যে, সে শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল **বুদ্**‌ যা ছিল সংস্কৃত 'বুদ্ধ' শব্দের খুব নিকট।

এই সব উপায়ে চীনা ভাষার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বকার উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া যায়। গত হাজার বছরের ভিতর তার উচ্চারণে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বিভিন্নার্থবোধক শব্দের একরূপ উচ্চারণ কেন দাঁড়িয়েছে তা' সেই সব শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ আলোচনা করিলেই ধরতে পারা যায়।

(২)

চীনাদের লিখনপ্রণালীই বিদেশীর কাছে তাদের ভাষাকে এত দুর্ব্বোধ্য করেছে। শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্ণমালা সৃষ্টি না ক'রে প্রাচীন চীনেরা এক একটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর সৃষ্টি করেছে। সেই অক্ষরগুলি দেখ্‌তেও অনেকটা গোলমেলে, কারণ এক একটি অক্ষর বহুরেখার সমষ্টিতে গঠিত। তাই চীনা ভাষায় কোন বর্ণমালা নাই—প্রতি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর শিখ্‌তে হয়। চীনা ভাষায় মোট চল্লিশ হাজারের উপর শব্দ আছে। অক্ষরও ততগুলি। তবে এই ভাষা

অধ্যয়ন করতে গেলে সমস্ত অক্ষর শিখ্‌তে হয় না। দশ হাজার অক্ষর শিখ্‌লেই কাজ চলে। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

চীনাদের এই অদ্ভুত লিপিমালার ইতিহাসও এখন উদ্ধার করা হয়েছে। এই ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত চীনা অক্ষরের প্রাচীন রূপ ধরতে পারি। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার চীনা লিপি পাওয়া গিয়েছে। এ লিপিগুলি বেশীর ভাগই কচ্ছপের খোলস কিম্বা জন্তুবিশেষের হাড়ের উপর খোদিত। এই খোদিত খোলস এবং হাড় নিয়ে যে প্রাচীন চীনেরা দৈব গণনা করত প্রাচীন চীনা সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। এই খোদিত লিপিতে চীনা অক্ষরের যে রূপ পাওয়া যায় তা' খুবই প্রাচীন। এই সব প্রাচীন লিপি থেকে খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতকে চীনা অক্ষরের এক তালিকা প্রস্তুত হয়। পরবর্ত্তীকালে খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে চীনসম্রাটের আদেশে তখন প্রচলিত চীনা অক্ষরের যে দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় তা' এখনও রক্ষিত আছে। তা'তে ৩৩০০টি অক্ষর পাওয়া যায়। রাজকর্ম্মচারীদের এই সব অক্ষর অনুশীলন করতে হ'ত। ঐ সময় থেকে অক্ষরের রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু লিখ্‌বার নানারূপ প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে এবং অক্ষরগুলির সহিত নূতন অক্ষর যোজনা করে বা তাদের ঈষৎ পরিবর্ত্তন ক'রে বহু নূতন অক্ষর সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা প্রায় ৮০০০, তৃতীয় শতাব্দীতে ১০,০০০, এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ৪০,০০০ হাজার অক্ষ-রের হিসাব পাই।

চীনদেশে অক্ষরসৃষ্টি ঠিক কোন্ সময় আরম্ভ হ'য়েছিল তা' বলা যায় না। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে যে সব লোক-প্রবাদ নিবদ্ধ আছে তা' বিশ্বাস করলে ধরা যায় খৃষ্টের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই লিপি প্রথম উদ্ভাবিত হ'য়েছিল। এই সব লোক-প্রবাদ যে খুব মিথ্যা তা' মনে হয় না। কারণ চীনদেশের নানা স্থানে যে সব খোদিত লিপি পাওয়া গেছে সেগুলি খৃষ্টের দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে এবং কতকগুলি তা'র চেয়েও প্রাচীন। এই খোদিত অক্ষরগুলির রূপ আলোচনা করলে মনে হয় তারা ঐ সময়ের বহুপূর্ব্বে উদ্ভাবিত হ'য়েছিল।

চীনা অক্ষরগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাদের সৃষ্টিপ্রণালী ধরা পড়ে। এই অক্ষরগুলির আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল

এক প্রকার চিত্রলিপি। বহুকালের ক্রমবিকাশের ফলে তারা বর্ত্তমান কালে এমন রূপ নিয়েছে যে তার প্রাচীন চিত্রের খোঁজ সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন খোদিত লিপির সাহায্যে তাদের রূপের ক্রমবিকাশ ধরা যায়। যেমন—

(প্রাচীন রূপ হ'তে বর্ত্তমান রূপ)

চক্ষু—**মি**

দন্ত—**ছ'**

সূর্য্য—**জ***

চন্দ্র—**য়ুয়ে**

বৃক্ষ—**কি**

মৎস্য—**ইউ**

উপরের অক্ষরগুলির নানা-রূপ তুলনা করলেই তাদের ক্রমবিকাশ ধরা যাবে। অতি প্রাচীন লিখনে 'চক্ষু' লিখতে গিয়ে চীনারা চিত্রটিতে একটি চক্ষুই নির্দ্দেশ করেছিল বেশ বোঝা যায়। 'দন্ত' লিখতে দু'পাটী দাঁতের, 'সূর্য্য' লিখতে গিয়ে সূর্য্যের, 'চন্দ্র' লিখতে গিয়ে চন্দ্রকলার, 'বৃক্ষ' লিখতে গিয়ে একটী গাছ ও তার শাখা-প্রশাখার চিত্র এঁকেছিল। চীনাদের প্রাচীন লেখনী হচ্ছে তুলি। তুলিতে চিত্রগুলির অনুশীলন হ'তে হ'তে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সেগুলি বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে।

কিন্তু মিশর দেশে যেমন চিত্রলিপির বিশ্লেষণে বর্ণমালা তৈরি হয়েছিল চীনদেশে তা' হয় নি। প্রকৃতির যে সমস্ত দৃশ্য কিংবা বস্তুকে চিত্রে রূপ দেওয়া যায় চীনারা তা' দিয়েছিল। এতে তাদের তুলির কৃতিত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তাদের ভাষা যখন পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলে তখন শুধু চিত্রলিখনে আর ভাষাকে বেঁধে রাখা গেল না। নূতন অক্ষর সৃষ্টি আবশ্যক হ'য়ে উঠল।

---

* "জ"-এর উচ্চারণ বর্গীয় জ-এর মত নয়। "শ" ও "জ"-এর সংমিশ্রণে যে উচ্চারণ উদ্ভূত হয়, তাই।

এই করতে গিয়ে চীনারা আর এক শ্রেণীর অক্ষর তৈরী করল যার দ্বারা তারা অপ্রাকৃতিক বস্তুকেও নির্দ্দেশ করতে পারল। যেমন—

উঁচু—'শ ং'

নীচু—'হিয়া'

'উঁচুতে' কিংবা 'উপরে' বোঝাতে গেলে একটি রেখার উপরে ও 'নীচুতে' বোঝাতে গেলে রেখার নীচে অন্য রেখা এঁকেই প্রথমে 'উঁচু' ও 'নীচু' নির্দ্দেশ করা হ'ত। তুলির লেখাতে ক্রমশঃ সেই রেখায় মাত্রা যোজনা করা হ'ল। এই শ্রেণীর অক্ষরগুলিকে 'নির্দ্দেশক' বলা যেতে পারে। আর এক জাতীয় 'নির্দ্দেশক'ও উদ্ভাবিত হ'ল যার দ্বারা চীনারা প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নির্দ্দেশ করতে পারল। যেমন—

বন—**লিন্**

প্রাতঃকাল—**তান্**

নিরীক্ষণ——**সিয়াং**

উজ্জ্বল——**মিং**

'বন' বোঝাতে গিয়ে অনেকে গাছের সমষ্টি, 'প্রাতঃকালে'র জন্য একটি রেখার (= দিগন্ত-রেখার) উপর সূর্য্য, 'নিরীক্ষণ করবা'র জন্য বৃক্ষ + চক্ষু (অর্থাৎ গাছের আড়াল থেকে চোখ উঁকি মারছে) এবং 'উজ্জ্বল' বোঝাতে গিয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের সমষ্টি নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে।

এই শ্রেণীর সমজাতীয় আর কতকগুলি নির্দ্দেশক চীনা ভাষায় আছে। যেমন—

'প্রাচীন'—কু =

এই অক্ষরটি তিনটি বিভিন্ন অক্ষরের যোজনায় তৈরী হয়েছে। প্রথম

রূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি বৃত্তাকার গণ্ডীর ভিতর দু'টি অক্ষর রয়েছে। বৃত্তটির বিশেষ কোন অর্থ নাই, শুধু অক্ষরের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই অঙ্কিত হয়েছে। ভিতরে যে দু'টি অক্ষর তার উপরেরটির অর্থ হ'চ্ছে দশ, নীচেকারটির অর্থ হ'চ্ছে 'মুখ'—মুখের চিত্র। দশ ও মুখ একসঙ্গে ক'রে নির্দ্দেশ করা হ'চ্ছে দশজন পূর্ব্বপুরুষের কথা। এই থেকেই অক্ষরটিকে 'প্রাচীন' অর্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে।

ভাষাকে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়ে চীনারা যখন এইরূপ বহু অক্ষর সৃষ্টি করল তখন আবার সেই সব অক্ষর খুঁজে বের করবার জন্য এবং তাদের অর্থ ঠিক করবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করতে হ'ল। অর্থাৎ রীতিমত অভিধান তৈরি করতে হ'ল। এই অভিধান তৈরি করতে গিয়ে নানা পণ্ডিতেরা নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। কেউ অক্ষরের কথা ভেবে সেগুলিকে কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সাজিয়েছেন। কেউ বা ভাষার কথা ভেবে শব্দ-গোষ্ঠী (phonetic) অনুসারে অক্ষরগুলিকে সাজিয়েছেন। শেষোক্ত উপায়টি বিজ্ঞানসম্মত এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট থেকে শেখা। প্রথমটি বিজ্ঞানসম্মত না হলেও বেশী প্রচলিত। সমস্ত চীনা অক্ষরগুলিকে ২১৪টি মূল-অক্ষর বা ধাতু (radical) অনুসারে সাজান হয়েছে। সাধারণতঃ একটি মূল অক্ষরের অর্থের সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অক্ষরের কিছু সম্বন্ধ থাকে। কখন কখন এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়েছে। মোট কথা, চীনা অভিধান দেখতে গেলে ২১৪ মূল অক্ষরের সহিত পরিচয় থাকা চাই এবং অক্ষরগুলি কোন্ কোন্ মূল অক্ষরের সহিত সংশ্লিষ্ট তাও জানা চাই। বুঝতে হবে প্রতি চীনা অক্ষরকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমটি মূল, যার সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয়টি শব্দ-গোষ্ঠী (phonetic) যার সঙ্গে উচ্চারণের সম্বন্ধ। নীচের অক্ষরগুলি আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে—

方 舫 坊 妨 紡 彷 防

এই সাতটি অক্ষরের প্রথমটির উচ্চারণ **ফাং**। পরবর্ত্তী ছ'টি অক্ষরের প্রত্যেকটিতে এই **ফাং** অক্ষরটি যুক্ত থাকায় ছ'টি অক্ষরেরই উচ্চারণ **ফাং**, কিন্তু তাদের অর্থ বিভিন্ন, কারণ মূল অক্ষরগুলি বিভিন্ন। প্রথমটির মূল অক্ষরের অর্থ হচ্ছে 'নৌকা', সম্পূর্ণ অক্ষরটির অর্থ 'বড় নৌকা'; দ্বিতীয়টির মূল অক্ষরের অর্থ

'জমি', সম্পূর্ণ অক্ষরের অর্থ 'দোকান' (জমির উপর স্থাপিত ব'লে) ; তৃতীয়টির মূল অক্ষরের অর্থ 'স্ত্রী', 'স্ত্রীজাতি', সম্পূর্ণ অক্ষরেরঅর্থ 'বিরক্ত করা' ; চতুর্থটির মূল অক্ষরের অর্থ 'রেশম' বা 'রেশমের সূতা', সম্পূর্ণ অক্ষরের অর্থ 'বাঁধা', ইত্যাদি। এই থেকেই মূল অক্ষর (radical) এবং শব্দ-গোষ্ঠীর (phonetic) প্রয়োজনীয়তা ধরা যাবে।

মূল অক্ষর বা radical সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। কোন চীনা অক্ষরের কোন্ অংশটি মূল আর কোনটি শব্দগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা ধরতে পারা অভ্যাস-সাপেক্ষ। সাধারণতঃ মূল অক্ষরটি উপরে না হয় বাঁদিকে বসে, কখনো বা উচ্চারণমূলীয় অপরটিকে আবৃত করে ? মূল অক্ষর কি ভাবে অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে তা' নীচের অক্ষরগুলির আলোচনাতেই ধরা পড়বে। [অক্ষরের বর্ত্তমান ও প্রাচীন রূপ ক্রমান্বয়ে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে]।

(১) 穴　　　　(২) 突

(৩) 竄　　　　(৪) 穿

প্রথম অক্ষরটির অর্থ হচ্ছে 'গুহা, গহ্বর'। এ অক্ষর হচ্ছে অর্থমূলীয় বা radical, সংখ্যা ১১৬। পরবর্ত্তী তিনটি অক্ষরের মূলেও যে এই অক্ষর তা' সহজে ধরা যায়। দ্বিতীয়টি এই মূল ও অপর একটি অক্ষরের (অর্থ 'কুকুর') সংযোগে তৈরী হয়েছে। একটি গুহার মধ্যে কুকুর প্রবেশ করছে—এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ও সেই অক্ষরের দ্বারা বেগে প্রবেশ করার অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয় অক্ষরটি নির্দ্দেশ করছে যে একটি ইঁদুর গুহা বা গর্ত্তে প্রবেশ করেছে। এই দিয়ে 'লুকানো'র অর্থ জ্ঞাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অক্ষরটি যে দু'টি অক্ষরের সংযোগে তৈরী হয়েছে তাদের অর্থ হচ্ছে—গুহা বা ছিদ্র ও দন্ত ; এর দ্বারা নির্দ্দেশ করা হচ্ছে যে 'ছিদ্রে দন্ত প্রবেশ করান হয়েছে'—সুতরাং 'ছিদ্র করা'।

চীনা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। সংস্কৃত ও চীনা সমজাতীয় ভাষা না হ'লেও চীনা ভাষার উপর সংস্কৃতের বহু প্রভাব দেখা যায়। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচারই তার মূল কারণ। কতকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ

শব্দ চীনারা তাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছে এবং সেগুলির জন্য নূতন, অক্ষরও সৃষ্টি করেছে। যেমন—

বুদ্ধ—**ফো** 佛 𠈃

সংঘ বা ভিক্ষু—**সেং** 僧 𠏥

'বুদ্ধ' 'সংঘ' প্রভৃতি কথাগুলি চীনাভাষায় ঠিক অনুবাদ করতে না পারায় চীনাদের নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতে হয়। শব্দ-গোষ্ঠীর* **ফো** (প্রাচীন-বুদ্) এবং **সেং** (প্রাচীন-**সেঙ্গ**)-এর সহিত 'মানুষ' অর্থবাচক মূল অক্ষর যোজনা করে চীনারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

---

* প্রতি লাইনের দ্বিতীয় অক্ষরটি উচ্চারণমূলীয় (phonetic) এবং প্রথমটি মানুষ-অর্থবাচক মূল অক্ষরের সহিত যুক্ত সম্পূর্ণ অক্ষর

টিকটিকি

দোতলা বাড়ী। সহরের যে অঞ্চল বেজায় সহুরে বলে খ্যাত, সেইখানে। তিন দিকে গাদা করা বাড়ীর চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তাছাড়া, এমন চেহারা বাড়ীটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসবর্ণ রহস্যের মত কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু সরলা খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বে-আবরু অসমতল পিঠে পুরাণো বাদামীরঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশী।

দোতলা বাড়ী বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়ির যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচা-বন্দী দোতলার সিঁড়ি, অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই কোন দিকেই। দোতলায় থাকেন ইতি-হাসের প্রফেসার, সদর দরজাটির পাশে ছোট পিতলের ফলকে যিনি এম-এ। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব, বাকী দুটি সদর দরজার উপরে কাঠের ফ্রেম-লাগানো রঙীন টিনের মস্ত সাইনবোর্ডে যিনি প্রথিতযশা। দুটি দরজাই একটি ঘরের, যার বেশীর ভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়, অল্প একটু অন্দরের প্যাসেজ। তিনটি সদর দরজার মাঝেরটি দিয়ে ঢুকলেই ডাইনে দোতলার সিঁড়ি আড়াল করা দেয়াল আর বাঁয়ে দুটি বই-ভরা আলমারির বে-আবরু পিঠ। এগিয়ে এগিয়ে যখন অন্দরের দরজা ডিঙ্গিয়ে জ্যোতিষার্ণবের আবছা অন্ধকার সেঁতসেঁতে অন্দরে পদা-র্পণ না করে প্রায় আর উপায় থাকে না, তখন দেখা যায়, আলমারির দেয়াল একেবারে অন্দরের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে নি, ফাঁক আছে হাত খানেক। এই ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যোতিষার্ণব নিজে আর তার নিজের লোক অন্দর থেকে গণনালয়ে যাতায়াত করে।

বাইরের লোক আসে তিন নম্বর সদর দরজা দিয়ে। এসে ডবল চৌকীর ময়লা ফরাসেই হোক আর অয়েলক্লথ মোড়া টেবিলের সামনে কাঠের

চেয়ারেই হোক, বসে। ব'সে চারিদিকে তাকায়, বিশ্বাস অবিশ্বাস শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, আশা নিরাশার ভারে বিব্রত চোরের মত। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয়, দেয়ালের টিকটিকি পর্য্যন্ত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন সমস্ত পরপুরুষের দৃষ্টি দিয়ে নিজের সমালোচনা করছে,—আমার কি উপায় হবে ?

আসলে, এ ছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সব কিছুতে এই সমস্যার ছাপ মারা। ভবিষ্যৎ কি সব কিছুকে গ্রাস ক'রে নেই ?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবার সময় তার ছেলেমেয়ের মা মাথা কাত করে, চোখ উল্টে দেয়, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান করে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপরাধ, সাতবছর আগে এই ভঙ্গি তাকে ভুলিয়েছিল। তবে, কেবল ভঙ্গি নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, 'আমি মরলে তোমার কি উপায় হবে ?'

জিজ্ঞাসা করে সকাল বেলা আর মরে যায় সেই সন্ধার কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই যেন সে মরে গেল।

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কি। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আরেকটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? আর সব তো তার জানা আছে,—যা কিছু মানুষের জানা দরকার। ওই জ্ঞানটুকু লাভ করলেই কি তার মনের এ ধাঁধাঁ মিটে যেত যে, তার ছেলেমেয়ের মা মরবে বলে টিকিটিকিটা ডেকেছিল না টিকিটিকিটা ডেকেছিল বলেই তার ছেলেমেয়ের মা মরে গেছে ?

ছেলেমেয়েরা ছোট। বড় ছেলেটি প্রথম ভাগের বানান শেখে, ছোটছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদের মাঝখানেরটি মেয়ে, বোবা ব'লে সে কথা বলতে শেখেনি। মার সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড় ছেলেটি।

'মা কোথায় গেছে বাবা ?'

'স্বর্গে।'

ব'লে প্রমাণের জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়ীতে

আট-দশটার কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবের কথায় সায় দেয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বোকা মনে করার লজ্জায় করুণভাবে একটু হেসে জ্যোতিষার্ণব নিজে নিজেই কয়েকবার মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়ের মা, এতদিনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কি সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে একথা বল্‌লে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে থাকতে পারবে না? তাছাড়া, স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া তো জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে-স্বর্গে যায় ইহলোকে কি সে-স্বর্গ আছে? স্বর্গই নেই ইহলোকে।

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায় নি বলেও তো চুপ ক'রে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল, সেটা অন্ততঃ একবার ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? জ্যোতিষার্ণবের বিপদ এই, সে জানে তার ছেলে-মেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিতা বৌদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী-জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয় তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয় না? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশা ভরসা জ্যোতিষার্ণবের।

মার জন্য ছোট ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবা-কান্না কাঁদে। বড় ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেছে বাবা?'

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতিষার্ণব দেয়ালে টাঙ্গান যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েন্টদের সবিনয়ে বলে, 'একটু বসুন, আসছি।'

ব'লে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর শিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সে দিন ঘরে যা কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা। শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে না, কিন্তু টিকটিকি তো ফাঁকে ফোঁকরে জিনিষপত্রের আড়ালে

অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, এতটুকু জীব টিকটিকি? একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতি-ষার্ণব। ছেলেকে বলে, 'কি বলছিলি তুই খোকা?'

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

'কখন বাবা?'

'আপিসে ঢুকে কি বললি না আমাকে?'

'কিছু বলিনি তো।'

ছোটবোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায়নি। তবে বয়সের তুল-নায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতিষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, 'তোর মার কথা কি জিজ্ঞেস করলি না?'

'মা কোথায় গেছে বাবা?'

বোমা নিয়ে খেলা করবার মত অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতিষার্ণব বলে, 'নরকে।' ব'লে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোট ছেলেটার কান্না, দোত-লায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর হঠাৎ-গাওয়া দুলাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি—

বড় ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধ হয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতিষার্ণব চোখ রাঙ্গিয়ে বলে, 'কাঁদিস না।'

খোকা কাঁদে না।

'শোন, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনও নরকে যায় নি, যাবে। বুঝলি? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।'

আবার জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে, বড় ছেলেটা কেঁদে ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোট ছেলেটার থেমে-আসা ছাড়া ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের থেমে-আসা দুলাইন গানের দুর্ব্বোধ্য গুনগুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকে-ছিল, সেটার। দু'টি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার সখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতিষার্ণব তাই হাত দেখাতে, কুষ্টি মেলাতে, ভাগ্য গণাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজা পার্ব্বণ শান্তি স্বস্ত্যয়ন নির্ব্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে, শুধু দেখা করতে যে বন্ধুরা আসে তাদেরও তেমনি মনের কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মত মনের কথা বলার কথাগুলি তার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। এ যুগের মানুষের অবিশ্বাস-প্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না এ পর্য্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বড় বিমর্ষ হয়ে যায়। গভীর আর্ত্ত বিষাদের ছাপ। তা ছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাসে বা চেয়ারে যেখানেই তার শ্রোতা বসে থাক, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশী। জ্যোতিষার্ণবের ভণ্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকে না,—অন্ততঃ তখনকার মত।

'...প্রমাণ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত বড় বড় প্রমাণ ঘটেছে। এই তো সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই দিন ওই সময় মারা যাবেন?'

'জানতেন?'

গণনালয়ের টিকটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্ত-রেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি, সুকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেয়ালপঞ্জী-বিজ্ঞাপন, দেয়ালে বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেয়াল, ছাদ, কড়িবর্গার আড়াল সমস্ত যায়গা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, এদিক ওদিক একটু তাকালেই নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকে টিকটিকিটার দিকে, তার পর মাথা হেলিয়ে বলে, 'জানতাম। তবে আগে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন তো, মন বিচলিত হয়ে পড়ে। সেদিন সকাল বেলা হল কি, তামাসা করে আমায় বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কি উপায় হবে? মানে, সংসার তো এক রকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কি যে, তিনি যদি মরে যান এ সব কাজকর্ম্মই বা কে করবে,

ছেলেমেয়ে মানুষই বা কে করবে। যেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিক-টিকি ডেকে উঠল।'

'টিকটিকি ?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্তরেখা বিচার করে ওঁর বয়স জিজ্ঞেস করলাম। বয়স অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময় থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কুষ্টিটা বার করো তো, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কুষ্টি বার করে দিলেন। তখনও আমার মন বলছে, থাকগে কাজ নেই, মরণ যদি ওর ঘনিয়ে এসে থাকে কি হবে আগে থেকে জেনে ? লাভ তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনঃকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনার ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেইদিন গোধূলি বেলা পর্য্যন্ত ওঁর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—'

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওয়া যায় না।

'জানতাম কোন লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের সময় তোমার বয়স তো দু'এক বছর কম করে বলা হয় নি ? কুষ্টি ঠিক আছে তো ? বিয়ের সময় যদি—থাকগে ওসব কথা। আপনাকে যা বলছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—'

নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী। ছ'মাস পরে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য রেবতীকে বিয়ে করে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়ীতে আসে বটে, বাড়ীতে কিন্তু একটিও টিক-টিকির দেখা সে পায় না।

তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বৌকে সতর্ক করে দেয়, 'ছাখো, কোনদিন মরার কথা মুখে এনো না।'

রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে

না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিপদ তুজনের নক্ষত্র নিয়ে। তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মত।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম কি এ-ই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারিনি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোট। কিছু-দিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসারের বাড়ী, কি ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়েসের তুলনায় কি প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন,—কারো স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশী কড়ি আর তাস খেলতাম যে ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামী কি যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীর সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতিষার্ণব তু'বার ঘুরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

'দেখি হে ছোকরা তোমার হাতটা। আরে বাস রে, একি হাত, এত হিজি-বিজি রেখা পেলে কোথায়? ভাল করে দেখতে হবে তো হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেকদিন, তবে—

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

'খুব হয়েছে, ছেলে মানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।'

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতিষার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপগুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধা তৃষ্ণার তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারীর পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষার্ণবের গল্প শেষ হ'তে বলি 'আরেকটা।'

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতিষার্ণব হাসির ভান করে বলে, 'এ বাড়ীর টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তা হলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘরেই তো তিনটে আছে, লাঠিটা দিয়ে মার না একটা ?'

আমি বলি, 'লাঠি দিয়ে বুঝি টিকটিকি মারে ? দাঁড়ান, আমার তীর ধনুক নিয়ে আসি।'

রেবতী বলে, 'মাণিক, মেরো না, টিকটিকি মারতে নেই।'

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে, রেবতীর মত মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালবেসেছে, কথা না শুনলেও ভাল না বেসে সে পারবে না, আমার সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলবার জন্য ও যে রকম পাগল হয়ে উঠেছে সে পাগলামি যাবার নয়। গল্প না বলে আমায় কষ্ট দেবার সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতালায় গিয়ে আমার বাঁশের ধনুক, আর শরের তীর নিয়ে আসি। তীর আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায় দুটি আলপিন বসান আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাসে উঠে দাঁড়ালে আমার তীরের আয়ত্তে আসে এইরকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিষ্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মায়া হয়।

রেবতী আবার বলে, 'মাণিক, মেরোনা, মারতে নেই।'

রেবতীকে আমি ত্যাগ করিনি, কিন্তু তার কথার কোন দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান করে চার ইঞ্চি তফাৎ থেকে বাণ নিক্ষেপ করি। এমন আশ্চর্য্য জীব টিকটিকি যে শিকারীকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নীচে পড়ে যায়। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি, দুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে দুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন দুটি চোখ। মানুষের রক্তের মত লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

'চার-চোখো করে দিলে ! টিকটিকি চারচোখো করে দিলে ! তোমাকেও চারচোখো হতে হবে মাণিক।'

প্রোটন

আমাদের প্রেমে বুনানি নহেক ঠাস,
যোগের চেয়ে যে বিয়োগ তাহার বেশী,
পরমাণু-মাঝে প্রোটন-ইলেক্‌ট্রন,
কাছাকাছি তবু নহে মোটে ঘেঁসাঘেঁসি।
পরমাণু-ভাঙা প্রোটন-ইলেক্‌ট্রন,
বস্তুজগতে ক্ষুদ্রতম যে তারা,
তবু তাহাদের স্থিতি ও গতির রীতি
বিস্মিত করে সৌরজগত সারা।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

বিরহ

তুমি দূরে, তাই দূর এত লোভনীয়।
তোমার বিরহ রাগে অনির্ব্বচনীয়
সুষমায় রাঙিয়াছে আমার আকাশ।
পূর্ণ আমি। বিচ্ছেদের কোথা অবকাশ?
দিগন্তে নিরন্ত জাগে তোমার প্রেক্ষণ,
তবস্পর্শমদালস মন্থর পবন,
নক্ষত্রসঞ্চারে, ছায়াপথ-পুরোভাগে
তব লঘুপদক্ষেপ রহি রহি জাগে,
আমার নিখিলে হয়ে আছো সর্ব্বময়ী।
তবুও নিভৃত মর্ম্মে লুক্কায়িত রহি'
আদিম সে কোন সর্প দংশে বারম্বার,
মগ্নচিত্ত মূর্চ্ছি পড়ে হলাহলে তার।
মৃত্যু অন্তে নবপ্রাণ। ওঠে জয়ধ্বনি।
তুমি আনো বিরহের বিশল্যকরণী।

যুবনাশ্ব

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক!

রেবতী নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, 'ফের? ফের ছেলে-মানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?' ব'লে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চারচোখো বলে কত যে তামাসা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসারের বাড়ীতে আমি কোন দিন যাই নি। চার-চোখে রেবতীকে একবার চোখেও দেখি নি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণ-বিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাসে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,—রেবতীর কোন দোষ ছিল না তবু।

হয়ত' রেবতী জ্যোতিষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়ত' টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমায় চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যালেষ্টাইনের সমস্যা

প্যালেষ্টাইন এক সময়ে ধর্ম্মজগতের কেন্দ্র ছিল কিন্তু তাহার পর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে তাহার স্মৃতি সকলে ভুলিয়াছিল, ভুলে নাই কেবল গৃহহীন,দেশচ্যুত যাযাবর ইহুদীজাতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহারা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিলেও, সর্ব্বত্র ধনবলে, বুদ্ধিমত্তায় ইহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও, প্যালেষ্টাইনের তীর্থ-ক্ষেত্রে,এই চিরবাঞ্ছিত পুণ্যভূমিতে বসবাস করিবার স্বপ্ন ইহারা চিরকালই দেখিয়াছে। সে সুযোগ তাহারা পাইল মহাসমরের পর। ভারতের ইতিহাসে যেমন ইংরাজশক্তির বৃদ্ধির মূলে একজন ইংরাজ ডাক্তারের স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম, ইহুদীদের প্যালে-ষ্টাইনে প্রত্যাবর্ত্তনও তেমনই একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিকের স্বজাতিবাৎসল্যের ফল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই দেশবিদেশের ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু এই চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হয় নাই তাহার কারণ প্যালেষ্টাইনের অরাজকতা। স্থানীয় আরব অধিবাসীগণ ইহুদীদিগের আগ-মনে বাধা দেয় নাই, কারণ তাহারা জানিত যে অল্পসংখ্যক ইহুদী তাহাদের কোন ক্ষতি করিবে না, বরং তাহাদের চেষ্টায় শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইলে, দেশের মঙ্গল হইবে। বিগত মহাসমরের সময় যখন ইংলণ্ড ডুবাজাহাজের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে গোলাগুলি প্রস্তুত করার উপর যখন জীবন-মরণ নির্ভর করি-তেছে, তখন দেখা গেল যে এই সকলের জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান এল্‌কোহল যথোপযুক্ত পরিমাণে নাই এবং অন্য কোন দেশ হইতে আনাইবারও উপায় নাই। এই সঙ্কটের সময় ইহুদী ওয়াইস্‌ম্যান কাষ্ঠ হইতে এল্‌কোহল নিষ্কাশন করিয়া ব্রিটিশ সমরশক্তিকে সহায়তা করেন এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ স্বজাতীয়গণ যাহাতে প্যালে-ষ্টাইনে বসবাস করিতে পারে, এই বিষয়ে ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহার ফলে ১৯১৭ সালে পররাষ্ট্র-সচিব ব্যালফুর তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে ইহুদীদিগের প্যালেষ্টাইনে উপনিবেশ স্থাপনে ইংলণ্ডের সহানুভূতি আছে এবং ব্রিটিশ সরকার তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সহায়তা করিতে প্রস্তুত; তবে স্থানীয় অধিবাসীগণের কোন অধিকার ইহার ফলে খর্ব্ব না হয়, তাহাও ইংলণ্ড দেখিবেন। ইহার পর ভের্সাই-র সন্ধির ফলে প্যালেষ্টাইনের অভিভাবকত্ব যখন ইংলণ্ড গ্রহণ করিলেন,

তখন তাঁহাদিগের লক্ষ্য হইল ইহুদী ও আরবকে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষা দেওয়া। এই দুই জাতির চরিত্রগত বৈষম্য যথেষ্ট ; ইহুদী পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী, আরব অলস ও বিলাসপ্রিয়। ব্রিটিশ শাসনে অন্যত্র বাঘে গরুতে একত্র বসবাস করিলেও এখানে তাহা হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই দুই দলে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। আরব ইহুদীকে বিধর্ম্মী ও দেশলুণ্ঠনকারী আখ্যায় অভিহিত করিল, ইহুদীও আরবকে অশিক্ষিত ও বর্ব্বর জ্ঞানে ঘৃণা করিল। ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিল। লর্ড প্লুমার হাই কমিশনার হইয়া আসিয়া উভয় দলে মিলন সাধন করেন এবং যখন ১৯২৫-এ আর্থিক সঙ্কটের ফলে অনেক ইহুদী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিতে লাগিল, আরবদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বুঝিয়াছিলেন যে আরবদিগের অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে, সেইজন্য অনুসন্ধানের পর শ্রমিক দল-ভুক্ত সচিব লর্ড প্যাসফিল্ড যখন ঘোষণা করিলেন যে ইহুদীদের আগমনে বাধা দেওয়া আবশ্যক, আরবগণ আনন্দিত হইল কিন্তু দেশবিদেশের ইহুদী সমাজ ক্ষোভ প্রকাশ করিল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড ইহুদী সমাজকে আশ্বস্ত করিলেন যে এই নীতি কার্য্যে অনুসৃত হইবে না। আরবগণ বৃটিশ সরকারের এই অস্থিরচিত্ততায় প্রসন্ন হইল না।

ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে। অনুর্ব্বর ভূমিকে বহু-অর্থব্যয়ে কৃষির উপযোগী করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। জর্ডনের জল-বেগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালনা করিয়া তাহারা নানা প্রকার শিল্পকেন্দ্র গঠন করিয়াছে। সাগরতীরে তাহারা এক সুরম্য নগরী, তেল অভিভ, গঠন করিয়াছে, সেখানে এখন অর্দ্ধলক্ষ ইহুদীর বাস। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের সর্ব্বত্র ইহুদী-বিতাড়ন নীতি অনু-সৃত হওয়ায় সহস্র সহস্র ইহুদী জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী হইতে প্যালেষ্টাইনে আসিতেছে, ইহার ফলে আরবগণ শঙ্কিত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ করিয়াছে। এই বিদ্রোহের মূল তিনটি কারণ—ইহুদীগণের অবাধ আগমন, ভূমির অধিকার, ও ও শাসনতন্ত্র।

ইহুদীপক্ষ বলে যে পৃথিবীর কোথাও তাহাদের স্থান নাই, সবদেশ হইতেই তাহারা বিতাড়িত হইতেছে, তাহাদের স্থান প্যালেষ্টাইনে কেন হইবে না, বিশেষ যখন তাহারা এই দেশের অনিষ্ট না করিয়া মঙ্গল সাধনই করিয়াছে। তাহাদের আগমনের ফলে এই দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। তাহারা আরবদিগকে স্থান-

চ্যুত করে নাই, বরং তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে আরবের অন্যান্য অংশ হইতে লোক আসিয়া বসবাস করিতেছে, ইহার ফলে গত ১৪ বৎসরে আরবের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ বাড়িয়াছে। আরবগণ অস্বীকার করেন না যে ইহুদীর আগমনে তাঁহাদের কিছু উন্নতি হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করেন। এখন ব্রিটিশ শাসনের ফলে ইহুদী কোন অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না বটে, ভবিষ্যতে যখন তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িবে, দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ইংলণ্ড তাহার অভিভাবকত্ব ছাড়িয়া দিবে, তখন ইহুদীর অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কে? বৈষয়িক সুখসম্পদের জন্য তাহারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ১০,০০০ ইহুদী আগমন করিত কিন্তু ১৯৩৩-এর পর হিটলারের অত্যাচারের ফলে হঠাৎ ইহুদীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে। গত তিন বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে। এই লোকবৃদ্ধির ফলে নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে এবং কমলালেবুর চাষ দ্রুত বাড়িয়াছে; ইহাতে আরব দিগের মধ্যে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু এখনই ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদিগের এক-তৃতীয়াংশ, এই হারেই তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকিলে ২০ বৎসরের মধ্যে তাহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং শাসনতন্ত্রে তাহাদের প্রভাব সেই পরিমাণে বাড়িবে। শাসনে অধিকতর দাবী করা যে ইহুদীর পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা আরব জানে। ইহুদীর ধনে দেশের সমৃদ্ধি এবং সেই ধনসংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য যে তাহারা ব্যগ্র হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই অধিকার স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। এখন যে আইন সভা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে আরব, ইহুদী ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিবে। বর্ত্তমানের সংখ্যা অনুসারে ১৪জন আরব ও ৭জন ইহুদী সদস্য থাকিবে। কিন্তু ইহুদীগণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা আরবদিগের সহিত সমান সংখ্যার দাবী করিতেছেন। রাষ্ট্রের রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ তাঁহারা দেন এবং শিক্ষায় তাঁহারা অগ্রগামী, সুতরাং লোকসংখ্যার অনুপাতেই কেবল বিচার করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। আরব পক্ষ চাহেন যে আইন দ্বারা ইহুদীদিগের ভূমির অধিকারবৃদ্ধি রহিত করা হউক। এখন কৃষি-উপযোগী জমি সমগ্র দেশে যতটা তাহার এক-অষ্টমাংশ ইহুদীর অধিকারে। কমলালেবুর চাষ হয়

৭০,০০০ একারে, তাহার মধ্যে ৪০,০০০ একার ইহুদীদের; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আরবদের কমলার চাষ দ্রুতবেগে বাড়িয়াছে। সকল জমি ইহুদী-দের চাষ বা বাসের উপযোগী নহে কিন্তু ভাল জমির অধিকাংশই তাহাদের অধিকারে। আরবের আশঙ্কা যে ইহুদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আরও যে কিছু ভাল জমি তাহাদের দখলে আছে তাহাও অধিকারচ্যুত হইবে। ইহুদী বলেন যে এ পর্য্যন্ত ভূমিবিক্রয়ের ফলে কোন আরব ভূম্যধিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, বরং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জমি সম্বন্ধে যে আইন করিয়াছেন তাহার ফলে যদিও ইহুদীকে জমি বিক্রয় নিষেধ করা হয় নাই, তবু জমির দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। এই চড়া দাম দিয়াও যখন ইহুদী জমি কিনিতে প্রস্তুত তখন তাহার চাহিদা যে কত বেশী এবং প্যালেষ্টাইনে বাস তাহার কত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের প্রবেশে কোন বাধা দিলে ব্যালফুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া তাহারা প্রতিবাদ করিবে অথচ বাধা না দিলে, আরবের "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইবার শঙ্কা বাড়িবে। এই সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

পররাষ্ট্রসচিব প্যাসফীল্ড ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের আগমনরোধ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আরব কৃষককে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা। ইহা সত্য যে আরবের জমি অনেকাংশে তাহাদের অধিকার-চ্যুত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে মুষ্টিমেয় অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষক ব্যতীত আর কোন আরবই লাভবান হয় নাই। সম্পন্ন কৃষক এই বিক্রয়লব্ধ অর্থকে শিল্পে বাণিজ্যে খাটাইয়া নিজের, অবস্থার উন্নতি করিবার সুযোগ পাইয়াছে কিন্তু দরিদ্র কৃষক ভূমি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইয়াছে, মহাজনের নিকট পূর্ব্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে তাহা চলিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা ভূমি ও বিত্ত দুই হারাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহুদীর আগমনে প্যালেষ্টাইনের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার অংশ গ্রহণ করিবার শক্তি অধিকাংশ আরবের নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে ইহুদী গ্রামগুলিতে যেমন বিংশশতাব্দীর ছাপ মারা, পার্শ্ববর্ত্তী আরবগ্রাম এখনও ২০০০ বৎসর পিছাইয়া আছে। ইহুদীর কৃষিকর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে উন্নত হইয়াছে এবং ভূমির ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ তাহারই পার্শ্বস্থ আরব কৃষক কোন মতে তাহার পূর্ব্বাচরিত পদ্ধতিমতে কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবনযাপন করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে ইংলণ্ড তাহার অভিভাবকত্বে ইস্তফা দিন। এক

আরব দেশকে ইহুদী বানাইবার প্রয়াসে ইংলণ্ডের লাভ নাই, এই সকল ইহুদী ত ইংলণ্ড হইতে যায় নাই, তাহারা জার্ম্মানী, পোলাণ্ড বা রুষ হইতেই গিয়াছে। আরবগণের ক্ষতির কারণ হইয়া অপরাপর মুসলমান দেশের বিরাগভাজন হইয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যদি ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তে তুর্কী অভিভাবক হয়, আরবগণ তাহা পছন্দ করিবে না এবং যদি প্যালেষ্টাইনকে সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হয় তাহা হইলে ইহুদীদিগের প্রতি অবিচার হইবে। ইহার একমাত্র সমাধান হইতেছে, এই দুই দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া, উভয়কে স্বায়ত্ত-শাসনের শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ ইংলণ্ডের সরিয়া দাঁড়ানো। উভয় পক্ষের নেতাগণের দায়িত্ব অতিশয় গুরু—তাঁহারা যদি মৈত্রীভাবে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হন এবং একযোগে কার্য্য করিতে দৃঢ়সংকল্প হন তাহা হইলে ভূমি বিষয়ক আইন বা অবাধ আগমনের অধিকারের প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন নহে। যদি ইহুদীগণ অঙ্গীকার করেন যে তাঁহারা কেবল নিম্নলিখিত সর্ত্ত অনুসারে জমি ক্রয় করিবেন তাহা হইলে আরবের আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়ের অধিকার থাকিবে। কমলালেবুর চাষ ব্যয়সাপেক্ষ এবং দরিদ্র আরবের পক্ষে ইহার বিস্তার সম্ভব নহে, সুতরাং এই চাষের নিমিত্ত তাহারা জমি ক্রয় করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া অন্যত্র জমি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় আরব অধিবাসীদের সম্মতি লইয়া তবে ক্রয় করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রীয় অধিকারে সাম্যের দাবী ইহুদীকে ছাড়িতেই হইবে, এবং আরবকে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হইতে হইবে, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সে শাসনতন্ত্রের ভার লইবার উপযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় শাসনের পূর্ণতর অধিকার দেওয়া উচিত, কারণ ইহাতে শিক্ষা লাভ করিলে পরে দেশের শাসনের ভার লওয়া সম্ভব হইবে।

প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ কি? ব্রিটেন তাঁহার অভিভাবক পদ রাখুন বা ছাড়িয়া দিন, ইহুদী আরব, কেহই প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিবেন না। এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের আর্থিক যোগ যে ভাবে স্থাপিত হইবে তাহার উপর দেশের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করিবে। এক উপায়, ইহুদী দেশের শিল্প-বাণিজ্যের নেতৃত্বগ্রহণ করিবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম্ম করিবে ও সকলপ্রকারের পরিশ্রমের কাজে আরব ব্যাপৃত থাকিবে। ইহার ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে

পুস্তকপরিচয়

কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

১৩২১ থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বইয়ে সেগুলি সংগৃহীত হ'য়েছে। এর প্রথম প্রবন্ধ কালান্তর—তার নাম অনুসারেই সমগ্র বইয়ের নামকরণ করা হ'য়েছে। কালান্তরে কবি প্রাক্-মহাসমর ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমরোত্তর কালে তার যে বিরোধ ঘটেছে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভেতর থেকে আজ সত্যিকার মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হ'য়েছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে দুর্নিবার পশুবল। মানুষের আধ্যাত্ম-সম্পদ, তার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত জীবন-ধারা, তার কল্যাণপ্রদ সুস্থ প্রয়াস, আজ কালধর্ম্মে পর-জাতিদ্বেষ ও বস্তু-সর্ব্বস্ব আত্মবিস্তার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। বিজ্ঞানে, দর্শনে সাহিত্যে আজ সগর্ব্বে সেই বর্ব্বরতা ঘোষণা করাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকথা—খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্র আজ উঠেছে কুলুঙ্গীতে, তার স্থানে দেখা দিয়েছে নিরাবরণ পাশবিকতা, যা শুধু চায় গ্রাস ক'রতে এবং তাই ক'রে যা ঘোষণা করে কালচারের মহিমা। এই হ'ল সত্যিকার কালান্তর, যার অক্ষুণ্ণ দাপটে সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, ধর্ম্ম—মানুষের বহু যুগের বহু তপস্যায় যাদের উৎপত্তি, তা উল্টে-পাল্টে ভেঙে-চুরে একাকার হ'য়ে গেছে। সুতরাং নবযুগের বহু আড়ম্বরময় এই আধুনিকতাটা একান্তই স্থূল—এ শুধু ফেঁপে উঠেছে বস্তুর আশ্রয়ে, এর ভেতর কিন্তু থেকে গেছে বিরাট একটি ফাঁকা, যা দিয়ে ঝলকে ঝলকে জল ঢুকে ইউরোপীয় সভ্যতার সৌধ-প্রাচীরে ফাটল ধরাচ্ছে···অতএব একদিন সমগ্র প্রাসাদের আকস্মিক ভূ-পতন ঘটবেই, ঘটা অনিবার্য্য। কালান্তর সেদিন কালান্তক হ'য়ে দাঁড়ানো আশ্চর্য্য নয়।

কবির এ বিশ্লেষণ যে অত্যন্ত নিপুণ তাতে সন্দেহ নেই। ইউরোপেও আজ থেকে থেকে গেলো গেলো শব্দ হ'চ্ছে—এই গেলো গেলো ভাবটা অনেক দিন থেকে চ'লেছে ব'লেই এটা সত্যি না, এমন নয়। ফাউষ্ট যে সয়তানের সহায়তায়

অমিত শক্তিধর হ'য়েছিল, দক্ষিণা স্বরূপ সেই সয়তানের হাতে আত্মবলি দিয়েই তাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'য়েছিল। মাঝপথে তার থামার উপায় ছিল না—ইউরোপের বস্তু-মুখী রাষ্ট্রবুদ্ধি তাকে যে অসীম প্রতাপ দিয়েছে, তার পেছনে সাধনা ছিল অশিব শক্তির, তার মূল্যও হয়ত তাকে দিতে হবে। কারণ সর্ব্ববিধ সদ্বুদ্ধিকে ছাপিয়েই ত আজ একথা বারবার ধ্বনিত হ'চ্ছে যে আবার যুদ্ধ চাই, তাতে ভালো মন্দ যা হয় হ'ক। সুতরাং একথা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতর কোথাও এমন একটা দুষ্টক্ষত র'য়ে গেছে যা দুশ্চিকিৎস্য। বলা বাহুল্য প্রাক্-মহাসমর ইউরোপে এ জিনিষ কল্পনাতীত ছিল, তখন পরস্পর পরস্পরকে ডোবাবার জন্যে এমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গলা কামড়াকামড়ি করে নি। ফরাসী বিপ্লবও সে হিসাবে বার দুই একটু সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে নাড়া দিয়ে গেছলো মাত্র, তার বেশী কিছুই করেনি। কাজেই এ যে কালান্তর তাতে আর সন্দেহ নেই—এই দুই কালকে বিভক্ত ক'রে মাঝখানে অবস্থিত মহাযুদ্ধ।

অবশ্য এই কালান্তরের ছায়াতেই নিঃশব্দে এ যুগের প্রজ্ঞাদৃষ্টিও এগিয়ে এসেছে, ব্যাপক ভাবে না হ'লেও জগতে তারও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি থাকতে বাধ্য। মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, বস্তু-দর্শন, সেই ঐতিহ্যের ঔরসে নব নব আদর্শের ও চিন্তারও জন্ম দিয়েছে—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তারই নূতন আলোকে নব নব আকারও ধ'রেছে। তার ভেতর সূক্ষ্ম রসাত্মকতা বা লোকোত্তর প্রশান্তি হয়ত নেই, কিন্তু একটি সহজ স্বচ্ছ প্রত্যক্ষতার দ্যুতিও আছে। অবশ্য রাষ্ট্রিক বিক্ষোভের আতিশয্যে এই প্রজ্ঞামূলক সংস্কৃতির ধারাটা বিশেষ ভাবে আত্ম-প্রকাশ ক'রতে পারছে না; তার গতিপথ অবরুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে বারবার এবং স্রোতহীন হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আবর্জ্জনাও জমে উঠেছে বিস্তর, তখন হট্টগোল ও হুড়োহুড়ি এত বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে তার গঠনের দিকটা প্রায়ই নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে কাজ কিছু হ'চ্ছেও—আধুনিক ইউরোপের এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি দিকেই কালান্তর—এর একটাকে কবি নিয়েছেন, আর একটাকে অস্বীকার ক'রেছেন। বলা বাহুল্য কবির প্রবন্ধ রাষ্ট্র প্রসঙ্গেই—এবং একথাও ঠিক যে রাষ্ট্র-সংস্রবচ্যুত হ'য়ে মানুষের কোন প্রচেষ্টাই সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে জয়যুক্ত হ'তে পারে না! তা পারছেও না। অন্ততঃ তার ভেতর থেকে যাচ্ছে একটা বিদ্রোহের সুর, একটা

ক্লান্তিকর আক্রোশের ঝাঁজ—যা সর্ব্ববিধ কল্যাণকর সৃষ্টির প্রতিকূল। তবু একে এক কথায় নস্যাৎ করা চলে না।

কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের ভেতর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে কালান্তরটা যত প্রত্যক্ষ, আমাদের দেশে তত নয়। আমাদের মাথার উপর দিয়েও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিপুল ঢেউ ব'য়ে গেছে বটে—কিন্তু তা আমাদের তটভূমিকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেনি, আমাদের সীমান্ত দেশ পার হ'য়ে আরো অনেক ঊর্দ্ধে রুশিয়ার ঊষর মাটিতে এই ঢেউ প'ড়ে ভেঙেছে এবং তাদের ভূমিকে উর্ব্বর ক'রেছে। আমরা মহাযুদ্ধকে অনুভব ক'রেছি একটা দুর্নিরীক্ষ্য দূরগত উপপ্লব রূপে—যা আমাদের চা'ল ও কাপড়ের দাম চড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের কণ্ঠরোধ ক'রে সমরঋণ আদায় ক'রেছে—আর অনুভব ক'রেছি পরোক্ষভাবে ও-দেশের সাহিত্যের আদর্শ বিপর্য্যয় থেকে। অর্থাৎ এটা আমাদের পক্ষে একান্তই পরোক্ষ ছিল সেদিন—যদিও আজ বুঝি ব্যবসার বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অল্পসংখ্যকের ধনবৃদ্ধির দ্বারা বিশ বৎসরে গোটা দেশের নিরন্ন হাড়পাঁজড়া এমন ক'রে বার ক'রে দেওয়ার পেছুনে হাত ছিল মহাযুদ্ধেরই সব চেয়ে বেশী! সেদিন আমরা তেমন বুঝিনি, বুঝলেও কিই বা প্রতিকার ছিল?

আমাদের দেশে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ব্যাপক ভাবে কোন কালেই ছিলনা—অতীত বাংলার ইতিহাসে সমগ্র দেশের ওপর একটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব কোন দিন ছিল ব'লে শোনা যায় না—কাজেই দেশ ছিল তার গৃহ নিয়ে, রাজা ছিল রাষ্ট্র নিয়ে। সেই সনাতন দ্বৈত বিধির ওপর প্রথম আঘাত পড়ে মহাযুদ্ধের অল্প আগে এবং ইউরোপের কাছে ধার-করা কড়ি নিয়েই আমাদের প্রথম জাতীয় এক্স্‌পেরিমেণ্ট। আমি ব'লছি স্বদেশী আমলের কথা। তার পিছুনে জিদ ছিল, ত্যাগ ছিল, সাহস ছিল—ছিল না প্রাণের সঞ্চয়—কাজেই সেই বিপ্লবের ব্যর্থ বুদ্বুদ অচিরে বিদীর্ণ হ'য়ে দেখালো গুটি কতক সাহেব মারাই জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে চরম বা পরম নয়—নিজেদের তৈরি ক'রে তোলা দরকার—নিজেদের অপ্রবুদ্ধ মন, অপটু অস্তিত্ব, অস্ফুট জাতীয় চেতনা, সংস্কারের কু-আচারের বেড়াজাল ঘেরা কুণো মনোভাব আমাদের পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বড় বাধা—তা তিরোহিত না হ'লে বৃথা এই ছেলে খেলা। সে আন্দোলন নিষ্ফল হ'ল, কারণ তা দেশের অন্তর থেকে উৎসরিত হয় নি, হ'য়েছিল দু'চারটি ইংরেজী শেখা

তরুণের মাথা থেকে—বাকী সমস্ত দেশেই তখনো ছিল ঘোরতর নিষ্কর্ম্ম—আজও আছে। সুতরাং মহাযুদ্ধটাকে চাকা হিসাবে গ্রহণ ক'রে আমরা জাতীয় জীবনের মোড় ফেরাতে পারিনি—সেদিকে হুঁস হয় নি আমাদের।

এই বইয়ের 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে চক্ষুকর্ণহীন রক্ষণশীলতাটা বহুযুগের জীর্ণ নামাবলী গায়ে আমাদের সর্ব্ববিধ অগ্রগতির পথ আটক ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে—তাকে কবি অত্যন্ত কড়া ভাবে আঘাত ক'রেছেন এই প্রবন্ধে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সবাই বোধ করি একমত যে এই ঘুণধরা বৃদ্ধত্বটা আমাদের চিন্তার বুকে ভারী পাথরের মতো জেঁকে ব'সে আছে এবং তা আছে বলেই বাইরের স্বাস্থ্যকর কোন হাওয়াও আমাদের গায়ে লাগে না। 'লোকহিত' এবং 'ছোট-বড়' প্রবন্ধেও কবি এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা ক'রে দেখাতে চেয়েছেন—দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেষ্টা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থ হারিয়ে কি ভাবে গতানুগতিক ধারায় দিনের পর দিন নিষ্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে একজায়গায় পাক খেয়ে ফির্‌ছে, তা কবির চেয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে কেউ দেখতে পারতেন না। এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বের রচনা—কিন্তু আজও এর প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে খাটে, হয়ত আরও ঢের দিন খাটবে। কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বহু দেশের ভৌগলিক সংস্থান এবং আত্মিক ঐতিহ্য ওলটপালট হ'য়ে গেলেও আমরা যথারীতি টিঁকে আছি; এই টিঁকে থাকাটা নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোর। বস্তুতঃ এর গ্লানিটা যে কত বড় কবি সে দিকে আমাদের অবহিত ক'রে দিয়েছেন। এই যে দেশে রেল ষ্টিমার মোটর কল কারখানা প্রাসাদ অট্টালিকা পলিটিক্স সাময়িক পত্রিকা ইউনিভার্সিটি মিউনিসিপালিটি আরও কত কত কি হ'য়েছে, এ ক'রেছে অন্যে—এদের প্রসার আমাদের জীবনের বাহিরেই সীমাবদ্ধ—আমাদের অন্তরদেশে আজও অক্ষুণ্ণ তেজে সনাতন আটচালা মাথা তুলে র'য়েছে—আমরা এক চুলও এগুইনি, তাই আমাদের সর্ব্ববিধ আন্দোলন আলোড়ন কৃত্রিম—ওদের জন্ম আমাদের প্রাণের তাগিদে নয়—এ কথা যত লজ্জারই হ'ক সত্যি কথা। কাজেই ওরা কোন দিন সুফল কিছুই আনতে পারে নি। আমরা পরানুকরণে রাতরাতি মাতামাতি করেছি; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পুঁজি শেষ হ'য়ে

গেছে—অমনি আমরা ধুলোর মতো গা থেকে সমস্ত আন্দোলন ঝেড়ে ফেলে গৃহ কোণে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

সমস্যা এই, কিন্তু সমাধান কি তা কবি দেখান নি। সেটা সংস্কারকের কাজ। সেদিকে আজও বৃথা প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

'সমস্যা', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শক্তিপূজা' প্রভৃতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গান্ধী আন্দোলন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কবি দু' একটি ইঙ্গিত ক'রেছেন। স্বদেশী আন্দোলনটা আমাদের শৈশবের ব্যাপার—কিন্তু এই আন্দোলন-কালে আমরা নেচেছি, যদিও বুঝেছি এ নাচের অর্থ শুধু নাচাই ; কারণ দেশের নাড়ির যোগ ছিল না এর সঙ্গেও। দলে দলে ছেলে-মেয়ে জেলে গেছে, লাঠির তলায় মাথা দিয়েছে, স্কুল-কলেজ কাজ-কারবার ছেড়েছে—কিন্তু তাদের সাম্নে কোন লক্ষ্য ছিল না, কোন গঠনমূলক পদ্ধতি ছিল না—সুতো কেটে, হরতাল ক'রে, আরো তজ্জাতীয় নানা খেলো কাজ ক'রে অচিরে শক্তিক্ষয়ের ফলে সমস্ত দেশ অসম্ভব রকম ক্লান্ত হ'য়ে একেবারে ঝিমিয়ে প'লো, তার সেই অবসাদের সুযোগে কখন গলায় নূতন শাসন-সংস্কারের লোহার হাঁস্থলি চড়েছে, তা কেউ টেরই পেলোনা! জালিয়ন-ওয়ালাবাগের উৎপীড়নকে উপলক্ষ্য ক'রে যে সাময়িক চাঞ্চল্যে এর জন্ম, তার সঙ্গে খিলাফতের রসায়ন মিশেল দিয়ে, চলনসই একটা পলিটিক্যাল পথ্য তৈরী করা হ'য়েছিল—বিচক্ষণ বৈদ্যের হাতে তা' মহিমান্বিত চেহারা ধ'রলেও, আসলে রোগের তাতে আসান হ'ল না—তার কারণ রোগটা বহুজীর্ণ এবং পুরুষানুক্রমিক। ওর সংস্কার সম্ভবই নয় হয়ত।

কবি বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন এই রোগটা কোথায়। তিনি জোরের সঙ্গেই ব'লেছেন এই রোগটা পলিটিক্যাল মার্কামারা হ'লেও, এর আসল বিস্তারক্ষেত্র হ'চ্ছে আমাদের গৃহ। এরই সীমানার মধ্যে এটা অদৃশ্য প্রেতের মতো উপদ্রব ক'রে ফিরছে—আমরা তার আভাস পাই, উদ্দেশ পাইনে। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের এই জীর্ণ পাঁজরে আর খাড়া হ'য়ে দাঁড়ানোর বল নেই—, আমাদের কৃষি নেই, বাণিজ্য নেই, শিক্ষা সীমাবদ্ধ, স্বাস্থ্য লুপ্ত—আমাদের নূতন ক'রে সহজ ক'রে নিজেদের সমস্যাগুলোকে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবার মতো শক্তি বা সাহস নেই—অথচ দিনের পর দিন অন্ধের মতো আমাদেরকে এই ভাঙাচোরা

জিনিষটাকে আঁকড়েই চ'ল্‌তে হচ্ছে—দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এর ভগ্নদশাটাও আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তারই ফলে বহু আবর্জ্জনা এর অলিতে গলিতে জমে উঠেছে—তাও আমাদের কাছে পুরাতনের গৌরবে সমৃদ্ধ। তাই কবি ব'লেছেন বিচারের চেয়ে আচারকে আমরা বড় ক'রেছি—আমরা মানুষকে চিনিনি, চিনেছি তার সাময়িক বদখেয়ালকে, এবং তাকেই দিয়েছি ষোল আনা শ্রদ্ধার উপচার! তাই বলা যেতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনে কালান্তর আজও আসে নি—আজও আমাদের চ'লছে পূর্ব্বতনের একটানা ঢিমেতালা গতি!

তবে কালান্তরে বিলম্বে আর নেই। ধনিক ও শ্রমিকের মাঝখানকার যে বৃহৎ স্তরটা—যেটাকে বলে মধ্যবিত্ত, আসলে এ দেশে যেটা গরীব সম্প্রদায়—তার অবলম্বন চাক্‌রী; তাতে কন্যাদায়, শিক্ষাদায়, জাত্যভিমান আরও বহু অবাঞ্ছিত জিনিষের ভীড়—চাক্‌রি আর হবে না; মেয়ের বিয়ে হওয়া বড় কঠিন, ছেলে-মেয়ের শিক্ষার পথ প্রায় রুদ্ধ—এই ভাবে ক্রমে এই সম্প্রদায়টা ধ্বংস হবেই। তার-পর মাঝখানের এই স্তরটা সরে গেলেই প্রথম ও তৃতীয়ে যে একটি বিপুল ঠোকা-ঠোকি হবে, তাতে আমাদের জাতের ভাগ্য হয়ত বদলালেও বদলাতে পারে। সেদিন এই কৌলীন্যের গর্ব্ব, এই সনাতনতার গর্ব্ব, এই নিশ্চেষ্ট রক্ষণশীলতার গর্ব্ব হয়ত দূর হবে। কিন্তু সেদিন থাকবেন না কবি—আর থাকবো না আমরা, তাঁর অনুগামী শিষ্য-সেবকগণ!

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

Ideology and Utopia—by Karl Mannheim, translated by Louis Wirth and Edward Shils. (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.)—15s.

নাৎসি-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সমস্ত জার্মানী বিভিন্ন মতামতের সঙ্ঘর্ষে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কার্ল্ মান্‌হাইম্-এর এই গ্রন্থটির অধিকাংশের মূল জার্মান্ সেই সময় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯২৯-১৯৩১)। সেই

চাঞ্চল্যর যুগে লেখা তাঁর পুস্তকের শান্ত আত্মস্থ ভাব সত্যই প্রশংসনীয় এবং তাঁরই উপযুক্ত। সোশিওলজি প্রায়শঃ বাক্‌বহুল এরূপ একটা ধারণা বহুদিন আমার মনে ভীতি উৎপাদন করে এসেছে। অনেক সময় এঙ্গেল্‌স্-এর একটা কথাতেও আমার সায় দিতে ইচ্ছা হয়, যে সকল জাতিই অল্পবিস্তর নিরর্থক কথা বলে বটে কিন্তু জার্মান্‌দের বিশেষত্বই এই যে তারা গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রলাপ বক্‌তে পারে। কিন্তু জার্মান্ পণ্ডিতের সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে এ গবেষণা আমার মত অনধিকারী সাধারণ পাঠককেও মুগ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস যে সমাজতত্ত্ব-সাহিত্যে এ বইখানির একটা বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ স্থান ইতিমধ্যেই সর্ব্বস্বীকৃত হয়ে গেছে এবং এখন এর ইংরাজি অনুবাদেও অনেকেই উপকৃত হবেন। সোশিওলজি-চর্চ্চায় মান্‌হাইম্ এক নূতন পথ খুলে দিয়েছেন তার নাম তিনি রেখেছেন—Wissenssoziologie (ইংরাজিতে sociology of knowledge)। তারই মূলসূত্র আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য।

সামাজিক সকল তত্ত্বের আলোচনা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য আছে—দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তগুলি সকলের স্বীকার্য্য হয় না, এ জাতীয় বিদ্যার প্রতি স্তরেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকে, এর ফ্যাক্টের বিশ্লেষণের প্রতি পদেও মানুষের নানারূপ স্বার্থ জড়িত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাকে অশান্তিজনক আলোচনারূপে অভিহিত করা যায়। জাপানের শাসকেরা যখন পশ্চিমের শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করেন তখনও তাঁরা ইয়োরোপের সকল প্রকার সামাজিক বিজ্ঞানকে তাই দূরে ঠেকিয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে গণিত ও সংখ্যাশাস্ত্রের রীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামাজিক তত্ত্বের কোন কোন সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মান্‌হাইমের মতে এ পদ্ধতিতে বিপদ এই যে এতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শুধু তারই উপর যাকে কোন প্রকারে অঙ্কের মাপকাঠিতে ফেলা যায়; ফলে একটা ধারণা প্রবল হয় যে যাকে গণিতসম্মত প্রথায় মাপা চলে না, তার কোন মূল্য নেই। এতে স্থিরসিদ্ধান্তের মোহে জ্ঞানের পরিধি অযথা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলতে পারেন সামাজিক বিদ্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান পদবাচ্যই নয়, তাতে বিজ্ঞানের কোন প্রয়োগই অচল। মান্‌হাইম্ কিন্তু এ ভাবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে খর্ব্ব করতে প্রস্তুত নন; কেন না,

২ × ২ = ৪, এ-জাতীয় যুক্তি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক চিন্তার অন্য ক্ষেত্র থাকতে পারে। সুসম্বদ্ধ বিশেষ জ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয়, তবে সামাজিক বিজ্ঞান একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু সমাজ সংক্রান্ত সকল আলোচনাই স্বার্থজড়িত ও পক্ষপাতদুষ্ট নয় কি? মান্‌হাইম্ এ কথা স্বীকার করেই বলছেন যে এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে মূল্যনির্দ্ধারণ (valuation), অন্তর্দৃষ্টি (insight) ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী (bias) জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; এবং এগুলি উপস্থিত থাকলেই সে ক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তের (control) বাইরে এমন কথা বলা অনুচিত। চতুর্থতঃ, আজকের দিনে অবশ্য চিন্তার রাজ্যে সংশয়বাদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, এমন কি তাতে পদার্থ বিদ্যার ভিত্তিও নড়ে উঠছে। আদর্শবাদ ও জড়বাদ জগৎ-সংসারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলেও সে সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব বলেই স্বীকার করে এসেছিল; হিউম সে নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সংশয়ের ভূমিকম্প আনলেন। কাণ্ট্ বিশুদ্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্র কিছু সংকীর্ণ করে' নিয়ে দর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু আধুনিক যুগে সংশয়ের পুনরভ্যুত্থানে মানুষের চিন্তা যেন পক্ষাঘাতে বিকল হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি পর্য্যন্ত আপেক্ষিকতত্ত্বের কৃপায় আর ধ্রুবসত্য বলে' মনে হয় না। এ সম্বন্ধে মান্‌হাইম্-এর যুক্তি এই যে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বিশ্লেষণী চিন্তা আংশিক ও আপেক্ষিক বটে (relational) কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সে জ্ঞান ও চিন্তা ভুল বা অবিশ্বাস্য বলা একান্ত অন্যায়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ব্যতীতও যেমন বিজ্ঞান থাকতে পারে, চিরন্তনীর পর্য্যায় বাদ দিয়েও তেমনি আপেক্ষিক সত্যের একটা অস্তিত্ব আছে।

মান্‌হাইমের মতবাদের দুটি প্রধান অঙ্গ নির্দ্দেশ করা সম্ভব। তিনি অকুণ্ঠ-ভাবে স্বীকার করেছেন যে বিশুদ্ধতম বিজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে মানুষের সকল চিন্তাই তার বিশেষ সামাজিক অবস্থানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। কিন্তু তার মানে জ্ঞানান্বেষণ অসম্ভব কিম্বা ছলনা মাত্র নয়; বিশিষ্ট পরিবেশের প্রভাব বুঝতে পারবার পরই জ্ঞানচর্চ্চা সার্থক হয়ে উঠতে পারে, তাই আজ জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে নূতন থিওরির প্রয়োজন আছে।

মান্‌হাইম্ বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের চিন্তা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। কিন্তু সামাজিক অর্থে এখানে সমগ্র সমাজের প্রতিফলন বোঝায় না। মানুষ ভাবে তার বিশিষ্ট গোষ্ঠীর (group) নির্দ্দেশে, তাই একই দেশ ও কালে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের

চিন্তার রূপ ও ভঙ্গী পৃথক হয়ে পড়ে। মাক্স্ ভেবর্ প্রতিপন্ন করেছিলেন যে-একই ধর্ম্ম একই কালে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন আকার ধারণ করে। এক হিসাবে এই মতের প্রধান উদ্ভাবক অবশ্য স্বয়ং কার্ল্ মার্ক্স্ কেন না তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে সংস্কৃতির সৌধের সকল অঙ্গই মূলতঃ আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মান্‌হাইম্ মনে করেন যে মানুষ যখন ভাবে তখন সে শূন্যে বিচরণ করে না; তার ভাবনার ক্ষেত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা (inherited situation), তার ভাববার প্রথাও অনেকখানি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট (patterns of thought)। ফ্রয়েড্ চিন্তার মূল খুঁজেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে কিন্তু আসলে অভিজ্ঞতা গোষ্ঠীগত; বাল্যজীবন অপেক্ষা সামাজিক পরিবেষ্টনের বিশ্লেষণই তাই বেশী যুক্তিসঙ্গত। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের পরিকল্পনা বস্তুতঃই কল্পনা মাত্র এবং উদীয়মান বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ আছে। আজ যখন সে সভ্যতার সঙ্গে সেই ব্যক্তিত্ববাদের প্রভাব কমে আসছে, তখন স্বভাবতঃই চিন্তার গোষ্ঠীগত মূলের দিকে মানুষের চোখ পড়েছে।

এ-বিশ্বাসের সমর্থনে মান্‌হাইম্ অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রতত্ত্বে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী মতবাদ সকলেরই চোখে পড়ে আর তার এক একটি যে সমাজের এক এক স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত এ কথা বোঝাও শক্ত নয়। মান্‌হাইম্ এ প্রসঙ্গে যে-সংজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছেন, তা' অনেকখানি মার্ক্সের প্রসিদ্ধ সূত্র—তত্ত্ব ও ব্যবহারের অঙ্গাঙ্গি যোগ-(unity of theory and practice)-এর অনুরূপ। ভাবুকের মনে এ যোগ যে সর্ব্বদা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় তা নয়; সেইজন্য যে-সব কথা লোকে নির্ব্বিচারে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ রূপে মেনে নেয়, তাদের চিন্তার বিশ্লেষণের সময় সেইগুলির মূল্যই প্রধান হয়ে ওঠে। Wissenssoziologie-এর প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল সকল চিন্তার মূল উদ্‌ঘাটন করে' তার নির্দ্দিষ্ট সামাজিক ভিত্তি প্রকাশ করা।

সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচিন্তায় মানহাইম্ এইভাবে পাঁচটি ভিন্ন টাইপের সন্ধান পেয়েছেন। এক ধরণের রক্ষণশীল মনোভাব রাজ্যশাসন-ব্যবসায়ীদের উপযোগী, এঁরা মনে করেন যে শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষসাধন ও শাসনপ্রণালীর সুদক্ষ পদ্ধতিই রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান কথা; এ মনোভাব বুরোক্রাটিক্, আমেরিকায় আজ কাল টেক্‌নোক্রাসি নামে এর প্রভূত প্রচলন হয়েছে। দ্বিতীয় টাইপটিকে রোমান্টিক্ রক্ষণ-

শীলতা আখ্যা দেওয়া যায়; এর ভিত্তি অভিজাত আবেষ্টনের মধ্যে; প্রাচীন ঐতিহ্যের পূজা এবং জাতীয় সংস্কার (Volkgeist) আঁকড়ে থাকা এর বৈশিষ্ট্য। উদার গণতান্ত্রিক মতবাদ বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর উদ্ভাবনা এবং বিশেষ করে তাদেরই সম্পত্তি; ধনিকতন্ত্রের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে, এর দোহাই হচ্ছে যুগধর্ম্ম (Zeitgeist)। শ্রমিক-স্বার্থ অবশ্য মূর্ত্তি নিয়েছে সমাজ-তন্ত্র ও সাম্যবাদে। শেষ টাইপটি ফাশিষ্ট মতবাদ; মান্‌হাইমের বিশ্বাস এর প্রেরণা এসেছে বর্ত্তমান সঙ্কটে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন স্তরের সাময়িক মিলনে এবং নেতৃত্বলোভী ব্যক্তিবিশেষদের স্বার্থসন্ধানে।

গোষ্ঠীর স্বার্থ ও পরিবেষ্টন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মতবাদ শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্য্যবসিত হয়—সেইজন্য সামাজিক আলোচনায় সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। এমন কি একই কথা (concept) পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে (weltanschauung) স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। Freedom-এর মতন সামান্য একটি সংজ্ঞাও রক্ষণশীলদের কাছে এক জিনিষ বোঝায়, মধ্যশ্রেণী বা শ্রমিকদের পক্ষে তার অর্থ অন্য প্রকার। তর্কের সময় তাই একই ভাষা বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত লোকের কাছে পৃথক ভাবের উদ্রেক করে।

সমাজের মধ্যে গোষ্ঠী অনেক হওয়াতে দৃষ্টিভঙ্গীও বিবিধ ও বহুসংখ্যক। মান্‌হাইম্ তাদের দুটি প্রধান পর্য্যায়ে ফেলেছেন—এবং তার থেকেই আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। প্রচলিত দুটি কথাকে ঈষৎ নূতন অর্থে ব্যবহার করতে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু মান্‌হাইম্ তাদের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করে' দিতে ত্রুটি করেন নি। সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার আত্মরক্ষাপ্রচেষ্টাতে যে-সব কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাদের তিনি নাম দিয়েছেন—ইডিওলজি। আর পরিবর্ত্তন সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সকল স্বপ্নকে উৎসাহ দেওয়া হয়—তাদের সাধারণ নাম—ইউটোপিয়া। মানুষের প্রায় সর্ব্ববিধ চিন্তাকে এর মধ্যে কোন এক কোঠায় ফেলা যেতে পারে।

আজকের দিনের যে-সংস্কৃতি-সঙ্কট চিন্তাশীল লোকদের পীড়া দেয়, Wissenssoziologieতে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইডিওলজি মাত্রই যে বিশেষ উদ্দেশ্য-সম্ভূত কল্পনাসমষ্টি, প্রতিপক্ষেরা তা প্রমাণ করে ফেলছেন;— আর ইউটোপিয়াও যে অবাস্তব ইচ্ছা-সম্পূরণ সে সন্দেহও আলোচনার মধ্যে মাথা

তুলে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে মানুষের আশ্রয় কোথায়? সমাজসংক্রান্ত চিন্তামাত্রই গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, মান্‌হাইমের এই প্রথম সূত্রের ফলই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু এখানে আলোচ্য বিষয়টির শেষ নয়। সংস্কৃতি-সঙ্কটের অনুভূতি থেকেই Wissenssoziologie তার দ্বিতীয় প্রস্তাবে পৌঁছচ্ছে। মানুষের সহজ সাধারণ বুদ্ধি পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-সমন্বয় খোঁজে, তার কি কোন সম্ভাবনা নেই? একই ব্যাপার বা ঘটনা সম্বন্ধে লোকের পৃথক ধারণা জন্মায় এই জন্য যে তার বিভিন্ন অঙ্গের দিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দৃষ্টি-ভঙ্গী হয়ত আংশিকভাবে সত্য—দ্রষ্টার চোখ সম্পূর্ণ দৃশ্য গ্রহণ করতে না পারলেও খানিকটা হয়ত তার কাছে ধরা পড়ছে। বস্তু যদি এক হয় তবে ন্যায্যতঃ অন্ততঃ আংশিক সমন্বয় অসম্ভব নয়। বাধা শুধু এই যে, প্রথম সূত্র অনুসারে সামাজিক জ্ঞান মাত্র কোনও এক গোষ্ঠীর স্বার্থ ও অনুভূতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। কিন্তু যদি এমন কোন গোষ্ঠী থাকে যার অনুভূতি ও স্বার্থকে অপর সকলের তুলনায় ব্যাপক আখ্যা দেওয়া চলে? মান্‌হাইমের মতে Intelligentsia অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের ঠিক এই অবস্থা। মধ্যযুগে চিন্তা পুরোহিতদের আয়ত্তে ছিল—তারপর কিন্তু সমাজের নানা স্তর থেকে পুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দল চিন্তাই নিজেদের ব্যবসায় করে নিয়েছে—সমালোচনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের স্বার্থ। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চা হয়েছে এদের যোগসূত্র। সাধারণতঃ তারা অপরাপর গোষ্ঠীদের থিওরির অস্ত্র যুগিয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্তর থেকে উৎপত্তি, ও ব্যাবহারিক স্বার্থের প্রসার তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক রূপ দিতে পারে, যদি অবশ্য তারা সে উদ্যমে প্রবৃত্ত হয়। মান্‌হাইম্ মনে করেন যে এইভাবে একটি গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আজকের সঙ্কটের দিনে আংশিক ও সাময়িক সমন্বয় আনতে পারে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, তাদের ব্যাপক দৃষ্টিও চিরন্তন ও ধ্রুব সত্য নয়, তাদের চিন্তার ভিত্তিও সামাজিক এবং তাকেও বারবার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে চলতে হবে। এ বিশ্বাসের অনুযায়ী টেক্‌নিক্ বা বিচারপদ্ধতির প্রবর্ত্তনাই Wissensso-ziologieর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

বিশেষজ্ঞেরা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে চল্‌তি ভাষায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায় না কি, যে ধনিক-শ্রমিক ও অন্যান্য সঙ্ঘর্ষের

অবসান হবে, যদি সকলে বুদ্ধিবাদীদের হাতে আত্মসমর্পণ করে? বুদ্ধিবাদের সুবিদিত অহমিকাই কি এর মূল নয়? মান্‌হাইম্ নিজেই বুদ্ধিজীবীদের গাঢ় তমিস্র রজনীর মধ্যে জাগ্রত প্রহরীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন (১৪৩ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক অধ্যাপক উইর্থ্ মার্ক্স্‌বাদ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও, মান্‌হাইম্ নিজে মার্ক্স্‌কে তাঁর অগ্রচারী বলে স্বীকার করেছেন (২৭৮ পৃঃ)। সুতরাং মার্ক্সের থেকে তার পার্থক্যের দিকে নজর রেখে Wissenssoziologieর কিছু সমালোচনা করা অন্যায় হবে না। মান্‌হাইমের যুক্তির প্রধান ফাঁক তাঁর গোষ্ঠী বা Groupএর ধারণা। চিন্তার ক্ষেত্রে মার্ক্স জোর দিয়েছিলেন শ্রেণীর (Class) উপর; তাই শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীপ্রত্যয়, শ্রেণীসঙ্ঘাত মার্ক্সে্‌সর বিশ্লেষণের গোড়ার কথা। মান্‌হাইম্ শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার করেন নি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন—গোষ্ঠী অর্থে তিনি আরও বহুবিধ সামাজিক ভাগকে বুঝেছেন, যেমন ব্যবসায় (occupation), সামাজিক অনুষ্ঠান (status), সমবয়স্কতা (generation) ইত্যাদি (২৪৮ পৃষ্ঠা)। এই ধরণের সমষ্টিগুলির কি মার্ক্সে্‌র শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা চলে? এই জাতীয় group-এর কি সত্য সত্যই পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গী আছে? তা'হলে প্রত্যেক ব্যক্তিরও ত পৃথক্ দৃষ্টি থাকতে পারে। মান্‌হাইম্ কোথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন নি যে আধুনিক জগতে দেশের মধ্যে শ্রেণী ব্যতীত অন্য গোষ্ঠীর বস্তুতঃ কোন স্বতন্ত্র weltanschauung আছে কিম্বা সে পার্থক্যের কোন ব্যাপক সার্থকতা দেখা যায়; উদাহরণের প্রয়োজন হওয়া মাত্র তিনি ফিউডাল্, বুর্জোয়া, শ্রমিক ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মান্‌হাইম্ মার্ক্স্‌কে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে' মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে সন্দেহ হ'তে পারে যে, গোষ্ঠীর সংজ্ঞার উপর জোর দেওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমিকা জোটাবার আগ্রহ। মান্‌হাইম্ পণ্ডিত, মার্ক্সে্‌র শ্রেণীসম্বন্ধে ধারণা তিনি নিশ্চয় Eighteenth Brumaire পুস্তিকায় পড়েছেন, বুদ্ধিজীবীরা যে আসলে ঠিক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নয় সে কথা তাঁর অজানা নেই। শ্রেণীকে তাই পেছুনে ঠেলে একবার গোষ্ঠীর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাঁর যুক্তির বাকী অঙ্গগুলি নিরাপদে নিজ আসন গ্রহণ করতে পারে। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে দুই মূল শ্রেণীর সঙ্ঘাতের সমস্যা অসংখ্য গোষ্ঠীর বিচিত্র পর্দ্দার আড়ালে আত্মপ্রত্যয় থেকে মিলিয়ে যাবে, মান্‌হাইমের

মনে এ আশা থাকলে তাকেও কি ইউটোপিয়া বলা চলে না? আর তাঁর নিজের সংজ্ঞানুসারে বুদ্ধিবাদের সমন্বয়কে ইডিওলজি আখ্যা দেওয়াও বোধ হয় অন্যায় নয়—কেন না ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন্ অবস্থার ইঙ্গিত বুদ্ধিজীবীরা দিতে পারে তা বোঝা শক্ত এবং শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবাদ প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার রক্ষক হয়ে পড়তে বাধ্য। বুদ্ধিবাদের সমন্বয়ের কথায় একটা বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। সন্তানের কি নাম রাখা হবে তা' নিয়ে পিতামাতার মধ্যে প্রচুর বাদবিতণ্ডার পর মিটমাট হয়—compromise-এ মাতার প্রদত্ত নামটিই রাখা হয়েছিল।

বর্ত্তমান যুগে দুই মূল শ্রেণীর বিরোধকে প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলা এবং শ্রেণীর বদলে গোষ্ঠীর ধারণার উপর অত্যধিক নির্ভরের ফলে, মান্হাইম্ ফাশিষ্ট আন্দোলনের স্বরূপটিও ঠিক ধরতে পারেন নি। ফাশিষ্টদের সাফল্য নিশ্চয়ই নানা স্তরকে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা এবং নেতাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে খোঁজা যায়। কিন্তু অন্ততঃ জার্মানিতে কি সোশ্যালিষ্টদের নিশ্চেষ্টতা এবং পণ্ডিতদের বাক্যচ্ছটার ফলে মূল সঙ্ঘর্ষকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করে তোলাও এর জন্য দায়ী নয়? ধনতন্ত্রকে দৃঢ়তর ও সুরক্ষিত করার চেষ্টা ছাড়া ফাশিষ্টেরা আজ পর্য্যন্ত আর কি করেছে? শুধু য়িহুদী উৎপীড়ন, রেস্ বা সাম্রাজ্যের গুণকীর্ত্তন ও অস্ত্রের আস্ফালনে নূতন সমাজ গঠন চলে না। ফাশিষ্টদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক গত শতকের বোনাপার্টিজম্—আর Eighteenth Brumaireএ তার যা' বিশ্লেষণ আছে, Wissenssoziologie এখনও তার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে।

মান্হাইম্-এর গবেষণার আরম্ভ মার্ক্স্‌এর সামাজিক ব্যাখ্যা থেকে কিন্তু অন্যান্য বহুলোকের মত তিনিও তাকে পরোক্ষে সংশোধিত, মার্জ্জিত ও ভদ্রস্থ করে' নেবার চেষ্টা করেছেন, এই বিশ্বাসই এত সমালোচনার কারণ। শুধু একটি কথার উল্লেখ করলেই এখন প্রসঙ্গ শেষ হয়। মান্হাইম্ লিখেছেন যে মার্ক্সের দুর্ব্বলতা এই যে তাঁর মতবাদও যে শ্রমিকশ্রেণীরূপ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গঠিত এ কথা ভুলে গিয়ে তিনি তাকে বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার পদ দিতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে কিন্তু বলা যায় যে, মার্ক্সের অন্তর্দৃষ্টির প্রাণ—জড়বাদ এবং ডায়ালেক্‌টিকে বিশ্বাস—এখন শ্রমিক স্বার্থের উপযোগী হ'লেও তার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে জগৎ-সংসারের স্বাভাবিক গঠনই এর মূল, অন্ততঃ মার্ক্সের তাই মত

ছিল। Objective dialectics-এ যদি কিছু সত্যই থাকে, তা'হলে বিশেষ কোন যুগে শ্রেণীবিশেষের মতবাদ বেশী objective হ'তে কোন বাধা নেই। আমাদের সমসাময়িক সঙ্কটে তাই উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর তরফ থেকে অধিক objectivityর দাবী করা আসলে সত্য হোক বা না হোক, ন্যায্যতঃ অসম্ভব নয়।

শ্রীসুশোভন সরকার।

জীবন ও সাহিত্য—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় (গোল্ডকুইন এণ্ড কোং লিঃ)
এ ও তা—প্রভু গুহ-ঠাকুরতা (প্রকাশক : সুভো ঠাকুর—ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস)

মহেন্দ্রবাবু বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে এই বইখানি বার করেছেন। বইটির নামকরণ খুব সার্থক হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ সাহিত্যের চেয়ে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অনুভূতি ও ভাবাবেগই বেশী রকমে পরিলক্ষিত হয়। 'ব্যাক্তিগত' বললাম এই জন্য যে, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এমন সব হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া যায় যার সঙ্গে প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নেই। ফলে প্রবন্ধগুলি বোঝবার জন্যে স্বয়ং লেখকের কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

শিল্প কি এবং শিল্পী কে হতে পারেন তাই নিয়ে লেখক সর্ব্বপ্রথমেই "শিল্প ও শিল্পী" নামক দীর্ঘ ছাব্বিশ পাতা ব্যাপী এক প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখকের মতে শিল্পীর স্বরূপ হচ্ছে 'প্রকাশময়'। তিনি হবেন দ্রষ্টা এবং অহংবর্জ্জিত। কারণ, "আত্মস্বাতন্ত্র্যানুভূতি শিল্প-সাধনার ভীষণ অন্তরায়। ধ্যান বিনা আত্মবিলয় হয় না, এবং আত্মবিলয় বিনা শিল্পী হওয়ার আর অন্য পন্থা নাই।" রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো স্বামীজি আর্ট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মধ্যে এ রকমের উদ্ভট মন্তব্য প্রকাশ যদি করতেন তো আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকত না। কিন্তু যেহেতু মহেন্দ্রবাবুর নামের আশে পাশে সে রকমের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, সে হেতু কিছুটা বিস্মিত হতে বাধ্য হয়েছি। "ট্রাজিডির কথাতে" লেখক একমাত্র দুঃখকেই বড় করে দেখিয়েছেন।

দুঃখই জীবনকে বৃহৎ করে, সুন্দর করে, 'কল্পলোকের' দিকে নিয়ে যায়। লেখকের মতে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যে ট্র্যাজিডির সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি তা খুব বেশী গভীর নয়। 'সত্যকার ট্র্যাজিডি' হচ্ছে 'স্বপ্নলোকে'। সেইজন্যই শেক্‌স্‌পীয়র 'সত্যকার ট্র্যাজিডি'র গভীরতা বুঝতে পারতেন যদি তিনি পৃথিবী ছেড়ে গ্রহলোকে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' করতেন। বলা বাহুল্য বইটির মধ্যে ঘন ঘন স্বপ্নের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পাঠকেরা নিশ্চয়ই লেখকের লেখার চেয়ে তাঁর ব্যাধির সম্বন্ধেই বেশী চিন্তিত হয়ে উঠ্‌বেন। আর এক জায়গায় লেখক বলছেন, "প্রতি মানবের মধ্যেই অনন্তবোধ সুপ্ত রহিয়াছে—মানবাত্মার গতি ভূমার দিকে, সম্ভাবনা তাহার অনন্ত। এই জন্য ক্ষণিকের বিশ্রাম দিলেও কোনও সুখেই তাহার পিপাসার চরম নিবৃত্তি নাই। থাকিয়া থাকিয়া অন্তরের সেই অনন্তবোধ হা হা করিয়া উঠিতে চায়।" রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের এ ধরণের travesty আর কোথাও বোধ করি হয়নি।

আসল কথা, খুব সাধারণ মোটা কথাও বলবার গুণে 'পথ্য' না হলেও অন্ততঃ 'পাঠ্য' হতে পারে। মহেন্দ্রবাবু একটু মনোযোগ দিয়ে লিখলে বইটিকে হয়ত কিছুটা "পাঠ্য" করে তুলতে পারতেন। যাঁর কোনরূপ মনোযোগ দেবার অবসর বা ক্ষমতা নেই, তাঁর পক্ষেও প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, গল্প ইত্যাদি লেখা খুবই ভাল, কিন্তু না ছাপানটা বোধ হয় আরও ভাল।

দ্বিতীয় বইটির গ্রন্থকার প্রভু-গুহঠাকুরতা যদিও আধুনিক সাহিত্যিকদের ওপর খড়্গহস্ত, তবুও তাঁর এই বইটি প্রচ্ছদপট থেকে আরম্ভ করে শেষ পাতা পর্য্যন্ত অভিনবত্বে ও মুন্সিয়ানায় অতি আধুনিকদেরও হার মানিয়েছে। সম্ভবত তাঁর একমাত্র সমকক্ষ হতে পারেন তাঁরই এই পুস্তকের প্রকাশক, বাংলাসাহিত্যের কালা-পাহাড় সুভোঠাকুর।

লেখকের পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠের অনুরাগ খুবই প্রবল। ফলে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রায় সারা দুনিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক নিজেও যেমন হাঁপিয়ে উঠেছেন, বইগুলিরও তেমনি কোন মর্য্যাদা দিতে পারেন নি। কেবল মাত্র কতকগুলি পুস্তকপাঠের পরিচয় দেবার জন্যে যে এক খানা বই পর্য্যন্ত লেখা যেতে পারে তা ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় অনেকেরই জানা ছিল না। এ ধরণের বিজ্ঞাপনীয় সাহিত্যের দ্বারা আত্মপ্রচার যে কতদূর পর্যন্ত চলতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আলোচ্য পুস্তকখানি। বইটিকে পুস্তক সমা-

লোচনা ছাড়া একটি নাতিদীর্ঘ ভ্রমণকাহিনীও বলা যেতে পারে। কারণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুস্তকের স্থানে স্থানে লেখকের বিদেশ ভ্রমণের ছাপ পাওয়া যায়। হয়ত তিনি ভেবেছেন যে পাঠকের সামনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিলে প্রবন্ধগুলি আরো বেশী শিক্ষণীয় হবে। প্রায় সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যেই দাম্ভিক উক্তি ও অর্থহীন প্রলাপের আড়ম্বর দেখা যায়। বিদেশী সাহিত্যের জড়োয়া প'রে লেখক হয়ত মনে করেছেন যে, এইবার তিনি জাতে উঠ্‌লেন। এ যেন অনেকটা ঈশপের গল্পে বর্ণিত সিংহচর্ম্মাবৃত কোন কুস্বর প্রাণীর মনের গোপন বাসনার মতো।

সবচেয়ে কৌতুক-পূর্ণ হয়েছে ''বল্‌শী এল দেশে" নামক প্রবন্ধটি। আধুনিক রাশিয়ার সাহিত্যের স্বরূপ দেখাবার জন্যে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আরম্ভ করে বহু নথি পত্তর পর্য্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো মীমাংসাতে এসে পৌঁছুতে পারেন নি। আসলে লেখক কোনো রকম মীমাংসা বিশেষ পছন্দ করেন না, বোধ হয় তাঁর পক্ষে সেটাই সব চেয়ে সুবিধাজনক। রাশিয়ার সম্বন্ধে বিরক্তির কারণ তাঁর ফ্যাশিষ্ট মন নয়, আসলে এটা সকলের সামনে নিজেকে প্রাধান্য দেবার একটা উপায় মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে লেখক রাশিয়াতে থাকলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টেরই প্রশংসা ক'রে বই লিখতেন এবং প্রয়োজন না থাকলেও ফ্যাশিজমের নিন্দা করতেন। সেখানেও কম্যুনিজম প্রীতি হত আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি উপায় মাত্র। বলা বাহুল্য ইনি সেই সবের দলভুক্ত যাঁরা প্রয়োজন মত কখনো কম্যুনিষ্ট হন, কখনো ফ্যাশিজমের গুণ গান, আবার কখনো বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাহিত্যের ব্যবসা চালান।

লেখকের মতে, "সাহিত্যের আগাছা দূর করবার জন্যে কখনো মালীর দরকার হয় না—নিকৃষ্ট সাহিত্য আপনিই শুকিয়ে যায়। ঔদাসীন্যই নিকৃষ্ট সাহিত্য-রচনার সবচেয়ে বড় শোধক। সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, সম্মার্জ্জনী দিয়ে আঘাত ক'রে তার আবর্জ্জনা অপসৃত করা যায় না ; সাহিত্যে যা মেকি ও ভেজাল তা চিরস্থায়ী হোতে পারে না।" এই জায়গাটিতে পাঠকের মন গ্রন্থকারের প্রতি আপনা হতেই শ্রদ্ধায় অবনত হয়। নিজের সম্বন্ধে এমন অকপটে সত্য কথা বলতে ক'জন মানুষই বা পারে।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

The Philosophy of Rhetoric—by I. A. Richards.
(Oxford University Press.)

একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনে ঐক্যের সুদৃঢ়তম বন্ধন হইতেছে তাহার ভাষা। ভাষার প্রয়োগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবের প্রকাশ হয়; আমরা কথা কহিয়া পরস্পরের মন বুঝিয়া চলি। যে সকল ভাব ভাষার অনধিগম্য তাহারা হয় এত স্থূল নয় এত সূক্ষ্ম যে সামাজিক বিচারে তাহাদের দাবী উপেক্ষণীয়। হঠাৎ যাদুবলে ভাষার বিলুপ্তি ঘটিলে মানব-সমাজও ভূকম্পবিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে।

অথচ এ-হেন ভাষার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা নিতান্তই অজ্ঞ। আজ নিরূপণ করা অসম্ভব কোন্ তারিখ হইতে মানুষ ভাষার উদ্ভাবন করিয়াছে, কথা কহিতে শিখিয়াছে। সেই সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত নিয়ত ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার প্রকৃতি আমাদের নিকট ঘন রহস্যের পর্দ্দায় ঢাকা। কেমন করিয়া শব্দের অর্থসৃষ্টি হয় ও বাক্যের অর্থবোধ হয় তাহা আমাদের অজ্ঞাত। বহু আলোচনা বহু গবেষণার ফলে যাহা জানা গিয়াছে তাহার পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাতে সত্যের চেয়ে ভ্রমের, দীপ্তির অপেক্ষা ধূম্রের পরিমাণই বেশী।

অধ্যাপক রিচার্ডস্-এর মতে তাই বর্ত্তমানে ভাষার প্রয়োগশিক্ষালোচনার পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যক, যাহাতে আমরা ভুল বোঝার সম্ভাবনা কমাইয়া অন্তম মিলনের পথে অগ্রসর হইতে পারি। 'পুনরুজ্জীবন' বলার অর্থ এই যে একসময়ে গ্রীসদেশে শব্দপ্রয়োগ ও ভাষাশিল্পের প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকরা যে-পথে চলিয়া তাহাদের তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় দিয়া গিয়াছে তাহার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে অন্যায় ও অযৌক্তিক হইবে। তাহাদের ভাষাপ্রয়োগবিজ্ঞানের মূলে ছিল অনুনয়ন, পরমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রচেষ্টা। আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের মূল অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত, রিচার্ডস্-এর মতে, সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও নির্ব্বাধ ভাবসংক্রমণ। ভাবের বাহন হিসাবে ভাষার রীতি ও গতি কি ধরণের, কিসে তাহার কার্য্যকারিতা বাড়ে ও ভাব সঞ্চরণ সহজ হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির দিকে রিচার্ডস্ সভ্যসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

শব্দপ্রয়োগের দ্বারা মোটামুটিভাবে আমাদের প্রতিদিনকার কাজ চলিয়া যায় বলিয়া ইহার পিছনে কত যে কত্ত্বপলব্ধি চাপা পড়িয়া আছে, তাহা আমরা

প্রায়শঃ ভুলিয়া যাই। এই প্রসঙ্গে রিচার্ডস্ আর্চবিশপ হোয়েট্‌লি-র একটি চমৎকার দ্ব্যর্থবোধক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"Preachers nobly aim at nothing at all and hit it!' ভাষার এই অপপ্রয়োগের ও ভাবসংক্রমণে অক্ষমতার মূলে আছে একটি ভ্রান্ত ধারণা, যাহাকে রিচার্ডস্ নাম দিয়াছেন, "প্রকৃত অর্থ কুসংস্কার"। আমরা সাধারণতঃ ভাবিয়া থাকি বাক্যে প্রত্যেকটি শব্দের একটি করিয়া প্রকৃত অর্থ আছে, যাহাদের যোজনায় বাক্যটি অর্থবিশিষ্ট হইয়া আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে। যেমন ইটের পরে ইট সাজাইয়া প্রাচীর গড়িয়া উঠে। রিচার্ডস্ বলিতে চাহেন, শব্দ সংযোজন ও ইষ্টক সংযোজনে প্রভেদ আকাশ-পাতাল; প্রত্যেকটি ইটের বিশিষ্ট রূপ আছে, যাহা পারিপার্শ্বিক-নিরপেক্ষ, কিন্তু কোনও শব্দের এমন নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই, যাহা আবেষ্টন দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হয়। শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ-প্রভাবে নিয়ত চলিষ্ণু; এক প্রসঙ্গে যাহা বুঝায়, প্রসঙ্গান্তরে তাহা না বোঝাইতে পারে; পূর্ণ-নির্দ্ধারিত, স্থির, রূপান্তর-বিহীন অর্থ কোনো শব্দে থাকিতে পারে না, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সীমার বাহিরে, ইহাই রিচার্ডস্-এর অভিমত।

এ উক্তির সমর্থন সহজেই মেলে কবিতার আলোচনায়। মাত্র ব্যাকরণ ও অভিধান অবলম্বনে যে মূঢ় কাব্যের অর্থবোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। প্রতিটি শব্দের অর্থ ও পদের পরিচয় জানিয়াও সমগ্রের ব্যঞ্জনা তাহার বোধাতীত থাকিয়া যাইবে। ইহার কারণ কবিতায় শব্দের অর্থ নিরূপিত হয়, অভিধানের সহায়তায় নয়, প্রসঙ্গের মাধ্যাকর্ষণে। কবিতার ভাষা রূপকবহুল, গূঢ়োপমাসঙ্কুল, অধ্যারোপময়; ত্রিশির কাচকলমে শুভ্র সূর্য্যরশ্মির মতো তাহাতে শব্দার্থের বর্ণবিচ্ছুরণ নিত্যনৈমিত্তিক; কবিতার অর্থের পূর্ণোপলব্ধির জন্য তাই এই বর্ণ-লীলার গতিশীলতাকে অন্তরে গ্রহণ করিতে হয়।

রিচার্ডস্-এর দাবী ব্যাপকতর। তাঁহার মতে, শব্দার্থ মাত্রেই অধ্যারোপময়; বিজ্ঞানের শুষ্ক পরিভাষা বাদ দিলে, সর্ব্বত্র শব্দের অর্থে অধ্যারোপ নিহিত থাকে। অধ্যারোপে দুটি স্বতন্ত্র বস্তুকে এক বলিয়া ভাবা হয়, আংশিক সাদৃশ্যের জোরে। যেমন স্থানবিশেষে কাষ্ঠখণ্ডকে বলা যায়, টেবিলের পা। এখানে 'পা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া রূপক-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। খোঁড়া মানুষের কাঠের পা-কে 'পা' বলিলে অধ্যারোপ হয় কিনা ভাবিবার বিষয় নয় কি? নাম-

করণেও অধ্যারোপ নিহিত থাকে। 'বিড়াল' সম্বন্ধে আমার মনে সাধারণ প্রত্যয় না থাকিলে বিশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাণীটিকে 'বিড়াল' বলিয়া চিনিতে পারিতাম কি? এই সাধারণ প্রত্যয় কোথা হইতে আসে তাহা আপাততঃ আমাদের অজ্ঞাত, তবে রিচার্ডস্ আশা করেন তাহাও একদিন আমাদের জ্ঞানগম্য হইবে। অধ্যারোপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে রিচার্ডস্ মনে করেন শব্দার্থের পরিবর্ত্তন-বেগ সাধিত হয় ইহার দ্বারা, ও ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলে এক মানুষের চিন্তাধারার জটিলতাও অন্যের নিকট স্পষ্টীকৃত হইবে, কারণ ভাষাই এখন মানুষের আত্মপ্রকাশের ও ভাবসংক্রমণের প্রশস্ততম পন্থা।

ভাষাপ্রয়োগ বিচারে রিচার্ডস্-এর দাবী তর্কাতীত। লেখক হিসাবে তাঁহার দায়িত্বশীলতার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে তাঁর আগের বইগুলিতে। এ গ্রন্থেও তাঁর গুণাবলী পরিস্ফুট, দোষগুলিও। তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ও অ-মামুলী; যুক্তি ধারালো ও সারগর্ভ; সরস ব্যঙ্গ ও অতর্কিত witticism গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্বস্তি আনে। দোষ শুধু অতি-পাণ্ডিত্যের গুরুভারে স্থানে স্থানে লেখনীর অনর্থক বক্রগতি। তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা ভাষার ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে সচেতন তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তকটি না পড়িলে চলিবে না। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়।

বেদান্ত-প্রবেশ—রায় বাহাদুর শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় বেদান্ত-বিদ্যার্ণব প্রণীত—ভারতী ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেদ+অন্ত=বেদান্ত। বেদ অর্থে বিদ্যা, প্রজ্ঞা। যাহা বিদ্যার চরম পরম, যাহা প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠা, তাহাই বেদান্ত। প্রাচীন যুগে এই বেদান্তেই হিন্দু-চিন্তা তুঙ্গতম চূড়ায় উঠিয়াছিল। সেইজন্য শোপেনহাওয়ারের মত তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিক বলিতেন—জগতের সাহিত্যে বেদান্তের সমতুল্য গ্রন্থ আর নাই। মূল উপনিষদাদি পড়িবার তাঁহার সুযোগ ঘটে নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদা বলিতেন 'জীবনে মরণে বেদান্তই আমার পরম স্বস্তি ও শান্তি'। পরবর্ত্তী কালে অনেক পাশ্চাত্য মনীষী মূল গ্রন্থের আস্বাদন করিয়া ঐ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

মনে রাখিতে হইবে, বেদান্তের বাণী প্রাচীন হইলেও এখনও জরতী হয় নাই। এ যুগেও বেদান্তের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ, বেদান্ত জীবনের সমস্ত সমস্যার উপর অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাত করিতে সমর্থ। সেই জন্য কি পাশ্চাত্যে

কি প্রাচ্যে বেদান্তের যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল। আমরা আশা করি এই 'বেদান্ত প্রবেশ' দ্বারা সে সম্পর্কে সহায়তা হইবে। কিন্তু বেদান্ত প্রসারের প্রকৃত সুবিধা করিতে হইলে, এ গ্রন্থকে একটু ভিন্ন ভাবে সজ্জিত ও সংস্কৃত করিতে হইবে। সে কথা পরে বলিতেছি।

প্রাচীনেরা বলিতেন বেদান্তের তিনটি 'প্রস্থান'। প্রস্থান অর্থে আধার (Receptacle)—বৌদ্ধেরা যাহাকে 'পিটক' বলেন। এই প্রস্থান-ত্রয় কি কি? উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, ও গীতা। উপনিষদ্ই মুখ্য বেদান্ত—'বেদান্তো নাম উপনিষদ্'। এই প্রস্থানকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

দ্বিতীয় প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রেরও গীতায় উল্লেখ আছে—ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি র্বিনিশ্চিতৈঃ। এই ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা বাদরায়ণ—পরাশর-পুত্র বেদব্যাস। এই জন্য পাণিনি সূত্রে এই ব্রহ্মসূত্রকে 'পারাশর্য্য-কৃত ভিক্ষুসূত্র' বলা হইয়াছে—কারণ, সে যুগে এ গ্রন্থ চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুরই উপজীব্য ছিল।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ অনেক স্থলে পূর্ব্ব-মীমাংসাকার জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে জৈমিনির সূত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকার জৈমিনিকে বাদরায়ণের শিষ্য বলিয়াছেন এবং পূর্ব্ব-মীমাংসা সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র সমকালে রচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ মত কিন্তু প্রমাণ-সিদ্ধ মনে হয় না।

বেদান্তের তৃতীয় প্রস্থান বিশ্ব-বিশ্রুত ভগবদ্-গীতা। ইহা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের এক পর্ব্বাধ্যায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই ভগবদ্-গীতা প্রায় উপনিষদের তুল্য-মূল্য। সেই জন্য গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে ভণিতা আছে—ইতি ভগবদ্-গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী কালে ভাগবত পুরাণকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্থানীয় বলা হইত। চৈতন্য-চরিতামৃতকার মহাপ্রভুর মুখে এই মত সমর্থন করিয়াছেন:

প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস সূত্রের গম্ভীরার্থ, ব্যাস ভগবান্॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ॥

এবং প্রমাণ-স্বরূপ গরুড় পুরাণ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

এ মতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই; কারণ, ভাগবত অনেক স্থলেই বৈদান্তিক ভাবে ভাবিত এবং স্থানে স্থানে ব্রহ্মসূত্রের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত; এমন কি কয়েক স্থানে উপনিষদ্-মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ভাগবতের অঙ্গে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় গ্রন্থকার যেন এ বিষয় লইয়া একটু অত্যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি যখন বলেন "অধিক কি ব্রহ্মসূত্রে যাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে আছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে তাহাই পরিপুষ্ট সংবর্দ্ধিত হইয়া, প্রাণারাম, হৃদয়োন্মাদনকারী, মধুরতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণের আশ্রয় ও শান্তির স্থান হইয়াছে"......"পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক কাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম -উক্ত আলোচনায় উভয়ের আশ্চর্য্য ঐক্যভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম"—তখন মনে হয় যেন কিছু বাড়াবাড়ি করা হইতেছে। ভাগবত পুরাণ যে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দ্বাদশ-স্কন্ধ-যুক্ত ভাগবত যে আকারে প্রচলিত আছে, ইহা কি বেদব্যাস রচিত? অথবা ইহা সেই প্রাচীন পুরাণের অভিনব সংস্করণ? গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন "গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ হইতে বা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আত্মসংগোপন হইতে মুক্তিলাভ করিলে পুরাণ সকলের পরস্পরের পাঠৈক্য সম্পাদন এবং অভিনব সংস্করণ সম্পাদিত হয়"। অধিকন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব তদানীং-প্রচলিত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প সঙ্কলন করিয়া একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন, এবং তাঁহার চারি জন শিষ্য তাহার supplement স্বরূপ চারখানি উপসংহিতা রচনা করেন। ঐ পুরাণসংহিতাই সমস্ত পুরাণের উৎস-স্থানীয়। এ মত কি অমূলক? তাহা যদি না হয়, তবে গ্রন্থকার কিরূপে সনির্ব্বন্ধে বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাগবত অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান?

সে যাহা হউক, এই বিবাদাস্পদ বিষয় লইয়া বর্ত্তমানে বিস্তার করিতে চাহি না। আমার আপত্তি এই যে, গ্রন্থকার ভাগবতের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ 'বেদান্ত প্রবেশে' কয়েকটি ব্রহ্মসূত্রের কদর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যে সূত্রে ভক্তির গন্ধমাত্র নাই সেখানেও পরাভক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "উপপন্ন-

স্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ" (৩।৩।৩০) ও "অনুবন্ধাদিভ্যঃ" (৩।৩।৫০) সূত্র-দ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সূত্রের কদর্থের একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত,—'উপপূর্ব্বম্ অপি ত্বেকে ভাবম্ অশনবৎ তদুক্তম্ (৩।৪।৪২)। শঙ্করভাষ্য—বিশেষতঃ প্রকরণের (contextএর) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিতে পারা যায়—যথা, অনুবন্ধাদিভ্যঃ (৩।৩।৫০), অন্তরাভূতঃ গ্রামবৎ স্বাত্মনঃ (৩।৩।৩৫), উপপন্নঃ তল্লক্ষণোপলব্ধের্লোক-বৎ (৩।৩।৩০), প্রধানবৎএব তদুক্তম্ (৩।৩।৪৩)।

এরূপ হওয়া আমার বিবেচনায় ক্ষোভের কারণ। যেহেতু বেদান্ত আলোচনায় গ্রন্থকারের প্রভূত যোগ্যতা আছে—তিনি বেদান্তে সুপ্রবিষ্ট। ২৫ বৎসরের অধিককাল শ্রদ্ধালু হইয়া বেশ নিবিষ্টভাবে বেদান্ত চর্চ্চা করিয়াছেন। এই 'বেদান্তপ্রবেশ' গ্রন্থ সেই আলোচনার পরিণত ফল। তা'ছাড়া গ্রন্থকার প্রাচীন মতে অনুরাগী হইলেও গতানুগতিক নহেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমিও ঐরূপ স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী এবং মদ্-রচিত গ্রন্থাদিতে সেই পথেরই অনুসরণ করিয়াছি। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ আমাদের মাথার মণি—অতি শ্রদ্ধার সহিত সেই সেই মত আমাদের আলোচনীয়। কিন্তু তাঁহাদের কথাই বেদান্ত সম্পর্কে শেষ কথা নয়।

ব্রহ্মতত্ত্ব অতি দুরবগাহ—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'সেয়্যথাপি মহাসমুদ্দো'—কারণ, অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম নামরূপের অতীত, সমস্ত দেশ কাল নিমিত্তের অপরিচ্ছিন্ন —বাক্য মন তাঁহার লাগ না পাইয়া হটিয়া আসে—যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তিনি বচনের মননের লক্ষণের বহির্ভূত। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা এই—যস্যামতং তস্যমতং—যে জানে না সেই জানে, যে জানে সেই জানে না। যিনি এইরূপ—তাঁহার সম্বন্ধে তর্কযুক্তির অবসর কোথায়? তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

নৈষা তর্কেণ মতি রাপনেয়া।

অতএব ব্রহ্ম-সম্বন্ধে চরম প্রমাণ—অপরোক্ষ অনুভূতি। যিনি ঋষিদিগের সহিত (তা' সে ঋষি যে দেশের, যে কালের হউন না কেন) সুর মিলাইয়া বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্
তমসের পারে যিনি, চিরজ্যোতিষ্মান্

—তিনিই এ ক্ষেত্রে বক্তার আসন গ্রহণের যোগ্য। গ্রন্থকারের ভাষায় বলি "প্রত্যক্ষদ্রষ্টার সাক্ষ্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণীয়। উক্ত সাক্ষ্যে দ্বিধা, সংকোচ প্রভৃতি বর্ত্তমান নাই।" ইহাকেই পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা ইদানীং "temperamental reaction to the vision of Reality" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, এইরূপ ঋষিরা ব্রহ্ম সম্পর্কে স্ব স্ব স্বানুভূতি অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই সর্ব্বজাতির বেদ এবং বেদের সার বেদান্ত। এই বেদান্তই দ্রষ্টা-ঋষি ভিন্ন অপরের একমাত্র গতি। সেইজন্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন—শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ। 'বেদান্ত প্রবেশে' এ সকল প্রসঙ্গের বেশ আলোচনা আছে।

ব্রহ্মসম্পর্কে আচার্য্যদিগের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন। রামানুজের মতে তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ—অধিকন্তু, নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। এই মতদ্বৈধ স্থলে (এবং আরও কয়েকটি স্থলে) গ্রন্থকার বেশ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন "যিনি নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার, নিরীহ, তিনিই প্রপঞ্চের দিক্ হইতে সবিশেষ, সগুণ, সাকার, ক্রিয়াশীল। একই বস্তুর দুই প্রকার দর্শনমাত্র। এই প্রকার দর্শনে বস্তুর স্বরূপ হানি হয় না। ইহা ভগবান্ সূত্রকার "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি" ৩।২।১১ সূত্রে ও "উভয় ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ৩।২।২৭ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ "ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ভাব, মূর্ত্তামূর্ত্ত ভাব তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মতত্ত্ব, নিজ অপ্রচ্যুত স্বরূপে চির বর্ত্তমান থাকেন॥" এই কথাই আমি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম যে, ব্রহ্ম একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ, উপাদান ও নিমিত্ত, চিৎ ও জড়, অণু ও মহান্, সগুণ ও নির্গুণ, দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও বাহিরে, Principle ও Person—এক কথায় "Supreme unity of all contradictions"—তাঁহাতে সমস্ত বিরোধের চির সমন্বয়, সমস্ত দ্বন্দ্বের চির অবসান।

সেইজন্য তিনি 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং' অথচ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং'। তিনি 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম, অব্যয়ম্' অথচ 'সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তঃ।'

তিনি আপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—অচক্ষু দেখিতে পান অপদ সর্ব্বত্র যান বিনা কর্ণে করেন শ্রবণ।

তিনি 'অকাম, নিষ্কাম, সর্ব্বকাম, পূর্ণকাম'—তবে তাঁহার আবার সৃষ্টি কেন? যিনি 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' তাঁহার কি অভাব কি অপূর্ণতা? দর্শনশাস্ত্রের ইহাই চরম প্রহেলিকা। ইহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—সৃষ্টি তাঁহার লীলা—sport মাত্র। তাহার আবার কারণ অনুসন্ধান কেন? এই সৃষ্টিতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে 'বেদান্তপ্রবেশে' অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে।

গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন সৃষ্টি মিথ্যা বা অলীক নহে—বিকারী বটে, ব্যাবহারিক বটে—কিন্তু noumenal না হইলেও ভ্রান্তি-মাত্র নয়। নিরুপাধি ব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া মহেশ্বর হন তখন তাঁহার মধ্যে সৃসৃক্ষা বা সৃষ্টির সঙ্কল্প উদিত হয়। ঋগ্বেদের ঋষি ইহাকে "কাম" বলিয়াছেন—কামঃ স্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। এই সৃষ্টি ভগবানের মায়াশক্তি হইতে নিষ্পন্ন হয়। আমাদের মানস জগৎ যেমন জীবসৃষ্ট, আমাদের বাহ্যজগৎ সেইরূপ ঈশসৃষ্ট—আকাশোহবৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা।

এই সৃষ্টি ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে বিবিধ। বৃক্ষ ব্যষ্টি, বন সমষ্টি—কোষাণু ব্যষ্টি, সংঘাত (organism) সমষ্টি। কিন্তু সমষ্টি ব্যষ্টির রূপকাদর্শ (idealisation) মাত্র নহে। ব্যষ্টির ন্যায় সমষ্টিরও একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। এ সম্পর্কে ও মায়াশক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের আলোচনা আমার নিকট জটিল ও অস্পষ্ট বোধ হইল। আশা করি তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন।

কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও গ্রন্থকার বেশ নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গীতার

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"

—এই শ্লোকার্দ্ধের তিনি যে সম্প্রসারিত অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন বোধ হইল না। গীতার মতে জীবনকে যজ্ঞে পরিণত করা যায়—যজ্ঞায়াচরতো কর্ম্ম, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র ইত্যাদি। এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মের পরপর তিনটি স্তর—প্রথম সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞান, দ্বিতীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং তৃতীয় ঈশ্বরার্পণ—তাঁহার নিমিত্ত মাত্র হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

কিন্তু এ বিষয়ে এখানে বিস্তার করিব না। গ্রন্থকার জীবতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ঐ আলোচনায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে কিন্তু তিনি ছান্দোগ্যের 'অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি' এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যান করিয়াছেন আমার মতে তাহা অসঙ্গত। ঐ 'জীবেন আত্মনা' আমাদের জীবাত্মা নহে—উহা ভগবানের জীবভূতা পরাপ্রকৃতি—যদ্দ্বারা এই জগৎ বিধৃত আছে।

গ্রন্থকার জীবতত্ত্বের আলোচনায় পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের 'কাঁচা আমি' ও ও 'পাকা আমি'র কথা সসম্ভ্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমহংসদেবের ঐ কথা বেশ গভীর কথা। কিন্তু আমার মনে হয় বেদান্ত—পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, জীবাত্মা ও ভূতাত্মা—এই যে চারি আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর-তর। পরমাত্মা = ব্রহ্ম (God or Absolute), প্রত্যগাত্মা (Monad) তাঁহার অংশ—যেন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ—তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গঃ হ্যগ্নিরেব (শঙ্কর)। এই প্রত্যাগাত্মার কিরণ (Radiation) জীবাত্মা—পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Soul বা Ego ; এবং তাহারই আভাস বা ছায়া (Reflection) আমাদের ভূতাত্মা বা Personality। প্রত্যগাত্মা ও জীবাত্মা—ঋগ্বেদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'। প্রত্যগাত্মা (Monad) 'বালাগ্রশতভাগ'—অণুরেষ আত্মা। এই Monad উপনিষদের ভাষায়—মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে। এ সম্পর্কে Mrs. Besant একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

"'The monads are self-moved in their entry into the fivefold universe —'none else compels."

প্রত্যগাত্মার কিরণে উদ্ভাসিত যে জীবাত্মা (Ego), ব্রহ্মসূত্রে তাহাকে আভাস (Radiation) বলা হইয়াছে—ইহাই ছান্দোগ্যের "সম্প্রসাদ"।

এই প্রত্যগাত্মা ও জীবাত্মাকে কঠ উপনিষদের ঋষি 'ছায়াতপ' বলিয়াছেন—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।

আর ভূতাত্মা বা Personality ? ভূতাত্মা আমাদের lower Self—হীনদীনমলিন—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। উহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ। আমার 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদে' আমি এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

'বেদান্ত প্রবেশের' অনেক গুণের কথা বলিলাম ; কয়েকটা দোষের উদ্‌ঘাটন করি—নহিলে সমালোচনা কি ?

গ্রন্থের ভাষা অনেক স্থলে জটিল ও নীরস এবং পদে পদে গ্রন্থকারের অপ্রকাশিত মূল গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ ভাগবতে'র দোহাই থাকাতে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হয়। গ্রন্থকার এ বিষয়ে লক্ষ্য দিবেন কি ? আরও দেখিলাম অনাবশ্যক বিষয়যোগে গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করা হইয়াছে—যেমন অবতার তত্ত্ব (যাহার সহিত ব্রহ্মসূত্রের কোনই সম্পর্ক নাই—যদিও কোন কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে) এবং বক্ষু নদী প্রভৃতি অমূলক প্রত্নতত্ত্বের অসঙ্গত অবতারণা।

ব্রহ্মসূত্রে (তথাচ উপনিষদে ও গীতায়) জীবের শুক্লা ও কৃষ্ণা গতির যথেষ্ট আলোচনা আছে এবং ক্রমমুক্তি প্রভৃতিরও প্রসঙ্গ আছে ; কিন্তু 'বেদান্ত প্রবেশে' গ্রন্থকার এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই।

আমার ইচ্ছা হয় গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়া গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত করেন—যেন ঐ গ্রন্থ তাঁহার 'ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্‌ ভাগবতে'র সহিত অসম্পর্কিত, স্বতন্ত্র গ্রন্থ হয়। তাহা করিলে, এই 'বেদান্ত প্রবেশ' বেদান্ত-পরিচয় সম্পর্কে একখানি সুন্দর প্রবেশ-গ্রন্থ হইতে পারিবে। পরিশেষে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মুক্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করি ঃ

সত্যপি ভেদাপগমে তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্‌।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ; ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৪৪

পরিচয়

পরকীয়া-তত্ত্ব

১

'স্বকীয়া'

প্রেমিক-ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান্ কেবল প্রতাপ-ঘন ও প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, কেবল Omnipotent ও Omniscient নহেন—তিনি আনন্দঘন, তিনি প্রেমঘন (All-loving)—

—that sustaining Love
Which, through the web of being, blindly wove
By man and beast and earth and air and sea,
Burns bright or dim, as each are mirrors of
The fire for which all thirst

—Shelley's Adonais.

তিনি 'বামনী' (Refuge of love)।

আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।

তিনি 'রসো বৈ সঃ'—তিনি 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ'।

তিনি প্রিয়তম (পিতম্) —তিনি দয়িত, বণিত—'পরপ্রেমাস্পদ'।

প্রেমিক ভক্ত—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা)—তিনি বিধিমার্গ ছাড়িয়া রাগমার্গে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন।

রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

অর্থাৎ 'বিধ্যনুগা' মার্গ ছাড়িয়া 'রাগানুগা' মার্গে বিচরণ না করিলে বৃন্দাবনের যে প্রেমময় কৃষ্ণ (যিনি Dolche Amori—sweetest Love)—তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

এক কথায়, ভক্ত 'ভব' ছাড়িয়া যখন 'ব্রজে' প্রবেশ করেন, তখনই তাঁহার ভক্তি প্রেমে পরিণত হয় (Devotion turns into love)—তিনি ধন্য হন।

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু

সেই সুধন্য তখন কি করেন ?

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ

—ভাগবত, ১১।২।৩৯

তাঁহার চিত্ত পিতমের প্রেমের তাপে বিগলিত হওয়ায় তিনি উন্মত্তের মত অদ্ভুত আচরণ করেন—কখন উচ্চহাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চিৎকার করেন, কখন গান করেন, কখন বা নৃত্য করেন!

ঐ 'নব প্রেমা'র বীজ তাঁহার চিত্রক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয়। অর্থাৎ—

ঐ প্রেম ক্রমে বাড়ি—স্নেহ, মান, প্রণয়,
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।

—চরিতামৃত

প্রেমের সাধারণ নাম 'রতি'। ঐ রতি পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

অধিকারি ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর।

শান্তাদি চতুর্বিধ রতির কথা আমরা বারান্তরে বলিব। কিন্তু মধুর রতি কি? মধুর রতি ভগবানে কামার্পণ—কৃষ্ণ কান্ত ভক্ত কান্তা, কৃষ্ণ মাসুক (Beloved) ভক্ত আসিক (Lover)—ভগবানকে এই কান্ত-ভাবে ভজন। সেই জন্যই মধুর রসের এদেশে নাম 'শৃঙ্গার' বা 'উজ্জ্বল' রস।

It is a passive and joyous yielding up of the virgin soul to its Bridegroom (কান্ত)—a silent marriage vow. It is ready for all that may happen to it, all that may be asked of it—to give itself and lose itself—to wait upon the pleasures of its Love—Underhill.

কৃষ্ণ কিন্তু 'তুহুঁ বহুবল্লভ কান'—'তোমার চপল মতি, একত্রতে নহে স্থিতি'। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের ভক্ত তাঁহার কান্তা—সেই অগণ্য আরাধিকার তিনিই কান্ত। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন—

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ

তাঁহারা আরও বলেন, ঐ কান্তা দ্বিবিধ—স্বকীয়া ও পরকীয়া—এবং পরকীয়ারই শ্রেষ্ঠত্ব। কেন? ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রেমিকের পক্ষে আমরা যে পঞ্চরসের উল্লেখ করিলাম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—তন্মধ্যে কিন্তু মধুর রসই প্রধান।

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য
মধুর রস শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য

... ...

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি
সব রস হইতে শৃঙ্গার অধিক মাধুরী
অতএব 'মধুর' রস কহি তার নাম
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান

—চরিতামৃত

প্রশ্ন উঠিবে—পঞ্চবিধের মধ্যে কোন রসের অবধি কোন পর্য্যন্ত?

আমরা জানিয়াছি, ভক্তচিত্তে ভক্তির ক্রমবিকাশ এইরূপ:—প্রথম প্রেম, পরে রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। এই ভাবেরই পারিভাষিক নাম 'রূঢ়' এবং মহাভাবের পারিভাষিক নাম 'অধিরূঢ়'।

শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়।
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকানিকরে ॥

এই রূঢ়ই 'ভাব' এবং এই অধিরূঢ়ই 'মহাভাব'। স্বকীয়াতে 'রূঢ়' এবং পরকীয়াতে 'অধিরূঢ়'।*

কান্তভাবে ভজন বেশ সুপ্রাচীন। প্রাচীনতম উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রণালীর ভজনকে লক্ষ্য করিয়াছেন—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবং অয়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন
আত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্

—বৃহ, ৪।৩।২০-১

এখানেই যুগলমিলনের বীজ—তবে ইহা অবশ্য পতিপত্নীর মিলন—'স্বকীয়া'। আরাধ্যের সহিত আরাধিকার এই যুগল-মিলনকে পশ্চিমে 'Spiritual Marriage' বলা হইয়াছে।

The extreme form of this kind of apprehension (i. e. of God as Love) finds expression in the well known and heartily abused symbolism of the 'Spiritual Marriage' between God and the Soul.

শুনা যায় পাশ্চাত্যে ঐ প্রতীক-প্রয়োগের উৎস প্রাচীন গ্রীসের Orphic Mysteries-এ—

This symbolism goes back to the Orphic mysteries,and thence descended via the Neoplatonists into the stream of Christian traditions. (Underhill. p. 509)

এই Neoplatonist-দিগের গুরু Plotinus। প্লোটাইনাস্ বেদান্তভাবে ভাবিত ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের একজন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার রচনাতেও ঐ স্বকীয়ার প্রতীক (symbolism) বেশ উজ্জ্বল আকারে দৃষ্ট হয়।

---

* অধিরূঢ় আবার দ্বিবিধ—মাদন ও মোহন—সঙ্গমে মাদন এবং বিরহে মোহন।

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত' প্রকার
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তার।

১৩৪২ শ্রাবণ-'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'সঙ্গম ও বিরহ' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

Plotinus, the ecstatic, is sure that the union with God is a union of hearts : "by love He may be gotten and holden, but by thought never." He is convinced that the vision is only for the desirous, who has that "loving passion" which causes the lover to rest in the object of his love. The simili of marriage, of conjuction as the soul's highest bliss, is found in the work of this hard-headed pagan philosopher.—Underhill. P. 445

এই দৃষ্টিতে দেখিলে উপাস্য ও উপাসিকা Bridegroom ও Bride, অর্থাৎ বর ও বধূ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন।

Prepare thyself as a Bride to receive the Bridegroom.

—Markos the Gnostic

'The soul's ascent to God begins with adoration and ends in spiritual marriage.'

খৃষ্টান মিষ্টিকদিগের পক্ষে এই প্রতীকের প্রপূর্ত্তি Old Testament-এর Song of Solomon-এ। তাঁহারা এই কমনীয় কামসিক্ত কবিতাকে the 'Song of Songs' বলেন।

Thus, for St. Bernard, throughout his deeply mystical sermons on the Song of Songs, the Divine Word (Logos) is the Bridegroom, the human Soul is the Bride.

এই Song of Solomon-এ সম্ভোগের চিত্র খুব জাজ্জ্বল্য—

Behold thou art fair, my Beloved, yea, pleasant.
Also our bed is green ;

... ...

His left hand is under my head,—
And his right hand doth embrace me.

... ...

His left hand should be under my head,—
And his right hand should embrace me,
I charge you, oh daughters of Jerusalem.
That ye stir not up, nor awake
my Love, until he please.

ইহার সহিত পদকর্ত্তা জগন্নাথ দাসের নিম্নলিখিত পদটি তুলনীয়—

সখি! হের দেখসিয়ে বা।
চন্দ্র-বদনী, ঘুমাইয়ে ধনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা॥

নাগরের বাহু, শীথান ক'রেছে,
বিথান রসন ভূষা।
নাসার নিশ্বাসে, বেশর ছুলিছে,
হাসিখানি আছে মিশা॥

এই 'স্বকীয়া'র সহ 'Mystic Marriage'-এর ঝঙ্কারে য়ুরোপের মধ্যযুগের মিষ্টিক সাহিত্য মুখরিত।

It may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.

—St. John of the Cross.

Our work is the love of God. Our satisfaction lies in submission to the Divine embrace—a personal surrender not only of the finite to the Infinite—but of bride to Bridegroom, heart to heart,—Ruysbroeck.

Richard of St. Victor compares the 'insuperable' but also inseparable' union with God to the Soul's bridal;—the definitive, irrevocable act, by which permanent union is initiated, a passive and joyous yielding-up of the Virgin Soul to its Bridegroom – a silent marriage vow.

—Underhill p. 391.

এ দেশে আমরা আরাধিকা মীরা বাঈর মুখেও ঐ কথা শুনিতে পাই :—

মেরে তো গিরিধর গোপাল—
দুসরা ন কোই
যাকো শির ময়ূর মুকুট
মেরো পতি সোই।

ভক্তদাস কবীরও ভগবানের সহিত ভক্তের এই পতিপত্নী সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন :—

তেরে গাওনেকে দিন নগিচানা—
সোহাগিন্ চেত করোরী
ঝিল মিল জোত বঁহা নিশদিন ঝল্‌কে
সুরত দে নিরত করোরী।
সাঁঈকে লগন কঠিন হৈ ভাঈ,
যৈসে পপিহা প্যাসা বুন্দকা
পিয়া পিয়া রটলাঈ।

খৃষ্টীয় সেন্টদিগের মধ্যে সেন্ট ক্যাথারিণের নাম প্রখ্যাত। এদেশে যেমন

আরাধিকা করমেতি বাঈয়ের সহিত গিরিধারীর বিবাহ বন্ধন ঘটিয়াছিল এবং মাদুরার রাজকুমারী মীনাক্ষীর মহাদেবের সহিত বর-বধূ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে Carnival-এর শেষ তিথিতে সেণ্ট ক্যাথারিণের সহিত ক্রাইষ্টের সেইরূপ উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

The Voice said to her, "I will this day celebrate solemnly with thee the feast of the betrothal of thy soul and even as I promised, I will *espouse* thee to Myself in faith." Then, says her legend, the Virgin Mother of God took the right hand of Catherine and besought the Son to deign to espouse her to Himself in faith. He said, 'Lo! I espouse thee to myself, thy Creator and Saviour in the faith, which, until thou dost celebrate thy eternal nuptials with Me in Heaven, thou wilt preserve ever without stain."

কিন্তু ইহাও স্বকীয়া—পতিপত্নী সম্বন্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ইহাতেও তুষ্ট নন—তাঁহারা বলেন—ইহারও উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—ভগবান্‌কে মাত্র পতিভাবে নয়—উপপতি ভাবে ভজনা করিতে হইবে; অর্থাৎ তাঁহার 'পরকীয়া' হইতে হইবে। তাঁহাদের পূর্ব্বে এ কথা কেহ বলিতে সাহস করিয়াছেন কি? বোধ হয় না। তবে যোগবাশিষ্ঠের একটি শ্লোকে ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত আছে—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়েদ্ অন্তঃ নবসঙ্গরসায়নম্ ॥*

'পরপ্রাণা নারী গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে সেই 'নবসঙ্গ রসায়ন' আস্বাদন করে।' এ শ্লোকের পাঠান্তর আছে—'পতিব্যসনিনী নারী'—পতিগত-প্রাণা নববধূ—তাহার সম্বন্ধেও 'নবসঙ্গ রসায়নে'র উল্লেখ অসঙ্গত নয়। অতএব এই শেষোদ্ধৃত পাঠই যদি ঠিক পাঠ হয়, তবে যোগবাশিষ্ঠে 'পরকীয়া'র ইঙ্গিত অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, পরকীয়া ভাবের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যেই—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরকীয়াতত্ত্ব কি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কি ভাবে এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—আগামী বারে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

---

* চৈতন্যচরিতামৃতকার মধ্য ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরে বলেন এ শ্লোক যোগবাশিষ্ঠের নহে।

সোম-লতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

দাদার আশ্রয়ে বিনোদিনীর পক্ষে অভিযোগ করার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ এখনও ঘটেনি। মা তাকে দিনরাত্রি পক্ষপুটে ঢেকে রাখে। নিতাইপদ এমনিতে যত রুক্ষভাষীই হোক, বিনোদিনীকে সে যেন এড়িয়েই চলে। নয়নতারার ব্যবহারের বিরুদ্ধেও তার বলবার কিছু নেই। অন্তরে তার যাই থাক, বাইরে কোনো দিন সে বিনোদিনীকে এতটুকু অবহেলা দেখায় নি। তা ছাড়া সামাজিক জীবনের একটা সুবিধা এই যে বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা ভোলবার জন্যে কেবলই কাজের পর কাজ এবং তারপর কাজের মধ্যে ডুবে থাকার আবশ্যক হয় না। মাঝে মাঝে আসে উৎসব। মুঠ সংক্রান্তি গেল তো নবান্ন এল।

এবারে নবান্ন একটু তাড়াতাড়িই এল। গত বৎসর ফসল ভালো না হওয়ায় মানুষের খাবার চাল এবং গরুর খড় ফুরিয়ে এসেছে। অনেককে তো রীতি-মত কিনেই খেতে হচ্ছে। ঘরের চালের ভাত যারা খায়, চাল কিনে খেতে তাদের গায়ে বাজে। এর উপর আছে অর্থাভাব। সুতরাং মাসের শেষের দিকে নবান্নর একটা ভালো দিন থাকলেও অত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে কেউ রাজি হল না।

আরও হল না নিতাইপদর জন্যে। তার অনেকগুলি গরু বাছুর। পরি-বারটিও নিতান্ত ছোট নয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি নবান্ন করার গরজ বেশী। এ অঞ্চলে সে বুদ্ধিমান, অর্থাৎ ভালো মামলা বোঝে ব'লে একটা খ্যাতি আছে। তার অনমনীয় জেদও সুপরিচিত। সে যখন বেঁকে বসেছে তখন অনেকেই আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করলে না। স্থির হল সাত তারিখেই নবান্ন হবে।

নবান্নর উৎসবে সারা গ্রাম মেতে উঠল। পয়লা তারিখে যে ধান কেটে আনা হয়েছিল, দিন রাত্রি খেটে মেয়েরা তাই চাল করলে। নবান্নর দিন তো সব রাত্রি থেকে উঠে উঠান লেপতে এবং আলপনা দিতে সুরু করলে। ছেলেরা সকাল সকাল স্নান করে এসে মন্দিরে মন্দিরে সিধা দিয়ে এল। বৎসরের প্রথম চাল দেবতা, বৈষ্ণব ও ভিখারীকে না দিয়ে খেতে নেই। বৈষ্ণব ও ভিক্ষুকের দল বাড়ী বাড়ী

গান গেয়ে ভিক্ষা নিয়ে যেতে লাগল। ছেলেরা দলে দলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল-নবান্ন খেয়ে যেতে লাগল। বিশেষ কিছু নয়, একটুখানি কলাপাতায় এক মুঠা চাল, দু'কুচি আখের টিক্‌লি, রাঙা আলু, কলা, কোথাও দুধে ভিজান, কোথাও ক্ষীরে, —আর বাতাসা। কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই, এড়াবারও পথ নেই। প্রত্যেক লোককে প্রত্যেক বাড়ী যেতে হবে, খেতেও হবে। বাড়ীর গিন্নী খোঁজ রাখছে কে এল, কে এল না।

ছেলেরা ছাড়া পুরোহিত আছেন, নাপিত আছে, চৌকিদার আছে, দাই আছে। এরা প্রত্যেকেই একটি করে সিধা পাবে। আর একটি সিধা পাবে কৃষ্ণদাস বাবাজি। গৌরহরির গ্রামত্যাগের পর এ গ্রামে আর বৈষ্ণব নেই,—গৃহীও না, আখড়াধারীও না। সেজন্যে পাশের গ্রামের কৃষ্ণদাসের উপরই টহল দেওয়ার ভার পড়েছে। গোটা কার্ত্তিক মাসটা সে প্রত্যহ ভোরে রাস্তায় রাস্তায় প্রভাতী গেয়েছে। সিধা সেইজন্যেই।

নবান্ন বিতরণের ভার নিতাইপদর মায়ের উপর। বয়স হওয়ায় অনেক কর্ত্তৃত্ব তাঁকে হস্তান্তরিত করতে হয়েছে। কিন্তু যেগুলি খাশ গৃহিণীর পোর্টফোলিও, যেগুলি নইলে গৃহিণীপনার সকল অধিকার লুপ্ত হয়ে যায়, এই জরাজীর্ণ শরীর নিয়েও বৃদ্ধা সেগুলি পরম যত্নে আঁকড়ে ধ'রে আছে। নবান্ন বিতরণ এই সমস্ত অধিকারের অন্যতম।

বিনোদিনী ওঘর থেকে বললে, তুই চোখে দেখতে পাস না, না কি মা? হাড়ী ছোঁড়াকে ছুঁয়ে ফেললি?

—এই মরেছে! ছুঁলাম নাকি?

কিন্তু বিনোদিনীর মা তখনই নিজেকে সামলে নিলে। বৎসরকার দিনে কারও উপর রূঢ় হতে নেই।

বললে, একটু সরে সরে হাত পাততে হয় বাবা। বুড়ো মানুষ, হাত কাঁপে কি না। চোখেও ভালো···

হাড়ীদের ছেলেটি বিব্রত হয়ে বললে, কখন আবার আমাকে ছুঁলে কত্তা? আমি তো এই এখানে দাঁড়িয়ে।

—ছুঁইনি? তা হোক, তা হোক। একটা ডুব দিয়ে এলেই হবে। ও বৌমা! তুমি আবার রাঁধছ বুঝি! ও হাবল, এইখানে একটু দাঁড়া না ভাই।

হাবল গভীর মনোযোগের সঙ্গে হাতের তীরের ঋজুতা পরীক্ষা করছিল। ঘোষেদের বাড়ী নবান্ন-কার্ত্তিকের পূজা। পূজাঘরের সামনের খোলা মাঠে এতক্ষণ হয়তো ছেলেদের তীর খেলা আরম্ভ হয়েই গিয়েছে। সুতরাং বাজে কাজে সময়-ক্ষেপ করার উৎসাহ তার নেই।

বিরক্তভাবে বললে, কেন, তুই যাবি কোথায় ?

—হাড়ীদের ছেলেটাকে ছুঁয়ে ফেললাম কি না জানি না তো। তা হোক একটা ডুব দিয়ে আসি! যাব আর আসব।

ছেলেটা তখনও যায় নি। অপ্রস্তুতভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল।

সকাতরে বললে, আমাকে তুমি ছোঁওনি কত্তা। আমি কি মিছে কথা বলছি ?

কত্তা তাড়াতাড়ি বললে, না, না, ছুঁবি কেন ? ছুঁলে আমি জানতে পারতাম না ?

হাবল বীরদর্পে ধনুক কাঁধে ফেলে বললে, তবে আবার ডুব দিবি কেন ? মরতে সাধ হয়েছে, নয় ?

কত্তা হেসে বললে, ওরে পাগলা, তবু একটা ডুব দেওয়া ভালো। পূজো-আচ্চার কাজ। কখন অপরাধ হয় বলা তো যায় না।

—তবে তুই মরগে যা। আমি ও সব আগলাতে পারব না।

বিনোদিনী ধমক দিয়ে বললে, কেন, তুমি কোন রাজকার্য্যে যাবে শুনি ? হতভাগা ছেলে, তোমাকে দিয়ে একটা উপকার পাওয়া না ?

হাবল তখন খেলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। মায়ের কাছ থেকে বাধা পেয়ে রাগে তার চোখ ফেটে জল বার হবার উপক্রম হ'ল। চেঁচিয়ে বললে, না। আমি পারব না। কোনো কাজ পারব না। আমি তোমাদের নবান্ন আটকাবার চাকর নাকি ?

হাবলের কথা শুনে বিনোদিনীর মা হেসে ফেললে।

নয়নতারা রান্নাঘর থেকে হেসে বললে, ওকে ঘাঁটিও না ঠাকুরঝি, ও কেউটে সাপের বাচ্ছা। হয়তো দেবে এখনি তীর মেরে একটা চোখ কাণা ক'রে। কিছু বিশ্বাস নেই।

মামীর কথায় হাবল যেন অকস্মাৎ আপনার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

বললে, নেইই তো বিশ্বাস। দেখবে আমার হাতের নিশ?

ব'লে বন্ করে অদূরবর্ত্তী কুলগাছটাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়লে।

বললে, দেখলে।

এবারে বিনোদিনীও হেসে ফেললে। পুত্রের কৃতিত্বে হয়তো বা মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করলে।

বললে, আমিও দেখাচ্ছি দাঁড়াও না। দাদা আসুক, তোমার গুণের কথা সব বলছি।

প্রথম জয়ের আনন্দে পুলকিত হয়ে হাবল ধনুকে আর একটি তীর যোজনা করতে যাচ্ছিল। মামার কথা শোনামাত্র থেমে গেল। বিরক্তভাবে বললে, আরে বাপু, চেঁচিয়ে সারা হচ্ছ। আমি আছি তো এখানে দাঁড়িয়ে। বুড়ী যাবে না তো আমি কি করব?

বিনোদিনীর মা হেসে বললে, তাই বল্।

মুখ ভেংচে হাবল বললে, তাই বল্! কেন তুই দেখতে পাচ্ছিস না? চোখে পোকা পড়েছে?

নয়নতারা ওঘর থেকে বললে, শোন ঠাকুরঝি, তোমার ছেলের কথার ছিরি! কি মিষ্টি কথা!

বিনোদিনী কাজ করতে করতে বললে, আমি কিছু বলব না তো। দাদা আসুক না, তারপরে পাট করাচ্ছি।

হাবল রাগে গুম হয়ে বসে রইল।

স্নান করতে যেতে যেতে বৃদ্ধা আর একবার তাকে সতর্ক করে দিলে, দেখিস ভাই, কাকে যেন মুখ না দেয়।

—না, না, দেবে না। তুই যা।

বিনোদিনী বললে, কাকে মুখ দেবে কেন, ও নিজেই এক সময় এক খাবল তুলে মুখে পুরে দেবে।

ফিক করে হেসে হাবল বললে, দেবে তাই।

স্নান সেরে আসতে বিনোদিনীর মায়ের বেশী দেরী হ'লনা।

এবারে বোধ হয় দারুণ বর্ষার জন্যে এরই মধ্যে শীত প'ড়েছে বেশ। অন্ততঃ জল তো রীতিমত ঠাণ্ডা। বাড়ীর পিছনে যে ডোবা, মেয়েদের প্রাতঃস্নানটা সেই-খানেই হয়। ডোবার চারিদিকে নিবিড় বাঁশবন। তার ভিতর দিয়ে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। এরা অভ্যস্ত তাই, নইলে নবাগত কেউ দিনের বেলাতেও একলা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহস করবে না। স্থানটা এমনি অন্ধকার। জলের রঙও নীলাভ। তাতে কমলা নেবু রঙের শুকনো ঝরা বাঁশপাতা হাওয়ায় নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভিজা কাপড়খানা আলগোছে গায়ে জড়িয়ে বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে বললে, বাবা! জলের যেন দাঁত বেরিয়েছে।

হাবল দিদিমাকে দেখামাত্র তীর-ধনুক নিয়ে দাওয়া থেকে এক লাফে উঠানে এবং সেখান থেকে এক লাফে সদর দরজা পেরিয়ে চক্ষের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল। তীর খেলার জন্যে সে ভিতরে ভিতরে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল।

শাশুড়ীর কথার উত্তরে নয়নতারা বললে, স্নান করতে না গেলেই হ'ত। পাটের কাপড় পরা ছিল, মাথায় একটু গঙ্গাজল নিলেই চুকে যেত।

বুড়ো মানুষের শীত একটু বেশীই লাগে। এই শীতে আর একবার স্নান করতে হওয়ায় সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, যেত যদি তো তখন বললে না কেন? এখন বুকে সর্দ্দি ব'সে বুড়ী মরলে তোমার সুবিধে হয়, না?

মৃত্যুকে বৃদ্ধার বড় ভয়। দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভয়ও তত বাড়ছে। তার সর্ব্বদা আশঙ্কা, লোকে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে মারবার চেষ্টা করছে। সে অত্যন্ত শক্ত মেয়ে তাই পারছে না।

নয়নতারা আহত কণ্ঠে বললে, তুমি ম'লে আমার আবার কি সুবিধে হবে?

বুড়ী চেঁচিয়ে বললে, গিন্নীপনার সুবিধে। জান না?

উত্তরে নয়নতারাও কি একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনোদিনী তাকে নিরস্ত ক'রে বললে, আঃ! থাম না বৌ।

—আমি কি মন্দ কথাটা বললাম ঠাকুরঝি? এই শীতে চান ক'রে এসে ঠক ঠক ক'রে···

বিনোদিনী চোখের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে চুপি চুপি বললে, বলুক না দুটো কথা বৌ। বুড়ো মানুষ।

বৃদ্ধা কাপড় ছেড়ে এসে নবান্নর সামনে ব'সে গজ গজ করতে লাগল। নয়ন-তারা চুপ ক'রে গিয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে দেখে তার হৃদয়াবেগ আবার উদ্বেল হয়ে উঠল। বহুক্ষণ পরে পুরোনো কথার সূত্র ধ'রে হঠাৎ বললে, চুপ যেন করলাম। কিন্তু আমি মন্দ কথাটা···

বিনোদিনী এবার বিরক্তভাবেই বললে, আঃ! থাম না বৌ!

বাইরে দুম দাম পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, এমন শান্ত পদশব্দ নিতাইপদ ছাড়া আর কারও হ'তে পারে না। লোকে পরিহাস ক'রে বলে, নিতাইপদ এ পাড়া দিয়ে হেঁটে গেলে ওপাড়ার লোক জানতে পারে। ওর দাপে যেন মা বসু-মতী কাঁপতে থাকে।

নিতাইপদ এল। কিন্তু একা নয়, হাবলচন্দ্রকে নিয়ে। তার একটা হাত ধ'রে টানতে টানতে। তার মাথার নানা স্থান থেকে দরদর ধারে রক্ত পড়ছে। মুখে, গায়ে, কাপড়ে রক্তের দাগ। অথচ চোখে এক ফোঁটা জল নেই। মাতুলভীতি ছাড়া মুখে ব্যথার কোনো চিহ্নই নেই। হাবলচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তার শরাসন কোথায় গেল কে জানে।

নিতাইপদ উঠানের মাঝখানে বিনোদিনীর সামনে হাবলের হাতখানা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললে, এই নাও তোমার গুণধর পুত্র। ছড়িখানা কই রে!

নবান্নর থালা ফেলে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল নিতাইপদর মা। রান্নাঘর থেকে ছুটে এল নয়নতারা। আর বিনোদিনী পাথরের মূর্ত্তির মতো শক্ত হয়ে অপলক নেত্রে পুত্রের রক্তাক্ত দেহের দিকে চেয়ে রইল। কি যে করবে ভেবে পেলে না।

ছড়ির সন্ধান করতে করতে নিতাইপদ ওঘর থেকে হুঙ্কার ছাড়লে, ওকে আজ আমি খুন ক'রে ফেলব, তবে আমার নাম নিতাইপদ।

হাবল নির্ব্বিকার।

মেয়েরা সমস্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। নিতাইপদর মা তৃতীয় বার স্নানের আশঙ্কা বিস্মৃত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে অন্য ঘরে নিয়ে গেল নিতাইপদর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। হাবল নিরীহ ভালো মানুষের মতো পিট পিট ক'রে চেয়ে দেখলে, প্রহার করতে না পেয়ে নিতাইপদ রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েরা ব্যাপারটা জানবারই সুযোগ পায়নি। হাবলের

অনুচর, পরিচর এবং অগ্রজপ্রতিমেরা, যারা নিজের চোখে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তারা নিতাইপদর ভয়ে এতক্ষণ বাড়ীর ভিতরে আসতে সাহস করেনি। আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করছিল। নিতাইপদ চ'লে যাও-য়ার পর তারা একে একে এসে উঠান আলো ক'রে দাঁড়াল। সকলেরই পরিধেয় মালকোচা মারা, এবং হাতে তীর-ধনুক।

—এই নাও গো, হাবলের তীর-ধনুক।

নয়নতারা তখন জল দিয়ে হাবলের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে। তার মাথার বহু স্থানে রীতিমত গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে। নিতাইপদর মা পিছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে এবং উত্তেজনায় ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। আর বিনোদিনী পাশেই একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

একে একে পাড়ার স্ত্রীলোকেরাও এসে কলকোলাহল তুলতে লাগল। একজন ন্যাকড়া পুড়িয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে। অবিলম্বে তাই করা হ'ল।

এতক্ষণে প্রশ্ন উঠল, কি হয়েছিল ?

কি হয়েছিল সে কথা বলবার জন্যে একসঙ্গে সকল ছেলেই কলরব ক'রে উঠল। তাদের সকলকেই সুযোগ দেবার জন্যে শ্রোতৃমণ্ডলীও বহুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

ফলে এই প্রকার বোঝা গেল ঃ

—কাকে ঠুকরে দিয়েছে।

—কেন ?

—আশ্চর্য্য নিশ্, বুঝলে মাসী। যেমন তীর ছোড়া, আর অমনি ঠুই ক'রে লাগবি তো লাগ একেবারে একটা কাকের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে সাবাড়।

হাবলের মাথায় তখন ন্যাকড়া-পোড়া লাগানো হচ্ছিল। মাথা নীচু ক'রেই গম্ভীর ভাবে বললে, ওইটেকেই তাক ক'রেছিলাম।

তার কান ধ'রে টেনে মাথাটা ঠিক ক'রে নয়নতারা ধমকে বললে, থাম।

প্রশ্ন হ'ল, তার পরে ?

—মরা কাকটার ঠ্যাং ধরে নিয়ে আসছিল। আর অমনি রাজ্যের কাক জড় হয়ে,···

—তা তো ঠুকরে দেবেই। বলে, আমার মামাতো ভায়ের চোখ শুদ্ধ ঠুকরে নেবার মতো করেছিল।

শুনে হাবল ফিক করে হেসে ফেললে।

—আবার হাসি হচ্ছে!

—যে রকম করে ঘিরে ধরেছিল, ওরও নিত চোখ ঠুকরে।

হাবল বললে, যাঃ।

বিনোদিনী ঊর্দ্ধাকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল, এই তো শান্ত ছেলে। ও আবার বাঁচবে, মানুষ হবে, তার দুঃখ দূর করবে। হয়তো কবে কোন দুর্ঘটনায় পথেই ম'রে পড়ে থাকবে।

বিনোদিনীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। অকস্মাৎ সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

অনেক দিন বিনোদিনীর ফিট হয় নি। বোধ হয় আবার আরম্ভ হল। ভিতরে ভিতরে সে বোধ হয় ক্ষয়ে আসছে।

যখন জ্ঞান হল, দেখলে গৌরহরি তার উপর ঝুঁকে পড়ে তার চোখে এবং হাতের মুঠোয় কিসের একটা শিকড় বুলিয়ে যাচ্ছে। বিনোদিনী উঠে বসবার চেষ্টা করলে। পারলে না। ক্লান্তিতে সে আবার চোখ বন্ধ করলে।

গৌরহরি তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে, বিনোদিনী! বিনোদিনী!

উত্তরে বিনোদিনী শুধু ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলে। তার চারিদিকে লোক জমে গেছে বিস্তর। সামনে গৌরহরি একেবারে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

বিরক্তি এবং লজ্জায় এবারে সে জোর করে উঠে গায়ে মাথায় ভালো ক'রে কাপড় দিয়ে পিছন ফিরে বসল।

গৌরহরি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আর ভয় নেই। একটু দুধ গরম করে খাওয়াও।

ঝুলি-ঝোলা কাঁধে ফেলে সে চলে গেল।

অনেকদিন পরে গৌরহরি গ্রামে এল। বিনোদিনী যে এখানে আছে তা সে জানে। নবান্নের ভিক্ষা গ্রহণকে উপলক্ষ করে তাকে দেখবার লোভেই তার

আসা। এসেই এই ব্যাপার। সত্য সত্যই তার জ্ঞান কতখানি বলা কঠিন, কিন্তু সাপের, ভূতের এবং আরও নানা আধি-ব্যাধির মন্ত্র-তন্ত্র এবং টোটকা ঔষধ জানার জন্যে তার একটা খ্যাতি আছে। এত বড় বিপদের সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে পেয়ে বিনোদিনীর বাড়ীর লোকেরা যেন হাতে চাঁদ পেলে। গৌরহরির লজ্জা করছিল। কিন্তু তবু তাকে যেতে হ'ল। এও মনে হ'ল যে, এ একরকম ভালোই হ'ল। বিনোদিনীর সহজ অবস্থায় তাকে মুখ দেখানো গৌরহরির পক্ষে আরও লজ্জার কারণ হ'ত। বিনোদিনী ভাবতে পারে, হয়ত শুধু তাকে দেখবার জন্যেই গৌরহরি আবার এসেছে। এখন আর সে সঙ্কোচ রইল না। বিনোদিনীর অজ্ঞাতে গৌরহরি প্রাণ ভরে তাকে দেখে নিতে পারবে।

কিন্তু কি দেখলে? মূর্চ্ছার আক্ষেপে বিনোদিনীর গায়ের মাথার কাপড় বিস্রস্ত হয়েছিল। এমন পরিপূর্ণ ক'রে দেখা তার জীবনে আর কি কখনও ঘটত? এত বড় সুযোগ সে কি কখনও আশা ক'রেছিল? বহু দূরের পথ হেঁটে সে এসেছিল। ভেবেছিল, অন্তরাল থেকেই বিনোদিনীকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবে, অবশ্য যদি এখনও সে এখানে থাকে। নইলে পথ হাঁটাই সার হবে।

দেখা হ'ল। আশার অতিরিক্ত ক'রে দেখা। কিন্তু বিনোদিনীদের বাড়ী থেকে ও যখন বেরিয়ে এ'ল, মনে হ'ল যেন শ্মশান থেকে ফিরছে। মুখ শুকনো। চোখের দৃষ্টিতে গভীর শূন্যতা। এরই জন্যে এতটা পথ আসা? কোথায় বিনোদিনী? সেই কিশোরীকালের বিনোদিনী? একে তো সে কোনোদিন চায়নি। কোনো দিন না। তার যে স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে, সে একটি কিশোরী মেয়ের। এর নয়।

গৌরহরি গুণ গুণ ক'রে গাইলে:

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী ক'রেছি সার।

কোথায় যেন কবরের উপর একবার সে একটা ফুলে-ভরা গাছ দেখেছিল। সেই গাছটির কথা হঠাৎ তার মনে পড়ল। ভুলে ভুলে সে একতারার তারে দিলে ঝঙ্কার।

—এই যে! কখন এলে?

গৌরহরি অকস্মাৎ মানুষের স্বর শুনে চমকে উঠল। লোকটি তার ছেলে-বেলার বন্ধু শিবদাস।

থতমত খেয়ে গৌরহরি বললে, এই একটু আগে এসেছি। ভালো তো ?

—এই যেমন রেখেছ আর কি ? ব্যাপার কি ? ফিরে চলেছ যে ?

শীর্ণ হেসে গৌরহরি বললে, ফিরেই চলেছি ভাই।

—বিলক্ষণ ! নবান্নর দিনে···চল, চল।

—আবার ফিরব ?

একটু আগে পর্য্যন্তও গৌরহরি বুঝতেই পারেনি যে, সে ফিরে চলেছে। কোথায় যে চলেছে তাও জানে না। শিবদাসের কথায় সচেতন হয়ে দেখলে, হাঁটতে হাঁটতে সে একেবারে গ্রামের প্রান্তে হাটতলায় এসে পৌঁছেছে। ভাবলে, আবার ফিরবে ? কিন্তু না ফিরলে এই অবেলায় কোথায় যে যাবে তারও স্থিরতা নেই।

শিবদাসও ছাড়লে না। টানতে টানতে বাড়ী নিয়ে গেল।

শিবদাসের বাড়ী গৌরহরির পুরানো আখড়ার সামনেই। গৌরহরি এ গ্রাম ছেড়েছে অনেক দিন। ফলে দীর্ঘদিনের অযত্নে এবং অব্যবহারে সে আখড়া এখন মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত। সে দিকে চেয়ে শিবদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে, পৈতৃক আখড়াটা ফেলে দিলে হে !

অন্যমনস্কভাবে গৌরহরি বললে, হুঁ।

—ওটা রাখলে ভালো হ'ত।

গৌরহরি বললে, হুঁ।

উৎসাহিত হয়ে শিবদাস বললে, রাখবে ? বল, তাহ'লে তার যোগাড় করি।

গৌরহরি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন ও যে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

শিবদাস কিন্তু তখন নিজের ঝোঁকেই ব'লে চলেছে—বাঁশ, খড়, দড়ি, কিছুই তোমাকে কিনতে হবে না। সবই আমরা ক'রে দোব। কিন্তু এই সময়। এর পরে দেরী হয়ে যাবে।

গৌরহরি বুঝলে, তার আখড়াটা আবার তৈরী করার কথা হচ্ছে, একটু ভেবে বললে, দেখি।

—দেখি নয়, করতেই হবে। এমনি ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এ কি ভালো দেখায় ? আবার আমাদের দিক দিয়েও দেখ। এমন একখানা গাঁয়ে এক-

ঘর বোষ্টম নেই। কথায় বলে, রামুন-বোষ্টমের গাঁ। তুমি যদি থাক, লোকে মাথায় ক'রে রাখবে। আর তোমার মতন একজন গুণী লোককে, কি বলছ বল ?

গৌরহরি হেসে বললে, ভেবে দেখি।

সেই দিন বিকালে গৌরহরির সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হ'ল। গৌরহরি কি জানি কি ভেবে তার সেই আখড়ার পোড়া ভিটায় কি যেন তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। আর বাঁধা ঘাটে জল নিতে যাচ্ছিল বিনোদিনী। তার সঙ্গে মেনী। মেনী অন্য সময়ে যেখানেই থাক, ঠিক এই সময়টায় তার মায়ের সঙ্গে বাঁধাঘাটে যাওয়াই চাই। আর যাওয়ার ঘটাই বা কত! ঠিক যেন কত বুড়ী চলেছে।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ এখন ?

বিনোদিনী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্‌টা জিজ্ঞাসা করলে, কি হচ্ছে ওখানে ? আবার আখড়া হবে নাকি ?

গৌরহরি হেসে বললে, তাই ভাবছি।

—আর ভেবে কাজ নেই। এইখানেই একটা আখড়া ক'রে ফেল। কোথায় আর যাবে ?

গৌরহরি অবাক হয়ে গেল, তার সম্বন্ধে বিনোদিনীর আর বিন্দু মাত্র বিরূপতা নেই।

একটু থেমে বিনোদিনী ফিক ক'রে হেসে বললে, আর সেই সঙ্গে একটি বোষ্টুমীও নিয়ে এস।

গৌরহরিও হেসে জবাব দিলে, তাও ভাবছি।

—সত্যি ?

—সত্যি।

অকস্মাৎ বিনোদিনীর মুখে কে যেন কালি লেপে দিলে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে তার বুক থেকে বেরিয়ে এল।

একটু পরে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, বোষ্টুমী ঠিক হয়েছে নাকি ? কোথায় ঠিক হ'ল ?

—ঠিক এখনও হয়নি ; তবে বোষ্টুমীর কি অভাব আছে ?

ঠোঁটে হাসি চেপে বিনোদিনী বললে, কিন্তু যেমন-তেমন হ'লে তো হবে না। একটি ভালো মতন চাই।

—আছে তোমার সন্ধানে ?

—চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

—দেখো দিকি।

—দেখব। কিন্তু তোমার আবার কি রকম পছন্দ তা তো জানি না।

গৌরহরি হেসে বললে, আমার পছন্দের খবর তুমি আবার জান না ?

বিনোদিনী ফস্ ক'রে ব'লে ফেললে, আমার মতন হ'লে হবে ?

উত্তরে গৌরহরি শুধু একটু হাসলে। তারপরে ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে কি যেন ভেবে নিয়ে বললে, কিন্তু দেখ, বেশ ছোট্ট মতন একটি মেয়ে। বড় মেয়ে চাই না।

এবারে বিনোদিনী সত্য সত্যই হেসে ফেললে। বললে, বুড়ো বয়সে ছোট মেয়ে নিয়ে কি হবে ?

মাথা নেড়ে গৌরহরি বললে, না, না। ছোট মেয়েই চাই। ছোট মেয়ে না হ'লে হবে না।

একটা কোপ-কটাক্ষ হেনে বিনোদিনী বললে, মরণ আর কি !

গৌরহরি ওর কথায় কানই দিলে না। বললে, এমনি মেয়ে সত্যি আছে তোমার সন্ধানে ?

—আছে।—বিনোদিনী মেনীকে ঘাটের পথে ঠেলা দিয়ে বললে, আমার ওই ব্যবসা কি না !

বিনোদিনী ঘাটে চ'লে গেল।

কিন্তু গৌরহরির বিয়ের কথা শুনে ও খুসী হ'তে পারলে না কেন ? সত্যই তো সে কি চিরদিনই ভেসে ভেসে বেড়াবে ? এ গ্রাম তার জন্মভূমি। বহু পুরুষ না হ'লেও অন্ততঃ দু'তিন পুরুষ এইখানেই বাস। তার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন কেটেছে এইখানেই। গ্রামের লোকে তাকে স্নেহও করে। বাস যদি তাকে কোথাও ক'রতে হয় তো এইখানেই। শুধু বাস কেন ? তাকে ঘর-সংসারও পাততে হবে, অর্থাৎ বাউলের ঘর-সংসার ব'লতে যা বোঝায়। তথাপি সমস্ত বুঝেও বিনোদিনীর মনের মধ্যে কি যেন একটা কাঁটা কেবলই খচ্ খচ্ করে।

আবার হাসিও পায়। গৌরহরির একটি ছোট্ট বোষ্টুমী চাই।

বিনোদিনী হেসে ফেললে। বুড়ো বয়সে গৌরহরির সখটুকু আছে!

ফেরবার পথে বিনোদিনী দেখলে গৌরহরি একটা জায়গায় নিঃশব্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার উৎসুক দৃষ্টি চঞ্চল ভাবে কি যেন খুঁজছে।

বিনোদিনীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এইখানটায় সেই করবী গাছটা ছিল, না?

বিনোদিনী হঠাৎ থমকে গেল।

ওইখানটাতেই বটে। আখড়ার ঠিক পিছনে। স্থানটা আগে আরও কতকগুলো আগাছায় ভর্ত্তি ছিল। বহুকালের কথা। দুজনেই তখন ছোট। এইখানে গৌরহরি বটের পাতার মুকুট ক'রে নিজের হাতে ওর মাথায় দিয়েছিল পরিয়ে। বাবলার কাঁটা দিয়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে গেঁথে দিয়েছিল বেলফুল আর রক্তকরবী। খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েছিল কল্‌কে ফুলের মালা। আর দুই কানে ছোট ছোট দুটি বাবলা ফুল।

বলেছিল, বাড়ী গিয়ে আয়নায় দেখো, তোমাকে ঠিক রাণীর মতো দেখাচ্ছে।

আনন্দে এবং লজ্জায় বিনোদিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। ব'লেছিল, ধ্যেৎ।

ওর গাল দুটি টিপে দিয়ে গৌরহরি ব'লেছিল, সত্যি। অবিকল রাণীর মতো।

বিনোদিনী হেসে ব'লেছিল, কি ক'রে জানলে? রাণী দেখেছ কখনও?

গৌরহরি দেখেনি। তবু ওকে যে অবিকল রাণীর মতো দেখাচ্ছে সে বিষয়েও তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

বিনোদিনীর মনে পড়ল, গৌরবে গর্ব্বে পুলকে খুশী হয়ে ওইখানে প্রথম সে গৌরহরির কাঁধে মাথা রেখেছিল। কিশোরী মেয়ের চোখে কি যে স্বপ্ন সেদিন ঘনিয়ে এসেছিল, আজ আর তা স্মরণ হয় না, কিন্তু তবু যেন অনুভব করতে পারে।

গৌরহরির প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারলে না। শুধু থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

মেনী বললে, মা চল্।

—হ্যাঁ, যাই চল্।

কিন্তু চলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এর মধ্যে কমলপুর গিয়েছিলে?

—না। কেন?

—তাই জিগ্যেস করছিলাম।

বিনোদিনী নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল। একটু পরে দ্বিধা-ভরে বললে, এর মধ্যে কি যাবে ওদিকে ?

—যেতে বল তো যেতে পারি। দরকার আছে কিছু ?

বিনোদিনী চুপ ক'রে রইল।

ওর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, হারাণকে কিছু বলতে হবে ?

বিনোদিনী অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল।

গৌরহরি আবার বললে, কিছু বলবার থাকে আমাকে বলতে পার। কাল-পরশুর মধ্যে ওদিকে একবার যেতেও হবে। একটু দরকার আছে। বড় বাবাজি দেহ রেখেছেন শুনেছ বোধ হয় (গৌরহরি যুক্ত কর কপালে ঠেকালে)। সেখানে যেতেই হবে। সেখান থেকে কমলপুর তো বেশী দূর নয়,—সাত-আট ক্রোশের মধ্যে।

বিনোদিনী অকস্মাৎ মাথা তুলে বললে, না থাক। চল্ মেনী।

গৌরহরি ফের ডাকলে। বললে, শোন।

বিনোদিনী ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

ওর চোখের দিকে গৌরহরি চাইতে পারলে না। অন্য দিকে চেয়ে যেন বাতাসকে শুনিয়ে বলতে লাগল, এর মধ্যে একটা কাণ্ড ক'রে ফেলেছি। যদি অভয় দাও তো বলি।

আশঙ্কায় বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। শুষ্ককণ্ঠে বললে, ভয়ের কথা হয় তো বলে দরকার কি ?

বহুদিন পরে গৌরহরি কেন যে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে, কাকে দেখবার লোভে, তা সে বুঝতে পেরেছে। নির্জ্জনে পেয়ে কি কথা সে ফস্ ক'রে বলে বসে তাই ভেবে তার ভয় হল।

গৌরহরি হাত চুলকে বললে, একটু ভয়ের কথাই বটে। তবে তোমার মত না হলে কিছুই হবে না। তাই বলছিলাম, শিবদাসকে আমি এখানে থাকব বলে কথা দিয়েছি।

আশ্বস্ত হয়ে বিনোদিনী বললে, বেশ তো।

গৌরহরি বললে, হ্যাঁ। কিন্তু আমার ভয় হয়, আমি এলে আবার তুমি পালিয়ে যাবে না তো ?

বিনোদিনী হেসে বললে, পালাব কেন ?

—তাই জিগ্যেস করছিলাম। আমার ওপর তুমি তো খুশী নও। কি জানি যদি···

বিনোদিনী বললে, না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। দু'পাশের ঘন বাঁশবনের মধ্যে সামনের রাস্তাটুকুতে এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার নেমেছে। গ্রামবধূদের ঘাটের কাজ শেষ হয়েছে। পথ নির্জ্জন। সামনের বাঁশবনের পরেই বিনোদিনীদের বাড়ী। মেনীর হাত ধরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

চীন-জাপান সমস্যা

১৯৩৪ সালে ওয়াশিংটনে জাপরাজদূত মিঃ সাইটো (Mr. Saito) জাপানের রাজনৈতিক মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "Japan must act and decide alone what is good for China,.. all legitimate foreign interests should consult Tokyo before embarking on any adventures there"। চীন সম্পর্কে এই বৈদেশিক নীতি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণার ফলে তখন জেনিভা, বার্লিন, লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাশক্তিবর্গ এই নীতি মানিয়া লইতে একরূপ অস্বীকার করিয়াছিল। চীন তাহার স্বাধীনতার উপর বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহার পূর্ব্বেই Nine Power Treaty-তে শক্তিবর্গ চীনের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি সমর্থনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং চীনে জাপানের কোন বিশেষ স্বার্থ মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই মতদ্বৈধ সম্বন্ধে জাপান পুনরায় কোন দ্বিরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সার জন সাইমন (Sir John Simon) বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সকলকে আশ্বাস দেন যে, "Japan would loyally observe the Nine Power Treaty and continue to attach the greatest importance to the maintenance of the Open Door in China."

এই মতভেদের পূর্ব্বেই ১৯৩২ সালে জাপান চীনে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার আয়োজন সুরু করিয়াছিল। যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই জাপান চীন আক্রমণ ও কিয়দংশ দখল করায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে মহাশক্তিবর্গ একরূপ উদাসীন ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিশেষ স্বার্থ তাহারা মানিয়া লয় নাই ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের প্রতিবাদ জাপানকে নিরস্ত করিতে বিন্দুমাত্র সক্ষম হয় নাই। জাপান ঘোষণা করিয়াছিল যে মাঞ্চু-বিদ্রোহ স্বতঃপ্রণোদিত, কিন্তু চীন প্রমাণ করে যে জাপানের সামরিক বিভাগের প্রচেষ্টায়, উত্তেজনায় ও সহায়তায় এই বিদ্রোহের সৃষ্টি। চীন গভর্ণমেণ্টের মতের সত্যতা

Lytton Report-এ সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়। জাপানের সামরিক শক্তি মাঞ্চু-বিদ্রোহকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলে ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ হইয়া ওঠে। শক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়ের তীব্র নিন্দা করে ও "মাঞ্চুকুয়ো"-(Manchukuo)-কে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। চীন অবশ্য বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু জাপশক্তি রোধ করা একক চীনের পক্ষে অসম্ভব। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে জাপান চীনকে যথাসম্ভব বাধা দিয়াছে ও সেই জন্যই চীন জাপানী উদ্যমকে স্পষ্ট করিয়া যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই কিম্বা বৈদেশিক সাহায্য ভিক্ষা করে নাই। বিনা দ্বিধায় ও সমস্ত শক্তিবর্গকে অগ্রাহ্য করিয়া ১৯৩৩ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও জেহল (Jehol) অধিকার করিয়া ফেলে। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের এই সাফল্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান। চীন তখনই বুঝিয়াছিল যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে নিঃস্বার্থ সহায়ক কেহ নাই। শক্তিবর্গের বিশ্বাস ছিল যে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর বিরত হইবে। সত্য সত্যই তখন মাঞ্চুরিয়া ও জেহল অধিকার করিয়াই জাপান ক্ষান্ত হইয়াছিল ও নিজ তত্ত্বাবধানে এই দেশগুলির শান্তিপূর্ণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে ("peaceful development") তৎপর হইবে এই আশ্বাস দিয়াছিল। সেই সময় হইতে এই তিন বৎসর জাপান উত্তর চীনের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগদখল করিয়া নিজেকে শক্তিমান ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আজ পুনরায় উত্তর চীনের অন্যান্য প্রদেশগুলির উপর জাপান সেই পুরাতন নীতি অনুসরণ করিতে ব্যগ্র।

উত্তর চীন লইয়া চীন ও জাপানে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতেছে। যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ লইয়া জাপান তিনবৎসর পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়া ও জেহল করতলগত করিয়াছিল, আজ তাহারই জন্য জাপান সমগ্র উত্তর চীনে অধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত। চীন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। উত্তর চীনে জাপান স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যে ব্যবস্থা করুক না কেন তাহাতে চীন গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ জাপান সহ্য করিবে না। হোপেই (Hopei) প্রদেশে জাপান নিজ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট। মিঃ এণ্টনি ইডেন (Mr. Anthony Eden) এই বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে স্বীকার করিলেও, চীন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে মোটেই আশ্বস্ত না হইয়া জাপানকে বাধা দিতে কিম্বা নিজেই কোন মিটমাট করিতে মনস্থ।

চীন গত কয় বৎসরের অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয় গত মহাযুদ্ধের সময় কোন খ্যাতনামা জাপানী সামরিক নেতা বলিয়াছিলেন, "When China realises that she can get no help against Japan, she will fall into our arms"। এই অভিজ্ঞতার জন্যই বোধ হয় চীন গভর্ণমেণ্ট জাপানের কতকগুলি স্বার্থ মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। জাপান তাহার অভিপ্রায় এইরূপে সিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের অক্ষমতা জাপানকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। জাপানের স্পষ্টবাদিতার উত্তরে মহাশক্তিবর্গ কেবলমাত্র শান্তিকামনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে; কিন্তু জাপান চীনে নিজ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দৃঢ় চিত্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। আজ উত্তর চীনে চীন ও জাপানে যে সংঘর্ষ তাহা সেই জন্য অবশ্যম্ভাবী।

জাপসাম্রাজ্যবাদে রাশিয়ার ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক। মাঞ্চুরিয়া ও জেহল অধিকার করিয়া, ও চীনের পূর্ব্ব রেলপথ (Chinese Eastern Railway) নিজ তত্ত্বাবধানে আনিয়া জাপান রুষ সীমান্তে প্রবল পরাক্রমে অগ্রসর হইতে পারে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই জন্যই জাপান বিস্তৃতভাবে সামরিক রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত। পূর্ব্ব সাইবেরিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ও ইহাকে জাপানের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাশিয়া জাপ-সাম্রাজ্যবাদে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের অভিপ্রায়ে সন্দিগ্ধ। প্রশান্ত মহাসাগরেই (The Pacific) আমেরিকার স্বার্থ বিজড়িত। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত উপকূলে আমেরিকার বাণিজ্যসমাগম; এখানেই আমেরিকার অধিকৃত হাওয়াই দ্বীপ (Hawaii) অবস্থিত। ফিলিপাইন (The Philippines) হইতে আমেরিকা সরিয়া দাঁড়াইলেও ইহাতে জাপ-আধিপত্য আমেরিকা কখনই সহ্য করিবে না। জাপ-আধিপত্যের ফলে দক্ষিণ আমেরিকার কিয়দংশ বিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। সেই জন্যই চীনের স্বাধীনতা রক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি (Open Door policy) আমেরিকার নিকট বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন (President Theodore Roosevelt) যে, "...The importance of the Pacific is destined to outrank that of the Atlantic."

চীনে গ্রেট-বৃটেনের স্বার্থ কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হংকং

(Hong-Kong), ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের (South Sea Islands) কথা বাদ দিলেও, চীনে ইংরাজের লৌহ, কার্পাস ও পশমী বস্ত্রাদির বিস্তৃত বাণিজ্য-ক্ষেত্র। চীনে ইংরাজের প্রচুর মূলধন ও নৌবহর খাটিতেছে,—চীনে জাপ-আধিপত্য বিস্তার লাভ করিলে বৃটেনের অর্থনৈতিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে জাপান সুদূর প্রাচ্যে বৃটেনের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে।

এইরূপ স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও কোন মহাশক্তি জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রেট বৃটেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, রাশিয়া একক জাপানের সম্মুখীন হইতে সম্ভবতঃ ইচ্ছুক নয়, আমেরিকার বিপদও একান্ত আসন্ন নয় ও সর্ব্বোপরি ইউরোপীয় সমস্যা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্ত শক্তিবর্গের সংশয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সুদূর প্রাচ্যে দুর্দ্ধর্ষ জাপানের সাম্রাজ্যবাদে বাধা না থাকিবারই কথা। সেই জন্যই জাপানের মৌখিক আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শক্তিবর্গ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত ১৯২২ সালে ওয়াশিংটন বৈঠকে একটি নৌচুক্তির উদ্ভব হয় (Naval Treaty) ও ১৯৩০ সালের লণ্ডন নৌ-বৈঠকে (London Naval Conference) সেই চুক্তি পুনরায় সমর্থিত হয়। গত ১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে ও নূতন চুক্তির আলোচনা চলিতেছে। এই সময়েই নয়টি শক্তির মধ্যে আর একটি চুক্তির উদ্ভব হয় (Nine Power Pact)—ইহাতে শক্তিবর্গ চীন দেশ ও তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ১৯৩০ সালের লণ্ডন বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদী ও পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান নৌচুক্তির মৌখিক বিরুদ্ধতা করিয়াছিল ও কার্য্যতঃ মাঞ্চুরিয়ায় হস্তক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। উপরন্তু উত্ত-রোত্তর সমস্ত চীনে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার ফলে চীনে অন্যান্য শক্তির সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। জাপান অবশ্য বলে যে রাশিয়ার আক্রমণ হইতে এবং চীনে জাপানের প্রতিকূল আন্দোলনের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই তাহাকে মাঞ্চুরিয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। চীনে জাপানের অভিপ্রায়ের ফলে সকল শক্তিরই অল্পবিস্তর বাণিজ্যে ক্ষতি হইয়াছে। জাপানও এই সুযোগে পূর্ব্ব এসিয়ায় দায়িত্বের দোহাই দিয়া নিজ নৌবহর বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই দায়িত্বগ্রহণ জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

সম্প্রতি উত্তর-চীনে চীন ও জাপানে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাও জাপানের বৈদেশিক নীতির ফল। হোপেই ও চাহারের লৌহ-খনি, শান্‌সির কয়লা-খনি, হোপেই-র লবণক্ষেত্র ও সর্ব্বোপরি উত্তরচীনের কার্পাসশিল্প—এগুলি জাপান নিজ আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ করিতেছে। সেই জন্যই উত্তর চীনের প্রদেশগুলিতে নানকিং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের স্থলে জাপানের কর্ত্তৃত্ব অধিষ্ঠিত করা হইতেছে। উত্তর চীনের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ নানকিং গভর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া জাপানের সর্ত্তগুলি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জাপান দাবী করিয়াছে যে জাপানের অপ্রীতিভাজন চীনা কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে, জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করিতে হইবে ও চীনা স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তক জাপান নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে। সর্ত্তগুলি স্বাধীন দেশের পক্ষে অসম্মানজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু একক চীনের পক্ষে জাপানকে বাধা দেওয়া সুকঠিন। শক্তিবর্গ নিঃস্বার্থ-ভাবে চীনকে সাহায্য করিবে না, কারণ মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারেও করে নাই, উপরন্তু তাহারা আপন আপন সাম্রাজ্য ও স্বার্থ বাঁচাইতে তৎপর। দুর্ব্বল চীনের পক্ষে জাপানকে বাধা দেওয়ার পরিণামে নানকিং গভর্ণমেণ্টের পতন হওয়াও অসম্ভব নয়। সেই জন্যই মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে নানকিং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা জেনারেল চাং-কাই-শেক (General Chiang Kai-shek) জাপানের আপ্রাণ বিরোধিতা করেন নাই। বর্ত্তমান বিরোধেও সেই বিপদসমূহ বিদ্যমান। অন্যদিকে ইন্দোচীনে ফরাসীর আধিপত্য প্রসার লাভ করিয়াছে ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে বিশেষতঃ ইউনান (Yunnan) প্রদেশে ফরাসীর স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। তিব্বত ও বার্ম্মায় ইংরাজের স্বার্থ রহিয়াছে। এইরূপে দেশের চতুষ্পার্শ্বে ও অভ্যন্তরে বৈদেশিক স্বার্থে জর্জ্জরিত হইয়া চীন একমাত্র জাপানকেই দোষী করিতে পারে না বা করে নাই। সেই জন্যই এডগার স্নো (Edgar Snow) তাঁহার "Far Eastern Front" পুস্তকে বলেন যে, "Certain circumstances seem to suggest that Chiang and the Japanese general staff for sometime have understood each other"। জাপানও এই সমস্ত বৈদেশিক স্বার্থের সম্মুখে নিঃশব্দে থাকিতে পারে না, অবশ্য সেইজন্য ইহাও সত্য নয় যে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা ন্যায়সঙ্গত।

চীনে দায়িত্বের নজীর দেখাইয়া জাপান সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দাবী সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে। জাপানের দায়িত্ব গ্রহণ যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তাহা হইলে তাহার

শক্তিরও প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, "A country, in order to wage war successfully in Manchuria, must possess an army as strong as that of Germany and a navy as strong as that of Britain"। ইহার উপর আজ আবার জাপানকে উত্তরচীনে স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইতেছে, সুতরাং জাপানের শক্তিবৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

চীনের আজ এই বহুমুখী সমস্যা বিভিন্ন স্বার্থসংঘাতে উদ্ভূত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সাহায্য বা সহানুভূতি চীনসমস্যা সমাধানে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপে যে সাম্রাজ্যলিপ্সার কল্লোল প্রবাহিত সুদূর প্রাচ্যে তাহার প্রতিধ্বনি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বৃটেনের পালেষ্টাইন-নীতি, ইটালীর আবিসীনীয় নীতি ও জার্ম্মানীর উপনিবেশ দাবী, জাপানের চীন-নীতি অপেক্ষা কোন অংশে কম গুরুতর নয়। চীনে জাপানের "hands-off policy" অন্যান্য শক্তির নিকট বিশ্বাসভঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে—কিন্তু বহুপূর্ব্বেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে "Monroe Doctrine"-এ এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এ সম্বন্ধে যে অজ্ঞ নয় তাহার প্রমাণ তাহাদের কার্য্যাবলীতেই পাওয়া যায়। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় হস্তক্ষেপ করিলে চীন সর্ব্বান্তঃকরণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) উপর নির্ভর করিয়াছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ, চীনকে সাহায্য করা দূরের কথা, ১৯৩৪ সালে সঙ্ঘের কাউন্সিলে (League Council) চীনের স্থানে তুরস্ককে (Turkey) নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ইহাতে কাউন্সিলে সুদূর প্রাচ্যের কোন প্রতিনিধি রহিল না এবং ইহাও প্রমাণিত হইয়া গেল যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইউরোপের বাহিরের কোন সমস্যায় মনোনিবেশ করিতে অনিচ্ছুক ও জাপানের আচরণে সঙ্ঘ বিশেষ বিচলিত হয় নাই। এই ঘটনার পর সুদূর প্রাচ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর কোন আস্থাই রাখে না ও রাখিবার কোন কারণ নাই। লণ্ডনস্থ চীন প্রতিনিধি মিঃ কুয়ো টাইচি (Quo Tai-chi) সত্যই বলিয়াছেন যে, "This vote against us is the League's loss, not China's."

চীন-জাপান সমস্যার সমাধান করা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিম্বা কোন বিশেষ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র চীনই কোনদিন ইহার প্রতিকার করিতে পারে। জগতে সাম্রাজ্যলিপ্সার অবসান ও সাম্রাজ্যবিরোধী মতবাদের প্রসার ব্যতীত জাপান কিম্বা সাম্রাজ্যবাদী কোন শক্তিকেই সংযত করা সম্ভব নয়। শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

কীট

"দস্যু···দস্যু—তুমি আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেচ, কীটের মতো সংগোপনে এসে তুমি আমার বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস ক'রেচ—আমাকে পথের ভিখারী ক'রেচ! দস্যু···শত্রু কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি।"

আর্ত্তকণ্ঠের এবম্বিধ একটা চীৎকারে বিরাজ বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন একটার কম নয়। এ হেন সময়ে এই রকম একটা চীৎকার শুনে তাঁর মতন শান্তিপ্রিয় লোকের যে কতখানি আতঙ্ক মনের ভিতরে হ'তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। বয়সে তিনি প্রাচীন এবং অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ্। সম্প্রতি তিনি এই পাড়ায় নতুন আসচেন। তাঁর মত ভীরু প্রকৃতির লোক প্রথম রাত্রির এই ব্যাপারেই ভয়ঙ্কর বিচলিত হ'য়ে উঠলেন।

তিনি ভয়ে ভয়ে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে ব্যাপারটা একটু বোঝবার চেষ্টা ক'রলেন কিন্তু আর কোনো রকম সাড়া শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না—ঘুমন্ত নগরী গহন রাত্রির কোলে শুধু ঝিম্ ঝিম্ ক'রচে, এক ফালি চাঁদ আকাশের শুভ্র মেঘ-পাহাড়ের উপরে ঝলমল ক'রচে আর অদূরের গোপনন্দিনীর বনাকীর্ণ তরঙ্গায়িত পাহাড়ের শ্রেণী কালো কালো দৈত্যের মতো যেন তাঁর দিকেই ভ্রূকুটি ক'রে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই দিকে চীৎকার!

"হাঃ হাঃ হাঃ···ক্ষমা...ক্ষমা! ক্ষমা নেই"...

বিরাজবাবু আর শোনবার চেষ্টা ক'রলেন না—তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলেন। কিছুক্ষণ তিনি বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন—কি যে করা উচিত এ অবস্থায়—তিনি তা বিচার ক'রে উঠতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, কি সাংঘাতিক পাড়ায় তিনি এসে পড়েচেন! আগে জানলে কখ্খনো তিনি এ পাড়ায় বাড়ী কিনতেন না।

বিহ্বল ভাবটা যখন তাঁর কেটে গেল তখন তিনি ঘরের দরজা খুলে পাশের ঘরের রুদ্ধ দরজায় টোকা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মনো···মনো ··

ডাকের পর ডাক। ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের উত্তর এলো, যাই গো

যাই। দরজা খুলে জনৈক স্থূলোদরা প্রৌঢ়া মহিলা বেরিয়ে এলেন। নিদ্রা জড়িত কণ্ঠে বল্লেন, কী হ'লো—অতো চেঁচাচ্ছ কেন!

বড় খারাপ পাড়া এটা, বিরাজবাবু ব'ললেন, কী সব ভয়ঙ্কর কথা; শোন নি, না কি!

—কই না তো!

—তা শুনবে কেন। মনে হচ্ছে কোথায় একটা খুন হ'লো। খোকাকে ডাকি থামো। বিরাজবাবু দ্রুতপদে ছেলেকে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। একটা কোণের ঘরের রুদ্ধ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলেন, তমাল···তমাল—ওঠ না একবার। ঘুমুলে কিছুই খেয়াল থাকেনা দেখচি তোদের।···

তমাল বি-এ পড়ে, নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়—বয়েস হ'য়েচে। প্রাচীন পিতার একমাত্র পুত্র হ'য়ে সব সুখ দুঃখের তার ভাগ নেওয়া প্রয়োজন। এটা সে নিজেও বোঝে। তাই এতো রাত্রে পিতার কম্পিত কণ্ঠের আহ্বানে সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস ক'রলো, ডাকছিলেন আমাকে?

বিরাজবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ। কি বিশ্রী পাড়াতেই বাড়ী পছন্দ করলি বল তো! কালই বাড়ী বদলাও।

—কেন, হ'লো কী?

—কেন, তুইও শুনিস্‌নি নাকি! কি সব ছেলে বাপু তোরা। যে চেঁচামেচি, মনে হ'চ্ছে—কোথায় কাছা-কাছি একটা খুন হ'লো। দরকার নেই অতো সবে—কালই বাড়ী বদলাও।

কিন্তু বাড়ী বদলাতে আর হ'লো না। অনুসন্ধানে জানা গেল: পাশাপাশি কেন--সারা সহরের মধ্যেই সাতদিনের ভেতরে কোনো রকম খুন-জখম হয়নি। সম্প্রতি এই পাড়াতে থিয়েটার হবে—তারই আয়োজন চলচে এবং যিনি নায়কের চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন তিনি আজ পনেরো দিন যাবৎ নিশীথ গভীর রাত্রে ষ্টেজ্‌ফ্রীর জন্য এবম্বিধ চীৎকার ক'রে থাকেন।

ভীরু বিরাজবাবু সাময়িক ভাবে আশ্বস্ত হ'লেন বটে, তাহ'লেও তিনি নতুন জায়গায় বসবাসের জন্য শঙ্কিত সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে মেলে রাখলেন।

বিশেষ ক'রে তাঁর মতো প্রকৃতির লোকের যথেষ্ট শঙ্কিত হবার কারণ আছে।

সম্প্রতি মাস কয়েক মাত্র হ'লো সহর থেকে সামরিক আইনটা উঠে গিয়েছে—কারণ সন্ত্রাসবাদীদের কোনো সাড়া-শব্দ আজ কাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। তা হ'লেও তিনি সরকারের মতো আশ্বস্ত নিঃশঙ্কচিত্ত হ'তে পারেন নি। আজ অবসর-প্রাপ্ত হ'লেও একদা তিনি সরকারের লোক ছিলেন—এবং এই জন্যে লুক্কায়িত দুর্দ্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর ওপরেও যে জুলুম অথবা ভয়ঙ্কর একটা কিছু ক'রে ফেলবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই জন্য সব সময়েই তাঁর ভীরু পদসঞ্চারণ।

কিন্তু মরণাপন্ন সহরটা যেন আবার বেঁচে উঠেচে। একটা বিষাক্ত কীট যেন এতোদিন তার বুকের ওপর বসে জীবনীশক্তি রক্তের সঙ্গে চুষে খাচ্ছিল—এতোদিন পরে যেন সহরটা মুক্তি পেয়েচে তার কাছ থেকে—নিষ্কৃতি পেয়েচে। ছ'টার পর পথে লোক চলাচল ছিল না, চল্লিশবছরের প্রৌঢ়েরও আতঙ্কের সীমা ছিল না এতোদিন, যে সব যুবকদের কার্ড ছিল, তাদের রং লাল, নীল অথবা সাদাই হোক না কেন—আতঙ্ক ছিল সব সমান। ধূসর গোধূলির মলিন ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরটা ঝিমিয়ে পড়তো···নীরব নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরে সোজা বুকে এসে ঘা দিত অশ্বারোহী দু-একটা সার্জ্জেন্টের ঘোড়ার খুরের শব্দ···শিশুর ক্রন্দন মাত্র দু এক মুহূর্ত্তের জন্যে শোনা যেত—ভোর সাতটা পর্য্যন্ত একাধিপত্য ক'রতো এই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। রাত্রে প্রহরীদেরা একট হুইসিলের শব্দ অথবা হাঁক-ডাক শুনলেই সকলে ভাবতো—সন্ত্রাসবাদীদের একটা দল বুঝি ধরা পড়লো—অথবা হয়তো লড়াই হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে তৈরী হ'য়ে থাকতো ঘর খানা-তল্লাসীর অজুহাতে সীপাইদের আগমন আর অত্যাচারের জন্য।

এখন যেন সহরটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলচে। গোপনন্দিনীর পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে যে রাঙামাটির পথটা উপর দিকে উঠে গিয়েছে সেই পথের ওপরে ছোট ছোট সচঞ্চল তরুণ তরুণীর দল—মুক্তির সহজ আনন্দে ঝলমল ক'রচে তাদের কথা, তাদের হাসি, তাদের মুখ। বুকভরা চর কংসাবতী···দু'কূল ভরা এতোদিনের অখণ্ড নরবতা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাচ্ছে হালকা হাসিতে···ওপাশের ভাঙা বাঁশের সাঁকোটা নতুক ক'রে আবার তৈরী হ'য়েচে।

বিরাজবাবু বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে এই নাগরিক চঞ্চলতা দেখছিলেন এবং মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠছিলেন ভয়ঙ্কর। এমন সময়ে স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ব'ললেন, দেখ্‌চ মনো—এদের ব্যাপার।

—কেন, কি হ'লো।

মুক্তির ব্যবহার এরা জানেনা। বিরাজবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন; এই সব ছেলে ছোকরাদের দল বেপরোয়া ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—গভর্ণমেণ্টের চোখে এসব তো সন্দেহজনক হ'তে পারে! এই দেখ না ওই দলটা, ফিস্ ফিস্ করে কী তোদের অতো কথা বাপু—কেন, জোরে কথা কইতে পারে না! সহরের সব··· সব ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েচে, সবগুলো সন্ত্রাসবাদী। হাত-পা বাঁধা হয়ে ঘরের মধ্যে চুপ-চাপ বসে থাকতে এদের ভালো লাগে।

স্ত্রী হেসে ব'ললেন, অদ্ভুত লোক তুমি—কি যে বলো!

বিরাজবাবু মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, ঠিক ব'লচি আমি মনো—ঠিক ব'লচি। তমালকে বলে দিও—এদের কারুর সঙ্গে যেন মেশা-মেশি না করে, ভয়ঙ্কর লোক এরা বাপু। সে কোথায়—তাকে দেখচিনে কেন?

স্ত্রী বললেন, কলেজ থেকে এসেই তো সে কোথায় বেরিয়ে গেলো।

সর্ব্বনাশ! বিরাজবাবু ধপ্ করে পাশের আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। নিতান্ত হতাশ কণ্ঠে বললেন, কোথায় গেল সে! নিশ্চয় সে এদের কারুর সঙ্গে মেশা-মিশি সুরু করেচে। না না মনো, এসব ভালো কথা নয়—বারণ ক'রে দিও তাকে। নিতান্তই যদি বেড়াবার ইচ্ছে থাকে তো যেন একা একা যায়। কিন্তু না বেরোনোই আমার মতে চার দিক দিয়ে ভালো।

স্ত্রী রেগে উঠলেন এবার—বললেন, কী লোক তুমি! জগৎশুদ্ধ সবাইকে তোমার অবিশ্বাস! বিকেলের দিকে বাইরে বাইরে একটু না বেড়ালে ভালো লাগে—না, স্বাস্থ্য থাকে! আমি কাল থেকে বেরোব—দেখি···

হতাশ হ'য়ে বিরাজবাবু বললেন, বুড়ো বয়সে কেন আর আমার দুশ্চিন্তা বাড়াও তোমরা মনো! তোমাদের ভালোর জন্যই আমি বলেচি। বেশ তো, স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করচো—বাড়ীতে ব্যায়াম ক'রোনা কেন! সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো।

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ—একে গতর নিয়ে নড়তে পারিনে, বাতের ব্যামো—বুড় বয়সে ব্যায়াম করবো বৈকী। কথার ছিরি···

বিরাজবাবু কলহের সূত্রপাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা বেশ বেশ—ব্যায়াম তোমাদের করতে হবে না। একটা মোটর না হয় কিনবো—সন্ধ্যে নাগাদ্ যতো খুসী ঘুরে বেড়িয়ো। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে মনো, বাড়ী থেকে

বেরিয়ে তোমরা কোথাও থাম্‌বে না বা কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পাবে না। যতো তেল খরচা হয় আমার হবে।

তমালকে ঘরে আটকাবার জন্যে বিরাট লাইব্রেরী ছিল ঘরে, ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল—শেষ পর্য্যন্ত মোটর এলো কিন্তু তমাল এসব চায় না—খোঁজে সে জীবনের মানে। এতো আয়োজনের মাঝখানে, এতো স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝখানে—জীবন যেন তার বিষাক্ত হয়ে ওঠে—দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে জীবন, কী,কী সে চায়— এর হদিস্ আজও সে পেলো না।

এ পাড়ায় এসে সে লক্ষ্য করচে, রাত প্রায় আট-টা নটার সময় একটা অন্ধ গান ক'রতে ক'রতে ঠিক তার পড়বার ঘরের নীচে দিয়ে ভিক্ষে চেয়ে যায়। তার দুরবস্থা, তার ব্যাকুল মিনতি সাগর ঢেউয়ের মতো বার বার লুটে পড়ে তার গানের তটে···

সে অন্ধ। তার দুঃখ সে বোঝাতে পারবে না ভাষায়—কেউ বুঝবেও না হয়তো। তাকে সকলে দয়া করো, সাহায্য করো—এই অন্ধকার বীভৎস রাত্রে তার নিপীড়িত ভবঘুরে জীবন নিয়ে অন্ধ সে পথ চলেচে একা।

কোন্ অজ্ঞাত কবির রচিত এই গানখানি—তমাল জানে না। এই গানের মর্ম্মার্থ গ্রহণ ক'রে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ভাবে—এইটাই কী জীবন! তমাল তার চার পাশের অপর্য্যাপ্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে চায় না—যেখানের জন্য সে লুব্ধ সেখানেও তো অসন্তোষের বীভৎস হাসি!

তমালের দর্শনবিলাস মায়ের প্রবেশে ভেঙে গেল। মা বললেন, খোকা—খাবি আয়। আজ বিকেলে তো খেয়ে বেরোস নি। আয় উঠে···

মা চলে যাচ্ছিলেন—তমাল পেছনে বলে উঠলো, জীবনটাকে আমার মাটি করে দিচ্ছ তোমরা।

মা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা পাগলা ছেলে তো! যখন তখন তুই ওই কথা বলিস—কেন বলতো? কি করলুম আমরা তোর?

তমাল এর উত্তর দিতে জানে না।

মা বললেন, যা তোর খুসী হচ্ছে, তাই তুই করচিস্। তবু···

তমাল মৃদু উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, চাইনে এসব আমি। একটা অন্ধ কী বিশ্রী গান করে যায়—শুনেচ মা! বিশ্রী!…ও ভিখিরী হয়ে ওর যা অভাব—আমার যেন তাই।

মা বলতে যাচ্ছিলেনঃ তোর ও সব পাগলামি বুঝিনে আমি—কিন্তু এই সময়ে বিরাজবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করায় তিনি চুপ করে গেলেন। বিরাজবাবু তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কি বলছিলি যেন না তমাল! ওসব সাংঘাতিক কথা শিখলি কোত্থেকে! বার বার তোকে বলেচি—এই বিশ্রী সহরের কারুর সঙ্গে মিশবিনে, কোনো সভা-সমিতিতে না। ক্যমুনিষ্টদের মতবাদ বড়ো সাংঘাতিক জিনিষ—সরকারের চোখে পড়লে…বুড়ো বয়সের পেনসন্‌টা কেন তোরা মারতে চাস্ বাপু।…

অন্ধ ভিখিরীটা তমালের জীবনকে উত্যক্ত করে তুলেচে। তার চিন্তাধারার সঙ্গে সাম্যবাদের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না সে কোনোদিন ভেবে দেখেনি, তবে সে ভেবে দেখেচে, জীবন তার দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়।

নিত্যকারের মতো অন্ধটা সেদিন গান গেয়ে গেয়ে যাচ্ছিল, তমাল প্রত্যহের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। অন্ধটা যখন ঠিক তাদের বাড়ীর ফটকের কাছে এসেছে তখন কে একটা জোয়ান মতো লোক এগিয়ে এলো তার দিকে—বিশ্রী দুর্দ্ধর্ষতা তার আকৃতিতে।

লোকটা অন্ধটার কাছে এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরতে অন্ধটা আতঙ্কে বলে উঠলো, কে!…

লোকটা নীচু গলায় তার হাতে চাপ দিয়ে বললো, চেঁচাস্‌নে—আমি। কতো হয়েচে আজ—বের কর।

অন্ধটা ট্যাঁক থেকে ছটা পয়সা যেন অভ্যাস মতো বের করে তার হাতে তুলে দিল। লোকটা দৃঢ় কণ্ঠে বললো, আজ এতো কম যে। এক পাড়াতেই রোজ ঘুরে মরিস্ কেন? সারা দিন রাতে এই রোজগার করলে খাবি কোত্থেকে? সঙ্গে সঙ্গে একটা সক্রোধ চপেটাঘাত।

অন্ধটার চোখের কোণ বেয়ে জলের ফোঁটা ঝরতে সুরু করেছিল কি না তমাল তা অন্ধকারে ঠিক দেখতে পেলে না। সে শুধু দেখলে—অন্ধটা কোত্থেকে আরো দুটো পয়সা বের করে লোকটাকে দিল। পয়সা পেয়ে লোকটা নির্ব্বিকার ভাবে

চলে যাচ্ছিল—অন্ধটা পেছন থেকে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, কিছু খাইনি আজ সারা-দিন—ছুটো পয়সার মুড়ি এনে দাও আমাকে।

কোনো উত্তর এলো না—লোকটা তখন চলে গিয়েছে। অন্ধটা অস্ফুট কণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়ে আবার তার মর্ম্মন্তুদ গান সুরু করলো।

তমাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সবটুকু, তারপর তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধটার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে ডেকে বললো, এই—শোন।

কে বাবা—আমাকে ডাকচ? অন্ধটা গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

তমাল বললো, হ্যাঁ। ও লোকটা কে? ও তোর পয়সা কেড়ে নিয়ে গেল কেন?

অন্ধ বিরক্ত হয়ে বললো, ও, ওই শালা তো? বজ্জাতের ধাড়ী বাবু। বেইমান আমার পয়সায় তাড়ি গিল্‌বে আর আমাকেই খেতে দেবে না।

তমাল প্রবল কৌতূহল নিয়ে শুনলো অন্ধটার হতচ্ছাড়া জীবনেতিহাস। ওই যে লোকটা, ওরই আশ্রয়ে থাকে এই অন্ধটা। কোনো দিন ডেকে নিয়ে গিয়ে ছুটি ভাত দেয়, কোনোদিন দেয় না—তবে পয়সাগুলো কেড়ে নিয়ে যেতে কোনো দিন ভুল করে না।

উপসংহারে অন্ধটা বললো, শালা গাঁটকাটা আজ আমাকে এমনি বিশটা বচ্ছর ভোগা দিয়ে আসচে বাবু।

তমাল জিজ্ঞেস করলো, তোর আগে দেশ ছিল কোথা?

—কিচ্ছু জানিনে বাবু, কে বাপ-মা কোথায় দেশ—কিচ্ছু জানি নে।

যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েচে—সেদিন থেকে এম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা পয়সা দেবে বাবু?

—দেবো, আয় আমার সঙ্গে।

অন্ধটাকে দেখে বিরাজ বাবু নিয়মিত সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে লোকটা বাস্তবিকই অন্ধ নয় বরং ছদ্মবেশী কোনো ভয়ঙ্কর লোক হতে পারে; অতএব ওকে দূর করাই প্রয়োজন এবং এই জন্য একদিন তমালের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্ধটার ওপর ধম্‌কা-ধম্‌কিও করেছিলেন। কিন্তু বিরাজ বাবুর কোটি ভয় প্রদর্শনেও অন্ধটা

কোনো রকমে চোখ মেলে তাকাতে সক্ষম হয় নি, অধিকন্তু নিরপরাধ বেচারীর ওপরে ভয় প্রদর্শনের জন্য তমাল নিতান্ত বিরক্ত হয়ে জানিয়েছিল, সাবাই মিলে জীবনটাকে মাটি করে দিচ্ছে আমার। এ বাড়ী ছেড়ে নিতান্তই দেখছি এবার আমাকে হোষ্টেলে গিয়ে উঠতে হবে।

বিরাজ বাবু ভয়ে কোনো দিন আর কিছু বলতে সাহস পান নি।

অন্ধটা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতো, তার দুর্ভাগা জীবনে বিধাতার এ কী রকমের প্রচণ্ড কৌতুক! তমালের সাদর লক্ষ্যের মাঝখানে হঠাৎ তার আশ্রয় লাভ—এ সৌভাগ্য সে নিজের বিগত জীবনের সঙ্গে কোনো রকমে মিলিয়ে উঠতে পারে না। সে কেবল বুঝতে পারে, কোনো একটি সহৃদয় লোকের আশ্রয়ে সে আছে। কোনো একটা বাড়ীর নীচের তলার কোণের ঘরে তার আস্তানা।

বিরাজবাবু অন্ধটাকে লক্ষ্য করে স্ত্রীকে বললেন, দেখো দিকি মনো—তমালের কাণ্ড! কোথাকার কে একটা—তাকে এনে ঘরে ঢোকানো! কোন্‌দিক দিয়ে কি বিপদ আসবে তার ঠিক কী!

স্ত্রী উত্তর দেন, তমালের স্বভাব তো জানই। দ্যাখোনা—দুদিন পরে ফের তাড়িয়ে দেবে। ওর কী ভালো লাগে না তা আমরাই আজও বুঝলুম না।···

কথাটা সত্যি। তমাল যে কী চায় আর কী চায় না—তার কোনো স্থিরতা নেই। নতুন জিনিষ দুদিনে পুরানো হয়ে যায়—বিরক্ত ভাবে বলে, এ আমার জীবন দুর্ব্বিষহ ক'রে দিচ্ছে। তার এই অস্থিরতা চরম করে বোঝাবার জন্যে যেন সে এই অন্ধ ভিক্ষুকটাকে একবার আশ্রয় দিয়ে আবার তাড়িয়ে দিল একদিন।

গোধূলির ধূসর ছায়া নেমে আসছিল তখন। তমাল কলেজ থেকে ফিরে নিয়মিত ভাবে প্রাঙ্গণে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে ছিল। অন্ধটা নিয়মিত তার পাশে বসে। উবু হয়ে বসে বসে সে ভাবছিল, যে লোকটা তাকে এমন ভাবে বসিয়ে বসিয়ে দিন দুবেলা খাওয়াচ্ছে তার জন্যে কিছু একটা করা প্রয়োজন, অন্তত তার মন যোগাবার জন্যে একটু কিছু সাহায্য করা দরকার। তাই সে ব'ললো, পা টা একটু টিপে দেবো বাবু?

তমাল উত্তর দিল গম্ভীর কণ্ঠে, না।

কতোদিন আর এমনি বসে বসে খাওয়া যায়! একটা কিছু সে করবেই। অন্ধ মৃদু কণ্ঠে বললো, কাঁহাতক আর বসে থাকি—একটা কাজ দেন বাবু।

তমাল বিরক্ত হয়ে বললো, কেন বিরক্ত কর—চুপ করে বসে থাকো।

অপ্রতিভ অন্ধ চুপ করেই বসে রইলো। তমাল হাই তুলে একটা আড়মোড়া ভেঙে বললো, নাঃ, কিছু ভালো লাগচে না।

তমাল অস্থির পদে কিছুক্ষণ পায়চারী করে বেড়াল। এমন ভাবে জবু থবু হয়ে থাকা আর ভালো লাগেনা—তারও কিছু একটা করা দরকার। এক সময়ে সে অন্ধের সামনে এসে বললো, তুমি তো গান গাইতে পারো—গাও দেখি একটা। তমাল শুয়ে পড়লো আবার আরাম কেদারায়।

অন্ধ বারকয়েক গলা ঝেড়ে গান স্বুরু করলো—সেই তার পুরানো গান, অন্ধজীবনের মর্ম্মন্তুদ গান। তমাল উত্যক্ত হয়ে উঠলো, একটা ক্রূর বিরক্তির অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো তার স্নায়ু, শিরা-উপশিরায়। তমাল বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, ফের ওই গান! জীবনটাকে আমার অস্থির করে তুলেচ একেবারে। বেরও সুমুখ থেকে—খবর্দ্দার, ফের যদি এ বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করো তো পুলিসে দেবো। বেরও…

এমন সময় জৈনক দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক ফটক খুলে ঢুকলো। তমাল তাকে সম্বর্দ্ধনা করে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে পেট ভরাবার মতো কিছু খাবারও এলো এবং নিয়ে এলো স্বয়ং মন্থরগমনা মা। অতিথি সৎকারের কোনো ত্রুটি হলো না।

হবার কথাও নয় মার একটা গোড়া থেকেই স্বভাব, তমালের যে বন্ধু, তমালকে যে ভালোবাসে এবং স্নেহ করে সে তাঁর নিজের শত শত্রু হলেও স্নেহের পাত্র। মেয়েদের ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা যে এই খাওয়ানো—মা সেটা ভালো করেই প্রমাণ করেন।

আজকের অতিথি এই অনিরুদ্ধর বেলাতেও তার ত্রুটি হলো না।

আহার পর্ব্ব শেষ হবার পর মা অনিরুদ্ধর এতো দিন না আসার জন্য তাঁর বহুবিধ দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করার পর চলে গেলেন। অনিরুদ্ধ তমালকে বললো, আজ দুদিন যাওনি যে বড়ো!

তমাল উত্তর দিলে, মনটা ভালো ছিলনা তা'ছাড়া শরীরটাও সুবিধে যাচ্ছে না।

অনিরুদ্ধ হেসে বললো, মন তো তোমার কোনোদিনই ভাল থাকে না, তবে

শরীর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। তমসাও তাই বলছিল, সহরে যে রকম বসন্ত হচ্চে···একটু সাবধানে থেকো।

তার পর দু'বন্ধু বেরিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধর অপরিচিত মুখ দেখে বিরাজবাবু আঁৎকে উঠলেন। স্ত্রীকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ও কে মনো ? বাড়ীর ভিতরে ঢুকেছিল !

স্ত্রী বললেন, তমালের বন্ধু। কেন, ছাখোনি ওকে —আজ দুবছর আসচে যাচ্ছে !···

নাঃ, ডোবালে তোমরা— বিরাজবাবু হতাশ হয়ে বললেন, আমি যা পছন্দ করিনে তাই তোমরা করবে। তমালও ওর সঙ্গে গেল কোথায় ?

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন কোথায় আর—বেড়াতে গেল বোধ হয়। রোজ যেমন যায়—তেমনি গেল।

রোজ যায় ! বলো কী !—এই সন্ধ্যের সময়—বিরাজবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তবে মোটর কিনলেম কি জন্যে ? দেখতে হবে না আর—নিশ্চয়ই কোনো সংঘ-সমিতিতে নাম লিখিয়েচে। যতো করে বলি···তাছাড়া অনিরুদ্ধ না কি নাম বললে, ওর চেয়ারা দেখলেই যে ভয় লাগে গো !···

স্ত্রী রাগ করে বললেন, তোমার তো সবটাতেই ভয়। কারুর ভালো সহ্য করতে পারোনা।

যা খুসী করো তোমরা—ব'লে বিরাজবাবু ঘর থেকে রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। তার পর ফিরে এসে বললেন, শুনেছ মনো, তামাল সেই অন্ধটাকে আজ তাড়িয়ে দিয়েচে।

স্ত্রী মৃদু হেসে বললেন, তখনি বলেছিলুম না ! কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম এই অনিরুদ্ধর বেলায়। আজ দু-তিন বছর হতে গেল—এখনও ও তমালের বন্ধু ! বিরক্ত তো দূরের কথা বরং অনিরুদ্ধ এলে তমাল দেখি ভারী আনন্দ পায়, ওর আদর যত্নে সে বেচারী অস্থির হয়ে ওঠে।

বিরাজবাবু শঙ্কা-ভরা কণ্ঠে বললেন, হবে না ! একই সামিতির সভ্য হয়তো···ডোবালে তোমরা আমাকে—ডোবালে।

তমাল বই থেকে মুখ তুলে শুনলো, সেই অন্ধটা তার সেই চিরপরিচিত গান-

খানি গেয়ে যাচ্ছে। তার জন্ম কোন্ দেশে সে জানেনা—কবে, তা-ও জানে না। অন্তহীন চলার পথে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সুখ-দুঃখের গান সমান—নির্ব্বাণ নেই তার বিরাট আকাঙ্ক্ষার। হায় রে এই কী জীবন! কোন্ অদৃশ্য কীটের চক্রান্তে তার এই চক্রমণ।

তমাল ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। সে ও-পাশের বসবার ঘর থেকে বিরাজবাবুর সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল এবং আরো একটা কণ্ঠস্বর—অনিরুদ্ধর।

বিরাজবাবু জিজ্ঞেস করছেন, সন্ত্রাসবাদীদের তুমি সমর্থন করো? তাদের কোনো সমিতিতে তুমি যোগ দিয়েছ? তমাল দিয়েচে?—ইত্যাকার অদ্ভুত প্রশ্ন। অনিরুদ্ধর কাছ থেকে সবগুলোর 'না' উত্তর পেয়ে বিরাজবাবু শেষ পর্য্যন্ত খেঁকিয়ে উঠলেন, আলবৎ তোমরা ওদের সমর্থন করো। পাছে বিরাজবাবু এমন কোনো অভদ্রোচিত কথা বলে ফেলেন যাতে অনিরুদ্ধ হয়তো অপমান বোধ করতে পারে, এই জন্য সে তাড়াতাড়ি ওঘরের দিকে ছুটে গেল। তমালের বিরক্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তমালও বেরিয়ে গেল অনিরুদ্ধকে নিয়ে। রাত তখন প্রায় আটটা।

বিরাজবাবু এই অসময়ে তমালকে অনিরুদ্ধর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শুনেচেন—অনিরুদ্ধ তমালকে ডেকে নিয়ে গেল কিন্তু কোথায় নিয়ে গেল! কোথায় ওদের গুপ্তসভা আজ বসবে!

স্ত্রীর কাছে গিয়ে বিরাজবাবু অস্থির ভাবে বললেন, দেখচ তো তমালের কাণ্ডটা! আমার বুড়োবয়সের পেন্সনটা এবার গেল—নিতান্তই গেল।

স্ত্রী বিরক্ত উত্তর দিলেন, কেন, কি হলো আবার?

—গেল ওই অনিরুদ্ধটার সঙ্গে বেরিয়ে। শেষকালে আমার ছেলে কি না ঢুকলো সন্ত্রাসবাদিদের দলে!

বিরাজবাবু বিপুল বিরক্তির ভাব নিয়ে সোজা লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন। একটা আলমারী খুলে এ-বই সে-বই নাড়া-চাড়া করতে করতে একখানা নাম না লেখা বই টেনে আনলেন কৌতূহলবশত। সেটা বই নয়—বইয়ের আকারে তমালের বাঁধানো কবিতার খাতা। প্রথম পাতা উল্টোতেই প্রথম কবিতার প্রথম লাইনটা নেচে উঠলো বিরাজবাবুর উজ্জ্বল চোখের সামনে—

দেহের চঞ্চল রক্তে এলো তব আদি আবাহন।

দ্বিতীয় কবিতার তৃতীয় লাইন—

অসহ্য সুন্দর তুমি রক্তের মতন।

তৃতীয় কবিতার একটা লাইন—

রক্তাক্ত লুণ্ঠিত পশু···

কেবল রক্ত···রক্ত···রক্ত, 'হাহাকার' কথাটাও সবগুলো কবিতার মধ্যে ভয়ঙ্কর গুঁতোগুঁতি করচে। বিরাজবাবুর মাথা গরম হয়ে উঠ্‌লো, তিনি যেন চোখের সুমুখেই দেখতে পেলেন—রক্তাক্ত দেহে মাটিতে কে একজন যেন পড়ে আছে—পাশে ছোরা হাতে উত্তেজিত ভাবে তমাল দাঁড়িয়ে। বিরাজবাবু আত্মস্থ হয়ে কবিতার খাতাখানা নিয়ে দ্রুত পদে চললেন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

স্ত্রীর সুমুখে কবিতার খাতাখানা মেলে ধরে বলে উঠলেন, ছাখো, ছাখো মনো—তমালের কবিতা। ঠিক যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। কবে পুলিস ঘর খানা-তল্লাসী করবে, এই খাতাখানা হাতে পড়লে তাদের—আর কী উদ্ধার আছে ভেবেচ? বুড়ো বাপ, বুড়ো মা—তমালের সেদিকে কী খেয়াল আছে একটু! যতো সব খুনীর দলে গিয়ে মিশেচে। আবার রোজ যাওয়া চাই সেখানে, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, রাত দুপুর নেই।···পুড়িয়ে ফ্যালা উচিত খাতাখানা।

তমাল এই সময়ে সেই ঘরে ঢুকলো।

বিরাজবাবু তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই যে তমাল! এ খাতাখানা এ রকম জায়গায় রাখে না কী! কী ভয়ঙ্কর সব কথা!···যা খুসী করো তোমরা।

বিরাজবাবু দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তমাল মার কাছ থেকে আগা-গোড়া ব্যাপারটা শুনে বিরক্ত হয়ে বললো, এ বাড়ীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচি আমি। বাড়ীতে কোনো ভদ্র লোক এলে, কোনো বন্ধু-বান্ধব এলে তাকে পাঁচ রকম জিজ্ঞাসাবাদ! ভালো লাগে না আমার। এবার পালাবো যেদিকে খুসী।

পরদিন সকালের ব্যাপার।

তমাল নেই।

বেলা একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বেড়ে আবার কমতে সুরু করেচে—তমাল তবু ফিরলো না। মা ভয়ানক উতলা, বিরাজবাবু দুঃখে ও ক্ষোভে ঘর-বার করচেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পেরেচেন, তমাল সোজা সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডাতেই গিয়ে উঠেচে, আর কোনো সন্দেহ নেই। তমাল বোধ করি আর ফিরবে না।

বিরাজবাবু ভারাক্রান্ত মনে বাইরের ঘরে বসেছিলেন। ঘরের কোণে কোণে ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার জমে আসছিল। এক সময়ে চাকর এসে টেব্‌লের আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেল। বিরাজবাবুর লক্ষ্য পড়লো টেব্‌লের ওপরে একখানা লাল কার্ডের ওপর। পাড়ায় থিয়েটার হবে, তারই নিমন্ত্রণ লিপি, মাস ছয়েক ধরে ওদের ভীতিপ্রদ রিহার্সাল চলচে! তমালের যাওয়ার কথা ছিল। বিগত সন্ধ্যায় বিরাজবাবুর সেই ভয়ের উল্লেখ করে মা ও ছেলের মধ্যে কতো হাসা-হাসি, কিন্তু তমাল আজ কোথায়।…কতো দূরে! বিরাজবাবুর স্নেহাতুর চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরই মতো এক প্রাচীন ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। বিরাজবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এইটা কী বিরাজবাবুর বাড়ী?

—হ্যাঁ, কাকে চাই আপনার?

—বিরাজবাবুকে। তাঁর সঙ্গে কী এখন দেখা হবে?

—আমিই বিরাজ। কেন বলুন তো?

—তমাল আপনারই ছেলে তো। তিনি বাড়ীতে আছেন কী?

বিরাজবাবু উঠে দাঁড়ালেন, কণ্ঠে প্রবল ঔৎসুক্য ঢেলে জিজ্ঞেস করলেন, জানেন তার খবর আপনি? সকাল থেকে সে বেরিয়েচে কোথায়, এখনো ফেরেনি।

হুঁ। থাকবার কথাও নয়—আগন্তুক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মুখ নীচু করলেন।

বিরাজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তার কোনো খবর জানেন আপনি।

আগন্তুক মন্থর কণ্ঠে বললেন, সে এখন কোথায় তা জানিনে, বোধ করি এ সহরের মধ্যেই নেই—দূরে কোথাও চলে গিয়েচে। আমার মেয়ে তমসাও তার সঙ্গে গিয়েচে।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে যা বর্ণনা করে গেলেন তার সারাংশটা প্রেম-সম্পর্কিত একটা ঘটনা। তমাল আগন্তুকের মেয়ে তমসাকে ভালোবাসতো এবং তাই তমাল

একদিন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তমসার পাণিপ্রার্থনা করে। কিন্তু বৃদ্ধ রাজী হতে পারেন নি—কারণ বারীদ্ রায়—আই, সি, এস-এর সঙ্গে তিনি তমসার সম্বন্ধ একরকম পাকা করেই ফেলেছিলেন। সেই মতো বারীদ কাল সন্ধ্যায় একেবারে এনগেজ-মেণ্ট রিং নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু এদিকে তমসা তমালের সঙ্গে চলে গিয়েচে, সকাল থেকে দেখা নেই।

আগন্তুক শেষ কালে বললেন, ওরা পরস্পরকে যে এতো ভালোবাসে তা জানতুম না। আমার ছেলে অনিরুদ্ধ আগা-গোড়া সবটাই জানতো কিন্তু এতোদিন আমাকে কিছু জানায় নি। জানলে আমি গোড়াতেই বারীদকে সব জানিয়ে ফিরিয়ে দিতাম।

বিরাজবাবু কোনো রকমে তমালের এই ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, তমাল রোজ কী এই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই যেতো! অথচ তিনি ভাবতেন…অসম্ভব, সে সন্ত্রাসবাদীদের দলেই গিয়েচে। কিন্তু অনিরুদ্ধ নামটা সব গোলমাল করে দিল। তার অনেক দিনের অনেক যাওয়া-আসা আজ নতুনতর অর্থের সৃষ্টি করলো।

আগন্তুক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে টেব্‌লের ওপরে রেখে বললেন, এই তাদের দুজনার চিঠি—আশীর্ব্বাদ চেয়ে গিয়েচে।

বিরাজবাবু চিঠিটায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো। টেব্‌লের ওপরে একটা ঘুষি মেরে বললেন, এর আগে তার মরণ হলো না কেন!

ইত্যবসরে ঘুষির ধাক্কায় টেব্‌লের আলোটা নিভে গিয়েছিল। চার পাশ থেকে অন্ধকার ছুটে এলো ঘরের মধ্যে। সেই থম্‌থমে অন্ধকারে দুই প্রাচীন মূর্ত্তি মুখোমুখি বসে।

বিরাজবাবুর চিন্তাধারা ধরে তাঁর পরিচিত সেই একদা শঙ্কান্বিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—

"দস্যু দস্যু—তুমি আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেচ, কীটের মতো সংগোপনে এসে তুমি আমার বিশাল সাম্রাজ্য গ্রাস করেচ—আমাকে পথের ভিখারী করেচ! দস্যু…শত্রু---কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি।"

থিয়েটার জমে উঠেচে।

শ্রীসুশীল জানা

নবযুগ

বীণার তারটা গেল ছিঁড়ে।
ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ,
নিত্যই ত ঘটে,
আবার নতুন তার চড়ে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ওল্‌ট্‌ পাল্‌ট্‌।
বৃদ্ধ রাজা গেছেন মারা,
এবং সেই সঙ্গে ওস্তাদ্‌জি হলেন
বরখাস্ত।

একবস্ত্রে তিনি বেরিয়ে এলেন
বীণাটি হাতে নিয়ে।
যুবরাজ এখন্‌ সিংহাসনে,
রইল পড়ে তাঁর তাচ্ছিল্যের নগদ বিদায়।

জ্যোৎস্নারাত্রি।
বীণকার বাজাচ্ছেন বেহাগ
কুটীরের প্রাঙ্গণে ব'সে,
শুন্‌ছে কেবল স্তব্ধ শর্ব্বরী।

এমন সময়ে—
পট্‌ করে জোয়ারি তারটি গেল ছিঁড়ে।
তরফের তারগুলো
শিউরে উঠ্‌ল কেঁপে।

দূরে রাজবাড়ীতে গ্রামোফোনে বাজছে
---জ্যাজ্‌।

সেই সঙ্গে চলছে পাশ্চাত্য নৃত্য
এবং আবসরিক মদ্যপান।

... ...

জ্যোৎস্নারাত্রি যেন এল নেমে
রাজকুমারীর মূর্ত্তিতে।
ওস্তাদ্‌জিকে প্রণাম করে বল্‌লে,
চলুন আমার সঙ্গে, ফিরে যাচ্ছি শ্বশুর বাড়ী।

মৃত অতীতের শ্মশানবহ্নি
এমনি করেই জ্বালে
নূতন যুগের বরণ-প্রদীপ,
শাশ্বত হয় পুনর্ভূ।

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

ঝড়

(ডেভিস্‌ অনুসরণে)

মোর হৃদয়পটে ঘনিয়ে ওঠে ঝড়।
থমকি' থাকে আকাশব্যাপী আকৃতি ছল ছল।
নামে না যবে কথার বারিধারা,
ভাবনা মম মলিন ফুলদল---
নীরব নত পাখীর মতো কাকলী-সুরহারা।

তবু, আবার এসো ঝড়ের রূপে প্রিয়!
ঘনাও মনোদিগন্তে সে সুচির আঁধিখেলা।
ঢালিবে যবে বাণীর ঝারি, রাণি!
আবেগ হবে দোদুল যূথী-বেলা---
ফিরিয়া পাবে কণ্ঠে পাখী চকিত সুরখানি।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য

কাব্য জীবনকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। এবং এই রস-সৃষ্টির পিছনে আছে সৌন্দর্য্য-বোধকে চরিতার্থ করিয়া বিমল রসোপলব্ধি। সৌন্দর্য্যবোধ কোনও শূন্য অস্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘায়ু হয় না, শুধু সেইজন্যই ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির চতুঃসীমার মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে থাকে। এখানেই জীবন এবং কাব্যের সুগভীর পরমাত্মীয়তা। কবি যখন জীবনকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করেন, তখন তিনি সৃষ্টির সমগ্রতাকে একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে যে লাভ করেন, তাহা নহে। কয়েকটি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল চিত্র-পরম্পরার সাহায্যে কবি তাঁহার সমগ্র সৃষ্টিকে লাভ করেন। "শ্রাবণ সন্ধ্যা"য় রবীন্দ্রনাথ ঠিক ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন, "প্রকৃতি হতে রঙ্ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে' তুলছে, প্রকৃতি হ'তে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে' তুলছে।" আর ছবি এবং কাব্য একই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বিভিন্ন পন্থামাত্র। "One Word More"-এ ব্রাউনিং ত বলিয়াছেনই যে Rafael এক সময়ে একশত সনেট রচনা করিয়াছিলেন, এবং Dante একদিন একটি এঞ্জেলের ছবি আঁকিয়াছিলেন। এগুলি তাঁহাদের শিল্পিজীবনে একটি চরম আনন্দময় ক্ষণের অক্ষয় কীর্ত্তি। অতএব মনের ধর্ম্মই এই যে সে চিত্র-সাহায্যে চিন্তা করে, এবং বর্ণাড়ম্বরে এই চিত্র সুষ্ঠু, সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া। বর্ণ রূপকে সত্তা দান করে—রূপকে সম্ভব করিয়া তুলে। অতএব বর্ণ-বিজ্ঞান ও বর্ণ-সমাবেশ-প্রতিভা সৌন্দর্য্যবোধ হইতেই জন্ম লাভ করে। রূপ সৌন্দর্য্যবোধকে মূর্ত্তিদান করে, এবং বর্ণ রূপকে বিচিত্রিত করিয়া তুলে—সুতরাং বর্ণের যথার্থ ব্যবহারের উপর কবি-প্রতিভার অনেকাংশই নির্ভর করিতেছে। কলালক্ষ্মীকে কবি কল্পনার দুর্লভ আয়োজনে অর্ঘ্য নিবেদন করেন, সযত্ন পারিপাট্যে তাঁহাকে মনের মতন করিয়া বেশবাসে ও বর্ণ-বৈভবে অপার্থিব করিয়া তুলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অপূর্ব্ব সংযম অথচ সাড়ম্বর সমৃদ্ধির সহিত তিনি বর্ণ-জগতের প্রত্যেকটি বর্ণকেই তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কবির অনুভূতি সাধারণ মানুষের অনুভূতির

অপেক্ষা গাঢ়তর ও সুচিরস্থায়ী। কবির অনুভূতি আরও অধিক স্পন্দমান, অধিক ব্যাপক ও অধিক সম্পন্ন। সুতরাং কবির অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে হইলে কবিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে চিত্র সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা শক্তিধরেরই সৃষ্টি-কার্য্য। সেজন্য যে বর্ণ-প্রলেপে এই সৃষ্টিকার্য্য প্রাণবান্ হইয়া উঠে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই অপরূপ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল ও সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ যখন মরণ সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করিতেছেন তখন তিনি মরণকে এই সৌন্দর্য্য-বোধ-জাত অনুভূতির অনুরূপ এক চিত্রে রূপায়িত করিতেছেন,—

মরণ রে—
তুঁহু মম শ্যাম সমান,
মেঘ-বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল-কর, রক্ত অধরপুট—(ভানুসিংহের পদাবলী)

এই চিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে কবিকে যে কয়টি বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাদের বিচিত্র সংমিশ্রণে মরণের রূপটি রসগ্রাহীর চিত্তে মহাশক্তি বিগ্রহের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল শ্রেষ্ঠ কবিরই অনুভূতির শক্তিমত্তা এক একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে এমন এক একটি চরম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়া থাকে যে তাহাদের মূলগত একটি সৌসাদৃশ্য ধরা না পড়িয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ মেঘ ও রক্তবর্ণে মরণের একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলিলেন। শেলি সম্পূর্ণ অন্যভাবেই জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পরম অনুভূতিকে বর্ণসমষ্টিদ্বারা রূপ দিলেন,

Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of eternity—(Shelley : Adonais)

আপাত দৃষ্টিতে উভয় চিত্রের মধ্য কোনও অর্থের মিল বা ভাবের সামঞ্জস্য চোখে পড়িবে না। কারণ স্পষ্টতঃ একটি জীবন সম্বন্ধে এবং অন্যটি মরণ সম্বন্ধে, দুইটি বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন সময়ের কবির ভাব-ধারা। কিন্তু বর্ণ-বিচারে উভয় কবির যে বলিষ্ঠ স্বকীয়তা তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। উভয়েরই অনুভূতির প্রগাঢ়তার ইঙ্গিত উভয় চিত্রেই বর্ত্তমান। Shelley eternity-কে white বলিয়াছেন। বর্ণ-বিচারে এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতার পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। সুচারু শুভ্রতা সকল বর্ণমাহাত্ম্যকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বিবিধ বর্ণজাল এক শ্বেতবর্ণে চিরকালের মত মিশাইয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকটি বর্ণ-সমষ্টিকে আশ্রয়

করিয়া জীবনের যে অনির্ব্বচনীয় চিত্র শেলির তুলিকায় দুইটি ছত্রে ফুটিয়া উঠিল তাহা একমাত্র নিবিড় অনুভূতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ কল্পনা-প্রয়োগেই সম্ভব হইয়া থাকে।

"কড়ি ও কোমলে"র কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে রাঙা রঙের ব্যবহার করিয়াছেন।

দু'টি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন। (চুম্বন, কড়ি ও কোমল)

"চরণ" কবিতাটিতে তিনটি বিভিন্ন ছত্রে,

(ক) দু'খানি অলস রাঙা কোমল চরণ
(খ) ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দু'টি রাঙা পায়,
(গ) লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল—(চরণ, কড়ি ও কোমল)

আবার "মোহ" কবিতাটিতে কবির যৌবনলক্ষ্মীর রূপমাধুরী—

রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে যৌবন-কাতর।—(মোহ, কড়ি ও কোমল)

সহজেই মনে করাইয়া দেয় শকুন্তলার যৌবন-শ্রী,

অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহু
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

এবং কৃষক-কবি Robert Burns-এর মানসপ্রিয়াকে,

My love is like a red rose.

"কড়ি ও কোমল" কবির এমন বয়সের দান, যখন রাঙা রঙের ছোপ তরুণ মনের কুঞ্জে কুঞ্জে ব্যথার বিবর্ণ গোলাপে গোলাপে রক্ত সঞ্চার করে, যখন আশাহত উদ্বেল যৌবন অনিশ্চিত গাঢ় কণ্ঠে সহসা বলিয়া উঠে,

Flush everything that hath a vermeil hue,
Let the rose glow intense and warm the air,
And let the clouds of even and of morn
Float in voluptuous fleeces o'er the hills,
Let the red wine within the goblet boil
Cold as a bubbling well ; let the faint-lipped shells
On sands or in great deeps, vermilion turn
Through all their labyrinths ; and let the maid
Blush keenly, as with some warm kiss surpris'd.
(Keats : Hyperion Bk III)

"শিশু"র "কেন মধুর" কবিতাটিতে ঐ রাঙা রঙের আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার হইয়াছে। এখানে পরম স্নেহাশীলা প্রথম-বিকশিত-মাতৃত্বা শিশু-জননীর আবেগ-বিধুর অনুভূতির যে-চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা বর্ণসম্পদে রমণীয় ভাবে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে,

রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে জলে রং ওঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে॥ (কেন মধুর,—শিশু)

রঙের, বিশেষ করিয়া, শিশুর রাঙা হাতের রঙীন্ খেলেনার রঙের তাৎপর্য্য কিশোরী মাতা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। শুধু তাই নয়, সে নাকি ধরিয়া ফেলিয়াছে, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর বাহিরের বর্ণ-বিকাশের রহস্যাপ্লুত গূঢ় মর্ম্মটি !

"নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় কবির বর্ণ-প্রাচুর্য্য অদ্ভুত সংযমে কোনও রকমে দিগন্তের বিশাল বাঁধের মধ্যে সংহত হইয়াছিল—

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায় অপরিচিতা
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা
ঝলিতেছে জল তরল অনল—

কিন্তু আর রক্ষা হইল না। বিগলিত বর্ণ-সমুদ্রের ক্রমবিবর্দ্ধমান চপলোর্ম্মি সহসা প্রচণ্ড শক্তিতে বাঁধ ভাঙিয়া মহা আড়ম্বরে অস্তাকাশের গাত্র বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—

গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
দিগ্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি অশ্রুজলে।

কোনও বর্ণবিশেষের উল্লেখ মাত্র না করিয়া শব্দ-ব্যঞ্জনায় কবি এই বর্ণবিপ্লবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন।

অযত্নবর্দ্ধিতা স্বচ্ছন্দ-সঞ্চারিণী গ্রাম্য বালিকা রাজধানীর সু-উচ্চ অট্টালিকার প্রস্তর-অন্দরে সু-নিভৃত অন্তরালে দুঃসহ প্রবাস যন্ত্রণায় মুহুর্মুহুঃ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কারণ, সৌভাগ্যক্রমে সে আজ কোনও প্রখ্যাতনামা ধনিগৃহের বধূ। সেই সুমহৎ দুঃখভোগের সুদীর্ঘ অবসর-কালটুকু পরিত্যক্ত অতীত জীবনের ছায়াছবি একটির পর একটি করিয়া সে ফুটাইয়া তুলিতে থাকে। মনে পড়ে তাহার গৃহের

কথা; যেখানে সে শৈশবের ক্রীড়াবিমুগ্ধ চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি অকৃপণ হস্তে ব্যয় করিয়া আসিয়াছে। কখনও ভাবিতে পারে নাই যে, আজ তাহাকে এভাবে নিঃস্ব হইয়া আনন্দহীন কিশোরীজীবনকে পলে পলে সুদূর পরিপূর্ণতার মাঝে টানিয়া বহিয়া চলিতে হইবে। বালিকা-বয়সের খেলাগৃহের প্রাচীরের অবিকৃত চিত্রও একে একে তাহার মনে পড়িতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবয়বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে কয়টি লতা যে-যে বর্ণের ফুল ফুটাইত, তাহাও তো সে বিস্মৃত হয় নাই!

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে,
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি। (বধূ)

বিগত-গৌরব মানুষের চূর্ণ সৃষ্টির উপর কত যত্নে তুলি ভরিয়া কবি সবুজ ও বেগুনী রঙের ছোপ লাগাইতেছেন। কালের ধ্বংসকে কুসুমান্বিত করিবার একটি বিচিত্র প্রয়াস!

বিত্ত যাহার অপরিমেয়, ব্যয়ের পন্থাও তাহার প্রকৃষ্ট। ধনী যতভাবেই তাহার সঞ্চিত বিভবের সদ্ব্যয় করিতে থাকে, তত ভাবেই তাহা শোভন হইয়া উঠে। কবি অন্য স্থানে এই একই বেগুনী রঙের সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কত বিভিন্নরূপে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

"শিশু ভোলানাথে"র শিশুরা হঠাৎ যেন আপনাদিগকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা যে শিশু, এই কথাটার সম্পূর্ণ সত্যতা কোন্ এক মাহেন্দ্রক্ষণে অকস্মাৎ তাহাদের মাথায় খেলিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা শিশুত্বের মায়া-মাধুরী বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে চেষ্টা করে—শিশুত্বের রোমান্স আর তাহাদের অজানা নাই। খেলা-ভোলা শিশু সেইজন্যই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, কেন যে তাহার খেলার সকল প্রবৃত্তি সকল নেশা হঠাৎ মাঝে মাঝে কোথায় ছুটিয়া যায়; কেন যে সে শূন্য দৃষ্টি তুলিয়া বিভ্রান্তের মত তাহার খেয়ালী মনের এই অদ্ভুত আচরণকে বহুক্ষণ ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রশ্নের সমাধান হয় না; সহসা সুকরুণ সুরে মাকে বলিয়া উঠে;

খেলা ভোলার দিন, মা, আমার আসে মাঝে মাঝে
সেদিন আমার মনের মাঝে কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে, দূরে কাদের ছাদের 'পরে,
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগ্নি রঙের শাড়ী।

চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই, তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ওইখানেতেই আছে রাজার বাড়ী। (খেলা-ভোলা)

আমার মনে হয় কবিচিত্তের সমস্ত সৌন্দর্য্যবোধ ঐ একটি বেগ্‌নি রঙের শাড়ীর মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ-বিচার ও বর্ণ-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এই চিত্রসৃষ্টিটি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া মানুষের অভিজ্ঞ চিত্ত শ্রাবণ সন্ধ্যার অবিশ্রান্ত ঝর ঝর ধারাবর্ষণে কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠে,—"আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খাট্‌বেনা, আজ গান ছাড়া আর কোনও কথাই নেই," ঠিক সেই একই মনোবৃত্তির খেয়ালীপনায় শিশুও মাঝে মাঝে ছোট্ট মেয়েকে ছাদের উপর রৌদ্রে বেগ্‌নি রঙের শাড়ী শুকাইতে দিতে দেখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যায়। হয় তো এই বেগ্‌নি রঙের শাড়ীর মধ্য দিয়া সে তখন শিশু-জীবনের স্বপ্ন ও সুষমাকে দীর্ঘায়ত করিয়া দেখিতে থাকে।

ময়নাপাড়ার মাঠে কবি একদিন অতর্কিতে যে-মেয়েটিকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন, বার বার করিয়া কবি বলিতেছেন যে, সে মেয়েটি মোটেই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা স্নিগ্ধ-শ্রী রূপসী নারী নহে। সে ছিল কালো, এবং সত্যভাষী তাহার গাঁয়ের লোক তাহাকে কালোই বলিত। মেয়েটির তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল কি না জানি না। তবে, কবি তাহাকে বলিতেন কৃষ্ণকলি। মেয়েটির কালো অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে যে কেবল একমাত্র কালো হরিণ চোখ দুইটিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন রূপদক্ষ কবি তাহাই বারম্বার সগর্ব্বে বলিতে চাহিতেছেন,

কালো—তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ॥

কালো রঙ্‌কে কল্পনা ও অনুভূতি-যোগে কত বড় কাব্যে পরিণত করা যায়, ইহা কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কোন্ দূর গ্রামবাসিনী এক অপরিচিতা মেয়েকে কবি কালো রঙের স্পর্শে স্পর্শে সজীব করিয়া তুলিলেন। বর্ণ-সমাবেশে এবং কলাকৌশলে চিত্র যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন কিন্তু দেখা গেল, কালোর কালিমা এ নারীকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এ তো কবির মানসতীর্থের রাজরাজেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি—সৃজন-সুনিপুণ কবির সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী—কবির অন্তরবাসিনী এ সেই চিরন্তনী নারী—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

সে নারী বিচিত্রবেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া ॥

সেইজন্যই এই কালো রঙ্ বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে একে একে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল—

এমনি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে' কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এমনি করে' শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।...

পিঙ্গল এবং গেরুয়া বর্ণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিরাট শক্তিপুঞ্জের পরিচয় পাইয়া থাকেন। প্রথমটি বাহিরের স্ফীত ও দুর্দ্ধর্ষ শক্তির এবং দ্বিতীয়টি অন্তরের সংযত ও সমাহিত শক্তির পরিচায়ক। বৈশাখের শীর্ণ তাপসশ্রী অঙ্কিত করিতে গিয়া তিনি দীপ্তচক্ষু সেই সন্ন্যাসীর গহন জটাভারের উল্লেখ করিতেছেন,

হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল

বিশিষ্ট বর্ণ-প্রয়োগে বৈশাখের রুদ্রমূর্ত্তি কত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। অথবা 'বর্ষশেষে'—

পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

আসন্ন ঝটিকা যে কিরূপ ক্ষিপ্ত গতিতে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণকে বর্ণ-বৈচিত্র্যে একটি সুগঠিত রূপ দেওয়া হইয়াছে। আবার পরক্ষণেই

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটি নরনারী হিয়া
চিন্তায় বিকল।

গেরুয়া রঙ্‌টি কবির হস্তে এক অভিনব দীপ্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

রসায়নবিৎ যখন একরঙা কোনও তরল দ্রব্য লইয়া গবেষণা করিতে থাকেন, তখন তিনি বিজ্ঞ রসায়নিক ব্যতীত আর কেহই নহেন। কিন্তু যখন বিভিন্ন তরল পদার্থের সংমিশ্রণে তিনি বর্ণ-বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে থাকেন তখন তাঁহার অভ্যস্ত অন্তরও নিরর্থক একটা খুসীর হিল্লোলে অল্পক্ষণের জন্যও খানিকটা দুলিয়া উঠে, কবির পক্ষেও ঠিক তাই। তিনি যখন গতানুগতিকতাকে অগ্রাহ্য না করিয়া বর্ণ ও বস্তুর সম্বন্ধকে অক্ষুণ্ণ রাখেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি যে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নহে। অর্থাৎ কবির কল্পনার দৌরাত্ম্যে নীল আকাশ হঠাৎ সবুজ হইয়া উঠিতে পারে না, অথবা "ক্লান্ত নাবিকের চোখ দূর সমুদ্রের মত লাল" হইয়া উঠিতে পারে না। তবুও বর্ণ-বিচারে যেমন কবি-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, অভিনব বর্ণ-সৃষ্টিতেও তেমনি রসবেত্তার প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। কবি যখন বলেন,

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে,

তখন দেখি, মেঘ তাহার গাঢ় কৃষ্ণত্ব কাটাইয়া উঠিয়া নীলিমার অন্তর্লোকে যাত্রা সুরু করিয়াছে। ইহা বর্ণবিচারের নহে, বর্ণ-সৃষ্টিরই দৃষ্টান্ত। অথবা আরও বিশদভাবে, এখানে যতটা না বর্ণ-বিচার করা হইয়াছে, তদধিক বর্ণসৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "বর্ষামঙ্গলে"ও প্রায় অনুরূপ এক চিত্র মনে পড়ে,

গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;

অরণ্য তো সবুজ বৃক্ষের সমাহার। অতএব "নীল অরণ্য" স্থলে শ্যাম অরণ্য বলিলে কবি হয় তো বর্ণ-বিচারে মুক্তি পাইতেন। কিন্তু বর্ষণ-নিবিড় অন্ধকার বর্ষার যে-চিত্র তমিস্রঘন অরণ্যের নীলিমায় বিড়ম্বিত হইয়া আছে, শ্যাম অরণ্যে তাহা তো মিলিত না। সহজ মুক্তি কবি তো অনেক ক্ষেত্রেই লাভ করিতে পারেন ; তবে কলালক্ষ্মীকে বেদনা দিলে তাহাও যে আবার কবিকে বিষম বাজিয়া থাকে। সেই জন্য জয়দেবও বোধ হয় তমাল শ্রেণীর অন্ধকারকে নীলই বলিয়াছেন,—

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকাণা
মাবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমালদলনীলতমং তমিস্রম্
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥

(গীতগোবিন্দম্ ১১ সর্গঃ ১২ শ্লোকঃ)

কবি কত ভাবেই না বৈশাখের রুদ্রত্ব কল্পনা করিতেছেন,

> ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর
> দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে' আসে,

সহসা মনে হয় দিগন্তের এরূপ বর্ণ-বিশ্লেষণ সাধারণতঃ তো আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ইহাও মনে হয় যে এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভাব-ব্যঞ্জক বর্ণ-বিশ্লেষণেরই প্রয়োজন এখানে ছিল বটে। বর্ণ-প্রয়োগের এই মৌলিকতা সকল প্রতিভাবান্ কাব্যস্রষ্টার মধ্যেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহাকবিও "রঘুবংশে" এইরূপই একটি বর্ণ-সমাবেশে প্রায় একই রূপ চিত্র আঁকিয়াছেন,

> সঞ্চরপূতানি দিগন্তরাণি
> কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্
> প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
> প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ॥ (২য় সর্গঃ, ১৫ শ্লোকঃ)

আবার কোলরিজ ঐ একই বিশেষণে এক অপূর্ব্ব অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়াছেন,

> All in a hot and copper sky
> The bloody sun at noon,
> Right up above the mast did stand
> No bigger than the moon. (Ancient Mariner)

এই তিনজনের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রত্যেকেই আকাশকে দগ্ধ তাম্রবর্ণে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা যে শুধু প্রত্যেকেরই বর্ণ-সৃষ্টির নিছক খেয়ালীপনার চূড়ান্ত নিদর্শন, তাহা নহে। প্রত্যেকেই আপন আপন বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধকে আপন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গী অনুযায়ী রূপ দিয়াছেন! কিন্তু বর্ণ-সংস্থাপনে তাঁহাদের মূলগত ঐক্য কেবলমাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতারই সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতি যেখানে নিতান্তই সখ করিয়া বর্ণান্তর গ্রহণ করে, কবির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সেখানেও অতন্দ্রভাবেই দর্শনোৎসুক। কবির দৃষ্টিকে ফাঁকি দিবার জন্যই যেন সমস্ত বিশ্বজগৎ চক্রান্ত করিয়া আছে। ক্ষণে ক্ষণেই আপন চিরাচরিত ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া বিশ্ব-সংসার অদ্ভুত আচরণ করিয়া বসিতেছে। আর কবি এই চিরন্তন গূঢ় পরিবর্ত্তনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া লীলা-চপল বিরাটের খেয়ালের বর্ণোজ্জ্বল ফুলগুলি আহরণ করি-তেছেন—শিশুসুলভ দুর্ব্বার আনন্দোৎসাহে সেগুলি দিয়া ইচ্ছামত চিত্রসৃষ্টি

করিতেছেন, ইচ্ছামত কতক হারাইতেছেন, কতক নষ্ট করিতেছেন, কতক বা বিলাইয়া দিতেছেন। কারণ, পর্য্যাপ্তির অধীশ্বর তিনি। তাঁহার অপ্রমেয় বৈভব—তিনি অকারণেই যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন। সেইজন্যই শরতের বর্ণ-বিহ্বলতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে থাকেন, "শরতের রঙটি প্রাণের রঙ্। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এই জন্যে শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির মহলের যৌবনকে।" (শরৎ)

এই জন্যই বর্ণ-সমাবেশে প্রায় সকল কবিকেই কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে মুক্তহস্ত দেখি। তাঁহাদের অন্তর লোকে রক্তহ্রদের তটে তটে লোহিতোচ্ছ্বাস সহসা উদ্দাম হইয়া জাগিয়া উঠে—সে উচ্ছ্বাসে অন্তরাকাশ ভরিয়া বিকশিত হইয়া উঠে বর্ণ-তরঙ্গের বিচিত্র ইন্দ্রধনু। তখন কবি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না কেন, বিশ্ব-স্থষ্টির অন্তরে বাহিরে দেখিতে পান উদ্বেলিত বর্ণ-বিপ্লব। বর্ণের উচ্ছৃঙ্খল বিপর্য্যয়ে কবি অসহ আবেশে লিখিয়া যান,

> একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
> শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে
> গেছো কি পাসরি।

সৌন্দর্য্যবিলাসী কীট্স্ অভিশাপগ্রস্তা সর্পিণীকে দেখিয়া বর্ণের উপর বর্ণ যোজনা করিয়া যে চিত্র স্থষ্টি করেন, তাহাতে অমিতব্যয়িতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু এ অমিতব্যয়িতা ঐশ্বর্য্যকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া অভিনব ঐশ্বর্য্যস্থষ্টি।

> She was a gordian shape of dazzling hue,
> Vermilion-spotted, golden, green and blue;
> Striped like a zebra, freckled like a pard,
> Eyed like a peacock and all crimson barr'd; (Lamia).

শেলি ও কোলরিজ এই অকুণ্ঠ বর্ণ-প্রাচুর্য্যকে অবলম্বন করিয়া এক অতি-প্রাকৃত আবহাওয়ার স্থষ্টি করিতে থাকেন।

শেলি—Ode to West Windএ স্ফুট কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন,—

> O Wild west wind, thou breath of autumn's being,
> Thou from whose unseen presence the leaves dead
> Are driven like ghosts from an enhanter fleeing,
> Yellow and black, and pale and hectic red,
> Pestilence-stricken multitudes.

অবশেষে, কোলরিজ ভূতগ্রস্ত সমুদ্রের সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত রূপটি বর্ণে বর্ণেই কেমন আশ্চর্য্য সফলতার সহিত চিত্রিত করিতে থাকেন,

The water like a witche's oils
Burnt green and blue and white.
(Ancient Mariner)

এই বর্ণবিপ্লব কবিচিত্তকে অনবরত কিরূপ আন্দোলিত ও উল্লসিত করিতে থাকে তাহা রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' হইতে কতকটা অনুমান করা যায়। সমুদ্রের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,

"দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে চলেছে যেন সৃষ্টি-কর্ত্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই। যেমন আকৃতির হরির-লুঠ, তেমনি রঙের। রঙ যে কত রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিমাকাশে যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মতো দু' হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য! প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি; সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

"তারপর রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বল্‌তে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব? সে তার জল-তরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ান্‌কে দেখায়, সমুদ্র সেই সময়ে তার ছোট ছোট লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।"

বর্ণ-জগতের সুগোপন অন্তঃপুরের বিচিত্র রহস্য অকস্মাৎ যেন কবি চক্ষুর সম্মুখে ক্ষণেকের জন্য সমস্ত সম্পদ লইয়া উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিহ্বল কবি আবেশে আশঙ্কায় সৌন্দর্য্যলোকের অন্তর্লীন এই রূপমাধুরী চকিতে লুব্ধ চক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর যাহা দেখিলেন তাহা উপলব্ধির গভীর অতলে জমা রহিল, যতটুকু বলিতে পারিলেন তাহা শুধু এই-যে, এ আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

"ক্ষণিকা"র কবি যৌবনের চঞ্চল মত্ততাকে পায়ে পায়ে বহুদূর ফেলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ত্বের গেরুয়াবাস গায়ে তুলিয়া দেন নাই। তাই "ক্ষণিকা"র কবিতাগুলি এক মুগ্ধ অনুভূতিশীল হৃদয়ের অতি সহজ সরল প্রেমাভিব্যক্তি। এখানে কথায় কথায় ব্যথার প্রলাপ নাই; দুঃসহ বিরহে তরুণ আত্মা পিয়ামুখচন্দা দর্শনের জন্য ক্ষণে ক্ষণে মনের গভীরে মাথা কুটিয়া মরে না; এখানে প্রেম জানিবার ও জানাইবার হাস্যকর ব্যাকুলতা বা কলরব থামিয়া গিয়াছে। দুইটি হৃদয়ের একান্ত মিলন এমন সাধারণভাবে সহজ হইয়া গিয়াছে যে, উভয়ে উভয়কে নিশ্চিত নির্ভরতার সহিত সকল কথাই বিনা আড়ম্বরে ও অভিনয়ে বলিয়া যাইতে পারে। তাই এখানে বিবিধ বর্ণচ্ছটা দ্বারা অত্যদ্ভুত চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন হয় না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য বর্ণের প্রয়োজন এখানে নাই এমন কথা বলি না। এইমাত্র বলি যে, বর্ণ-সংযোজনে এখানে যে চিত্রপরম্পরা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা এক অপূর্ব্ব কলাকুশলী শিল্পীর বহু সংযম-সাধনার ফল। দুই একটি বর্ণের প্রশস্ত ইঙ্গিত এখানে কল্পনার সমারোহ আনিয়া দেয়। দুই একটি বর্ণের আভাসকে আশ্রয় করিয়া আমরা সৌন্দর্য্যের তীর্থলোকে বিহার করিয়া ফিরি।

কবি প্রিয়তমার সহিত আজ বাহির হইয়া পড়িবেন। কোথায় যে বাহির হইয়া পড়িতেছেন তাহার ঠিকানা না জানেন কবি, না বা তাঁহার প্রিয়া। মিলনের আনন্দাতিশয্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত কবি কেবল বলিয়া চলিতেছেন,

মোরা নব নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোক বনে
শিখিপুচ্ছ শিরে ॥ (জন্মান্তর)

এই নীল নদীটির অবস্থিতি যে কোথায়, আর কেহ বরং জানিতে পারেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, প্রেম-বিহ্বল কবি তাহার কোনও ঠিকানাই রাখেন না। মিলন-নিবিড় এক পরম মুহূর্ত্তে কবির মুখে এই প্রলাপটি উচ্চারিত হইয়াছে মাত্র—ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। কিন্তু হয় তো প্রলাপের মধ্যে যত মধু সঞ্চিত হইয়া থাকে, সরল সত্যভাষণের মধ্যে তত থাকে না। তাহা না হইলে এই নীল নদীটির মধ্যে এত মুগ্ধ সৌন্দর্য্য কি করিয়া

আত্ম-গোপন করিল? নীল এখানে বর্ণ বিশেষ কি না, সে বিষয়ে হয়তো যথেষ্ট আপত্তি উঠিবে। হয় তো বা জন্ম লাভের পর হইতেই নীল নামে নদীটিকে বরাবর ডাকা হইয়াছে। শৈশবের এই নামকরণের মধ্যে হয় তো বর্ণবিশেষের কোন ইঙ্গিতই ছিল না। অতএব নীল যদি নাম মাত্রই হয়, তাহা হইলে ইহাকে আফ্রিকার প্রসিদ্ধ নাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করিতেই বা এমন কি অপরাধ ঘটে? এ সকল অবান্তর প্রশ্নের উত্তর জানিনা। তবে বলিতে পারি, নীল বর্ণবিশেষকে ইঙ্গিত করুক বা না করুক, বর্ণের প্রচ্ছন্ন আভাসটুকু এই নদীটি সম্বন্ধে কল্পনাকে লীলায়িত করিয়া তুলে।

অকস্মাৎ লব্ধ এই নীল নদীটির অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য্য বোধ হয় পরে আবার কবিকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাই তিনি অন্য আর এক স্থলে নিরুদ্দেশের অন্তরাশ্রয়ী এই নদীটিকেই পুনরায় স্মরণ করিয়াছেন—

> নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
> শৈল-চূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা।
>
> (বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী)

এখানে গোটা দুই তিন বর্ণের পরিমিত প্রয়োগে যে চিত্রটি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার স্থান পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকাগাত্রে নহে। কল্পনার তেপান্তরকে ছাড়াইয়া অচলের বিদীর্ণ উচ্ছ্বাস এবং সাগরের অজস্র মমতা দিয়া রচিত এক নিরুদ্দেশ মহারাজ্যের অস্তিত্ব এই চিত্র অকস্মাৎ স্মরণ করাইয়া দেয়। এই রূপসৃষ্টি অভিজ্ঞ আর্টিষ্টের আশ্চর্য্য:সি।দ্ধ। মনে হয় 'প্রবাল দিয়ে ঘেরা' এই অতি পরিচিত দ্বীপটি এই সে-দিন যেন কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি। পরক্ষণেই শিথিল কল্পনা—ইহা যে নিরুদ্দেশের কোন্ প্রত্যন্ত সীমায়—অপরিচয়ের রাজ্যকে ছাড়াইয়া কতদূরে অবস্থান করিতেছে, তাহাই মুহুর্মুহু মনে করাইয়া দিতে প্রয়াস পায়। তবুও কিন্তু মনে হয়, যে সাগর বিহঙ্গেরা এই শ্যামল দ্বীপের শৈলচূড়ায় পরম নিশ্চিন্তে নীড় বাঁধিয়া আছে। ধূসর সুদূরকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের ক্ষীণ পক্ষধ্বনি এখন পর্য্যন্তও যেন কানে ভাসিয়া আসিতেছে।*

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

---

* রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবদিনে সরিষা বিবেক ভারতী সাহিত্যচক্রের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ইতিহাসের কাল

(১)

চার বৎসর পূর্ব্বে 'ইতিহাস' নামে আমার তিনটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ পরিচয়ে প্রকাশিত হয়।[১] বিষয়টির গুরুত্ব আমার লেখনীকে এতদিন অকর্ম্মণ্য করেছিল। কিন্তু তার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে একদিনের জন্যও আমি অচেতন ছিলাম না। ইতিহাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বই পেলেই পড়েছি। আজ মনে হচ্ছে যে কোনো লেখকই ইতিহাসের মূলতত্ত্বের সন্তোষজনক সন্ধান দিতে পারছেন না। এই সেদিন একুশজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত মিলে Philosophy and History নামে এক বই লিখেছেন[২], গুরুস্থানীয় আর্ণষ্ট ক্যাসিরার-এর ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে। এ-রকম শক্ত বই জীবনে খুব কম পড়েছি। তিন চারটি রচনা ভিন্ন অন্যগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট, অতএব সবগুলি যে বুঝেছি তাও বলতে পারি না। কিন্তু অনেকগুলির প্রধান মন্তব্য আমার সমস্যার ওপর আংশিকভাবে আলো ফেলেছে। অতএব আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধকে পূর্ব্বোক্ত বইএর এবং পরে যে সব বইএর উল্লেখ থাকবে তাদের সমালোচনা হিসেবে না দেখে আমার ইতিহাস সংক্রান্ত চিন্তার অভিব্যক্তির চতুর্থ অধ্যায় ধরাই ভাল। Philosophy and History সম্বন্ধে একটা মজার কথা প্রথমেই বলি। ৩৩৭ পৃষ্ঠার কেতাবে মাত্র তিনটি স্থানে কার্ল মার্ক্‌সের উল্লেখ আছে এবং তাও অশ্রদ্ধভাবে। অথচ বইখানি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এবং লেখকবৃন্দ জীবিত, ও বলা বাহুল্য, মূর্খ নন। তবু কার্ল মার্কসের কারবার ইতিহাস নিয়েই, প্রধানত, এবং মার্ক্সিষ্টের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে মানতেই হবে। অবশ্য সেই ভঙ্গীতে ঐতিহাসিক প্রত্যয় নিয়ে কোথাও আলোচনা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

কালই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। কাল সম্বন্ধে ধারণাগুলিকে মোটামুটি চার ভাগ করা যায়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক। একটি শ্রেণীর

---

১ বৈশাখ, শ্রাবণ ও কার্ত্তিক ১৩৪০।

২ Oxford, edited by R. Klibansky and H. J Paton.

কাছে (তাঁরা নিতান্ত সভ্যজীব) কালের সামাজিক ধারণা মোটেই স্পষ্ট নয়, এমন কি তাঁদের সাধারণ ব্যবহারেও অবহেলিত ও অগ্রাহ্য হয়। জনগণের কাছে কিন্তু সমবেত জীবন-যাত্রার লয়ের, ও তার প্রধান প্রধান ঘটনার দ্বারা নিরূপিত সন-তারিখের মূল্য আছে। যদি কোনো কারণে তাদের জীবন-যাত্রায় বৈচিত্র্য না থাকে তবে প্রতীকের সাহায্যে, কখনও বা পুরাণের আশ্রয়ে ধারণাগুলি রূপ নেয়। সূক্ষ্মতর দার্শনিক মতামত তৈরী হতে তখন আর দেরী হয় না। একটি অপরটির প্রসারে সাহায্য করে। যেমন হিন্দুসমাজের মহাকাল, ব্রহ্মার নিদ্রা ও জাগরণ, তথা কল্প-ভাগ, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ-পরম্পরা প্রভৃতি পৌরাণিক ধারণা ও সামাজিক বিশ্বাসগুলি আত্মার অবিনশ্বরতা, পুনর্জ্জন্ম, চক্রবৎ কালপরিবর্ত্তন প্রভৃতি দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে বাঁধা। এই উপায়েই দর্শনের কাল সব সমাজেই জনসাধারণের কাছে নির্দ্দিষ্ট। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সমাজের উন্নতি-অবনতির, রক্ষণশীলতা ও বিপ্লব সাধনের শক্তির ও ইচ্ছার তারতম্যের একটি কারণ কাল-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সামাজিক ধারণা। যমরাজকে ধর্ম্মরাজ, শিবকে মহাকাল, দেবাদিদেব আখ্যাদান, সুরাসুর যুদ্ধে মহাদেব-মহাকালের সাহায্য প্রার্থনা, ধ্বংসের নৃত্যকে শিবের তাণ্ডব কল্পনা প্রভৃতি সাধারণ ধারণা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু জনসাধারণ কালের ব্যক্তি-সম্পর্করহিত অস্তিত্ব স্বীকার করে এসেছে। তার ওপর তারা কৃষিপ্রধান জাতি, তাই অন্য কৃষিজীবীদের মতন ঋতুচক্র মানতে তারা বাধ্য। অন্য প্রকার সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের একটি প্রধান পার্থক্য কালের নৈর্ব্যক্তিক ও চাক্রিক পরিক্রমার ধারণার সুদৃঢ়তায়।

অবশ্য চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ও কর্ম্মফল নামক নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাও হিন্দু সংস্কৃতিতে আছে—তার নাম, ধ্যান, যৌগিক প্রক্রিয়া। কিন্তু উপায়টি গুহ্যধর্ম্মের অন্তর্গত, ব্রাহ্মণেতর জাতি, অর্থাৎ জনসাধারণের করায়ত্ত নয়। তাই সন্দেহ হয়, হিন্দুসমাজে নিয়তিকে অতিক্রম করার জ্ঞান, কালব্যূহ ভেদ করার রীতি কেবল ব্রাহ্মণেরই জানা ছিল, অন্যান্যের ছিল নিয়তির দাসত্বভোগ, কালের পেষণ মাত্র। ব্রাহ্মণ-যোগীর কালপ্রত্যয়ের সাহায্যে সমাজের লয় দ্রুত হয় নি, তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হয় নি। হলে কি হত বলা যায় না। এক কথায়, কালের হিন্দু-ধারণা সক্রিয় ছিল না, অত্যাচারের বিপক্ষে

বিদ্রোহকে সে সমর্থন করেনি, কেবল সংরক্ষণকেই সে সাহায্য করেছে। অবতার অনেক এসেছেন, গিয়েছেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাঁদের হজম করে সনাতনত্বেরই বড়াই করেছে। হিব্রুদের অবতারবৃন্দ শুনেছি খুব খারাপ লোক ছিলেন, নিষ্ঠুর, রাগী, কামুক ইত্যাদি, কিন্তু কোনো হিন্দু অবতার কি দেবতার শ্রীমুখ থেকে Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold I will do a new thing, এই বাণী নির্গত হয়েছে কি? 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র ব্যাখা ভবাম্যহং মাত্র—সম্ভাব্যতার নতুনত্ব নির্দ্দেশ তাতে নেই। তাই অত অবতার সত্ত্বেও এই দুর্দ্দশা! সত্য কথা এই: হিন্দুর কাল-প্রত্যয় যান্ত্রিক, কারণ চিরন্তন চক্রাকারে পরিবর্ত্তন যন্ত্রেরই সম্ভব। ব্রাহ্মণ অবশ্য যন্ত্র নন, তাঁরা যন্ত্র-চালক, তাই তাঁরা কালাতীত। জার্ম্মান দার্শনিক নীটশেরও এই মত ছিল, হিটলার তাঁরই শিষ্য, তাই সন্দেহ হয় বর্ত্তমান জার্ম্মান-সমাজ যেন হিন্দু-সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, একটু রং চড়ানো মাত্র।

আজই ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে নতুন মত পোষণ করবার ও প্রচার করবার দায়িত্ববোধ এসেছে। ইতিহাস চর্চ্চার উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু আজকালকার এমন কোনো—কি সাহেব, কি ভারত সন্তান রচিত—ভারতের ইতিহাস পড়িনি যাতে পুরাতনের গুণগান অর্থাৎ যান্ত্রিক-কালের ছাপ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রিক সংস্কারের ধীর অভিব্যক্তির পরিবর্ত্তে আজ না হয় কাল পূর্ণ স্বরাজ পাবার স্বপ্ন আমরা দেখছি, কেউ কেউ সাধনাও করছেন (অমুক তারিখের মধ্যে একজনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার ফলে স্বরাজ পাওয়াটা অবশ্য যান্ত্রিক-কালেরই নিদর্শন), ছেলেরা সোশিয়ালিজমের সাহিত্য ঘাঁটছে, বলছে, অভিব্যক্তি চলে লাফিয়ে লাফিয়ে, মার্ক টোয়েনের ব্যাঙের মতন, ঈসপের কচ্ছপের মতনও নয়, কলুর বলদের মতনও নয়। তাই হওয়া উচিত, এবং হয় জীবন্ত ও হঠাৎ-জাগা সমাজে। কারণ অতি সোজা, সামাজিক কাল ঘড়ির কাঁটার মতন এক কদমে চলে না; কখনও চলে ঠায়ে, কখনও ধূণে; কারণ, কালের পুর্ব্বতন বিভাগ সামাজিক, সমাজ-জীবনের লয় একাধিক, এবং গ্রীণউইচের কালবিভাগ, যেটা এক লয়ে চলে, যেন চলেই না মনে হয়, সেটা বিভিন্ন ভাষা থেকে এসপেরান্টো যেমন জন্মেছে তেমনই বিভিন্ন সামাজিক-কালের সুবিধানুযায়ী সামান্যীকরণ থেকেই উদ্ভূত। ভারতের বিশেষত্ব এই যে সব তাতেই তার দেরী লাগে। হেরাক্লিটাস Aionকে (গ্রীক মহাকাল) ইয়ার ছোকরা বলেছিলেন,

পার্মেনিডীসের Logos ধমকে কালের ভূত ভাগিয়েছিলেন ; তারপর য়ুরোপের কালপ্রত্যয় কত না বদলাল, রিনেসাঁস্, রিফর্মেশন যুগের নতুন বিশ্বাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর উন্নতিবাদ, উনবিংশের অভিব্যক্তিবাদ, বর্ত্তমানের সান্তরবাদ (discontinuity, mutation, per saltum) ··এতগুলি স্তর আমাদের কালপ্রত্যয়ের ইতিহাসে নেই। হবে কি করে ? মা গঙ্গার মতনই আমাদের সামাজিক জীবন, অতএব মনেরও জীবন। সাহিত্যে এখনও যে লোকে 'গল্প' চায় তাই থেকে সন্দেহ হয় যে আমাদের মনের সব কর্ম্মে কাল সম্বন্ধে নতুন ধারণার জোর তাগিদ আসে নি। তবু আনতে হবে। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঐ সামাজিক কার্য্যে সহায়তা করা।

কাল-সংক্রান্ত সামাজিক ধারণা পরিবর্ত্তনের হেতু জানা চাই। কাল-নির্ণয়, কাল-বিভাগ ও কাল-গণনার আদিতে যদি সমবেত জীবনের প্রেরণা থাকে[১] তবে পূর্ব্বোক্ত কাল-প্রত্যয় পরিবর্ত্তনের কারণও ঐ সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই প্রত্যাশা করা সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক ব্রিজম্যান বলেছেন,[২] "The methods which we adopt for assigning a time to events change when the character of events changes"। ঘটনাবলীর প্রকৃতি যখন ও যেখানে সামাজিক তখন তাদেরই পরিবর্ত্তনেরই ওপর তাদের জানবার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন নির্ভর করছে, সেই সঙ্গে প্রত্যয় বদলাতে বাধ্য। কিন্তু Philosophy and History-র লেখকবৃন্দ এ বিষয়ে নীরব। সে যাই হোক, কার্ল মার্ক্‌স বিশদভাবে কারণের বিশ্লেষণ করেছেন। ধন-উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্ত্তনের সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতির রচিত অনুযায়ী ভাবধারার বিরোধ বাধে (তাঁর ভাষায়, methods ও conditions of production)। এ ছাড়া আর কোনো অধিকতর সন্তোষজনক বিপ্লবসাধক সামাজিক উপায় কল্পনা করা যায় না। কেবল ফলিত বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এত বড় কর্ম্ম সাধিত হয় না। আবিষ্কার অনেক হয়, কিন্তু গৃহীত হয় সামাজিক নির্ব্বাচনেরই ফলে। নির্ব্বাচনের একটি উদ্দেশ্য—কোনটিতে আরো ভাল করে জীবন-যাত্রার সুবিধা হবে। বড় বড় মহারথীরা অনেক সময়

১ Sorokin & Merton—Social Time—a methodological and functional analysis, Journal of American Sociology, March, 1937. M. P. Nilsson—Primitive Time Reckoning.

২ Concept of Time—Scientific Monthly, August 1932.

তারিখ ও সন বাঁধতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোন্‌গুলি তাদের মধ্যে চলেছে? যে সন-তারিখ সামাজিক ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা সেইগুলিই তাঁদের নামের সাথে জুড়ে আছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে মহারথীদেরও সামাজিক বিপ্লবের প্রতিভূ হতে হয়েছে, তবেই তাঁদের তারিখ গৃহীত হয়েছে। ভূমিকম্প, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা থেকে যে তারিখ জন্মায় তারও সার্থকতা সমাজ-জীবনের ওপর তাদের প্রভাবে।

বিজ্ঞানের কালের সঙ্গে অন্য কালপ্রত্যয়ের পার্থক্য কি? জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায়, ভূতবিদ্যার কাল এবং অন্যান্য জ্ঞানের কাল এক বস্তু নয়, মোটেই নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য, কিন্তু অন্য অবস্থায় মিল অসম্ভব নয়। সেই অবস্থার মূলযুক্তি আমার প্রবন্ধ পাঠের পর পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হবে। নিউটনী কালের তিনটি গুণ ছিল, সমভাবাপন্নতা (uniformity), অসীম বিভাজ্যতা (infinite divisibility) এবং সাতত্য (continuity)। তিনের পিছনে ছিল কালের আত্মব্যতিরেক ও নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। বলা বাহুল্য, তখন থেকে য়ুরোপীয়ান দার্শনিকবৃন্দ ঐ প্রকার ধারণার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করেন, তার ভুল দেখান, বার্কলে, কান্টের আপত্তি প্রসিদ্ধ। এই সেদিনও ব্র্যাডলে 'কাল'কে মায়া (appearance) বলেছেন; জেমস্‌ বল্লেন, প্রয়োজনীয় কল্পিত সত্য। বার্গসনের ভাষা হল, 'Imaginary homogeneous time is an idol of language, a fiction, কালের বদলে তিনি কালাতিপাতের বোধকেই সত্য অভিজ্ঞতা ধরেছেন এবং ধ্যানীর পক্ষে সেই বোধকে অতিক্রম করার সম্ভাবনাও দেখিয়েছেন।'[১] সমাজতাত্ত্বিকের মধ্যে দুর্‌কৃহাইমই সর্ব্বপ্রথম নিউটনীয় কালের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে তৎপর হন, তার পর সোরোকিন প্রচার করেছেন যে calendrical time সমাজতত্ত্বে অচল। তার প্রয়োজন আছে মাত্র পরিমাণের ক্ষেত্রে, তাও সে পরিমাণের তত্ত্ব মেকানিকস্‌ নয় ষ্ট্যাটিসটিক। তা ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদার্থবিদেরাই নিউটনী কালের সার্ব্বজনীনতায় আস্থা হারিয়েছেন।

আজকালকার পদার্থ-বিজ্ঞানে কাল ক্ষেত্রের সঙ্গে জোড়া। এতে বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্য কারুর উল্লাসের হেতু নেই। একত্রীকরণের যুক্তি কি? ভূতবিদ্যায় এখন কি ঘটছে তা বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন না (কোনো কালেই করেন নি)।

---

১ Time and Free Will এবং Two Sources of Religion and Morality.

ঘটনাবলীর সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বক্ষেত্রজ সম্বন্ধগুলিই পদার্থবিদের লক্ষ্য। অতএব, ঘটনাবলীর পিছনে কালাতীত *is* থাকবেই থাকবে। কিন্তু পদার্থ-বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ও বাচ্য যা লক্ষ্য করা সম্ভব তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যা লক্ষ্য করা সম্ভব (observable), সেগুলি নির্ভর করছে এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরই ওপর। নিউটনীয় মেকানিক্‌সের যুক্তি, উইটগ্যানষ্টাইনের ভাষায়[১], যা প্রকাশ করা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই ; প্রকাশের সময় যখন এই বর্ত্তমান, তখন লক্ষ্য-করা-সম্ভব ঘটনাবলীই একমাত্র ঘটনা, ও বিজ্ঞানের বিষয়। নব-পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তিতে লক্ষ্য-সম্ভব ঘটনাবলীরও অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, নতুন জ্যামিতির আশীর্ব্বাদে। অতএব, আজকালকার পদার্থবিদের সমস্যা আরো ব্যাপক। তাঁকে যা এখন লক্ষ্য করা যায় এবং যা এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা, অথচ যার অস্তিত্ব অনুমিত হতে পারে, এই দুটির সম্বন্ধকে একই প্রজ্ঞাবদ্ধ নিয়মে বাঁধতে হবে। যা লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা তাকেও যখন তিনি ছাড়তে পারছেন না, তখন বাধ্য হয়ে 'এখন'-কে তাঁকে ছাড়তেই হবে। তাই তার বদলে তিনি বলেছেন, observable under the following conditions,—এই সর্ত্তে, এই পরিবেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ সর্ত্ত ও পরিবেশের চিরস্থায়িত্বে তিনি সন্দিগ্ধ। এই খানেই আপেক্ষিকতার দায়িত্ববোধ জন্মায়। কিন্তু জন্মালেই বেঁচে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। স্থায়িত্বের আপেক্ষিকতা অতি পুরাতন কথা। ক্ষেত্র ভিন্ন কাল, কাল ভিন্ন ক্ষেত্র অসম্ভব, মিন্‌কাউস্‌কীর মন্তব্যের দর্শনের দিক থেকে কোনো অর্থ নেই। কাল-ক্ষেত্র কেন, অমন বহু প্রত্যয়কেই দার্শনিকেরা জুড়ে এক করে দিয়েছেন, সারা বিশ্বকেই অনেকে মায়া বলেছেন, ছায়া ত ছাই!

অর্থাৎ ভূতবিদ্যায় এই যোগের স্বার্থকতা দার্শনিক যুক্তিতে নেই। তার তাৎপর্য্য ভূতবিদ্যায় পরিমাণের আবশ্যিকতা ও তার প্রকৃতির তাগিদে। যেটা লক্ষ্য করা যায়, এবং যেটি লক্ষ্য করা সম্ভব উভয়ই পরিমেয়, পরিমাণই তাদের সাধারণ গুণনীয়ক। অতএব পদার্থ-বিজ্ঞানের relativity, দর্শনের contingency, সমাজতত্ত্বের relativism পৃথক পৃথক অর্থ বহন করে। অতএব প্রত্যেক জ্ঞানেরই কালপ্রত্যয় পৃথক হয়েছে। আমার মতে পার্থক্যের প্রয়োজন নেই যদি জ্ঞানাবলীর যুক্তি বদলানো যায়, তাদের সীমা সম্বন্ধে নতুন চেতনা আসে। সে-কথা পরে আলোচ্য।

---

১ Tractatus Logico-Philosophicus—Wittgenstein.

আপাতত পার্থক্যকে দফা পিছু সাজাচ্ছি।[১] (১) মেকানিক্‌সের কাল সংখ্যাত্মক ; মানসিক, সামাজিক, ও ঐতিহাসিক কাল গুণাত্মক। (২) ভূতবিদ্যার কাল চতুর্থ ডাইমেনশন্‌; অভিজ্ঞতার কাল তা নয়, তার অতিপাত ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, যদিও পৃথকভাবে নয় (এইখানে বার্গসনের অপূর্ণতা), ঘটনার আশ্রয়ে, অন্তত দুটি ঘটনার তুলনায়। (৩) ভূতবিদ্যায় ক্ষেত্রের মতনই কাল আপেক্ষিক, পরিমাণের জন্য ; অভিজ্ঞতায় absolute now ও absolute here আছে, অতএব সমাজে ও ইতিহাসে আছে, কারণ এই জ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক যদিও তারা সব সময় অমন সূক্ষ্ম নয়। তাই মিস্ ষ্টেবিং লিখছেন, It must suffice to say that the discussion of time as a problem for philosophers is largely independent of physical speculations[২]। সমাজতাত্ত্বিকেরও তাই মত ঃ অঙ্কের সময় শূন্যগর্ভ (empty—Sorokin), সামাজিক সময় গুণাত্মক, অর্থাৎ, বিশ্বাস, আচার সমবেত জীবনের স্পন্দন, ছন্দ, লয় ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে (Durkheim-এর representation of social rhythms)। কিন্তু সংখ্যা ও গুণ কি পরস্পর-বিরোধী ? যদি হয় তবে গোল চুকেই গেল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাসে গুণ ভিন্ন হয়। মানুষের গায়ের উত্তাপ ৯৮-এর খুব বেশী কমলে ও ১০৭-এর বেশী বাড়লে কি সেই মানুষই থাকে ? জল আর হাইড্রোজেন পেরক্‌সাইড কি একই বস্তু ? অথচ পার্থক্য ত' কেবল একটি মাত্র পরমাণুর আধিক্যে ? তাপের একটু এ-পাশ ও-পাশ হলে পানীয় হয় চর্ব্ব্য। দেশে দশ লাখ শিক্ষিত থাকলে রাজ্য-শাসন একপ্রকার, দশ কোটি হলে অন্য প্রকার। অল্প কয়জন বিদ্রোহ করলে rebels, বেশী হলে belligerents—দুয়ের আইন-কানুন তফাৎ। বিশেষের গণিত আর সমষ্টির গণিতপদ্ধতি ভিন্ন। আমার বক্তব্য এই—ঐতিহাসিক আরো একটু বেশী বৈজ্ঞানিক হতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের, অর্থাৎ পরীক্ষার, যন্ত্রের প্রত্যয়ের ক্রমবিকাশ জেনে কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো সচেতন হতে পারেন যদি উভয়েই সংখ্যা ও গুণের সম্বন্ধ বুঝে নিজের নিজের কাজ করেন।

---

১ M. Sturt : Psychology of Time ; Durkheim : Elementary Forms of Religious Life, ch. I এবং Sorokin-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ L. S. Stebbing—Some ambiguities in discussions concerning Time in Philosophy and History p. 123.

ওধারে, সমাজতত্ত্ব বলছেনা যে সময় নিতান্তই ব্যক্তিগত ও অপরিমেয়। যতই ব্যক্তিগত, গোপন ও স্বকীয় হোক না কেন, কালকে গোটাকয়েক সর্ত্ত ও পরিবেশের মধ্যে থাকতেই হবে। সেই সর্ত্ত এই সমাজেরই আশ্রিত, সমাজেই আছে, ও কিছুকাল থাকবেও। কিন্তু যতই দেশী আচার-ব্যবহার ও সাময়িক বিশ্বাসের ওপর সমাজতত্ত্বের কাল নির্ভর করুক না কেন, সেই আচার-ব্যবহার-বিশ্বাসেরও স্থায়িত্ব, অর্থাৎ তাদের লয়, ছন্দ ও কালক্ষেপ আপেক্ষিক। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবহারেরও বৃহত্তর একাধিক আনুরূপ্য (correspondences) আছে যাদের এক সময়ের মালায় গাঁথার (Synchronise করা) আবশ্যিকতা অন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য থাকেই থাকে। সমাজতত্ত্বের সাম্প্রতিকতা ক্ষণিকবাদ নয়। অতএব সামাজিক কালের লয় বৃহত্তর হয় আচার-ব্যতিরিকে, সমাজতাত্ত্বিকের কল্পিত অনুভূত বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে। কারণ সমগ্র মানবজীবনের ঐক্যচেতনা একটি মাত্র ছোট গণ্ডীর পক্ষে সম্ভব নয়, জাতিবোধে বাধা দেয়। যেখানে সম্ভব হয়েছে, যেমন জেসুইট কিংবা য়িহুদী কিংবা আরব-মুসলমানের, মধ্যে সেখানেও একটি বিশেষ ধর্ম্মের প্রচারই ছিল সমাজের স্বার্থ। সে-স্বার্থ মূর্ত্ত হয়েছিল অধিনায়কের ইচ্ছায়। চেতনা ব্যক্তির আশ্রয়ে রূপ নেয়। তা হলে, সামাজিক কালকেও মাপতে হয়। কেবল এইটুকু ভুললে চলবে না যে সব সময় গ্রীণউইচের ঘড়ি ধরে সব সামাজিক ব্যবহার চলে না, তার নিজের লয়কেই প্রথমে দেখা চাই, নচেৎ তুলনার ভূমিকা পৃথক হয়ে সমাজেরই প্রতি অন্যায় করা হয়। অর্থশাস্ত্রে এই সাবধানের বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের ধারণা বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রের কাল (Short period and long period) বুঝি পাঁজি পুঁথিরই কাল। তা মোটেই নয়। সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রের পরিবর্ত্তন-সম্ভাব্যতাই period কথাটির অর্থ।[১] অন্যভাবে বিচার পরে করব।

যতটা আলোচনা করেছি তাই থেকে স্বতই ঐতিহাসিক কাল-প্রত্যয় পরিস্ফুট হয় না। জেনটিলে-র মত[২]—'The only history that really is, is not in time, but in thought and of thought ; it is eternal'—গ্রহণ করলে গোল ঢুকে যায়। তাঁর মতে আত্মজ্ঞানই ইতিহাসের মূল কথা, এবং আত্ম-

১ R. Opie - Marshall's Time Analysis: Economic Journal, June 1931

২ The Transcending of Time in History—G. Gentile (Phil & His.)

জ্ঞান কালের অন্তর্ভুক্ত নয়, কালকেও অন্তর্গত করে, অতএব আত্মাবোধ ও বাইরের ঘটনার বিরোধ নিষ্পত্তি হয় সচেতনতার দ্বারা। আমার মতে, এ প্রকার Concrete Synthesis বাস্তবও নয়, সমন্বয়ও নয়, স্বামী-স্ত্রীর রফা মাত্র। ব্যাপার এই, Selfই কালসাপেক্ষ, ও সমাজের দ্বারা পুষ্ট। পূর্ব্বেই স্বীকার করেছি যে পুষ্ট হলেও ব্যক্তিগত মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর প্রয়োজন। কিন্তু জেনটিলের Self বোধহয় একমাত্র মুসোলিনিরই আছে। ঐতিহাসিক আদর্শবাদ বরাবরই ডিক্‌টেটরশিপকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু ও-বস্তু ধাতে বসে না। যেটা ধাতে বসে তাতে জনসাধারণের ইচ্ছা, আশা, ভরসা, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, এক কথায় জীবন-যাত্রার তাগিদ আছে, এবং তারই জোরে ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত তৈরী হচ্ছে। ইতিহাস নেতৃবৃন্দের কর্ম্মতালিকা নয়। ইতিহাস সমবেত জীবনের, যার প্রাথমিক গঠন সমাজ।

অতএব সমাজতাত্ত্বিক যে কালপ্রত্যয় ঠিক করেছেন তাই থেকে সুরু করাই ভাল। ব্যক্তিগত মানসিক কালকে আপাতত বাদ দিচ্ছি, কারণ আমরা জানি[১] একজন ব্যক্তি কালের যে ধারণা করেন সে ধারণাও সে ব্যক্তির সমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিজ্ঞানের কাল ধরলে সুবিধা হবে না নানা কারণে, তার মধ্যে প্রধান এই, পণ্ডিতবর্গের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে বিজ্ঞান ও ইতিহাস কখনও মিলবে না। দর্শনের কালতত্ত্বও বাদ দিতে হচ্ছে কারণ, দার্শনিকদের মধ্যেই কাল সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবু সেই মতামতের মধ্যে একটি ধারা প্রবল। ডেকার্ট, স্পাইনোজা, লাইবনীটস, ভিকো, মরিস কোহেন, ডিলটাই, গাসেট সকলেই তর্ক-যুক্তিকেই (Logical reason) ঐতিহাসিক যুক্তি (Historical reason) থেকে আলাদা রেখেছেন। তাঁদের প্রমাণ তাঁদেরই যুক্তি-পদ্ধতিতে। এও সেই রফার মতন। আমার এই রফায় মন বসে না। আমার ধারণা ঐতিহাসিক কালের প্রকৃতি বুঝলে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক সকলেরই সুবিধা হবে, এবং তাঁদের যুক্তির দোষ কাটবে। তখন ঐতিহাসিক কালই হবে একমাত্র কাল।

কে একজন বলেছেন, 'Philosophy is a study of errors'। অনেকটা ঠিক, অন্তত যুক্তির সুবিধার জন্য। কালপ্রত্যয়ের গোল বাধে কেন জানবার জন্য পণ্ডিতবর্গের যুক্তির সাধারণ দোষ দেখাচ্ছি—যে-দোষ আবৃত হয় প্রত্যেক জ্ঞানের সীমানির্দ্ধারণে, প্রত্যেক জ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রত্যয় বিভাগে।

১ Mary Sturt—Psychology of Time p. 141.

জ্ঞানের বিভাগ জ্ঞানের উন্নতির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। ফলে কিন্তু বিশেষ জ্ঞানেরই উন্নতি হয়, খানিক দূর পর্য্যন্ত। সেইজন্য সর্ব্বদাই স্মরণ রাখতে হয় যে তাদের পরস্পরের মিলনের ক্ষেত্র আছে, আদিতে ও অন্তে; নচেৎ সেই জ্ঞানই আর অগ্রসর হয় না। তাই আমি প্রথমেই ইতিহাস ও বিজ্ঞানের, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের তথাকথিত পার্থক্যের অর্থাৎ পরিচিত নির্দ্ধারিত সীমা জরীপ করব, এবং পদ্ধতিগুলির বিশেষত্ব আছে কি না বিচার করব। আশ্চর্য্য এই, 'প্রত্যেক' পদ্ধতিরই সেই একই দোষ।

'পরিচয়ে'র তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ইতিহাসের যে অধ্যায় প্রকাশিত হয় তাইতে আমি নিজে ইতিহাসের সীমা-নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করি, তার পদ্ধতি ও প্রত্যয়ের দিক থেকে। আমার যুক্তি দর্শনের ধারানুযায়ীই ছিল। পূর্ব্বের প্যারাগ্রাফে যে-সব দার্শনিক বৃন্দের নাম করেছি আমি গত প্রবন্ধে তাঁদের মতই গ্রহণ করেছিলাম। ডিল্‌টাই একটু বেশী অগ্রসর হয়ে বলছেন যে বিজ্ঞানের যেমন প্রকৃতি, তেমনই ইতিহাসের Geisteswissenschaft। যিনি যে নামই দিন না বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পৃথকীকরণের মধ্যেই একটা সামাজিক প্রয়োজন কাজ করেছে। ডেকার্ট প্রজ্ঞাকে প্রধান করেছিলেন ও ইতিহাসকে সাহিত্যের কোঠায় ফেলেছিলেন এই জন্য যে তখন ইতিহাসের অর্থ পুরাতনকে রক্ষণাবেক্ষণ ও আপ্তবচন হিসেবেই লোকে জানত। ততদিন পর্য্যন্ত ইতিহাস মানেই প্রভুত্বের সমর্থন ছিল। তাই প্রজ্ঞা, যেটি বিজ্ঞানের মূল বিশ্বাস, হল বিরোধের মন্ত্র। কিন্তু আজ কি কেউ ইতিহাসকে প্রামাণ্য-প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, কিংবা প্রকৃতিকে কার্টে-সীয়ান ভুজের অন্বয় ভাবে? প্রত্যয়ের অর্থ-পরিবর্ত্তনের মধ্যেই কালের অতিপাত যখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তখন বিজ্ঞানের মধ্যেই ইতিহাস (বিজ্ঞানের) কাজ করছে এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের ভেতরই বিজ্ঞানের প্রত্যয় কাজ করছে স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞান কালকে কালস্রোত থেকে যতই বিচ্ছিন্ন করুক না কেন, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের ইতিহাস,পরীক্ষার কোনো না কোনো মুহূর্ত্তেও পরীক্ষকের মনের ওপর কাজ করে। কালের গতি দুভাবে পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিকের মনকে একত্রে সচল করে ; এখন ও পুরাতনের জের হিসেবে। তা ছাড়া, ভবিষ্যতের চিন্তাও তাঁর মাথায় কখনও কখনও থাকে। যখন পুরাতন পরীক্ষার ফল যাচাই হচ্ছে তখন মিল হবে কি না, হচ্ছে কি না তাঁকে দেখতে হয়, সেই মত যন্ত্রপাতি সাজাতে হয়। ফলিত

বিজ্ঞানে কালের অগ্রস্থতি অত্যন্ত পরিষ্কার, তাঁর ভাবনা কি উপায়ে সাধারণের সুবিধা হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানেও ইতিহাস মিলে মিশে থাকে, তাই বৈজ্ঞানিক কালের অন্তরে ঐতিহাসিক কালের প্রেরণা থাকা চাই, না থাকলে বৈজ্ঞানিক বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে পড়েন। অতএব ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে বিরোধ সম্পূর্ণ (Contradictory) নয়, আংশিক (Contrary)। ইতর ব্যবর্ত্তকতা কোনো জ্ঞানে নেই, কেন না কোনো কর্ম্মে নেই। Excluded middle কোন্ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য ?

পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে কি ? ধরা যাক্, ঐতিহাসিক একটি যুগ-বর্ণনার জন্য এক পুরাতন পুঁথি ঘাঁটছেন যা দিয়ে সেই যুগের ওপর, তার কোনো ঘটনার ওপর তিনি আলো ফেলতে চান, কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে চান। পুঁথি পড়তে পড়তে পুঁথিকেই তাঁর বিচার করতে হয়, সেই যুগের প্রতিবেশে ঐ পুঁথির স্থান নিরূপণ করতে হয়। প্রধান উদ্দেশ্য তখনকার জন্য স্থগিত রইল। যেটা ছিল জ্ঞানের উপায় সেই উপায় হয়ে উঠল, ক্ষণিকের জন্য, জ্ঞানের বিষয় ! ক্ষণের জন্যও কালস্রোত অবরুদ্ধ হল। কেবল তাই নয়, ভাঁটা এল তাতে। পুঁথির সাহায্যে যে-খবর তিনি পরে পাবেন প্রত্যাশা করছিলেন সেই খবরই তাঁকে প্রথমেই জানতে হচ্ছে। পর হল পূর্ব্ব ! পুঁথি-বিচারের পর যে কাজ-চালানো ব্যাবহারিক সত্য (hypothesis) তিনি ধরেছিলেন, সেটা যদি সমর্থিত হয় তবে তার মূল্য বাড়ল, না হলে পরিত্যক্ত হল, এবং অন্য একটি ব্যাপকতার ব্যাবহারিক সংজ্ঞার প্রয়োজন উঠল।

পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকের অবস্থা একই। তিনি তাপ পরিমাণের জন্য যন্ত্র সাজালেন। যে কোনো যন্ত্র যে- কোনো উপায়ে খাড়া করলেই চলে না, একটা পূর্ব্ব ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তাঁকে সাজাতে হয়। অর্থাৎ যন্ত্র নির্ব্বাচন ও সাজাবার প্রক্রিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞান হলে তাঁর চলে না। কেবল তাই নয়। যন্ত্রের মধ্যে পারা আছে, পারাই নিরিখ, কারণ তাপবৃদ্ধির সঙ্গে অন্য বস্তুর চেয়ে পারাই সমান ভাবে প্রসারিত হয়। শেষ সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বে নিশ্চয় জানা ছিল তাঁর ; থার্ম্মোডাইনামিক্সের ব্যাবহারিক রীতি অস্পষ্টভাবেও তিনি নিশ্চয় জানতেন, না হলে পারা-দেওয়া যন্ত্র বাছলেন কেন ? অথচ, তিনি সেই থার্ম্মোডাইনামিক্সেরই নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করতে কিংবা স্পষ্টতরভাবে জানতে চাইছেন। এডগার

উইণ্ড[১] এই প্রকার পূর্ব্বাপর ক্রমের ওলট পালট, এই পদ্ধতি ও বিষয়ের পরিবর্ত্তনকে একস্থানে paradox অন্যত্র circular reasoning, আবার হঠাৎ dialectical বলে ফেলেছেন। তাঁর মতে বোধ হয় ডায়েলেকটিক ও চক্রাকার যুক্তি এক। সে-যা হোক্, একই বিবাদ ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের।

এখানে বলা চলে, যে-বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্রের সাহায্য তাপের রীতিনীতি জানতে চান তিনি নিজে সে যন্ত্রের অবিষ্কারক নন। অবশ্য নন, কিন্তু উত্তরাধিকারী বটে, এবং এইখানেই জ্ঞান হিসেবে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকতা। কেবল তাই নয়, যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্ব জ্ঞানের মূল্য বাড়ছে। এডগার উইণ্ড যখন পূর্ব্বেকার দৃষ্টান্ত দিয়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সাধারণ তর্কপদ্ধতির ভুল দেখাচ্ছেন তখন তিনি একটি কথা লিখতে নিজে ভুলেছেন—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও ঐতিহাসিক গবেষণার পর যন্ত্র ও পুঁথির মূল্য যা ছিল তাই থাকে না। যখন পুঁথি গবেষণার এবং যন্ত্র তাপরীতি আবিষ্কারের অংশীদার তখন তাদের তাৎপর্য্য গবেষণা ও আবিষ্কারের পর বেড়েই চলল, নতুনতর হল। আরো এক কথা মানতে হয়। যন্ত্র ও পুঁথি নিজেরা অংশীদার নয়, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যচালিত হয়ে তাদের 'জড়ত্ব' যায়। জড়ের সাথে জীবও মিশে যাচ্ছে। ডিলটাইর মতে বৈজ্ঞানিক অংশীদার নন, কেবল ঐতিহাসিকই অংশীদার—এই হল বিজ্ঞান ও ইতিহাসের একটি প্রধান পার্থক্য। তাঁর মত সেই মেটিরিয়ালিষ্ট ও মেকানিষ্টিক দর্শনের অনুযায়ী যার আদেশে বিষয় আর বিষয়ী পৃথক হয়, যার হুকুমে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক্, সব জ্ঞানীই জ্ঞানের পদ্ধতি ও উপায় থেকে বহিষ্কৃত হয়। অতএব সীমার মাঝে প্রবেশ নিষেধ লেখার অর্থ জ্ঞানের গতিকে, অর্থাৎ জীবনেরই গতিকে অস্বীকার করা। সুবিধার প্রতি উৎসাহ দেখাতে যদি সত্য-সম্বন্ধের প্রতি আগ্রহ কমে যায় তবে উপকারটুকু বেশী হয় না, কারণ সেটি যুক্তির আবর্ত্তে শক্তির নিঃশেষ করে। মোদ্দা কথা এই বিষয়, বিষয়ী ও পদ্ধতির interpenetration-এর ফলে নতুন সার্থকতা অর্জ্জন, এই পূর্ব্বের মধ্যে পরের অনুপ্রবেশ, পর-কে নতুনভাবে গড়াকে circular বলে না, ডায়েলেকটিক বলে। ডায়েলেকটিক সব জ্ঞানেরও পিছনে আছে—এঙ্গেলসের এই বাক্য হেয় নয়। ডায়েলেক্‌টিক চক্রাকারে ঘোরে না। চক্রবৃদ্ধিতে বাড়ে।

---

১ Edgar Wind—History and Natural Science in Philosophy and History.

অন্য দিক থেকেও ডায়েলেকটিক গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের সমবেত ব্যবহার বদলাচ্ছে, চোখের সামনে। ঐতিহাসিক আবিষ্কারের ফলে পরিবর্ত্তন প্রত্যয়ে, বিশ্বাসে, ধারণায়। শেষেরটি সাধারণত সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু সুস্পষ্ট হয় কখন? যখন নতুন সামাজিক জীবন জোর দিচ্ছে। জোর আসছে বিজ্ঞানের ফলে জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন থেকেই। তখনই ঐতিহাসিক আবিষ্কার সম্বন্ধে সকলে সচেতন হচ্ছে। তবেই, বিজ্ঞান ও ইতিহাস মিলে মিশে কাজ করছে না কি? বন্ধন তার জীবন, শক্তি তার জীবনের গতির, বন্ধন-রীতি তার ডায়েলেকটিক। সুবিধার জন্য মেকানিষ্টিক মেটিরিয়ালিজম, সম্বন্ধের সত্য উৎ-ঘাটনের জন্য ডায়েলেকটিক। বৈজ্ঞানিকের প্রাথমিক আগ্রহ যন্ত্রে থাকুক, তিনি যত পারেন নৈর্ব্যক্তিক হোন; ঐতিহাসিকও পুঁথি ঘাঁটুন যত পারেন, তাঁর অনুভূতি আরো সূক্ষ্ম হোক ব্যাপক হোক—কিন্তু বর্ত্তমানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চিরকাল চলে না, অতীতকেও নয়, জীবন প্রতিশোধ নেবে এই ডায়েলেকটিকের অস্ত্রে, যার জোরে সমন্বয়ের নতুন স্তরে বিজ্ঞানও ওঠে আবার ইতিহাসও ওঠে, যেখানে কালপ্রত্যয় নতুন অর্থ সংগ্রহ করে, ভিন্ন ভিন্ন কালপ্রত্যয়ের পুরাতন পার্থক্য অমান্য করে। এত জোর এক জীবনেরই হতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

স্মরণ

বাদুড়ের ডানা থেকে ঝরে পড়া আঁধারের গুঁড়া,
নীরব সঙ্গীত সম ঢেকে দিলো আলোর সাগর।
ঢেকে দিলো পথ-ঘাট, ঢেকে দিলো মিনারের চূড়া,
আমার নীরন্ধ্র-প্রাণে—তুমি সাখি রয়েছ জাগর।
তোমার প্রশান্ত-স্নিগ্ধ বিমলিন নীলাভ নয়ন,
আমার ঝিমায়ে পড়া স্বপ্ন-সাধ করিছে চয়ন॥
আকাশে ফুটিলো তারা, ছাড়াইয়া পাইনের বন—
জাগিলো রাতের চাঁদ মনে হলো তুমি নাই পাশে।
এমন চাঁদিনী রাত, মদালস বিহগ-কূজন,
স্বচ্ছ-নির্ঝরিনী-ধারা গুমরায় কল কল ভাষে।
দেওদার বন হতে সমীরণ বাউল-উদাসী,
আমারে একেলা হেরি হা—হা করি ওঠে অট্টহাসি॥
তুমি ছায়া সমা এলে সঙ্গোপনে হৃদয়ে আমার
ফেনিল সমুদ্র হতে জন্ম লভি যেমন 'ভেনাস্';—
এই পৃথিবীর পথে রেখে গেলো অস্তিত্ব তাহার,
তুমি এলে উড়ে-চলা সন্ধ্যার আঁধারে বুনো-হাঁস।
এমন চাঁদিনী রাত, এমন রূপসী রাত ভরি,'
আমার মিনতি সখি, স্মৃতির পসরা রাখো ধরি'॥
প্রভাতী-বলাকা যবে গগনে মেলিবে দু'টি ডানা,
তরুণ তনুটি হতে—অরুণ ঢালিবে স্বর্ণ-রেণু।
আবার ঢাকিবে আঁখি অকস্মাৎ হে বিবশমানা,
রাতের তিমির তলে,—বাজিবে পাইন-বন-বেণু।
আমার মানস-পটে যদি টানো বিস্মৃতির রাস
স্মৃতির সমুদ্রে মোর পুন জন্ম লভিয়ো 'ভেনাস'॥

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পুস্তকপরিচয়

Freud and Marx—By R. Osborn, with an introduction by John Strachey (Victor Gollancz Ltd.)

মার্কস ও ফ্রয়েডের তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই বইখানি প্রকাশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়েছে এইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করবার দাবী অনেকেই করেছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈষ্টম্যান ও পোষ্টগেটের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে পোষ্টগেট অপেক্ষাকৃত সাবধান লেখক ; কিন্তু তিনিও ডায়ালেক্‌টিক বিসর্জ্জন না দিয়ে যে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় করা সম্ভব সেটা কল্পনা করতে পারেন নাই। আর এ কাজটাও এত দুরূহ যে এতে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত সাহসের কাজ, কারণ অনেকেরই এই উভয় মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত ভাসাভাসা। মার্কসবাদীরা এতকাল ফ্রয়েডের আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকে ফ্রয়েডীয় মতবাদকে বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলতেই নারাজ। মিরস্‌কী তাঁর The Intelligentsia of Great Britain গ্রন্থে এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একদল আধুনিক লেখকের কৌতূহল সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন

"Freud has been accepted as the consecration of all desires and lusts, a sort of free pass to every kind of freedom or looseness, a complete liberation from all discipline. He has become the Bible of this intelligentsia."

টি, এ, জ্যাক্‌সনও তাঁর অন্যান্য হিসাবে মূল্যবান গ্রন্থ "ডায়ালেকটিকসে" এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

For the more politically conscious denizens of the jungle which has the British Museum for its central oasis, Freud's *metaphysic*, and his *metaphysical sociology*, and their implicit idealist and solipsist epistemology have provided a yearned-for way of escape from the grim fighting front of Dialectical Materialism and revolutionary proletarian communism back into the camp of intellectualist reaction, sophistry, subjectivism, and at the last, supernaturalism,"

এক কথায় বল্‌তে গেলে মার্কসপন্থীরা ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনার সময় সাধারণতঃ আলোকের চেয়ে উত্তাপই বিকীরণ করেছেন বেশী। অবশ্য ইষ্টম্যান, পোষ্টগেট প্রভৃতি ছিদ্রান্বেষীদের মার্কসবাদের ত্রুটি প্রদর্শনের বিশেষ মূল্য নাই ; মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদ এই উভয় বিষয়ের অজ্ঞতার একটা সুন্দর ও সুক্ষ্ম ভারসাম্যই তাঁদের মত অনেক অসহিষ্ণু সমালোচকের এ বিষয়ে তিক্ত মন্তব্য করবার একমাত্র কারণ। পক্ষান্তরে ফ্রয়েডীয় মতবাদ সম্বন্ধে যাঁরা লেখেন তাঁরাও অনেকে মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমনকি ফ্রয়েডের নিজের লেখাতেও মার্কসবাদ সম্বন্ধে এমন অনেক মন্তব্য আছে যা ধোপে টেঁকে না। New Introductory Lectures on Psycho-analysis বইখানার শেষ অধ্যায় পড়লেই দেখা যায় যে মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতির লেখার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় নাই এবং সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন। ডাঃ গ্লোভারের বইগুলিও মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় অজ্ঞতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এমনকি অধ্যাপক ফ্লুগেলও মার্কসবাদ সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে লিখেছেন যে শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে কেবল id-এর যথেচ্ছা-চারিতাই বেড়ে যাবে মাত্র। তাঁর মতে অযৌক্তির Super-egoর নিয়ন্ত্রণের বশীভূত না থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ধ্বংস করাই কাম্য তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ego-কেও ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয়ের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়ে যে Super-egoর শক্তি ক্রমশঃ খর্ব্ব হয়ে যুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ego ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে এবং শ্রেণীসংঘর্ষ যে 'Sublimation'এর উৎকৃষ্টতম পন্থা এই সহজ সত্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এর মূল কারণ বোধ হয় মার্কসবাদের সমগ্র রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাব।

মার্কসীয় ডায়ালেকটিকসের উল্লেখে আতঙ্ক ও ফ্রয়েডের নামে নাসাকুঞ্চন, এই উভয়সঙ্কট থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হয়ে অস্‌বর্ণ্‌ আধুনিক সভ্য জগতের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। মার্কস্‌, এঙ্গেলস্‌, লেনিন ও ষ্টালিন প্রভৃতির লেখা থেকে তিনি এমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যার সাহায্য গ্রহণ করলে ফ্রয়েডের মতবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সামঞ্জস্য করা অসম্ভব বা যুক্তি-হীন বলে মনে তো হয়ই না, এমন কি তার সমগ্র ফল এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। এই পরিণতিকে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক ও ইতি-

হাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যারই সম্প্রসারণরূপে গ্রহণ করবার পক্ষে এত অকাট্য যুক্তি অস্‌বর্ণ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন, যে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও সতর্ক মনও তাতে সায় না দিয়ে পারে না। জন ষ্ট্রেচির মত বিখ্যাত লেখকও এই জন্য অস্‌-বর্ণের এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিক সমর্থন ও মার্কসীয় সাহিত্যে তাঁর এই অসামান্য দানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বইখানির ভূমিকা লিখতে যেয়ে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলেছেন যে, এঙ্গেলস্‌ যদি আর কুড়ি বছর বেশী বাঁচতেন, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের আবিষ্কারকে অবহেলা করতেন না ; বরঞ্চ তিনি যেমন প্রাণি-বিদ্যায় ডারউইন ও নৃতত্ত্বে মরগ্যানের আবিষ্কারের সার ভাগ গ্রহণ করে ডায়ালেক-টিকের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহার করেছিলেন, মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডের আবিষ্কারের বেলাও তার অন্যথা হতো না। বিশেষতঃ আদিম মানব সমাজের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর The Origin of Family : Private Property and the State গ্রন্থে লিখেছিলেন,

"But mutual tolerance of the grown males, freedom from jealousy, was the first condition for the formation of large and permanent groups."

হঠাৎ পড়লে মনে হয় যেন ফ্রয়েড-এর Totem and Tabu থেকে উপরের বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে এঙ্গেলসের উক্ত তত্ত্বের ইঙ্গিতের স্বপক্ষে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

অবচেতন মনের সক্রিয়তা সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের মতবাদ এঙ্গেলসের উক্তি সমর্থন করে। Marx-Engels Correspondenceএ প্রকাশিত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে মেহরিঙ-এর কাছে লেখা এঙ্গেল্‌সের চিঠিতে আমরা পাই,

"Ideology is a process accomplished by the socalled thinker consciously, indeed, but with a false consciousness. The real motives impelling him remain unknown to him, otherwise it would not be an ideological process at all. Hence he imagines false or apparent motives."

অবশ্য এঙ্গেলস্‌ "ideological process"-কে আর্থিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। ষ্টার্কেনবুর্গকে লেখা তাঁর একখানা চিঠিতে (জানুয়ারী ২৫, ১৮৯৪) আছে,

"The political, legal, philosophical, religious, literary, artistic etc., development rest upon the economic. But they all react upon one another

and upon the economic base. It is not the case that the economic situation is the *sole active cause* and everything else only a passive effect. But there is a reciprocal interaction within a fundamental economic necessity which *in the last instance* always asserts itself."

যাঁরা মনে করেন যে মার্কসবাদীরা একমাত্র আর্থিক কারণ ভিন্ন রাষ্ট্রিক প্রভৃতি কারণের সক্রিয় অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁদের সম্বন্ধে স্মিডট্-এর নিকট একখানা চিঠিতে (অক্টোবর ২৭, ১৮৯০) এঙ্গেলস্ লিখেছেন,

"What all these fellows lack is dialectic. They see cause here, effect there. They do not at all see that this method of viewing things results in bare abstractions ; that in the real world such metaphysical polar opposits exist only in crucial situations ; that the whole great process develops itself in the form of reciprocal action, to be sure, of very unequal forces, in which the economic movement is far and away the strongest, most primary and and decisive. They do not see that here nothing is absolute and everything relative. For them Hegel has never existed."

ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের আর্থিক ছাড়া অন্যান্য কারণও যে আছে, এটা স্পষ্ট করে বোঝাতে যেয়ে ব্লখ্-এর নিকট একখানা চিঠিতে (সেপ্টেম্বর ২১, ১৮৯০) তিনি লিখেছেন,

We ourselves make our own history, but, first of all, under very definite presuppositions and conditions. Among these are the economic, which are finally decisive. But there are also the political etc. Yes, even the ghostly traditions which haunt the minds of men play a role albeit not a decisive one."

ঐতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে যেয়ে তিনি ঐ চিঠিতেই লিখেছেন,

"According to The Materialist Conception of History, the determining element in history is ultimately production and reproduction in real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted. If, therefore, somebody twists this into the statement that the economic element is the only determining one, he transforms it into a meaningless, abstract, and absurd phrase. The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of the class struggle and its consequence—the reflexes of all these actual struggle in the brains of the combatants ; political, legal, philosophical theories, religious ideas···also

exercise their influence upon the course of the historical struggles, and in many cases preponderate in determining their form."

তদানীন্তন তরুণ মার্কসবাদীদের এই আর্থিক একদেশদর্শিতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐ চিঠির শেষে এঙ্গেলস্ লিখেছেন,

"Marx and I are ourselves partly to blame, we had to emphasise this main principle in opposition to our adversaries, who denied it, and we had not always the time, the place, or the opportunity to allow the other elements to come into their rights."

এই চিঠিখানার শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এখন, অর্থাৎ যে যুগে পৃথিবীর একষষ্ঠাংশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর্থিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখেও, মার্কসের ফয়েরবাখ বিষয়ক একাদশ প্রস্তাব অনুযায়ী বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে জগৎকে পরিবর্ত্তিত করার দিকে বেশী জোর দেওয়া দরকার। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ যখন তাঁদের মতবাদ প্রচার করেছিলেন তখনকার সঙ্গে এখনকার জগতের আর্থিক পরিস্থিতির গুরুতর পার্থক্য আছে। তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন যায়গায় সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে নাই ; উপরন্তু এখনকার মত পৃথিবীর সমস্ত দেশের আর্থিক অবস্থা একটা সঙ্গীন সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়ায় নাই। ষ্টালিন বলেছেন,

"Marx and Engels lived in a pre-revolutionary period, when imperialism was still in an embryonic condition, when the workers were only preparing for the revolution, when proletarian revolution had not yet become an immediate and practical necessity."

সুতরাং এ যুগে আর্থিক পরিস্থিতির চেয়ে দলগত কর্ম্মপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করে আমূল সামাজিক পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা বেশী দরকার। সেই জন্য এঙ্গেলস্ আর্থিক দিকটার উপর বেশী জোর দিতে গিয়ে যে 'Formal' ব্যাপারগুলি অবহেলা করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার দিকে মনোযোগ দেবার উপযুক্ত সময় এসেছে। মেহরিঙ-কে লেখা পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে এক জায়গায় আছে,—

"In doing so we neglected the formal side—the way in which these notions come about—for the sake of the content. This has given our adversaries a welcome opportunity for misunderstandings."

উপরে যে বিষয়টার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, এবং সেজন্য Marx-

Engels Correspondence থেকে এঙ্গেলসের লেখা কয়েকখানা প্রয়োজনীয় চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা হল, ঠিক সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অস্‌বর্ণ মার্কসের সঙ্গে ফ্রয়েডের একটা সমন্বয় স্থাপন করবার চেষ্টা করে-ছেন। এতকাল মানুষের আর্থিক প্রতিবেশের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে; গ্রন্থকার বলতে চান যে এখন এমন ঐতিহাসিক অবস্থা এসেছে যখন মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে এই প্রতিবেশের সম্পর্কের আদান-প্রদানের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম্ম-পদ্ধতি রচনা করা দরকার। অবশ্য মানুষের স্বভাব কিছু একটা চিরন্তন পদার্থ নয়; জাগতিক পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবেরও কিছু পরি-বর্ত্তন হয়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের গতি অত্যন্ত মন্থর। এর কারণ মানুষের মজ্জাগত অভ্যাস; একটা চিন্তাগত বা ব্যবহারগত অভ্যাস নিজের উন্নতির পরিপন্থী জেনেও অনেক সময় মানুষ সেটাকে বদলাতে পারে না। এই সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক,

"The power of habit ingrained in millions and tens of millions, is a terrible power."

যে সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে, সেটার প্রতি জনসাধারণের অন্ধ আনুগত্যের মূঢ় জড়তা সামাজিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধা। এই বাধার মূলগত কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে অস্‌বর্ণ ফ্রয়েডীয় Super-egoর সঙ্গে এর অভিন্নতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন ও সেই সম্পর্কে id, ego ও Super-ego ফ্রয়েড কি অর্থে ব্যবহার করেছেন সেটা বোঝাবার চেষ্টা ও আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করেছেন। ধর্ম্ম সম্পর্কিত আলোচনায় অস্‌বর্ণ মার্কস ও এঙ্গেলসের মতের সঙ্গে ফ্রয়েড-এর মতবাদ তুলনা করে দুয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহিরাশ্রয়ী অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়; আর ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরাশ্রয়ী অর্থাৎ মানসিক কারণের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। কিন্তু উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় সামাজিক মানুষের ব্যবহার।

অস্‌বর্ণ এই উভয় মতবাদের সমন্বয় করবার জন্য বইখানির প্রথম অংশে ফ্রয়েডের আবিষ্কারের মূল সূত্রগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ও দ্বিতীয় অংশে

মার্কসের মতবাদের সঙ্গে প্রথমে আলোচিত ফ্রয়েডের আবিষ্কারের সম্পর্ক নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক মার্কস মোটামুটি বাইরের দিক থেকে ও ফ্রয়েড মনের দিক থেকে বুঝেছেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরবিরোধী, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর পরিপূরণশীলও বটে ; ইংরাজিতে বলতে গেলে, "dialectical opposits"। তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি বহু যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তার মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সত্যই অচিন্তিতপূর্ব্ব। তিনি বলতে চান যে আমাদের জাগ্রত চিন্তা অনেকাংশে "dialectical" নয়; জাগতিক ঘটনার নিরবচ্ছিন্নতাকে আমরা বুঝবার সুবিধার জন্য সাধারণতঃ যে "metaphysical" ও "abstract" চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করি, স্বপ্নের সাবলীল ও চিত্রকল্প চিন্তার "concretness" তারই একটা "dialectical opposite" বা বিরুদ্ধ পরিপূরক। অস্‌বর্ণ বলেন যে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান সমস্তটাই "unconsciously dialectical," অবচেতন মনের জ্ঞান ব্যাপারটাই ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু এই "dialectical process"-কেই মনের প্রকৃত স্বরূপ বলে নির্দ্দেশ করে ফ্রয়েড সাধারণ ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের "formal" ও "metaphysical" দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে "dialectical stage"এ-উপনীত হয়েছেন। এ বিষয়ে আরও অনেক বিচার ও মন্তব্য আছে যা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আগ্রহান্বিত করবে। এই বইখানিতে এত চিন্তার খোরাক আছে যে প্রত্যেকেরই পড়ার শ্রম সার্থক হবে। ষ্ট্রেচির ভূমিকাটিও অত্যন্ত সুলিখিত।

গ্রন্থকারের লেখার প্রসাদগুণও বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে বইখানি সব দিক থেকেই উপভোগ্য। তবে বইখানির শেষ অধ্যায়ে তিনি যে ব্যাবহারিক কর্ম্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা দিয়েছেন সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশের কর্ম্মীদের সঙ্গে লেখকের সব জায়গায় মতের মিল হবে কি না বলা শক্ত। এমন কি ষ্ট্রেচিও এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে অস্‌বর্ণের পরিকল্পিত ব্যাবহারিক কর্ম্মপদ্ধতির উপর ফাশিষ্ট ডিক্টেটরশিপ কিছু ছায়াপাত করেছে বলে অনেকের মনে হওয়া বিচিত্র নয়; আর তত্ত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়নীতির মাপকাঠিতে বিচার করে দেখলে সম্ভবতঃ তাঁর বইখানার মূলনীতির মধ্যেই কিছু গলদ বেরিয়ে পড়তে পারে। যেমন, ফ্রয়েড়ীয় মতবাদকে মার্ক্‌সীয় দর্শনের সঙ্গে সম-

পর্য্যায়ে স্থাপন করে তিনি মনোবিকলনকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ পরিপূরক বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভাল রকম বিশ্লেষণ করলে হয় তো দেখা যাবে যে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে মনোবিজ্ঞানের চেহারাটাই অনেকটা বদলে যাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখলেও নিরপেক্ষ সমালোচকের মনে এ সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে চিকিৎসক রূপে ফ্রয়েডের অভিজ্ঞতা সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরে বিস্তৃত নয়। সুতরাং, ধনী, ভদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোবিকারের (বিশেষতঃ উত্তরসামরিক যুগের) বিশ্লেষণ থেকে তিনি মানবমনের সাধারণ বিধিতে পৌঁছাতে পারেন কিনা এ নিয়ে বিচার বিতর্কের অবসর নিশ্চয়ই আছে। পরিশেষে আর একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—বইখানির একটি নির্ঘণ্ট-পত্র থাকলে পাঠকের সুবিধা হতো। আশা করি আগামী সংস্করণে সমস্যাগুলির গভীরতর বিচার ও নির্ঘণ্ট-পত্রের ত্রুটি নিরাকৃত হবে।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

Forward From Liberalism—by Stephen Spender
(Gollancz)

আধুনিক কয়েকজন ইংরাজ লেখক সাহিত্যিক নন্দদুলাল নন; অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন না যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মন্থর মৃত্যু এমন কিছু বড়ো দুর্ঘটনা নয়, যেহেতু এখন পর্য্যন্ত তাঁরা নিজেরা কয়েকটি উত্তম কবিতা, ছোট গল্প কিম্বা উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম। দুর্ঘটনার আয়তনে বিচলিত হয়ে অ্যাংগ্লো ক্যাথলিসিজ্‌ম্ কিম্বা শান্তিবাদের বালুতে মাথা গুঁজে ঝড়ের আগে উটপাখীর মত নিষ্ফল নিষ্কৃতি এঁরা খোজেন নি, সে জন্য ধন্যবাদ।

১৯৩৩এর পর হিটলারের উত্থান সমস্ত ইউরোপে যুদ্ধ ও বর্ব্বরতার বিভীষিকা এনেছে। শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত লিবারল ইউরোপে কতদূর বিস্তৃত এবং অন্তঃশীল তা সমসাময়িক ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। এর আগে অনেক সাহিত্যিকই সনাতন জীবনপ্রথার সমালোচনা করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, কিন্তু সেই আত্মসমাহিত ভাব এখন সম্ভবপর নয়। সে জন্য আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে একটি পথ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। কয়েকজন লেখক খোলাখুলিভাবে বলেছেন

যে শ্রেণীহীন সভ্যতায় কাজ নেই, চপহাউসের ইতরতায় আমাদের স্পৃহা কম, চার্চ্চ গঠনে মনোনিবেশ করাটাই সভ্যতার পরিচায়ক। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। দুএকজন সম্ভবতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করছেন। অন্যদিকে অনেককেই ফ্যাশিজমের বর্ব্বর অভিযান, সমসাময়িক সংস্কৃতি-সংকট, প্রাচুর্য্যের মধ্যে দারিদ্র্যের দুঃস্বপ্ন, ইত্যাদি পীড়িত করেছে, এবং নতুন সমাজগঠনের সম্ভাবনায় তাঁদের প্রবল আস্থা আছে। স্পেণ্ডর এদের মধ্যে একজন: Everything which we do to fight for life, to extend knowledge and understanding, create beauty, must be bound up with the political will to make impossible war, hatred and public misery which destroy these values.

ধনী-শ্রমিকের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর জন্য প্রধানতঃ 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজ্‌ম্' রচিত। বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে পড়েন। মধ্যশ্রেণীর সাহায্য আজকের সঙ্কটের সময় জাতীয় ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে অন্ততঃ ফ্যাশিজমের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারে, কারণ প্রতিক্রিয়াপন্থী মধ্যশ্রেণীই ফ্যাশিজমের প্রাণশক্তি। এই ধারণার ভিত্তিতে ইউরোপে সম্প্রতি সম্মিলিত জনসঙ্ঘের জন্য আন্দোলন চলেছে এবং ফ্রান্স ও স্পেনের সাম্প্রতিক ইতিহাস অনেকের মনেই নতুন উৎসাহ এনেছে। ইংলণ্ডে মধ্যশ্রেণীর সংগঠন অত্যন্ত দৃঢ়। এর মধ্যে অনেকেই আজকাল সভ্যতার দুর্দ্দিনে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। এঁরা ফ্যাশিজমে আস্থাবান নন, স্বাধীনতাকে সব চেয়ে বড়ো জিনিষ বলে মনে করেন, কিন্তু ওদিকে কমিউনিষ্ট জুজুর ভয়পীড়িত। স্বাধীনতায় বিশ্বাস এই সূত্র তাঁদের এবং সাম্যবাদীদের একত্রে বাঁধবার সহায়তা করবে, স্পেণ্ডরের এই ধারণা। সেজন্য 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজ্‌ম্' অনেকটা ব্যক্তিগত হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়, কারণ স্পেণ্ডর উপরোক্ত শ্রেণী হতেই আসছেন, এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করার আগে খুব সম্ভব তাঁকে অনেক মানসিক বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে হয়েছে। লিবেরলের সাম্যবাদী হবার ইতিহাস পাঠক এই পুস্তকে পাবেন। ধনী-শ্রমিকের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ের কয়েকজনের কাঠিন্য ভেদ করতে 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজ্‌ম্' সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

উদার মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ যে শ্রেণীর পুষ্টিসাধন করেছে, তার কাছে উদারপন্থীদের আদর্শ যে উজ্জ্বল বলে ঠেকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু উদার

গণতান্ত্রিকতা বর্দ্ধিষ্ণু বুর্জোয়ার সৃষ্টি। স্পেণ্ডরের মনে লিবেরল তত্ত্ব ও ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। লিবেরল তত্ত্বে লিবেরল আদর্শে তিনি গৌরব বোধ করেন। কিন্তু উপরোক্ত আদর্শ রাজনৈতিক পার্টির কার্য্যপ্রণালীতে আবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে এর আভ্যন্তরীণ সমস্ত খুঁত আর বিরোধ ধরা পড়ল। তখনই মার্ক্সের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একে ক্ষতবিক্ষত করতে বাধ্য, তখনই একথা মানতে হবে যে লিবেরল কার্য্যপদ্ধতি এবং আদর্শবাদ শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতেই গঠিত, বিশুদ্ধ পরার্থপরতা নয়। উদারপন্থী রাজনীতি, তখন বুর্জোয়া মুখোস বলে ঠেকে, মনে হয় লিবেরল 'ইউটোপিয়া' সকল সাম্রাজ্যবাদপ্রসূত, পীড়িত শ্রেণীর সাহায্যে ক্ষমতা পাবার আন্দোলন মাত্র; ক্ষমতা হাতে আসার পর প্রচলিত সমাজব্যবস্থা রক্ষণা-বেক্ষণের 'ইডিওলজি'ই উদার গণতান্ত্রিকতার আসল কথা।

এই আসল কথাটা স্পেণ্ডর মোটামুটি ভাবে মানেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে লিবেরল আদর্শবাদ সভ্যতার চিরস্থায়ী সম্পত্তি, শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হলেও এই আদর্শ কখনো মরবেনা; লিবেরল পার্টির সমাধি হয়েছে বললেই চলে, কিন্তু তার তত্ত্ব এখনো জীবন্ত: এখনো ত ইউরোপে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধতা বহু লিবেরল সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ব্যক্তিবিশেষ জীবন বিপন্ন করে করছেন। কালক্রমে পুরোনো আদর্শের রূপান্তর হয়েছে—অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন—এ সত্যেরই উপলব্ধি যাঁরা করেছেন তাঁদের সাম্যবাদে বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্পেণ্ডরের মত অনেকেই লিবেরল বলেই সাম্যবাদী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন। সাম্যবাদই লিবেরল আদর্শের উত্তরাধিকারী। নতুন তনুতে লিবেরল অতনুর পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

কোনো শ্রমিকশ্রেণীর গোঁড়া লেখক উদারপন্থীদের ব্যাবহারিক ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ থেকে আদর্শবাদের উজ্জ্বল উদ্বৃত্ত টেনে বার করবার জন্য ব্যস্ত হতেন না বোধহয়, লিবেরল তত্ত্ব ও ব্যবহারের বিরোধকে শ্রেণীগত বুজরুকি বলেই ধরে নিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলন, শাসকশ্রেণীর অত্যাচার, যুদ্ধের আগে লিবেরলদের ইউরোপব্যাপী কাপুরুষ প্রতারণা তাঁর চোখের সামনে ভাসত। কিন্তু স্পেণ্ডর যে শ্রেণী থেকে আসছেন তার অতীতের সঙ্গে উদারপন্থীদের উত্থানপতন, গৌরব-কলঙ্কের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। তাই স্পেণ্ডরের লেখায় উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বর্ণনায় 'যদি'র সংখ্যাটা বেশী।

গত মহাযুদ্ধের সময় লিবেরল পার্টির লজ্জাকর ব্যবহার তার ভবিষ্যৎকে চির-কালের জন্য ব্যাহত করেছে। কন্টিনেণ্টে সোশাল ডিমক্রাসীর প্রাকসামরিক ও সমরোত্তর কার্য্যপদ্ধতি গৌরবময় নয়। অক্ষম লিবেরল ডিমক্রাসী কন্টিনেণ্টে এনেছে হতাশা আর বিরাগ, ইংলণ্ডে এনেছে ঔদাসীন্য। এই দুই মনোভাবই ফ্যাশিজমের ভিত্তি এবং পরিপোষক। হাত পা ছেড়ে বসে থাকাটা ইউরোপের সব চেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ করেছে, কারণ হতাশায় আর ঔদাসীন্যে দিন যাপনের সময় যা হাতের কাছে আসে তাকেই লোকে আঁকড়ে ধরে, এবং হাতের কাছে হাত-পা-ছোঁড়া, চটপটে আস্ফালন নিয়ে এসেছে মুসোলিনী, হিটলার। সে জন্য ফ্যাশিজম্‌কে দমন করতে হলে লিবেরল আদর্শবাদকে জিইয়ে রাখা দরকার; অবশ্য সে আদর্শকে রূপান্তরিত করতে হবে, পুরোনো শক্তিকে আনতে হবে নতুন প্রণালীতে। আসন্ন যুদ্ধের কলকাঠি, ফ্যাশিজমের সরঞ্জাম আছে সেই সব কর্ত্তাদের হাতে যাঁরা পার্লামেণ্টে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত বাক্যালাপ করেন। কিন্তু যুদ্ধ যারা করবে তাদের উপরেই শেষ পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি ইতিহাসে নতুন পাতা রচনা করতে পারে।

অনেকেরই ধারণা যে ইংলণ্ড ধ্রুপদী গণতান্ত্রিকতার দেশ, ওখানে ফ্যাশিজমের ভীতি, বিশেষ কেন, মোটেই নেই। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী যাঁরা পরীক্ষা করে আসছেন তাঁরাই জানেন যে ওখানকার শাসক সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে হাওয়া কোন দিকে বইছে। অ্যাবিসিনিয়া এবং অধুনা স্পেনের ব্যাপারে ন্যাশন্যাল গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ জলের মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিষকুম্ভ পয়োমুখ ফেবিও-ফ্যাশিষ্টদের উদাত্ত কথাবার্ত্তা ইংলণ্ডে আসন্ন বর্ব্বতার পথ পরিষ্কার করে রাখছে। একে দমন করতে পারে জনগণের সম্মিলিত শক্তি। সেই সূত্রে স্পেণ্ডর লেবর পার্টি, শান্তিবাদী সঙ্ঘ ইত্যাদির গঠন ও কার্য্যপদ্ধতি পরীক্ষা করেছেন।

লিবেরল কার্য্যপদ্ধতির উত্তরাধিকারী হচ্ছে ইংলণ্ডের লেবর পার্টি। সেই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি, সেই পুরাতন শ্রেণীসতর্কতা লেবরে আবার রূপ পেয়েছে। এ পার্টির আয়তন দেখে বিচার করতে হলে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে ঠেকে। তথাকথিত লেবর পার্টি যদি শুদ্ধমাত্র সমালোচনার পরিবর্ত্তে সোশ্যালিষ্ট প্রোগ্রাম ভোটারদের সামনে উপস্থিত করত, এবং ক্ষমতা পেলে প্রোগ্রাম অনুসারে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যেত, তাহলে ওখানে জনগণের কাজ এতদিনে অনেকটা অগ্রগামী হত।

এক হিসেবে লেবর পার্টিতে এ ধরণের কর্ম্মঠতা আশা করা বৃথা। শ্রমিকশ্রেণীর উপরিভাগে যাঁরা কালক্রমে সচ্ছল হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীতে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা যে ভবিষ্যৎ-ভাবি-কেবা-বর্ত্তমানে-মরে চিন্তা করে বুর্জোয়াসমাজ-প্রথাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সমাজ সংস্কারের চেষ্টা সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। লেবর পার্টির সমস্ত শক্তি সাম্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই নিঃশেষিত, গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যেতে লেবর নিস্পৃহ, কারণ গভর্ণমেন্টের দেওয়া মুখরোচক খাদ্যেই পার্টির কর্ত্তাদের জীবন বেশ আয়েসেই কাটছে। সম্প্রতি লেবর পার্টিতে একটি বামপন্থী দল ক্রমশঃ বাড়ছে, সেটাই একমাত্র আশার কথা।

শান্তিবাদীদের বিষয়ে স্পেণ্ডর যা বলেন তার সঙ্গে মতানৈক্য অনেকেরই হবে। বুর্জোয়া শান্তিবাদ স্বার্থ সংরক্ষণের নামান্তর। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রমিক বিদ্রোহকে এত বেশী ভয় করেন যে নিরস্ত্র শান্তিবাদের ভঙ্গুর খুঁটিই শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরেছেন। এঁদের বিচিত্র ও অচল বিধি বিশ্লেষণ করার পর স্পেণ্ডর বলেছেন যে এঁদের আদর্শের সঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শের মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। কারণ শান্তিবাদীরা স্বাধীনতা এবং সভ্যতায় বিশ্বাসী; যে পার্থক্যটা আছে সেটা পদ্ধতি-ঘটিত। এ কথা অনেকেই অবিশ্বাস করবেন। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনেক নিষ্ফল মতবাদকেই যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠিয়েছে। গতযুগের শ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী রোমাঁ রোলাঁ সম্প্রতি লেনিনের উক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এখনো পদ্ধতিসংক্রান্ত সন্দেহ থাকাটা আশ্চর্য্যকর লাগে। তাছাড়া সাম্যবাদীরা শূন্যে স্বাধীনতা চান না, স্বাধীনতার অর্থ তাঁদের কাছে বিশিষ্টঃ অর্থ-নৈতিক দাসত্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কখনো গড়ে উঠতে পারে না—এ কথাটা হাক্‌স্‌লি প্রমুখ শান্তিবাদীদের মুখে শোনা যায় না, সমাজ ব্যবস্থায় অধিকারভেদের প্রতি তাঁদের আক্রোশ নগণ্য, এবং হাক্‌স্‌লির অন্ততঃ শ্রেণীহীন সমাজে কোনোই আস্থা নেই, অতএব হাক্‌স্‌লি মার্কা 'গঠনশীল শান্তিবাদ' এবং সাম্যবাদী আদর্শের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। হাক্‌স্‌লির শান্তিবাদ পুরাতন অজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি, একটি বুদ্ধিজীবী উটপাখীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা। অন্যান্য সঙের সঙ্গে সাময়িক ঐক্যের প্রয়োজন স্বীকার করলেই যে মূল আদর্শের ঐক্য প্রমাণ করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই, কম্যুনিষ্ট পার্টি ইংলণ্ডে সংখ্যায় গরিষ্ঠ নয়; কিন্তু আয়তনই সব নয়, এ সঙ্ঘের আদর্শই ইংলণ্ডের জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করবে।

বুর্জোয়া সভ্যতায় অনেক কিছু আছে যা চিরকালের সম্পত্তি, কিন্তু চিরকালের কথা ভেবে অনেকেই বিশেষ কোনো সান্ত্বনা পান নি যখন দেখেছেন যে তাদের ভোগ করবার লোকসংখ্যা কত সঙ্কীর্ণ। এমন পৃথিবী আধুনিক শ্রমিককে গড়ে তুলতে হবে যার সভ্যতার মূল সূত্র হবে সমষ্টিগত জীবন, কয়েকজন পরগাছা ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধিবিলাস নয়। জরাগ্রস্থ ধনতন্ত্র সৃষ্টিশক্তির পরিপোষক নয়, সেজন্য বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এককালীন প্রতিভাবান লেখকরা শেষ পর্য্যন্ত অর্ব্বাচীনের মত কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করেছেন, একটি ধ্বংসোন্মুখ ঐতিহাসিক শ্রেণীর শেষ প্রলাপ তাদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। এখানে একথা উল্লেখ করা উচিত যে মার্ক্স্-পন্থীরা ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাস করেন না, উপরন্তু তাঁরা মনে করেন যে শ্রেণীহীন সমাজেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর। তাঁদের ব্যক্তিত্বের ধারণা আধুনিক অনেক বুদ্ধিজীবীর মুখরোচক না হতে পারে, কারণ বহুমূল স্বার্থপরতা ও সতর্কতা আধুনিক মানুষের প্রায় সহজাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন পৃথিবীতে বণিক-সভ্যতার উল্লেখযোগ্য দান স্থায়ী হবে, কারণ যে বাঁশের সঙ্কীর্ণ সাঁকোর উপর দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক সংস্কৃতির পুঁজি হাতে আমার-পরে-বন্যা জেনে সন্তর্পণে যাতায়াত করত তার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন অরাজনৈতিক সমাজে দৃঢ় ও সত্যিকার গণতান্ত্রিক সেতু নির্ম্মিত হবে। 'ফরওয়ার্ড ফ্রম লিবেরলিজ্‌ম্'-এর শেষ অধ্যায়ে স্পেণ্ডর 'সোভিয়েট কম্যুনিজ্‌ম' থেকে উদ্ধৃত করে ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী সমন্বয়ের উপরে গঠিত সমাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

সমর সেন

Pie in the Sky—By Arthur Calder-Marshall (Jonathan Cape).

The Wheel Turns—By Gian Dauli (Chatto & Windus).

গত পনেরো-কুড়ি বছর ধ'রে আর্য্যসত্যের উপরে আবালবৃদ্ধবনিতার আর বিশ্বাস নেই। পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী সকলেই

আজ সমস্বরে বল্‌তে স্থরু করেছেন যে ধর্ম্মনীতি কোন্ ছার, এমনকি ন্যায়শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পর্য্যন্ত আত্মম্ভরির চক্রান্তচালিত। অবশ্য এ-অভিমত অভিনব নয় ; উনিশ শতকের বেন্থামী ভাবুকেরাও চার্ব্বাকপন্থীদের মতো রটিয়ে বেড়াতেন যে অভীষ্ট আর ইষ্ট একই টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কিন্তু সোহংবাদে তাঁদের মন উঠতোনা ; ভূয়োদর্শনের খাতিরে তাঁরা নিঃসংশয়ে মানতেন যে মানুষমাত্রেই যেকালে আকারে-প্রকারে অনেকখানি অভিন্ন, তখন ভিতরে-ভিতরেও তাদের মধ্যে বৈষম্যের চেয়ে সাদৃশ্য বেশী। সুতরাং রাষ্ট্রগত ব্যক্তিকে স্বাধীন প্রতিযোগিতার অধিকার দিতে তাঁদের আপত্তি ছিলোনা। তাঁদের নিজস্ব জীবনে চক্রবৃদ্ধি আর হিতৈষণার নির্দ্বন্দ্ব ঘটাতে তাঁরা স্বাভাবতই ভাবতেন আসল স্বার্থের উপরে জ্ঞানের আলো পড়লে আজন্ম অনাচারী সুদ্ধ বুঝবে যে স্বপ্রাধান্যের জন্যেও সার্ব্বজনীন শান্তি ও শৃঙ্খলা আবশ্যিক। তবে উক্ত মহানুভবেরা কূটবুদ্ধিতে সাময়িক সমাজপতিদের সঙ্গে তাল রাখতে পারেননি ; এবং সেইজন্যে বর্দ্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যে তাঁদের সদুপদেশ বারম্বার গৃহীত হলেও তাঁরা কেউই পৃথিবীর কোথাও বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল দেখে যাননি, অনেকেই মরবার আগে চার্ল্‌স্ ডারুইন্-নামক একজন হঠকারীর মুখ থেকে শুনে গিয়েছিলেন যে তেলা মাথার তেল জোগাতেই পশুপতি সর্ব্বস্বান্ত।

সৌভাগ্যক্রমে পরবর্ত্তী প্রাণিবিদেরা ডারুইন্-এর অপসিদ্ধান্তে অসংখ্য ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমবয়সী তত্ত্বসন্ধানী মার্ক্‌স্-এর মীমাংসা নৈয়ায়িকদের কাছে নিন্দনীয় ঠেকলেও কৃতকর্ম্মাদের পরোক্ষ সমর্থনে আজ অবধি বঞ্চিত হয়নি। কারণ মার্ক্‌স্-এর বিবেচনায় অন্তত লোকযাত্রার উদ্বর্ত্তন স্বার্থ ও শক্তির সমন্বয়ঘটিত এবং সচরাচর মানুষ যদিচ লাভের আশাতেই জোট পাকায়, তবু সংঘবদ্ধ জীব বিশ্বমানবিকতার প্রতিভূকল্প নয়, যূথচারী জন্তুদের মতো অনাত্ম ও হিংসাপরায়ণ। অতএব যে-স্বার্থ আমাদের পরমার্থের দিকে ছোটায়, তা নৈর্ব্যক্তিক অথবা শ্রেণিগত ; এবং সেইজন্যে অন্তর্মুখী প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে চাইলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিনা, অনিবার্য্য কুরুক্ষেত্রের স্বেচ্ছাসেবকদলে অগত্যা নিজের নাম লিখাই। বলাই বাহুল্য, এ-অবস্থায় সার্ব্বভৌমিকতার ভার সত্য-শিব-সুন্দরের পক্ষেও দুর্ব্বহ ; এবং সম্প্রতি সোভিয়েট্‌ব্যবস্থার সমালোচনায় হিতে বিপরীত ক'রে স্বয়ং আঁদ্রে জীদ্ যখন তাঁর নূতন কুটুম্বদের কলমে অতখানি বিষ জুগিয়েছেন, তখন আমি ও

আমার সগোত্রেরা এ-প্রবচন অহরহ মনে রাখতে বাধ্য যে ভয়াবহ পরধর্ম্মের চেয়ে স্বধর্ম্মে নিধন শতশ্রেয়। উপরন্তু জীদ্-ই অবশ্যম্ভাবী শ্রেণিসংঘর্ষের একমাত্র ভুক্তভোগী নন ; শুনেছি ড্স্টোয়েভ্স্কি-র রচনা রুষ কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে অপাঠ্য ; এবং এখনো কোনো বোল্‌শেভিক্ কথাসাহিত্যিক আমার একাধিক বন্ধুকে তিলার্দ্ধ আনন্দ দিতে পারেননি। আমি যেহেতু বুর্জোয়া, তাই তাঁদের সঙ্গে আমার মতান্তর নেই ; আমিও প্রায়ই ভেবে থাকি যে গর্কি-র ইদানীন্তন পুস্তকাবলী শুধু জরার সংস্পর্শে কিম্ভূতকিমাকার নয়, তাঁর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনই বোধহয় এই হানির মূলাধার।

পক্ষান্তরে সারা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের অধিকাংশ অধিবাসী ও-মন্তব্য নিশ্চয়ই নির্ব্বিবাদে মানবেনা, একবাক্যে বলবে গর্কি হোমর-দান্তে-শেক্স্পীয়র-এর সমকক্ষ তো বটেই, এমনকি হয়তো বা অগ্রগণ্য। অবশ্য বর্ত্তমান জগতে আমার দল এখনো সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ব'লে মাথাগুণতিতে তাদের পরাজয় আজ অবিসংবাদিত। কিন্তু আদম-সুমারির পৃষ্ঠপোষণ বুদ্ধিজীবীদের রুচিসম্মত নয় ; এবং সেইজন্যে গণতন্ত্রের পরীবাদে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাম্প্রতিক মনীষীরা সর্ব্বদা জানাতে ব্যস্ত যে বিপ্লবী লেখকদের মধ্যে যথার্থ প্রতিভার পরিচয় পেলে অর্ঘ্যবিতরণে আমরা কোনো দিন কার্পণ্য করিনি, বরং মাল্‌রো-র মতো রূপকারকে ট্রট্স্কি-র অন্যায় আক্রমণে বিপন্ন দেখে নানা রকমে তাঁর পক্ষ নিয়েছি। তবে সেইসঙ্গে এ-সত্যটুকু প্রচ্ছন্ন রাখা অনুচিত যে মাল্‌রো-র সর্ব্বশেষ উপন্যাস ছাড়া অন্য বইগুলি যে-আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা অন্তত প্রকাশ্যে আমাদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিকূল নয় ; এবং তাঁর অন্তিম পুস্তকে গ্রন্থকারের অর্থনৈতিক পক্ষপাত যদিও সুস্পষ্ট, তবু সেখানির সেই জায়গাই বিশেষভাবে আমাদের উপভোগ্য, যেখানে লেখকের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট অথবা যে-স্থানে তিনি নিতান্ত সাবেকী ধরণে নায়কের চরিত্র ও সুখ-দুঃখ ফুটিয়ে তুলেছেন। জন্ ডস্ পাসজ্-এর অদৃষ্টও অনুরূপ ; তাঁর প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের প্রায়ই এড়িয়ে যায় ; এবং তিনি একবার কথকতায় ঢিলে দিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাহিত্যসভা থেকে তাড়িয়ে প্রচারকের অনাচরণীয় পর্য্যায়ে ফেলি। সুতরাং রসবস্তুও রাজকার্য্যের বিভাগমাত্র ; শিল্পী ও শিল্পোমোদীর প্রাথমিক বিশ্বাসের অদ্বৈত সর্ব্ববিধ মূল্যবিচারের জন্যেই অপরিহার্য্য ; এবং আমার বয়স যতই বাড়ছে, ততই পরিষ্কার ক'রে বুঝছি যে কাব্যবিবেচকের অন্তরঙ্গ আপত্তিকে যিনি ঘুম পাড়াতে অক্ষম, তাঁর কবিতাপাঠ পণ্ডশ্রমের পরাকাষ্ঠা।

তাহলেও এ-কথা সত্য নয় যে মনুষ্যসমাজ দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে আবহমানকাল বিভক্ত। এমনকি আজকের দিনেও অনেকের সম্বন্ধেই এ-রকম অনুমান অমূলক যে তারা যখন ষ্টালিন্-র কথামৃত শুনতে প্রস্তুত নয়, তখন মুসোলীনি-র সিংহনাদই তাদের বীজমন্ত্র। অন্ততপক্ষে এতে বোধহয় সন্দেহ নেই যে রুষদেশের বাইরে যে-লেখকেরা এখনো পর্য্যন্ত সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের দিকপাল, তাঁরা আপাতত দুর্গম মধ্যপন্থারই পথিক ; এবং সে-পথের প্রান্তে বাম বা দক্ষিণ যে-তন্ত্রই থাকনা কেন, তাতে চল্‌লে নিষ্ফল আত্মজিজ্ঞাসার অত্যাচার থেকে অব্যাহতি মেলে। অবশ্য যুবকেরা পারম্পর্য্য মানলেও কার্য্যকারণের ধার ধারেন না। কাজেই অন্ধ নিয়তির আঁচল ছেড়ে তাঁরা ইদানীং মুক্তকণ্ঠে ব'লে বেড়াচ্ছেন যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলেই ভবিতব্যকে ইচ্ছাপূরণের কাজে লাগানো যাবে। ফলত ইংলণ্ডের মতো নিশ্চেতন দেশেও তরুণ সাহিত্য রাষ্ট্রনৈতিক বাদবিতণ্ডার গর্ভগৃহ ; এবং সাধ থাকলেও তারুণ্য যেহেতু আর আমার সাধ্যে কুলয়না, তাই আমি দূর থেকেই অত্যাধুনিক আত্মবেদের গুণ গাই, সে-সন্ধানে যোগ দিয়ে অনাবশ্যক কায়ক্লেশ বা পরিহার্য্য মনঃকষ্ট সওয়ার সার্থকতা বুঝি না। এই কারণে গত পাঁচ-সাত বছরের অনেক প্রথিতযশা লেখকই আমার কাছে নামমাত্র, এবং সাময়িক পত্রে কল্‌ডর-মার্শেল্-এর নিরন্তর উল্লেখ দেখে জানি বটে যে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে তিনি স্বয়ং অডেন্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট্ পার্টির অন্যতম কর্ম্মীর সঙ্গে আমার মনান্তর অবশ্যম্ভাবী ভেবে আমি এতদিন তাঁকে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু পঠনপাঠন অকর্ম্মণ্যদের ব্যসনবিশেষ ; এবং আমি যে-লেখকদের অনুরাগী, তাঁরা যেমন অল্পসংখ্যক, তাঁদের গ্রন্থাবলীও তেমনি নাতিবহুল। অতএব সম্প্রতি একদিন অভাবে প'ড়ে আমি অবশেষে কল্‌ডর-মার্শেল্-এরই শরণ নিয়েছিলুম। কিন্তু সেজন্যে আমি অনুতপ্ত নই; কেননা তিনি শুধু আমার চিত্তপ্রসাদই জাগাননি, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর ভুলও ভেঙেছেন।

আমার প্রগতিক বন্ধুদের কাছে প্রায়ই শুনি যে কলাকৌশলের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ ধনিক সভ্যতার দারুণ দুর্লক্ষণ ; এবং সংবাদপত্রাদিতে মাঝে মাঝে পড়ি যে রুষ দলপতিরা কবিযশঃপ্রার্থীকে শিল্পপ্রকরণ ভুলে শিল্পসামগ্রীর দিকে তাকাতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে উল্লিখিত উপন্যাসে কল্‌ডর-মার্শেল্-এর কৃতিত্ব প্রসঙ্গনির্ব্বাচনে নয়, প্রকাশপদ্ধতিতে।

উপরন্তু তাঁর উদ্দেশ্য আধুনিক ইংরেজী সমাজের পরিচয় প্রদান ; এবং এ-প্রচেষ্টা যদিও কম্যুনিষ্টশোভন, তবু ভূতপূর্ব্ব ঔপন্যাসিকেরাও বোধহয় অনুরূপ আদর্শের প্রেরণাতেই কলম ধরতেন। তবে জয়েস্ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সামনে না-থাকাতে তাঁরা প্রবহমাণ জীবনস্রোতের বর্ণনায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারতেন না ; এক একবারে এক একজন পাত্র-পাত্রীর পৃথক বৃত্তান্তে এক একটি পরিচ্ছেদ ভ'রে, নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্ক নিরূপণ ক'রে অসংলগ্ন উপাদানে অখণ্ডতা-নির্ম্মাণের প্রয়াস পেতেন। যুগধর্ম্মের কল্যাণে কল্‌ডর-মার্শেল্ এই অপ্রাকৃত বিশ্লেষণ বাঁচিয়ে চলেছেন ; এবং তাঁর গল্পে ব্যক্তি ও শ্রেণীর তাৎকাল্য আর পরস্পরের উপরে তাদের ঘাত-প্রতিঘাত একত্রে প্রতিভাত। বলাই বাহুল্য, সংসারে ও-রকম নিশ্ছিদ্র সংযোজনা স্বভাবসিদ্ধ হলেও সাহিত্যে তার প্রতিবিম্বপাত আয়াস-সাধ্য ; এবং নিছক অনুকরণের সাহায্যেও অতখানি অবৈকল্যে পৌঁছতে পারলে কল্‌ডর-মার্শেল্ আমাদের সাধুবাদ কুড়তেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য আরো অনেক বেশি। কারণ 'পাই ইন্ দি স্কাই'-এর সর্ব্বত্র যেমন গ্রন্থকারের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ আছে, তেমনি কাহিনীর সমগ্রতা কোথাও ভার্জীনিয়া উল্‌ফ্-এর মতো আত্মনেপদী নয়, আগাগোড়া বহিরাশ্রয়ী। অর্থাৎ আখ্যানের কথক তো প্রথম পুরুষ বটেই, এমনকি, হয়তো সাধারণস্বত্বের খাতিরে, চরিত্রবিশেষের প্রাধান্যও লেখকের অনভি-প্রেত ; এবং বইখানি নায়কহীন, সমানাধিকারের মানচিত্র।

কিন্তু কল্‌ডর-মার্শেল্-এর উপরে সাম্যবাদের প্রভাব আর বেশী দূর খুঁজলে নৈরাশ্য অনিবার্য্য ; এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে উক্ত নৈরাত্ম রীতি বাদে অন্য সব বিষয়ে তিনি কম্যুনিষ্টসুলভ সমাজসেবার প্রতি অবহেলাই দেখিয়েছেন। অন্তত তাঁর উপন্যাসে হিতোপদেশের প্রত্যাশিত গন্ধ নেই ; বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে বামাচারী ভিন্ন অন্য সকলেই পশু বা পিশাচ, এমন সংবাদসরবরাহে তিনি নিতান্ত নিরুৎসুক ; এবং এই বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের পিছনে যদি কোনো নীতি লুক্কায়িত থাকে, তবে তা সম্ভবত এই যে বুঝে-সমঝে কম্যুনিষ্টদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে ভূস্বর্গের দ্বার খোলাই থাকে, ফ্যাশিজ্‌ম্-এর নরকে লোকসংখ্যা বাড়ে না। অবশ্য বইখানির একমাত্র বুদ্ধিবাদী ফেনার-এর লোভনীয় পরিণাম হয়তো বা সামান্য বিধির ব্যতিক্রম হিসাবেই মর্য্যাদার স্থান পেয়েছে ; নতুবা বোল্‌শেভিকদের সাম্প্রতিক বেণেপনার সমর্থনেই কল্‌ডর মার্শেল্ আমাদের জানাতে চান যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপান্তবর্ত্তিনী

উইন্-এর পুণ্যবলেই ফেনার-এর মতো পাপিষ্ঠও চরমে ত'রে গেলো। কিন্তু সেই 'পেতিৎ বুর্জোয়াজ্'-এর সম্বন্ধে লেখকের অন্যায় দুর্ব্বলতা উপসংহারে স্পষ্টত ধরা পড়লেও, এমন সন্দেহ একবারও আমার মনে জাগেনি যে মেয়েটির মারফতে গ্রন্থকার এই আশ্বাসবাণীই আমাদের শোনাতে চান যে ষ্টালিন্-প্রসঙ্গে বিষয়ী মানুষের হৃৎকম্প নেহাৎ নিষ্প্রয়োজন; কেননা রুষদেশের ভাগ্যবিধাতা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশিষ্ট বন্ধু; এবং তাঁর শতনাম জপলে বিপ্লববিলাসীরাই নিপাতে যাবে না, অধিকারভেদ, উদ্বাহবন্ধন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি চিরপ্রথাগুলোর দুর্দ্দশাও ঘুচবে। এই শোকাবহ কর্ত্তব্যবিমুখতার পরে সধর্ম্মীদের মধ্যে কল্ডর-মার্শেল্-এর সুখ্যাতি টিঁক্‌বে কিনা, তা বোধহয় অনিশ্চিত, কিন্তু রসিক মহলে তাঁর প্রতিপত্তি যে আরো ছড়াবে, তা একরকম তর্কাতীত।

আসলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম ক'রে যারা স্বাতন্ত্র্য খোওয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তিস্বরূপের বালাই নেই নয় তারা কার্য্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত। অন্ততপক্ষে ফলিত মনস্তত্ত্বের মতে ধাক্কা না-খেলে চৈতন্য জাগে না; এবং স্বাবলম্বীর স্বাক্ষরিত প্রতিকূল প্রতিবেশই যেহেতু রূপসৃষ্টির অনন্য অভিজ্ঞানপত্র; তাই জার্মান্ বা ইটালিয়ান্ সাহিত্যসেবীরা এখনো একেবারে লোপ পাননি। তবে দাউলি-ও অগণ্য ইটালীয় মনীষীর মতো স্বদেশপলাতক কিনা জানি না; এবং মাতৃভূমিতে থাকলে তাঁর অবস্থা হয়তো ক্রোচে-র চেয়েও বেশী সঙ্গীন। কিন্তু 'দি হুইল্ টর্ন্স্'-এর যে-ইটালিয়ান সমালোচনার তর্জ্জমা বইখানির মলাটে উদ্ধৃত হয়েছে, তা দেখে তাঁকে মুসোলীনি-র চক্ষুশূল ব'লে লাগে না; এবং এটাও কষ্টকল্পনা যে যাঁর ভাগ্যে আত্মীয়ের অনুগ্রহ জোটেনি, তিনি বিদেশী প্রকাশকের বিষয়বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াবেন। ফলত পুনশ্চ আমরা মানতে বাধ্য যে বাহ্য বশ্যতা বজায় রাখলেও, প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুক ফেটে মরে না, সহস্রাক্ষ স্বৈরাচারীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বকীয় দৃক্‌শক্তিই ফুটিয়ে তোলে; এবং তখন লেখকের মৌখিক মতামতকেও আর মিথ্যা ঠেকে না, সতীর পতিনিন্দার মতো তার তোতাপড়ার আড়ালে নিজস্ব পক্ষপাতের পরিচয় মেলে। অবশ্য ডাউলি উক্ত উপন্যাসে এ-রকম কোনো শ্লেষ বা বক্রোক্তির সাহায্য নেন নি, বরং নায়কের সমাজতান্ত্রিক পিতাকে তাঁর বিষাক্ত বিদ্রূপের উপলক্ষ্য বানিয়েছেন। তাহলেও তিনি নিঃস্ব-নির্জ্জিতেরই অনুপায়ী, এবং সম্ভবত সেই-জন্যেই উল্লিখিত সমালোচকের বিবেচনায় জোলা তাঁর একমাত্র উপমান।

কিন্তু জোলা-র সাহিত্যিক বস্তুবিলাস তাঁর বিরাট বিশ্বপ্রেমেরই অন্যতম অভিব্যক্তি ; তিনি শুধু কুৎসিৎ কাহিনী লিখেই শুচিগ্রস্তদের অভিশাপ কুড়ননি, দ্রেফ্যুস্-এর পক্ষসমর্থনে নেমেই সংরক্ষিত স্বার্থের অত্যাচার সয়েছিলেন; এবং দাউলি-র গল্প পারিবারিক কুৎসাপ্রচারের অছিলায় এগিয়ে চল্‌লেও, এমন ধারণা অগ্রাহ্য যে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রত্যেক উপকরণের ফাঁকি বুঝে যিনি আধুনিকদের নিরুদ্দিষ্ট জীবনযাত্রাকে মৃত্যুর তুল্যমূল্য ভাবেন, কেবল ফাশিষ্ট তর্জ্জন-গর্জ্জন তাঁর কাছে অর্থগম্ভীর।

দুঃখের বিষয়, দাউলি-র সম্বন্ধে আমার সমস্ত জ্ঞান এই একখানি নিখুঁত উপন্যাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; এবং বস্তুতই যদি য়ুরোপে তাঁর অল্পবিস্তর নাম-ডাক থাকে, তবু ভারতে তিনি এখনো পর্য্যন্ত অপরিচিত। কাজেই তাঁর কত বয়স, তিনি কবে প্রথম এবং এ-যাবৎ কখানা বই লিখেছেন, এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার অজ্ঞাত। তবে যেহেতু তাঁর বিশ্ববীক্ষা হেগেল্-এর প্রভাব কাটিয়ে ভিকো-র দিকে ঝুঁকেছে, তাই তিনি শুধুই মধ্যশ্রেণিভুক্ত নয়, বোধহয় মধ্যবয়সীও। অর্থাৎ ধ্বংসের উপলব্ধি তাঁর অস্থি-মজ্জাগত, এবং তাঁর বিবেচনায় এই প্রাকৃতিক ক্ষয় অপ্রতিকার্য্য ব'লেই তিনি বুঝি বা আখ্যায়িকার মাঝখানে দৈবজ্ঞ প্রমুখাৎ তাঁর নায়ককে আসন্ন অধঃপাতের পূর্ব্বোক্তি শুনিয়েছেন। কিন্তু সে-ভাগ্যগণনা থেকে বেচারা তিলমাত্র উপকার পায় নি, হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে কার্য্যকারণের দুশ্ছেদ্য শিকলে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিলো ; এবং বয়োবৃদ্ধির ফলে সে নিঃসংশয়ে জেনেছিলো বটে যে তার সর্ব্বনাশ হেতুপ্রভব, তবু সেজন্যে সে কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মীয়-স্বজনের উপরে দোষ চাপায়নি, বুঝেছিলো যে নটরাজের গৈবী টানে নর-নারী বানরের মতো নাচে। এই সিদ্ধান্তের পরে দাউলি-কে প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্টদের সমপাংক্তেয় ভাবা খুবই শক্ত ; এবং সাধারণত বামেতর দক্ষিণেরই নামান্তর হলেও, বর্ত্তমান বন্দোবস্তের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ এতই সুপ্রকট যে ফাশিষ্ট প্রভুভক্তদের দলে তাঁর স্থাননির্ণয় আরো কষ্টকর। আসলে অন্যান্য রূপকারের মতো তাঁরও পাদপীঠ সম্ভবত সর্ব্ববিধ আদর্শের সীমাসন্ধিতে ; সকল মতামতের আতিশয্যই তাঁকে পীড়া দেয় ; কোনো বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটাতে না-পেরেই তিনি সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসনে আত্মসমর্পন করেন। অবশ্য তার মানে এ নয় যে একদেশদর্শিতা তাঁকে একেবারে ছোঁয়না। কিন্তু তিনি সে-সম্বন্ধে হয়তো সচেতন ; এবং সেইজন্যে তাঁর সমাজচিত্রের যাথার্থ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভিতরে ভিতরে আমরা যত স্বপ্নই পুষিনা কেন, বাহ্য জগৎ সে-কল্পনাবিলাসের বাদ না-

সাধলে সংসারে সংস্কারকের অন্নজল জুটতোনা ; এবং সংস্কারক যখন ভবিষ্যৎপ্রলুব্ধ দূরদৃষ্টির সাহায্যেই বর্ত্তমানের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে, তখন স্বার্থপ্রণোদিত শিল্পীর পক্ষেও সত্যসন্ধান সুসাধ্য।

সুতরাং হিতবাদীদের বিশ্বমানবিক মনোভাবের প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রদর্শন অসঙ্গত; এবং নিরপেক্ষতার নেতিবাচক নির্দ্দেশ মানলেও শেষ পর্য্যন্ত দু কূল বাঁচিয়েই সার্ব্বজনীন গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে। অন্ততপক্ষে রসগ্রহণ শ্রেণিস্বার্থের তোয়াক্কা রাখেনা। নচেৎ জ্ঞাতসারে ডাইনে বা বাঁয়ে না-তাকালে আমি কখনো এই প্রকাশ্য কম্যুনিষ্ট ও অনুমিত ফাশিষ্ট-এর লেখা পড়ে এতখানি পরিতৃপ্তি পেতুমনা। তবে আমার উপভোগ নিশ্চয়ই নৈর্ব্যক্তিক নয়, তার পিছনে আমার উপস্থিত আবেশ-অভিনিবেশের অনুমোদন আছে ; এবং সেইজন্যেই দুখানা উপাদেয় উপন্যাসকে উপলক্ষ ক'রে আমি অর্থশাস্ত্রের অবান্তর আলোচনায় এতটা সময় কাটালুম। বলা বাহুল্য, লেখকদ্বয় আমার বাগ্‌বিস্তারের জন্যে আদৌ দায়ী নন ; এবং উভয় পুস্তকই কথাসাহিত্যের প্রশংসনীয় নিদর্শন। অর্থাৎ কোনোটাতেই তত্ত্ববিচারের বা মতপ্রচারের ইঙ্গিতমাত্র নেই। আসলে দাউলি-ও কল্‌ডর-মার্শেল-এর মতো আখ্যানশিল্পের নূতন প্রকরণ আবিষ্কারেই ব্যস্ত ; আর এ-দিক থেকে তাঁদের দুজনের সিদ্ধি এমন অসামান্য এবং গল্প দুটির বিষয় ও ভঙ্গী এত গাঢ় ও অননুকরণীয় যে সেগুলির সার-সংগ্রহের চেষ্টা বিড়ম্বনা। কিন্তু কলাকৈবল্য যদি বা সম্ভবপর হয়, তাহলেও বৈদগ্ধ্যের সমাধি কোনোকালেই সহজ নয় ; এবং কল্‌ডর-মার্শেল্‌ ও ডাউলি-র অন্যান্য পাঠকেরা আমার মতে সায় দিন বা না-দিন, প্রত্যেকেই নিজের রীতিতে মাথা ঘামাবেন, আর একবার ভাবতে বসলে রাষ্ট্রবিধি ও সমাজব্যবস্থার কথা তাঁরাও নিশ্চয় ভুলতে পার-বেন না। কারণ চিত্তবিনোদনই সৎশিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে, তবু লোকরঞ্জন আর লোকশিক্ষা হরিহরের মতো ঐকাত্মিক ; এবং তাই আর্ট আর প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার মালা-বদল-ব্যাপারে ঢেঁট্‌রা পেটা পণ্ডশ্রম ; অনিচ্ছাসত্ত্বেও রূপস্রষ্টা প্রবক্তার সোদর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কয়েকটি কবিতা—শ্রীসমর সেন প্রণীত ও প্রকাশিত।

চিরাচরিত কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোনো কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রেণিবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হয়ে' ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ করে বাংলা গদ্যকবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে কথা বুঝতে সংস্কৃত অলঙ্কার বা এরিষ্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত নেই। আর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে' পাংক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পৈতা ধরলেই কি সমাজ-সংস্কার শেষ? বিকালে এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ক্রীরীডিংরুম করে' সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগর-জীবন যাপন করার মতোই এ সংস্কার লিবারল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনীঠাকুরে, এমন কি রমেশদত্তের জীবনসন্ধ্যায়, স্বভাবতই এই গদ্য চর্চ্চা ঘটেছে। তফাৎ শুধু এই হয়তো যে সেকালে বড়ো বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙীন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্ব্বস্ব করে' লিখলে ও লাইন ভাগ করে' ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের "কয়েকটি কবিতা"য় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি আঙ্গিকের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে' নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর

কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়তো ক্রোচের মতেই, কবিতা আর তার ভাষায় আলঙ্কারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে থাকে গদ্যপন্থী নির্ব্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্ম্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউণ্ড-এর গদ্যকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইট্‌ম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই, সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক্ "পুনশ্চ"-র কোনো কবিতা, যথা কোপাই নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে।—

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জ্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্ত্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো ঃ
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো সুন্দর
অন্ধকারের মতো ভারি।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি ;
দেখি আর শুনি
গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার ঃ—

অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কিসের আর্ত্তনাদ
কঠোর কঠিন।

বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।

এ কবিতাতে বিষয় মহৎ নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ কথাও বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতার। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা, গান ও লিপিকা, শরৎ, আষাঢ় ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী যে আবহ, সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পট-ভূমি। সমর সেনের কবিতা যে কোনো লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্ত্তির সূচনা। তাই তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-লালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শালমহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, সহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফিলিষ্টাইন শরীরসর্ব্ব-স্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজ-জীবনের মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্ত্তমানে ক্ষান্ত না হয়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কি কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সঙ্গতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণিবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি; আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে' উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ

কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মার্কস্ এবং প্লেখানভের অনুমোদন কবিরই পক্ষে, শিষ্যেরা যাই বলুন।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসত্তাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। কয়েকটি কবিতায় তিনি ভিন্নপ্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ১৯০০, বসন্তের গান, একটি প্রেমের কবিতা, সিনেমায়, মেঘদূত ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্য কবিতায় মুস্কিল হচ্ছে যে এখানে কোনো অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমন কি কোনো কবি-নিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক এখানে মুখোমুখি বলে কাণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই archetypal pattern বা কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে ত্রুটি Amor stands upon you-তেও দ্রষ্টব্য। নাগরিক-নামে উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হুঁচট্ খেতে হয় তা কোনো নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার মুক্তি-তে ডাষ্টবিনের সামনে মরা না হয়ে মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে। মৃত্যু, পোষ্টগ্রাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলা হয়ে গেছে এক আধবার। দু একবার বোধহয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায় —লাইনের শেষে ক্রিয়া বা কঠিন বর্ণান্তক শব্দে, হতে শব্দটার সর্ব্বদা ব্যবহারেও হয়তো, এবং বিশেষণের দুর্ব্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই মদনভস্মের প্রার্থনায়—

> মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
> জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
> দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
> বিষণ্ণ নাবিকের গান।

এ রকম জায়গায় মালার্মে বা বদলেয়র কি 'অদ্ভুত বলে' স্থির থাকতেন? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি তো গদ্যকবিতায় লরেন্স-

মার্গী নন, তিনি পাউণ্ড-পন্থী। ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষাপ্রয়োগ তো ঢিলা হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায়, রুতার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্য্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থাম্‌তে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য্য। আর এ কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। বিস্মৃতি কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়তো কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা রসঘন উপমাউপচারে অন্বিত। রাত্রি বা বিরহ নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানী কবিতার মতো সরল স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই রক্তকরবী, মহুয়ার দেশ ইত্যাদিতে উপমাউপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জ-নাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এবং এগুলি কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব বলেই দেখি এই উপমাউপচারাদি এলিয়টের মতো মধ্যে মধ্যে হয়ে ওঠে পরোক্ষপ্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেই জন্যেই একটু বিড়ম্বিত হতে হয় যখন একই প্রতীক কখনো পরোক্ষদীপ্ত হয়ে' ওঠে আর কখনো প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

কিন্তু ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে' ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিক-এ—

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর সহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।

কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

বিষ্ণু দে

সন্ধান—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পিনাকী রায়—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ। মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট। ৪০, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য দুইখানি পুস্তকই উপন্যাস। ইহা ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য তাহাদের নাই।

'সন্ধান' পঁচিশ বৎসর আগে প্রকাশিত হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল না। লেখকের ভাষায় না হউক, রচনরীতিতে, ২৫ বৎসরেরও বহু পূর্ব্বেকার ছাপ পড়িয়াছে। তাঁহার নায়ক সুজয়ের মনে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি একেবারে বঙ্কিমী ঢঙে সময়ে অসময়ে তর্ক ফাঁদিয়া বসে, যদিও কলসীর ছলাৎ ছলাৎ তর্কের ফাঁকে ফাঁকে তাল ঠোকে না। অতঃপর যাহা ঘটে তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বা অপর কেহই দায়ী নহে, তাহা লেখকের সম্পূর্ণ স্বকীয় সৃষ্টি। ভাবের আতিশয্যে শ্রীমান্ সুজয় কখনো তরুণী কলেজের ছাত্রী, কখনো 'বৌদি' অর্থাৎ বন্ধুর স্ত্রীর সহিত প্রেমের চেষ্টা বা চর্চ্চা, যেরূপ সুবিধা হয়, করিয়া অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে এক গণিকার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে এই গণিকা-প্রণয়িণী নিরুদ্দেশ হইলে সুজয় এমনই বিভ্রান্ত হয় যে এককে হারাইবার দুঃখ ভুলিবার আশায় বহুর শরণাপন্ন হয়—এবং এই বহুর সকলেই গণিকা। ফলে যাহা ঘটে তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। স্ত্রী মাধবী, বন্ধু-পত্নী (বিকল্পে বৌদি) এবং ভগিনী, এই ত্রয়ীর সমবেত ও স্বতন্ত্র যত্ন ও শুশ্রূষাসত্ত্বেও ভগ্নস্বাস্থ্য সুজয় মৃত্যুর দ্বারে—এবং বৃন্দাবনে—উপস্থিত হয় এবং মরিবার ঠিক পূর্ব্বেই তাহার প্রথম গণিকা-প্রণয়িণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে যে সুজয়েরই প্রেমের স্মৃতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

অত্যন্ত সাদাসিধা ও মামুলি এই ঘটনাগুলি। এইগুলি সাজাইয়া চলনসই রকমের একটি গল্প হয়তো লেখক লিখিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার দুরাশাবশত তাহা হয় নাই। যাহা অতিশয় তুচ্ছ ও স্থূল তাহাকে তিনি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন অসামান্যের মর্য্যাদা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা শক্তিশালী চরিত্রচিত্রণের দ্বারা নহে—বাক্যোচ্ছ্বাসের দ্বারা। ফলে যে-উপন্যাসটির উদ্বর্ত্তন হইয়াছে সাহিত্যের আসরে তাহা একেবারেই অপাংক্তেয়।

বইখানির একমাত্র বিশেষত্ব—প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা। রক্তবর্ণ বিরাটদেহ নরবর সম্মুখে ধাবমান ; বামহস্তে ধৃত মশালের ধূম্র দিকে দিকে বিকীর্ণ, দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন বিপুল বস্ত্রখণ্ড বা মৎস্য ধরিবার জাল বোঝা যাইতেছে না ; পদতলে ঐ জাল বা বস্ত্রখণ্ডের উপর বিসর্পিতদেহা নতজানু নারীমূর্ত্তি—চিকুরাচ্ছাদিত-বদনা, ভূলুণ্ঠিতবসনা, উদ্বেলিতযৌবনা। রোমাঞ্চকর।

'পিনাকী রায়'-এর কোথাও সাবেক কালের চিহ্নমাত্র নাই, ইহা আনকোরা আধুনিক উপন্যাস। রুচিভেদে সুখের বা দুঃখের বিষয় এই যে পুরকায়স্থ মহাশয় এই আধুনিকত্বের অবতারণার জন্য অস্বাভাবিক দেহবিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ; মনোবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতের উপর তাঁহার প্লটের প্রতিষ্ঠা। এই মনোবৃত্তি সময়ে সময়ে এত সূক্ষ্ম হইয়া উঠে যে পাঠকের পক্ষে গল্পের সূত্র হয় প্রায় অদৃশ্য, তখন মনে হয় আর একটু মামুলি হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু নায়িকা সুকৃতি, নায়ক পিনাকী এবং নন্দীভৃঙ্গীর দল পাঠকের মনের তোয়াক্কা রাখেনা, সম্পূর্ণ স্বকীয় বলে এবং অতি প্রবল বেগে তাহারা তর্ক করিয়া যায় যে দেহের আধার মন, না মনের আধার দেহ এবং নরনারীর প্রেমে দেহের ও মনের প্রভাব ঠিক কি অনুপাতে। এই সকল জটিল বিষয়ে জটলা যত ঘোরতর হয়, তাঁহাদের বুদ্ধির দীপ্তি ও রসনার ধার হয় ততই প্রখর এবং তর্ক যখন চরমে ওঠে তখন মননের সম্মোহনে ব্যকরণের বিশুদ্ধতা পর্য্যন্ত পায় লোপ। লেখকের অভিপ্রেত হউক বা অনভিপ্রেত হউক ব্যাকরণের সহিত বুদ্ধির এই বিরোধ শিক্ষিতসমাজের পক্ষে শোচনীয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু পুরকায়স্থ মহাশয় মেধাতে আস্থাবান হইলেও জৈবধর্ম্মে একেবারে উদাসীন নহেন, তাই নির্বুদ্ধি বা স্বল্পবুদ্ধি পাঠকও এই বইখানি পড়িয়া যথেষ্ট তৃপ্তি পাইবেন। কেন না ইহার নরনারীবৃন্দের আহারবিহারে অরুচি নাই এবং

সামাজিক আদান প্রদানের ব্যাপারে তাহাদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে। ফলে তাহাদের পরস্পর আলাপপরিচয়ের ও আনাগোনার মধ্য দিয়া গল্পটি বেশ ভালোই জমিয়াছে, এবং আরো ভালো জমিত যদি তাহাদের সচল মন অনর্থক তর্কজ্বরে অতখানি বিকৃত না হইত।

লেখকের প্রধান ত্রুটি তাঁহার অপচয়-প্রবৃত্তি—শুধু বাক্যে নহে, চরিত্র-সৃষ্টিতেও। এতগুলি তার্কিক নরনারীর একত্র সমাবেশ বাস্তব জীবনে যদি কখনো ঘটে পৃথিবী তাহা হইলে সত্যই অসহ হইয়া উঠিবে। কি কারণে লেখক ইহাদের সকলকে আসরে নামাইয়াছেন বোঝা শক্ত। জীবনের জটিলতা বোঝাইবার জন্য? কিন্তু জনতাদ্বারা জটিলতা হয় না, হয় শুধু কোলাহল। এবং এই জনতা অসাধারণ মেধাবী হইলেও এবং তাহাদের প্রত্যেকের উক্তি বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইলেও তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া সময়ে সময়ে অত্যন্ত কঠিন হয়। ইহার জন্য দায়ী ততটা পুস্তকের নরনারীর সংখ্যা নহে, যতটা তাহাদের সমাবেশ। মনের সহিত মনের সজ্ঘাতে যে সমস্যার সৃষ্টি তাহাই দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে যে সজ্ঘাতের অবকাশ আছে তর্কের আখড়ায় তাহা শুধু আস্ফালনে পরিণত হয়। বইখানিতে তাই ঘটিয়াছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও ইহার গল্পভাগ যে উপভোগ্য হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও গল্প লিখিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন নাই। তাই বোধহয় লেখকের অজ্ঞাতসারে পিনাকীর বন্ধু অজিত মোটরের নিবিড় আবেষ্টনের মধ্যে সিক্তবসনা সুকৃতির সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয় এবং একদা এক বিরল বসন্তরজনীতে নায়িকা সুকৃতি ক্ষণেকের উন্মাদনায় নায়কের ওষ্ঠাধরে চকিত চুম্বন মুদ্রিত করিয়া পাঠকের মন হরণ করে। লেখকের অনবধানতা! এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও অধিকতর অন্তরঙ্গ আবেগ যদি জীবনে কখনো আসে তাহা হইলে প্রথমত তর্কদ্বারা তাহাদের যাচাই করিতে হইবে এবং তৎপরে করিতে হইবে—আবার তর্ক।

আশ্বস্তির কথা এই যে তর্ক হইতে তর্কান্তরে প্রয়াণের অবসরে মানবজীবনের তর্কাতীত ও বুদ্ধির অগোচর এমন অনেক রহস্য দীপ্যমান হইয়া উঠে যাহা লেখক নিজে উপলব্ধি করিয়াছেন মনে হয়, কিন্তু তাঁহার রচনায় যাহার অত্যন্ত ক্ষীণ আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষীণ আভাসের মধ্যে দিয়াও

লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানেই এই পুস্তকটির বিশেষত্ব। ইহাতে লেখক যে আবহাওয়া সৃজনের চেষ্টা করিয়াছেন ও কতক পরিমাণে যাহার সৃজনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সত্যই বিরল এবং বিরল বলিয়াই সাবেকি বা অতি আধুনিক মামুলি নভেল পড়িয়া যাহাদের বিরক্তি ধরিয়াছে তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত তৃপ্তিকর। যদি লেখক তাঁহার নায়কনায়িকা প্রভৃতির তর্কাবসরের জীবন নিতান্ত দায়সারা করিয়া না লিখিয়া আর একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে বাক্যবিনিময়ের সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কণ্ঠসর্ব্বস্ব জনতার মত মনে হইত না, জীবনের ব্যাপক পটভূমিতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বলতর ভাবে পরিস্ফুট হইত। তাহা না হওয়া সত্ত্বেও বইখানি মনকে স্পর্শ করে তাহার কারণ চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা লেখকের আছে এবং 'পিনাকী রায়'-এ তাহা সম্পূর্ণ সার্থক না হইলেও ভবিষ্যতে হইবে এইরূপ আশা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
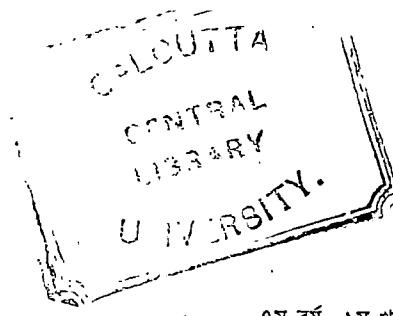
৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৪৪

পরিচয়

পরকীয়া-তত্ত্ব

[২]

'পরকীয়া'

গত বারের 'পরিচয়ে' পরকীয়াতত্ত্বের আলোচনায় আমরা মধুর ভজনের প্রসঙ্গ উৎথাপিত করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম, মধুর ভজন ভগবানে কামার্পণ—কৃষ্ণ কান্ত ভক্ত কান্তা, তিনি Beloved ভক্ত Lover—ভগবান্‌কে এই রূপ কান্ত-ভাবে ভজন। কান্তভাবে ভজনে ভক্তের প্রেম ক্রমশঃ 'ভাব' এবং পরে 'মহা-ভাবে' পরিণতি লাভ করে। ভাবের পারিভাষিক নাম 'রূঢ়' এবং মহাভাবের পারিভাষিক নাম 'অধিরূঢ়'। রূঢ় ভাবে ভগবান্ ভক্তের পতি (Bridegroom) এবং অধিরূঢ় ভাবে তিনি ভক্তের উপপতি।

> অতএব মধুর রস কহি তার নাম
> স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান

অর্থাৎ ভগবান্ স্বকীয়ার পতি ও পরকীয়ার উপপতি। স্বকীয়াতে ভাব রূঢ় এবং পরকীয়াতে মহাভাব অধিরূঢ়।

গতবারে স্বকীয়া কর্তৃক ভগবান্‌কে কান্ত (পতি-) ভাবে ভজনের কথার উল্লেখ করিয়াছি এবং উপনিষদ্ যুগ হইতে এদেশে এবং প্রাচীন গ্রীস হইতে বিদেশে এভাবের ভজন কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। এই বার পরকীয়ার আলোচনা করিব।

আমরা জানি পরকীয়া ভাবের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন ঃ—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস—চরিতামৃত

অতএব ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই এই রসের আধার ও উৎস।

শ্রীকৃষ্ণকে যে ভক্তেরা মধুর ভাবে ভজনা করেন—তাঁহারা তাঁহার 'কান্তা'। তিনি যখন 'বহুবল্লভ কাণ'—তখন তাঁহার কান্তাগণ অবশ্যই অগণ্য—তন্মধ্যে কেহ স্বকীয়া, কেহ পরকীয়া।

মধুর রস-ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কে? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, ও পুরে মহিষীগণ।* আর পরকীয়া কে? ব্রজে গোপীগণ—বিশেষতঃ শ্রীরাধা—যিনি 'গুণৈঃ অতিবরীয়সী' 'হরেরত্যন্ত বল্লভা'।

কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার!

—চরিতামৃত

লীলালাবণ্যরূপ বিনোদ বিলাস
হৃদয় নিবদ্ধ তায় বন্ধুভাব রস
এই কামতত্ত্ব সখ্য দ্বিবিধ পালনা
স্বকীয়া বলিয়া এক, পরকীয়া জনা
স্বকীয়া ভজনে সেই রুক্মিণী আদি
সর্ব্বভাবে ভজে তাঁরে প্রেম নিরুপাধি ...
স্বকীয়া কহিল সংখ্যা শুন সর্ব্বজন
পরকীয়া ভাবে রাধা আদি গোপীগণ

—লোচন দাসের দুর্লভসার

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে চাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার ব্রহ্মাকে কন্যাকর্ত্তা বনাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার সঙ্গমের পূর্ব্বে যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে বিবাহ

---

* শ্রীকৃষ্ণ যখন বৈকুণ্ঠপতি মহাবিষ্ণু—অসংখ্য ব্যষ্টি-বিষ্ণুর সমষ্টি—তখন তাঁহার কান্তা লক্ষ্মীগণ অগণ্য। আর দ্বারকায় ত' তাঁহার ১৬০০০ মহিষী—রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি।

ঘটাইয়াছেন ; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এ বিবাহের বৈধতা (validity) অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এ বিবাহই অস্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার 'পরকীয়' এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের 'পরকীয়া'।

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ পরম পুমান্
পরকীয়া নারী রাধা তাঁহার সমান—দুর্লভসার

কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস'। পরকীয়া কে ? 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে রূপগোস্বামী পরকীয়ার এই লক্ষণ করিয়াছেন—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

ইহার উপর জীবগোস্বামীর টীকা এই—

অন্তরঙ্গেণ রাগেণ অর্পিতাত্মানো, নতু বহিরঙ্গেণ বিবাহপ্রক্রিয়াত্মক-ধর্ম্মেন।

অর্থাৎ যে কামিনী অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করিয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে—যে বহিরঙ্গ বিবাহাদি লৌকিক ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না—সেই পরকীয়া।* ব্রজবধূরা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া চরিতামৃত বলিতেছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ।

এই পরকীয়াভাবের প্রতি চৈতন্য মহাপ্রভুর বেশ পক্ষপাত ছিল। তিনি ব্রজগোপীদিগের সৌভাগ্য ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা ভাগবতের এই শ্লোকটি আস্বাদন করিতেন।

---

* পরকীয়া আবার দ্বিবিধা—কুমারী ও ঊঢ়া

কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ
অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখীকেলিষু বিশ্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধাগুণান্বিতাঃ॥

গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্ যদ্ অমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ।—১০।৪৪।১৪

ইহার ভাবানুবাদ এই ঃ—

সখি হে ! কোন্ তপঃ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী
পিবি-পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন
নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে
যিঁহো সব অবতারী
পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা,
নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা ।
তিঁহো এ মাধুর্য্যলোভে
ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেই ত মাধুর্য্যসার
অন্যা সিদ্ধি নাহি তার
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি ।
আর সব প্রকাশে
তাঁর দত্ত গুণ ভাসে
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি

—চরিতামৃত

মহাপ্রভু বলিতেন, গোপীদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে ? নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যে প্রসাদ কোন দিন লাভ করিতে পারেন নাই, গোপবধূরা রাসোৎসবে সেই প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন ।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ জনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥

—ভাগবত, ১০।৪৭।৫৩

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস বিলাস।
অতএব "নায়ং শ্লোকে" কহে বেদব্যাস॥

এই বিষয় লইয়া চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণ কালে এক শ্রীবৈষ্ণবকে বেশ একটু মিষ্ট পরিহাস করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপঃ করিলা অপার॥
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎতপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥
... ...
শ্রুতি সব গোপী সবের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥

প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থ 'কাব্যপ্রকাশে' পরকীয়া ভাবের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে—

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি—তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলা বিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এক নায়িকার কুমারী দশায় নায়কের সহিত মালতীসুরভিত, অনিল-বিকম্পিত নর্ম্মদাতটে বেতসকুঞ্জে সঙ্গম হইত। পরে সেই বঁধুই তাহার বর

হইল—সে আর 'পরকীয়া' রহিল না—'স্বকীয়া' হইল। কিন্তু এক্ষণকার সুরতলীলায় আর তাহার সেই পূর্ব্বের রভস হইত না। অথচ সেই পূর্ব্বেকারই মত চাঁদিনী যামিনী—সেই মলয়ানিল—সেই ফোটা ফুলের গন্ধ—সেই কৌমারহরই এক্ষণকার বর! স্বকীয়া ও পরকীয়ায় এত প্রভেদ! তা'ই সে খেদ করিয়া ঐ শ্লোকটি রচনা করিয়াছিল।

সম্প্রতি বিলাতি রঙ্গমঞ্চে মিঃ প্রিস্‌ট্‌লি তাঁহার "Duet in Flood-light" নাটকে এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন—তবে তাঁহার treatment কিছু coarse ধরণের—তাঁহার রচনা জুগুপ্সা-বিলসিত। তাঁহার নাটকের নায়ক একজন নাট্যকার ও নায়িকা একজন নটী।

He shows a dramatist and actress "living in sin" and perfectly happy. For publicity purposes they are made to marry, and at once they fight like cat and dog,—in the intervals of being photographed and interviewed as the world's greatest lovers. When the marriage proves to have been invalid, they resume their former sinful lives and *happiness.*

মহাপ্রভু সর্ব্বদা ঐ 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন—ভক্তেরা উহার সার্থকতা বুঝিতনা। তিনিও মুখে কিছু বলিতেন না। শেষে রূপগোস্বামী যখন পুরীতে গিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গ করিলেন, তখন

রূপগোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়।
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে দেখিতে
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে।
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা
হেন কালে রূপ গোঁসাই স্নান করি আইলা।
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥

রূপগোস্বামীকৃত শ্লোকটি এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র মিলিতঃ
তথাহং সা রাধা তদ্ ইদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥

এই শ্লোকে পরকীয়া-ভাব সুব্যক্ত হয় নাই, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেব যখন ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, তখন উহা আমাদের শিরোধার্য্য।

স্বকীয়ার উপর পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে এ বিষয়ের অনেক আলোচনা আছে। তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

যিনি স্বকীয়া তাঁহার সহিত নায়ক-নায়িকা ভাব চলেনা—অথচ নায়ক নায়িকা ভিন্ন মধুর রসের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না—এক কথায় 'romance' হয় না।

ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥
... ...
নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

—চরিতামৃত

স্বকীয়ার 'অতিপরিচয়াৎ অবজ্ঞা—অনাদরোঽপি' অর্থাৎ, familiarity breeds contempt। কারণ, মানুষের মন নিতুই নূতন চায়—'নবে দারপরিগ্রহে' কয়েকদিন 'romance' থাকে বটে, কিন্তু কিছুকালেই বলিতে হয়—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। কোথা ক্লিওপেট্রা পাওয়া যাইবে, যাহাকে—

Age doth not wither, nor custom stale
Her infinite variety. —Shakespeare

এ জন্য পরকীয়ার প্রয়োজন।

এই পরকীয়া-প্রসঙ্গে রূপগোস্বামী ভরতমুনির একটি প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু, যত্র প্রচ্ছন্ন কামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥

যেথানে (যেমন পরকীয়াস্থলে) বহু বারণ, যেথানে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন কামসেবা, যেথানে নায়কের পক্ষে নায়িকা এবং নায়িকার পক্ষে নায়ক দুর্ল্লভ—সেখানেই কামের পরাকাষ্ঠা।'

বহুবারণ কি? বহুবারণং লোকতঃ ধর্ম্মতশ্চ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)—যাহাতে লোকের বাধা, ধর্ম্মের বাধা—অর্থাৎ যাহা Forbidden Fruit, তাহার প্রতিই মানুষের লোভ ও লালসা। আদম ও ঈভকে নন্দনবনে স্থাপিত করিয়া ভগবান্ বারণ করিলেন, 'সব বৃক্ষের ফল যথেচ্ছা গ্রহণ করিতে পার, কেবল জ্ঞান-বৃক্ষের (Tree of Knowledge-এর) ফল আস্বাদন করিওনা।' আর রক্ষা নাই! মানবের আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ আর কোন ফল খাইবে না—সেই একমাত্র ফলই তাহাদের আস্বাদনীয়। নদীর জলপ্রপাত পাষাণের বাধা পাইলেই স্ফীত হইয়া দুকূল প্লাবিত করে। সেই জন্য জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—স হি বার্য্যমানত্বাদিসম্ভাবেন রসোৎকণ্ঠং স্থাপয়তি।

আরও—যাহা সহজপ্রাপ্য নয় (যেমন পরকীয়া)—তাহাকেই মানুষের পাইবার প্রয়াস—কারণ, Distance lends enchantment to the view—দূরাদ্ অয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী (কালিদাস)।

আর এক কথা—স্বকীয়ায় কেবল মিলন—বিরহ নাই। কিন্তু 'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ'। দুর্ল্লভসারে লোচনদাস একথা বেশ বিশদ করিয়াছেন,—

পর না হইলে নহে ভাবের উদয়
বিচ্ছেদের ভয়ে আর্ত্তি অনুরাগ হয়।
স্বকীয় জনের নাহি বিচ্ছেদের ভয়
এ কারণে স্বকীয়েতে অনুরাগ নয়।
অনুরাগ বিনা প্রেমভাব নাহি রয়
'সাত্ত্বিক' বলিয়া শাস্ত্রে অষ্টভাব কয়।
... ...
স্বকীয় ভজনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়
তে কারণে ভাব তাতে নাহিক উদয়।
উপপত্যে ভাব অনুরাগ প্রকাশ
তে কারণে বৃন্দাবনে রসের বিলাস
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, কৃষ্ণ বৃন্দাবন-নাথ
রাস বিলাস শত শত গোপী সাথ। —দুর্ল্লভসার

এই পরকীয়াতত্ত্ব Austin Allen-প্রণীত 'Pleasure Cruise' নাটকে বেশ নিপুণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (এপ্রিল ১৯৩২) এই নাটক লণ্ডনের রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল। ম্যাডেলিন ক্যারলের (Madeline Carroll) সহিত ওয়েন্ নেরিসের (Owen Nares) বিবাহ হইয়াছে। এ অবশ্য love-marriage—গান্ধর্ব্ব বিবাহ (মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ)। কিন্তু দুই বর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবনের পর বধূ দেখিলেন বর আর তাঁহাকে 'রভস' দিতে পারিতেছেন না (after two years of marriage she finds none of the ecstasy of which she had read)। স্বকীয়ে যখন মন উঠিলনা, তখন স্ত্রী স্থির করিলেন স্বামীর অসম্মতিতে (বলা বাহুল্য তিনি স্বাধীন জেনানা) নরওয়েগামী ষ্টীমারে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া আসিবেন। কে জানে সেখানে হয়ত পরকীয়-লাভ ঘটিতে পারে। জাহাজে গার্ডিনার (Gardinar) নামক এক অপরিচিত যুবকের সহিত তাঁহার প্রণয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং সঙ্কেত স্থির হইল যে, গভীর রাত্রে যুবতী তাঁহার কেবিনের দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিবেন এবং তথায় উভয়ের মিলন হইবে। স্বামী নেরিস স্ত্রীর ব্যবহারে একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। নরওয়েগামী জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাঁহার সাহায্যে স্বামী ছদ্মবেশ ধরিয়া ষ্টুয়ার্ডের ভূমিকায় স্ত্রীর সহযাত্রী হইলেন। স্ত্রী অবশ্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। স্বামী, ম্যাডেলিন ও গার্ডিনারের সঙ্কেতস্থান (assignation) জানিতে পারিয়া গার্ডিনারের কামরা-দ্বার এমন দৃঢ় ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিলেন যে, গার্ডিনারকে 'সচকিত নয়নে বিরহ শয়নে' সেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। ইতিমধ্যে স্বামী অন্ধকারের সুযোগ লইয়া স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার শয্যাসঙ্গী হইয়া রজনী যাপিত করিলেন। স্ত্রী জানেন তাঁহার শয্যাসঙ্গী 'পরকীয়'—অতএব রভসের কোনই ত্রুটি হইল না।

Next day she is radiantly happy and sends off a pleasant postcard to her husband.

তারপর গার্ডিনারের সহিত যুবতীর সাক্ষাৎ হইল—

He is all apologies to her and after a certain amount of risky conversation at cross purposes, he tells her that he was prevented from coming because some scoundrel had roped his cabin door to the adjoining one.

যুবতী ত' স্তম্ভিত—যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—তাই নাকি? তবে গত রাত্রে কার তিনি শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছিলেন? সমুদ্র যাত্রা তাঁর পক্ষে অতি বিরস হইয়া উঠিল—তিনি পরবর্ত্তী বন্দরে জাহাজ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। স্বামীও অলক্ষ্যে ফিরিয়াছেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রী ক্ষমা চাহিলেন—তখন স্বামী প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

When she implores forgiveness, and says that she will never, never, etc, he tells her all. Then she does not know whether to be glad or sorry.

আমি আশা করি, এই দুর্ঘটনার পরে যুবতীর 'পরকীয়'-লালসা প্রশমিত হইয়াছিল—কিন্তু হইয়াছিল কি?

পরকীয়াতত্ত্ব আর এক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। পরকীয় প্রেম প্রকৃত Platonic Love—ইহার মধ্যে দেহের মিলন নাই—কেবল আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ। মধ্য যুগের Knight Errantদিগের প্রত্যেকের যে Lady-love থাকিতেন—যাঁহাকে Knight দূর হইতে উপাসনা করিতেন as a bright particular star (Shakespeare)—যেন গগনচারী আশমানী তারা যাহা কোনদিন ধরাতলে উদয় হইবেনা—যাহার সহিত দৈহিক সংযোগের সম্ভাবনা না থাকায় প্রেম সত্য সত্যই কামগন্ধহীন হইত—যাহা 'অদ্বৈতম্ সুখদুঃখয়োঃ'—সেই হয়ত' প্রকৃত 'পরকীয়া'!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মেরি ক্রিস্‌মাস্‌

প্রথম যৌবনে বিলেত গেলে—প্রায় সকলেই love-এ পড়ে। যারা পড়ে না, তারা দেশে ফিরে বড় লোক হয়। আমিও পড়েছিলুম। শিশুদের যেমন হাম একবার না একবার হয়, বিলেত গেলে, এদেশী নব কিশোরদেরও তেমনি এ জাতীয় চিত্তবিকার ঘটে।

এরূপ কেন হয়—তার বিচার বিজ্ঞান-শাস্ত্রীরা করুন। আমি শুধু যা হয়, তাই বলছি।

এ ঘটনার কারণ অবশ্যই আছে। আমরা গল্প-লেখকেরা যদি সে কারণের বিষয় বক্তৃতা করি, তাহলে psychology, physiology এবং উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে এক সঙ্গে মিলিয়ে ও ঘুলিয়ে যে শাস্ত্র বানানো হয়েছে—যার নাম sexology —তারও অনধিকার চর্চ্চা করব।

এ সব বিদ্যের পাঁচমিশেলী ভেজাল উপন্যাসে চলে, বিশেষতঃ শেষোক্ত উলঙ্গ শাস্ত্রের, কিন্তু ছোট গল্পে চলে না, কেননা তাতে যথেষ্ট জায়গা নেই।

আমরা বিলেত নামক কামরূপ কামাখ্যায় গিয়ে যে ভেড়া বনে যাই—এ কথা শুনে আশা করি কুমারী পাঠিকারা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। বিলেতী মেয়েরা যে রূপে দেশী মেয়েদের উপর টেক্কা দিতে পারে, তা অবশ্য নয়। রাস্তাঘাটে যাদের দু বেলা দেখা যায়, তাদের নিত্য দেখে নারীভক্তি উড়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে দলে পুরু। অবশ্য বিলেতে যারা সুন্দরী তারা পরমাসুন্দরী, মানবী নয় অপ্‌সরী। সুখের বিষয় এই অপ্‌সরীদের সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ বাঙ্গালী যুবকদের ঘটে না। আর আমরাও সে দেশে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে উদ্বাহু হই নে।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে—অধিকাংশ দেশী যুবক বিলেতে প্রেমে পড়ে। কিন্তু সকলেই আর কিছু বিলেতী মেয়েদের বিয়ে করে না। নভেল-পড়া দেশী মেয়েরা বোধ হয় বিশ্বাস করেন যে মানুষ প্রেমে পড়লেই শেষটা বিয়ে করা স্বাভাবিক। অবশ্য এ রকম কোনও বিধির বিধান নেই। প্রেমে পড়াটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ও হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষণ। অপর পক্ষে বিবাহটা হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের মূল ভিত্তি। লোকে প্রেমে পড়ে অন্তরের ঠেলায়—আর

বিয়ে করে বাইরের চাপে। প্রেমের ফুল—বিলেতী নভেলে—বিবাহের ফলে পরিণত হতে পারে, কিন্তু জীবনে প্রায় হয় না। জীবনটা romance নয়, তাই ত romantic সাহিত্যের এত আদর।

আমি বিলেতে প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিলেতী মেয়েকে বিয়ে করিনি, করেছি দেশে ফিরে দেশের মেয়েকে আর নির্ব্বিবাদে সস্ত্রীক সমাজের পিতলের খাঁচায় বাস করছি। কপোত কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়েও নয়, ঠোক্‌রা ঠুক্‌রি করেও নয়। কিন্তু সেই আদি প্রেমের জের বরাবরই টেনে এনেছি অন্ততঃ মনে।

জনৈক উর্দ্দু বা ফারসী কবি বলেছেন "উনসে কুতানং বাকী অস্ত্"। অর্থাৎ অন্তরের মনসিজ ভস্ম হয়ে গেলেও সেই ছাইয়ের অন্তরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বাকী আছে। আমরা হিন্দুরা হলে বলতুম, দগ্ধ সূত্রে সূত্রের সংস্কার থাকে। আমার মনেও ঐ জাতীয় একটা ভাব ছিল। কখনো কখনো গোধূলি লগ্নে যখন ঘরে একা বসে থাক্‌তুম, তখন তার ছায়া আমার সুমুখে এসে উপস্থিত হত, তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। বছর চার পাঁচ আগে শীতকালে বড়দিনের আগের রাতে মনে হল সেই বিলেতী কিশোরীটি আমার শোবার ঘরে লুকোচুরি খেলছে—এই আছে, এই নেই। সমস্ত রাত ঘুম হল না, জেগে স্বপ্ন দেখলুম। স্ত্রীকেও জাগালুম না। সে রাত্তিরে আমার জ্বর হয় নি, কিন্তু বিকার হয়েছিল।

পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হল, দেহ ও মন দুই সমান বিগড়ে গেছে, আর বিকারের ঘোর তখনও কাটেনি।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অসুখ করেছে?

—কেন?

—তোমাকে ভারি শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

—কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি বলে।

—তবে কি আজ বেলা সাড়ে নটায় থিয়েটারে যাবে?

—যাব। আর বাড়ী ফিরে দুপুরে নিদ্রা দেব।

থিয়েটারে যেতে রাজী হলুম—সে আমার সখের জন্য নয়, স্ত্রীর সখের খাতিরে।

আমরা বেলা সাড়ে নটার সময় চৌরঙ্গীর একটা থিয়েটারে গেলুম। কলিকাতার সৌখীন সাহেব-মেমদের গান শোনবার জন্য। সে গানবাজনা শুনে মাথা

আরও বিগড়ে গেল। একে বিলেতী গান বাজনা, তার উপর সে সঙ্গীত যেমন বেসুরো তেমনি চীৎকার-সর্ব্বস্ব। আমি পালাই পালাই করছিলুম। আমার মন বলছিল ছেড়ে দে মা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের বাঁ পাশের সারের প্রথম চেয়ারে বসে আছে আমার আদি প্রণয়িনী। এ যে সেই, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সেই Grecian নাক, সেই violet চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু জাদু। একে দেখে আমার মাথা আরও ঘুলিয়ে গেল। আমার মনে হল—এ হচ্ছে optical illusion ; গত রাত্তিরের অনিদ্রা, তার উপর এই বিকট সঙ্গীতের ফল। একটু পরে থিয়েটারের পরদা পড়ল—কিছুক্ষণ বাদে উঠবে। অমনি সেই বিলেতী তরুণী উঠে দাঁড়ালেন ও আমাকে চোখ দিয়ে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমিও আমার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর অনুসরণ করলুম।

বাইরে গিয়ে—আমি প্রথমে সিগারেট ধরালুম। তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে,

—আমাকে চিনতে পারছ ?

—অবশ্য। দেখামাত্রই।

—এতকাল পরে ?

—হাঁ। এতকাল পরেও। আমাকে চিনতে পেরেছ !

—তোমার ত বিশেষ কোনও বদল হয় নি। ছিলে ছোকরা, হয়েছ প্রৌঢ় —এই যা বদল। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। যাক্ ও সব কথা। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—কি কথা ?

—তোমার পাশে কে বসেছিল ?

—আমার স্ত্রী।

—তোমার আর কিছু না থাক্ চোখ আছে। কত দিন বিয়ে করেছ ?

—বিলেত থেকে ফিরেই, অল্পদিন পরে।

—আমাকে বিয়ে করলে না কেন ?

—জানিনে। করলে কি হত ?

—তোমার জীবন আরামের হত না। কিন্তু তোমার স্ত্রীর মত আমারও আজ রূপ থাকত, প্রাণ থাকৃত।

—কেন তুমি ত যেমন ছিলে তেমনি আছ।

—তার কারণ তুমি ত আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছ তোমার স্মৃতির ছবি।

—তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি নে।

—পারবে আমি চলে যাবার সময়।

—কখন চলে যাবে?

—ঐ সিগারেটের পরমায়ু যতক্ষণ আমার মেয়াদও ততক্ষণ। ও যখন পুড়ে ছাই হবে, তোমার পূর্ব্বস্মৃতিও উড়ে যাবে। তখন দেখবে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরের প্রকৃত রূপ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,

—এ রূপ-পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

—আমি বহুরূপী।

—তা জানি, কিন্তু সে মনে। দেহেও কি তাই? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছিনে।

—কবেই বা কি তুমি বুঝতে পেরেছ? Prologue-এর রূপ ও epilogue-এর রূপ কি এক? তা জীবন-নাটক comedyই হোক্ আর tragedyই হোক্।

—তোমার জীবন-নাটক এ দুয়ের মধ্যে কোনটি?

—গোড়ায় comedy, আর শেষে tragedy।

—কথা কইবার ধরণ তোমার দেখ্‌ছি সমান আছে।

—তুমি ত কখনো আমাকে ভালবাসনি। ভালবেসেছিলে আমার কথাকে। তাই তুমি আমাকে বিয়ে করোনি। পুরুষ-মানুষে মেয়ে-পুতুলকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু গ্রামোফোনকে নয়।

—আর তোমার কাছে আমি কি ছিলুম?

—আমার খেলার সাথী।

—কোন্ খেলার?...

—ভালবাসা-বাসি পুতুল-খেলার। তুমি যখন বিলেত থেকে চলে এলে

তখন দুচারদিন দুঃখও হয়েছিল। পুতুল হারালে ছোট ছেলে মেয়েদের যে রকম দুঃখ হয়।

—তার পর আমার কথা ভুলে গিয়েছিলে ?

—হাঁ, ততদিন যতদিন জীবনটা comedy ছিল। আর যখন তা tragedy হয়ে দাড়াল, তখন আমার মনে তুমি আবার ফিরে এলে।

—এর কারণ ?

—সুখে থাক্‌তে আমরা অনেক কথা ভুলে যাই। দুঃখে পড়লেই, পূর্ব্বসুখের কথা মনে পড়ে।

আমি বললুম, হেঁয়ালী ছাড়। ব্যাপার কি ঘটেছিল বলো।

সে উত্তর করলে,

—অতকথা বলবার আবশ্যক নেই। দু কথায় বলছি। আমিও তুমি চলে আসবার পরে বিবাহ করেছিলুম। একটি ধনী ও মানী লোককে। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে আমি একটি পুতুল। পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আমি স্ত্রীলোক হলেও মানুষ। আর আমিও আবিষ্কার করলুম যে তিনি পুরুষ হলেও সমাজের হাতে গড়া একটি পুতুল মাত্র। কাজেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার পর থেকেই সামাজিক ও সাংসারিক হিসেবে আমার অধঃপতন সুরু হল। তার পর দুঃখকষ্টের চরম সীমায় পৌঁছেছিলুম। আর সেই সময়েই তোমার স্মৃতি আবার জেগে উঠল, জ্বলে উঠল। এখন আমি সুখদুঃখের বাইরে চলে গিয়েছি। আবার যখন দেখা হবে সব কথা বলব।

—আবার দেখা কবে ও কোথায় হবে ?

—কবে হবে জানিনে। তবে কোথায় হবে জানি। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে। সে দেশে ঘড়ি নেই। কালের অঙ্ক সেখানে শূন্য—অর্থাৎ অনন্ত। সে হচ্ছে সুধু কথার দেশ।

এর পরে সে বললে—ঐ যে তোমার স্ত্রী তোমাকে খুঁজতে আস্‌ছে। আমি সরে পড়ি। এই কথা বলবার পরে, পুরাকালে সুর্পনখা যেমন এক মুহূর্ত্তে পরমা সুন্দরীর রূপ ত্যাগ করে ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করেছিল, সেও তেমনি নবরূপ ধারণ করে আমার সুমুখে দাঁড়াল। সেটি একটি জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা, পরনে তালিমারা ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক। অথচ তার মুখে চোখে ছিল তার পূর্ব্বরূপের চিহ্ন।

যদিচ তার চোখের রঙ এখন violet নয়, ঘোলাটে, আর তার নাক Grecian নয়, ঝুলে পড়ে Roman হয়েছে। আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখছি, এমন সময় আমার স্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এখানে রোদে দাঁড়িয়ে কি করছ, তোমার না অসুখ করেছিল ?

আমি বললুম—একটা বুড়ী মেম আমাকে এসে জ্বালাতন করছিল ভিক্ষের জন্যে। এই মাত্র চলে গেল।

—কৈ আমি ত কাউকে দেখলুম না, বুড়ী কি ছুঁড়ী কোনও মেমকেও। সকাল থেকেই দেখ্‌ছি কেমন মনমরা হয়ে রয়েছ। সমস্ত রাত্রে ঘুমোও নি, তার উপরে এই দুপুর রোদে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছ। চল বাড়ী যাই, নইলে তোমার ভির্মি লাগ্‌বে।

—যো হুকুম। চল যাই।

—ভাল কথা আজ তোমার হয়েছে কি ?

—আজ আমার Merry Christmas।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ইতিহাসের কাল

(২)

এতক্ষণ আমি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনা করলাম। এইবার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের সীমা ও পদ্ধতি আলোচনা করব, প্রমাণ করতে যে সমাজতত্ত্বেরও কালপ্রত্যয় ভিন্ন করা হয়েছে কালপ্রত্যয়ের ডায়ালেক্‌টিক অস্বীকারের জন্যে। যাঁরা সমাজতত্ত্বেরই অস্তিত্ব মানেন না তাঁদের কথা আপনিই বাদ পড়ছে। যাঁরা অস্তিত্ব মানেন তাঁরা অনেকে বলেন সীমা পার্থক্যের ঝোঁকে।[১] প্রধানতঃ, এঁদের মতে, সমাজতাত্ত্বিকের নজর পড়বে সামাজিক জীবনের গতির টানগুলির সাধারণ নির্দ্দেশ ও পরস্পারের সম্বন্ধ আবিষ্কারের দিকে, এবং ঐতিহাসিকের নজর পড়বে বিশেষ ও concrete ঘটনার দিকে। কেউ বা বলেন ঐতিহাসিকের concrete-এর, বিশেষের, মধ্যেই সাধারণ বাসা বাঁধে, কেউ বলেন বিশেষ থেকেই সাধারণ উৎপন্ন হয়, তার অনুভূতি (intuition) হয়। বিরুদ্ধমতের বিশদ ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন ট্রয়েল্‌শ[২]। তিনি বলেছেন, সমাজতত্ত্বে অন্ততঃ পাঁচটি বিভাগ থাকা চাই। (১) সাধারণ ও রূপগত (formal) ঐক্য-বিচার—বিষয়-নিরপেক্ষভাবে ; (২) সাধারণ গুণের দৃষ্টান্ত, যেমন ধর্ম্ম ও আর্ট ; (৩) বিশেষ একটি সমাজের concrete রূপ দেখানো ; (৪) ভিন্ন দিক, অবস্থার ও ঝোঁকের তুলনা ; এবং (৫) সামাজিক পরিশীলনের সঙ্গে সমাজের ইকনমিক, পলিটিক্যাল প্রভৃতি ভিত্তির সম্বন্ধ নিরূপণ। ট্রয়েল্‌শের বিশ্বাস যে এই বিভাগের যে কোনোটি থেকে যা প্রত্যয় উঠবে তার সাহায্যে ঐতিহাসিকের কাজ চলবে না। অন্য দিকে ইতিহাস হল concrete and intuitive representation of individual wholes। সম্পূর্ণতা আঙ্কিক যোগ নয়, পুরোপুরি emergent। অনুভূতি চাই এই জন্য যে প্রত্যেক যুগের ও দেশের এমন বিশেষ গুণ (Wesen, Sinn) আছে যাকে বুঝতে হলে সাধারণ তর্ক-

১ মতামত বর্ণিত হয়েছে Morris Ginsberg এর Studies in Sociology বই-এর History and Sociology নামক অধ্যায়ে। আমি সেই বই থেকেই উদ্ধৃত করছি।

২. ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়।

বুদ্ধিতে চলবে না, চাই অন্তর্দৃষ্টি, সহ-অনুভূতি, 'immanent criticism'—এক প্রকার 'এম্‌প্যাথি'। কোনটি সম্পূর্ণ ও এক বুঝতে ত বটেই। ইতিহাসের পদ্ধতি তা হলে sympathetic penetration, সমাজতত্ত্বের ও বিজ্ঞানের যেমন বিশ্লেষণ ও সমন্বয়।

ট্রয়েলশের ইতিহাসের বিশেষত্ব সমালোচনা করা শক্ত নয়। অনুভূতির প্রজ্ঞান-ধারা (cognitive process) ও বৈজ্ঞানিকের construction মূলতঃ একই। গ্রীক সভ্যতা যে অখণ্ড সত্তা বুঝব কিসে? ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই শুনে আসছেন, অন্য ঐতিহাসিকের রচনা থেকে, সাধারণের মুখ থেকে যে গ্রীক সভ্যতা একটি অখণ্ড সত্তা। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিশ্চয়ই পুঁথি শিলালিপি প্রভৃতি বিচার করেই ঐ আন্দাজ করেছিলেন। তাঁদেরও ঐ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও construction পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছিল (যে-পদ্ধতির দোষ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়েছি)। ধরা যাক, গ্রীক সভ্যতার অখণ্ডত্ব আরো ভালোভাবে প্রমাণিত হল একখানি ইতিহাসে। বুদ্ধিমান পাঠক সে ব্যাখ্যা, ও সেই রূপোদঘাটন গ্রহণ করতে পারেন না যতক্ষণ ইতিহাসে উল্লিখিত প্রমাণগুলিকে পুনরায় না যাচাই করেন। যাচাই-এর প্রকৃতি, পদ্ধতি, মনোভাব সবই বিজ্ঞানের। কোনো অনুষ্ঠানের ইতিহাস কি-ভাবে লেখা হয়? বিবাহের ইতিহাস কি ইতিহাস পদবাচ্য নয়? সে-ইতিহাস লিখতে কত বিশ্লেষণেরই না প্রয়োজন আছে! ধনিক-তন্ত্রের ইতিহাস সম্বার্ট লিখেছেন, তিনি নিজেই আবার লিখছেন যে সেটি একসঙ্গে ইতিহাস ও ইকনমিক্ থিওরী। তা ছাড়া, সভ্যতায় সভ্যতায় আদান-প্রদান, প্রভাব, যাকে diffusion বলে, তার সাধারণ উত্তরাধিকারগুলি কি ইতিহাসের বহির্ভূত? বেদে জাতির ইতিহাস কি লেখা যায় না; তারা ত কেবলই বাহক। আমার বক্তব্য এই: অনুভূতির অর্থ সামান্যীকরণ, কম সংখ্যক ঘটনা থেকে বৃহৎ সামান্যীকরণকেই সাধারণতঃ অনুভূতি বলা হয়। অনুভূতির বিশেষ অস্তিত্ব আছে কি নেই তর্ক তুলব না[১], তবে এটা ঠিক যে তার প্রমাণ নিজেরই মধ্যে, ইতিহাসের পদ্ধতিতে নেই।

স্বীকার করতে সকলেই বাধ্য যে সামান্যীকরণ সকল জ্ঞানীকেই করতে হয়, ঐতিহাসিককেও। কিন্তু সামান্যীকরণটাই কি এক প্রকারের? লিট্ বলছেন,

---

১ চিন্তয়সি···যোগধর্ম্মের যুক্তি···

তিন প্রকারের[১] ঃ—(১) অনুভূতিমূলক যেমন স্ত্রীজাতি ও মহাত্মাজীর ; (২) শ্রেণী-বিভাগমূলক, যেমন লিনীয়াসের কিংবা হেগেলের ; এবং (৩) concrete universal-এ বিশ্বাসীদের। ট্রয়েল্‌শের মতে প্রথমটি, হেগেলের Philosophy of Historyতে মোটামুটি দ্বিতীয়টি, এবং রিকার্ট-এর মতে তৃতীয়টিই প্রকৃত ঐতিহাসিক সামান্যীকরণ। কোনটি ঠিক্? লিট বলছেন ঃ ভাল কথা, মানলাম ঐতিহাসিকের অনুভূতি যে-কোনো সাধারণ ব্যক্তির যে-কোনো অভিজ্ঞতা-বোধেরই সমগোত্রের, অর্থাৎ বিশেষ, concrete, অখণ্ড, হঠাৎ আলোর ঝলকানি। কিন্তু অখণ্ড অভিজ্ঞতাগুলি ছিন্ন ভিন্ন থাকলে চলে না—তাদের বাছতে হয়, সাজাতে হয়। তাও না হয় বুদ্ধির অতিরিক্ত বোধির (understanding-এর) সাহায্যে হল। কিন্তু তার পরেও কাজ রয়েছে, uniformitiesগুলিকে একত্রিত করে বাক্যে পরিণত করতে হবে, তবেই অখণ্ড সত্তার অখণ্ড ছবি ফুটবে। এখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-বুদ্ধিরই প্রয়োজন। অনুভূতিতে আকারের নেগেটিভ ওঠে, কিন্তু আলো-কালোর ছবি তৈরী হয় না।

সামান্যীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার গোটাকয়েক বক্তব্য আছে। (১) কথার প্রকৃতিই এমন যে তার সঙ্গে অনেক ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা মিলে মিশে থাকে। যে কথা যত বেশী পরিমাণে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে সামান্যভাব উদ্রেক করতে পারে সেই কথাই সামান্যীকরণের ভাষায় প্রয়োগ করা হয়।[২] অতএব যথার্থ সামান্যীকরণ কি ভাবের জোরে ঘটছে বুঝতে হবে। সে জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন। (২) ক্যাসিরার বলছেন কথার প্রাথমিক প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত সার্ব্বজনীন, সেই সার্ব্বজনীন অর্থ এখনকার সেই কথাগুলির ব্যবহারেও জুড়ে থাকে। কথার কাজ প্রথমে ছিল ব্যক্তিগত ছাপকেই এমন অর্থ দেওয়া যা আপনা থেকেই ন্যায্য (valid)। ক্যাসিরারের মতে নামকরণ 'is not a consequence of the class to which something belongs, but connects itself with some single quality which is apprehended in a vivid

১ T. Litt···The Universal in the Structure of Historical Knowledge (Phil and His.)

২ Reality (with cheers) এডিংটন। পারেটো তাঁর Mind and Society-র প্রথম ভলুমে এর বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। Empson, Ogden, Richards-এর রচনা দ্রষ্টব্য।

content'। কিন্তু আজ যখন কোনো ঐতিহাসিক baroque, cinquecento, কিম্বা ভিকটোরীয়ান যুগ কথাটি ব্যবহার করেন তখন কি গুণাবলীর তালিকা হিসেবে, মোটামুটি, তাদেরকে ক্ল্যাসিক্যাল কি এলিজাবীথান যুগ থেকে পৃথক করেন না? তালিকা প্রস্তুত কি করে হয়, গুণগুলি কি উপায়ে নির্দ্ধারিত হয়, কেমন ভাবে ভিন্নতা দেখানো হয়? বুদ্ধিবিচারেরই দ্বারা—যেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই বিচার, যেখানে সেই circular reasoning। (৩) সর্ব্বপ্রকার সামান্যী-করণেরই পিছনে বিষয়ের গঠন সম্বন্ধে গোটাকয়েক এমন পূর্ব্বস্বীকৃত সংজ্ঞা থাকে যেগুলি প্রমাণ করা সম্ভব সামান্যীকরণের পরে। ধরা যাক্, হিন্দু জাতির ইতিহাস লিখছেন একজন হিন্দু। তাঁর পক্ষে প্রমাণ করা শক্ত হবে না যে হিন্দু জাতির মনের ওপর হিন্দু-দর্শনের ছায়াপাত হয়েছিল বলেই যা ঘটবার তা ঘটেছিল, অর্থাৎ যা বর্ণনা করেছেন তাই হয়েছিল। হিন্দুদর্শনে বিশ্বের গঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি প্রধান ধারা আছে, যেটি ভাষার খাতে বইছে, যে ভাষা পুঁথিতে আছে, এবং ঐতিহাসিক আজও সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করেন। সেই ধারার বশবর্ত্তী হয়ে, সেই ভাষার প্রভাবে ঐতিহাসিক হিন্দুজাতির ইতিহাস লিখছেন। ধরাই যাক, আজকার হিন্দুজাতির বিশেষত্ব তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাই থেকে গোটাকয়েক ব্যাবহারিক সত্যে (emperical generalis-tions) উপনীত হয়েছেন। কিন্তু পুরাতন কালের বর্ণনা লেখবার সময় কি ঐ প্রকার ব্যাবহারিক সত্যগুলি সামান্য বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছেনা, অবচেতনায় ডুবে যাচ্ছে না, ডুবে গিয়ে কি ভিন্ন গুণ অর্জ্জন করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কিন্তু তার কি তিনি বিচার করছেন? করছেন না। একমাত্র কারণ তিনি তা পারেন না। কারণ, লিটের ভাষায়, spiritual world-এর সংবাদে, 'what the thinking mind presupposes forms at the same time a part of what it wants to investigate। লিট আগের লাইনে লিখছেন এই বিশেষত্বটুকু যাঁরা spiritual world-এর (ঐতিহাসিক) বিবরণ লেখেন তাঁদের লেখাতেই থাকে, অর্থাৎ তাঁরাই এই দোষে দোষী। কিন্তু ঠিক ছয় লাইন পূর্ব্বে লিখেছেন 'প্রত্যেক' চিন্তারই এই দোষ। আমারও মত, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই অংশকে অর্থাৎ পূর্ব্ব-অঙ্গীকারকে সম্পূর্ণ ভাবার অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ভাবার গলদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন না, যতক্ষণ না পুরানো য়্যারিষ্টটেলীয়ান যুক্তি ত্যাগ করেন। লিট্

আশা দিয়েছেন ইতিহাসে পূর্ব্বস্বীকারগুলি নতুন অর্থ বহন করে। আমার মতে সর্ব্বত্রই তাই হয়, সর্ব্বক্ষেত্রেই partগুলি participate ক'রে নতুন অর্থ বহন করে, সর্ব্বত্রই তখন constitutive and fundamental motives-এ ঘটনা, পদ্ধতি, প্রত্যয়গুলি পরিণত হয়।

ট্রয়েলশ্‌ সমাজতত্ত্বের বিষয়কে ঘটনার সাধারণ-গুণ আবিষ্কার ও তার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের মতনই বিশ্লেষণ ও সমন্বয় বলেই খালাস। কিন্তু রাইস্[১] সম্পাদিত সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তকে অন্ততঃ পক্ষে বাইশটি, বিভিন্ন পদ্ধতির সাক্ষাৎ পেয়েছি। গিন্‌স্‌বার্গের[২] যে-প্রবন্ধ থেকে আমি এতক্ষণ মত বিচার করেছি তাতে তিনি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিবিড় সম্বন্ধ দেখিয়ে ক্ষান্ত। কিন্তু দুবৎসর পরে লেখা বইতে[৩] তিনি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণকেই (Functional correlation) এবং মিল-এর ভাষায় Inverse-Deductive method-কেই সমাজতত্ত্বের বিষয় ও পদ্ধতি বলেছেন। অতি সাবধানে লিখেছেন, হয়ত এরই সাহায্যে সমাজতত্ত্বের middle principlesগুলি আবিষ্কৃত হবে, হয়ত সমাজতত্ত্বের বিশেষ রীতি (laws) বেরিয়ে আসবে। মিল-এর একটি বাক্য তুলে দিচ্ছি, যার সাহায্যে সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সমীকরণ প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে সংশোধিত হতে পারে: "when states of society and the causes which produce them are spoken of as a subject of science it is implied that there exists a natural correlation among these different elements; that not every variety of combination of these general social facts is possible; that, in short, there exist uniformities of co-existence between the states of the various social phenomena[৪]।" এখন গোল বাধে there exists কথা নিয়ে। 'আছে' এটা বিশ্বাসের অঙ্গ যদি না হয় তবে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অন্তর্গত হতে বাধ্য। অথচ 'আছে' বিশ্বাসটিই সমাজতত্ত্বের সর্ব্বপ্রাথমিক

---

১ Rice—Methods in the Social Sciences ?

২ Ginsberg—Studies in Sociology 1932

৩ ,, —Sociology 1934

৪ J. S. Mill—Logic—Book VI, Ch X.

অঙ্গীকার[১]। Inverse Deductive method তুলনামূলক বিচারেরই অঙ্গ, যেটা মিল-এর সময় ব্যবহৃত না হলেও আজকালকার অনেক ঐতিহাসিকই ব্যবহার করছেন।

মোদ্দা কথা এই, পুরাতন যুক্তির সমাজতত্ত্বের এমন কোনো সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না যা থেকে তার নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভূত হয়। কোনো সমাজতাত্ত্বিকই বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে বাদ দিতে পারেন না। আমি সমাজতত্ত্বের সীমা আছে কি না আলোচনা করব না। তার অনেক বিভাগ আছে, প্রত্যেকের সম্বন্ধে নানা মতামত আছে। সুবিধার জন্য কেবল আমি Sociology of Knowledge নামক নতুন জ্ঞানের কাল-প্রত্যয়ের সমালোচনা করছি। কয়েকটি কারণে :—এটাই নতুনতম ;[২] আমার বিষয়—কালতত্ত্ব এই জ্ঞানেরই অংশ, এবং সমাজতত্ত্বে সামাজিক কালপ্রত্যয়ের যে বিশেষ অর্থ আছে, সোরোকিনের এই প্রতিপাদ্য ঐ নতুন জ্ঞানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, ক্লিবান্‌স্কী পরিষ্কার বলছেন[৩] যে এই প্রকার সমাজতত্ত্বই ইতিহাসের বিপরীতধর্ম্মী, অর্থাৎ তাঁর মতে Sociology of Knowledge ও ইতিহাসের সীমা সুস্পষ্ট। ইতিপূর্ব্বে আমি সমাজতত্ত্বের কালের ইঙ্গিত দিয়েছি। পুনরুল্লেখ করছি,সেটি সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, তারই

---

১ Ginsberg—Sociology, ১৯ পৃঃ

২ Mannheim—Sociology of Knowledge 1936ই প্রথম বড় চেষ্টা।

৩ "But history now seems to be at the mercy of a more dangerous foe, the destructive forces of the modern Sociology of Knowledge, which calls in question every claim to objectivity and therewithal the scientific character of history"—Klibansky : The Philosophical Character of History (His and Phil p. 335.)। তিনি নতুন সমাজতত্ত্বের আপেক্ষিকতাকে ইতিহাসের objectivityর শত্রু বলেই সামলে গিয়েছেন…'For the notion of objectvity has changed its character. From a *fixum* confronting the thinking consciousness it has become a pure invention of the thought itself (!), a tendency of consciousness towards gaining as far as possible objective knowledge of phenomena. p. 336। কিন্তু এর সঙ্গে Sociology of Knowledge-এর objectivity-র সংজ্ঞার কোনো পার্থক্য নেই—Vide Preface to Mannheim's Sociology of Knowledge by Louis Wirth p. XX

মাত্রা লয় ছন্দে চলে, এবং ভিন্ন ব্যবহারকে কালসূত্রে গাঁথবার জন্য তার উৎপত্তি, তার অস্তিত্ব নির্ভর করে social correspondenceগুলির ওপর। অবশ্য এও বলেছি, তার মানে নয় যে ক্যালেণ্ডারের কাল নেই, বলেছি সামাজিক কাল তার সহকারী প্রত্যয়, অবশ্য এমন সহকারী যে তার বদলে কাজ চালিয়ে নিতে সে পারে। যে-সব সামাজিক ঘটনার আবর্ত্তন-প্রবণতা পাঁজির কাঠামোতে পড়েনা সেগুলি সামাজিক কালের ছন্দ ও লয়ে সহজে সজ্জিত ও অর্থ-যুক্ত হয়। অতএব সমাজ-তত্ত্বের functional correlation-এর দিক থেকেও এর সার্থকতা।[১]

এ অতি চমৎকার কথা। কিন্তু periodicity এক নয়, বহু। ভিন্ন পরি-বেশে, ভিন্ন স্বার্থবন্ধনে সেগুলি পৃথক। সমাজের অন্তরেই বহু লয় চলছে, কোনোটি এত দ্রুত যে তাকে মাত্রা বলাই চলে। আবার আন্তরসামাজিক লয় থেকেই বৃহত্তর লয় পাওয়া যায় (সোরোকিন স্বীকারও করেছেন। বৃহত্তমকে তিনি গ্রীণ-উইচ কাল বলেছেন—যেমন এস্‌পেরাণ্টো ভিন্ন ভাষার সাধারণ গুণ নিয়ে তৈরী হয়েছে)। কিন্তু কোন্ স্বার্থে বৃহত্তর বিভাগ তৈরী হয়? বৃহত্তর সুবিধায়, না অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কালবিভাগ পাশাপাশি থাকার জন্য যে অসুবিধা হয় তাকে দূর করতে? সাধারণ মানুষ তার নিজের সমাজেরই জীব, আন্তর্জাতিক জীব তিনিই যিনি সমাজে আদান-প্রদানে ব্যস্ত—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর দল। বৈজ্ঞানিকও বটে। কিন্তু যে বিজ্ঞান-সভায় বিজ্ঞানসম্মত পরিমাণের সুবিধার জন্য পৃথক সামাজিক লয়গুলির সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয় সেটির জন্ম সমগ্র বিশ্বে ব্যবসার প্রসারেরই কালে। রয়াল সোসাইটির জন্মকাল স্মরণ করলেই হবে। যতদিন অবাধ বাণিজ্য চলল তখন বৃহত্তর সামাজিক কাল আর বৈজ্ঞানিকের গ্রীণউইচ সময় একই রইল। কিন্তু প্রোটেক্‌শানের যুগে, যুদ্ধের সময়, বিপদকালে কালবিভাগ ওলট পালট হয়ে যায়। Day-light savingই তার একটি দৃষ্টান্ত। গ্রীণউইচ কালের তালে রাশিয়া চলে নি, তাই রুশ সমাজের অদল বদল অন্য সমাজের কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। জার্ম্মানী, জাপান, ইটালী কি সকলেই গ্রীণউইচের ঘড়ি ধরে বসে আছে? থাকে তারা যারা অভিব্যক্তিবাদের ছ্যাকড়া গাড়িতে চড়ে স্বর্গে উঠতে যায় এবং যাত্রাস্থানেই ফিরে আসে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস-দলের কাল গ্রীণউইচের লয়ে চলে না। কিন্তু Goverment of India Actএরই কাল-

১ Sorokin—Ibid.

প্রত্যয় গ্রীণউইচের। অতএব, স্বার্থভেদে কাল-বিভাগ কেবল নয়, স্বার্থজ্ঞানেই সেই 'নিঃস্বার্থ' গ্রীণউইচ কাল ভেঙ্গে চুরে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে সোরোকিনের সামাজিক periodicity সেই ঘুরে ফিরে যথাস্থানে চলে এল, cycleএর মতন। সমাজতত্ত্বে, বিশেষতঃ অর্থনীতির business-cycle মতামতের আলোচনায়, পণ্ডিত-প্রবর পূর্ব্বে যা লিখেছেন[১] তার অনেক কথাই তাঁর এই প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আমি মাত্র কয়েকটি আপত্তি উদ্ধার করছি। (১) non-periodic cyclesও আছে। Periodic cycles যদি উদ্দেশ্যে চালিত হয় তবে হয় সে-গুলির চিত্র বৃত্তাকারের, না হয় কম্বুরেখার (spiral)। উদ্দেশ্য এখানে যে ব্যক্তি মত খাড়া করেছে তারই, সমাজের নয়। (২) লয়, কিংবা বৃত্তগুলি এক মাপের নয়, কারণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সমান জোরের নয়। কোন্‌টি নির্ব্বাচিত হবে তার হদীশ এই মতামতে নেই, সামাজিক কালপ্রত্যয়ের মধ্যে নেই। তা ছাড়া, যেটি বৃহত্তর সেইটিই পরিমেয়। কিন্তু সেইটাই সব চেয়ে স্থায়ী, কিংবা সমাজের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি না তার ঠিক নেই। (৩) একটা ছোট cycle শেষ হয়ে বড়তে পৌছতে সময় লাগে। সেই time-lagকে মতের মধ্যে আনতে long period নিতে হয়। এটা ফাঁকি, সংখ্যাগণনার[২]। (৪) বড় লয় ছোট লয়ের বিরোধ বাধেই বাধে, কারণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। অথচ বড়কে জানতে হলে ছোটকে চিনতে হয়। ছোট লয়ের মধ্যেও বড় লয়ের কাজ থাকে (যাঁরা সেতারের গৎ তোড়ার ধূণ শুনেছেন তাঁরা সহজেই আমার বক্তব্য বুঝবেন)। সোরোকিন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাই তাঁর প্রবন্ধের শেষে লিখছেন—'The fact is—that when social and astronomical ("time") phenomena are related, other social correlates of the same astronomical phenomena must be ascertained before these relations take on any scientific significance. Otherwise, these constitute but empirical uniformities which remain theoretically sterile"। এটাও কি আমাদের পরিচিত circular reasoning নয়? ষট্‌চক্রভেদের মতনই একে ভেদ করা শক্ত। অতএব দাঁড়াল এই ঃ—ভূতবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের সেই

---

১ Contemporary Sociological Theories···730-734.

২ প্রমাণ Moore's Business Cycles-এর periodicities.

একই সমস্যা, তাদের সীমানির্দ্ধারণে, তাদের পদ্ধতিতে, অতএব তাদের কাল-প্রত্যয়ে। ডায়েলেকটিক যুক্তি ভিন্ন কারুরই গতি নেই, কারণ formal logic-এই ঐ গোলমাল বেধেছে। পণ্ডিতবর্গ যা betray করেছেন (parade-এ নয়) তাইতেই তাঁদের যুক্তির গলদ ধরা পড়ে।

মনস্তত্ত্বের কালপ্রত্যয় নিয়ে আলোচনা কিছু হয়েছে। মেরী ষ্টার্ট বলছেন,[১] কালপ্রত্যয় সমাজের প্রভাবে মানুষ মনে তৈরী করে। 'মানসিক বয়স'-এর ধারণার সঙ্গে আজ সকলেই পরিচিত। মানসিক ঘটনার পরীক্ষা ছেড়ে দিলেও, ফ্রয়েডের মতামতে ডায়েলেকটিক সুস্পষ্ট, অস্‌বর্ণ্‌ সাহেব দেখিয়েছেন।[২] ফ্রয়েডের নতুন মতে Id, Ego ও Super-ego-র মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। প্রথমটি সুখ চায়। দ্বিতীয়টির অনেক কাজ—reality principle-এ বাধা দেওয়া, প্রথম ও তৃতীয়টির সামঞ্জস্য-বিধান ইত্যাদি। তৃতীয়টির প্রিন্‌সিপল পিতৃত্ব-বোধ—কখনও আদর্শ, কখনও নিষেধ, ব্যক্তিগত জীবন অনুসারে। সেই অনুযায়ী আবার সমাজের গঠন সম্বন্ধে ধারণা ফোটে। অস্‌বর্ণ্‌ সাহেব কালপ্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর আলোচনা থেকে কালপ্রত্যয়ের সৃজন-রীতি খানিকটা বোঝা যায়। ঈদ্‌ ও ইগোর বিরোধে কালপ্রত্যয় জন্মায়। সুখময় ঘটনায় কাল দ্রুত, অবদমিত হলে ধীরে। সমাজ-সংরক্ষণ প্রবৃত্তি, (যেটা সুপার-ইগোর ওপর নির্ভর করে) জোরাল হলে কালের গতি মন্দা হয়, আবার ধ্বংসের প্রবৃত্তিতে কাল ধুনে চলে। ইউটোপীয়া রচনায়, এই দুঃখময় কালের অন্তে সুখময় কালাতীত সমাজ কল্পনায় ঈদ্‌-এর সুখপ্রবৃত্তি পিতৃত্ববোধের সুখস্বপ্নকে মূর্ত্তি দেয়। এটা এক হিসেবে জেমসেরই কথা।[৩] নতুনত্ব, ইগোর reality principleকে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা, টানাটানি ও দারিদ্র্য বলা। বাস্তবিক পক্ষেও তাই। "O Economics, O

---

১ Time is a concept, and this concept is constructed by each individual under the influence of the society in which he lives.—M. Sturt. p. 141.

২ Osborn—Freud and Marx.

৩ W. James – Principles of Psychology : Vol 1. "In general, a time filled with varied and interesting experiences seems short in passing but long as we look back…"

Inhibitions।[৪] এইটাই সব চেয়ে বড় কথা এ যুগে, তা ছাড়া, সমাজ-শাসন এই ইগো ও সুপার ইগোর মধ্য দিয়েই ব্যক্তির মনের ওপর কাজ করে।

কিন্তু এখানে আমার গোটাকয়েক সন্দেহ ওঠে। ইগোর স্কন্ধে সমাজ-সত্তা ও সেই সাথে সমাজ-পরিবর্ত্তনের দায়িত্ব চাপালে সইতে পারবে কি? নব্য মনো-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই social psychologyতে খাটে ও খাটানো হয়েছে জানি।[৫] কিন্তু ব্যক্তিগত কাল ও সামাজিক কালের পরিমেয় সম্বন্ধ নির্ণীত হবে কি ভাবে? সামাজিক কালের স্থায়িত্ব একটু বেশী। কেন? শ্রেণীর উপস্বত্বভোগের কালের দীর্ঘতার জন্য? সনাতনত্ব অবশ্য শক্তিশালী মধ্যস্বত্বোপভোগী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার অজুহাত অনেক সময়েই। কিন্তু অজুহাত এক প্রকার ব্যবহার; এবং ব্যবহার ও ব্যবহৃত সমাগ্রী এক নয় (প্রত্যয় কি কেবলই ব্যাবহারিক? মার্ক্সিষ্ট অবশ্য তাই বলবেন, কিন্তু সকলে ডায়েলেক্‌টিকে বিশ্বাসী instrumenta-list নন)। যেমন বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ধনিকতন্ত্র ব্যবহার করেছে, কিন্তু science = capitalistic conspiracy বলা যায় কি? অবদমনের উপর যদি লয় নির্ভর করে তবে এইটুকু মাত্র প্রমাণিত হয় যে কাল-বোধ আপেক্ষিক। এ কথা সমাজ-তাত্ত্বিক মাত্রই জানেন। এইটুকু মাত্র বোঝা যায়, কাল-বোধের দীর্ঘত্ব সেন্‌সরের ও ঈদের সনাতনত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একধারে ঈদ্ কালাতীত, অর্থাৎ মানুষ সর্ব্বদাই সুখ চায়, অন্য ধারে ইগো ও সুপার ইগোর বাধাও চিরন্তন, এদের ঘাত-প্রতিঘাতে কালবোধ সৃষ্টি হয় বলা চলে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কালবোধগুলির সামান্যীকরণে যে কালপ্রত্যয় তৈরী হবে সেটা কি পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে? সামাজিক মন যখন নেই তখন বৃহত্তর সামাজিক periodicity-বোধ কে ধারণ করবে?

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ সত্ত্বেও নব্য মনোবিজ্ঞানে যে ডায়েলেকটিক পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে সেটা আনন্দের কথা। এই পদ্ধতির সাহায্যে মনের সাথে বাইরের আদান-প্রদান না জানলে কালপ্রত্যয়ের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনের হেতু বোঝা যাবে না। এতদিন মার্ক্সিষ্টরা ভূগোলতাত্ত্বিকেরই ঘরোয়ানা ছিলেন। তাঁদের ডায়ে-লেকটিক একপেশে ছিল।

---

৪ Calder Marshall—Pie in the Sky.

৫ —Kolnai, Glover, Flugel ইত্যাদি

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ হল। কিন্তু নাচার। আমার সিদ্ধান্ত এই :—কাল সম্বন্ধে ধারণা বদলায়। আজ বিশেষ করে বদলাতে বাধ্য, কারণ আমরা ঠেকায় পড়েছি। কাল সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা অথরিটির সমর্থক, তারই বশীকরণ মন্ত্র। শেকল ছেঁড়বার নিয়ম, কানুন, পদ্ধতি, প্রত্যয় শেকল গড়বার ও শক্ত করবার নয়। তাই মেকানিষ্টিক কালপ্রত্যয় এখন চলবে না। সেটা পরিমাণের ক্ষেত্রে আবশ্যক। পরিমাণ জানবার উপায়, উপায় কখনও বিষয় নয়। সমাজ-তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে, অর্থাৎ কালের সামাজিক আপেক্ষিকত্ব না গ্রহণ করে উপায় নেই। তবে, ব্যাপকতর ভাবে, ও নতুন তাৎপর্য্য সৃষ্টির উপায় হিসেবে, নচেৎ সামাজিক গতির গুণগত গুরুত্ব বোঝা যাবে না। সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যেই বুঝব। আবার পুরাতন মেকানিষ্টিক মনস্তত্ত্বের কালের বিশেষত্ব ও অন্তর্মুখিতা atomistic ও anarchistic। তাই নব্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের সমবেত ব্যবহার বুঝে কালপ্রত্যয়ের কর্ম্মিষ্ঠতাকে ব্যবহার করতে হবে। জ্ঞানের দিক থেকে আমার বক্তব্য এই যে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের circular reasoning ছাড়া চাই। অর্থাৎ এমন যুক্তি-পদ্ধতি চাই যার সাহায্যে ষড়চক্র ভেদ হয়, এবং সামাজিক ঘটনার নতুন সার্থকতা অর্জ্জিত হয়। অতএব, সংখ্যাকে গুণে পরিণত ক'রে, বিরোধের interpenetration-এর শক্তিতে নতুন সার্থকতার স্তরে আরোহণ করা অর্থাৎ চক্রভেদের পর নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করাই হল নতুন কালপ্রত্যয়ের উদ্দেশ্য। কালকে গতির রীতির লয়ে, ছন্দে বোঝাই ভাল। এই যুক্তির নাম ডায়েলেকটিক।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সোম-লতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[৩]

বড় বাবাজির আখড়ায় যেন মেলা ব'সেছে।

সামনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মস্ত বড় একটা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সেখানে পাঁচ দল বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া পালা ক'রে কীর্ত্তন গাইছেন। আখড়ার সম্মুখের মাঠে অনেকগুলি চাল বাঁধা হয়েছে। কিন্তু তাতেও নেড়ানেড়ীর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। বড় বড় তেঁতুল গাছগুলির নীচেও তাদের জন্য জায়গা করা হয়েছে। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত গঞ্জিকা চলছে, আর গোপীযন্ত্র ও ডুবকির সহযোগে গান। স্ত্রীলোক এবং বয়স্ক লোকের ভিড় কীর্ত্তনের আসরে। কিন্তু রাজ্যের ছেলে জুটেছে এই বাউলের আসরগুলিতে। তারা যে সব সময় গানই শুনছে তার কোনো মানে নেই। উৎসব উপলক্ষে এ কদিন তাদের পাঠশালা বন্ধ। সুতরাং এখানেই তাদেরও খেলার চব্বিশ প্রহর আরম্ভ হয়েছে। হুড়াহুড়ি, মারামারি এবং চীৎকারে তেঁতুলতলাগুলি মুখর হয়ে উঠেছে।

ছোট বাবাজি দাওয়ায় বসে প্রসাদ-বিতরণ তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর চারি পাশে নানা বয়সের অসংখ্য স্ত্রীলোক। তারা তাদের নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগের ফর্দ্দ নিয়ে কলকোলাহল তুলেছে। ছোট বাবাজি নিঃশব্দে মালা জপছেন, আর মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দুএকটি কথা বলছেন।

ছোট বাবাজির আখড়া এখানে নয়, গঙ্গাপারে। তবে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। সেই সূত্রে এখানকার অনেকেই তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত। মানুষটি আকারে ছোট। শ্যামবর্ণ। মুণ্ডিত মস্তকে পরিপুষ্ট একটি শিখা। ললাটে, নাসিকায়, বাহুতে, বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। বড় বাবাজি আর তিনি একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য এবং সেই জন্যে দুজনের মধ্যে সহোদরেরও অধিক স্নেহের সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠ এবং স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র।

স্ত্রীলোকদের কারও চাই, ছেলের জন্যে হাঁপানীর ঔষধ। কারও নাতনীর বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটেছে, সে জন্যে চাই মাদুলী। কারও বাড়ীতে সাপের বড় উপদ্রব, তার প্রতিকার করতে হবে। এমনিতর হরেক রকমের অভিযোগ। ছোট বাবাজি তাঁর হরিনামের ঝুলি থেকে কাকেও ঔষধ দিচ্ছেন, কাকেও বা শুধু একটু মিষ্টি হেসেই বিদায় করছেন।

গৌরহরি এতক্ষণ বাউলের দলে ভজন গাইছিল। ক্লান্ত হয়ে এসে ছোট বাবাজির অদূরে দাওয়ায় বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দর দর ধারে ঘাম ঝরছে।

—তুমি প্রসাদ পেয়েছ বাবা? ছোট বাবাজি জিজ্ঞাসা করলেন।

গৌরহরি হাত জোড় করে কি একটা বলবার পূর্ব্বেই ঘরের ভিতর থেকে একটি বছর চৌদ্দ পনেরোর মেয়ে শালপাতায় করে প্রসাদ নিয়ে এসে নিঃশব্দে ওর সামনে নামিয়ে দিলে। পরণে তার আধ ময়লা থান কাপড়। কর-প্রকোষ্ঠ রিক্ত। কিন্তু মলিন বসনেও তার রূপ যেন ঢাকা পড়ে না।

এই কিশোরী মেয়েটির দিকে একবার চেয়েই গৌরহরি চোখ নামিয়ে নিলে। একটু পূর্ব্বে বাউলের দলে বসে সে প্রসাদ পেয়ে এসেছে কিন্তু সে কথা বলার আবশ্যক বোধ করলে না। নিঃশব্দে প্রসাদে মনোনিবেশ করলে।

মেয়েটিকে সে চিনতে পারলে না। বাইরের লোক নিশ্চয়ই নয়। বাইরের হলে তার উপর প্রসাদ বিতরণের ভার পড়ত না। কিন্তু কার মেয়ে? প্রসাদ সাজিয়েছে বড় পরিপাটি করে। একপাশে দুটি মুগের ডাল ভিজে। দুটি শশার কুচি, রাঙ্গা আলু, আম, নারকেল, একখানি পাটালি। সাজানোর মধ্যে শ্রী আছে, যত্ন আছে। কে এই মেয়েটি?

গৌরহরি স্মরণ করতে পারলে না।

ছোট বাবাজি তার দিকেই চেয়েছিলেন। হেসে বললেন, চিনতে পারছ না?

গৌরহরি বিস্মিতভাবে ওঁর দিকে চাইলে। মাথা নেড়ে লজ্জিত ভাবে ঘাড় নাড়লে।

ছোট বাবাজি স্মিতহাস্যে বললেন, আমাদের মনোহর দাসের মেয়ে তমাললতা। আমার কাছেই থাকে কি না।

—মনোহর দাস তো···

—হ্যাঁ। সে তো বছর দুই হ'ল। তার পরে তার স্ত্রীও গেল। রাধারাণী ওকে আমার কাছেই এনে ফেললেন। হরিবোল! হরিবোল!

ছোট বাবাজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে গৌরহরি বললে, মনোহর দাসের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল গবিন্দপুরে, না?

—হাঁ। সেও গেছে।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

একটু পরে ছোট বাবাজি বললেন, বড় লক্ষ্মী মেয়ে বাবা। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। এত বড় একটা ভাঁড়ার ও একাই সামলাচ্ছে। তা কাউকে একবার বলতে শুনলে, এটা পেলাম না, ওটা হচ্ছে না?

তার পর নিজেই বললেন, হবে না? কার মেয়ে দেখতে হবে! মনোহরদাস না থাকলে যে একটি বৃহৎ কর্ম্ম হ'ত না। এ সব বড় ব্যাপার সামলাতে আর কি কেউ জানে, না পারে?

গৌরহরি শালপাতাটি মুড়ে দূরে ফেলে দিয়ে এল। ঘাট থেকে এক অঞ্জলি জল নিয়ে এসে এঁটো জায়গাটা মুছে নিলে। তার পর আবার যথাস্থানে ব'সল।

সামনের উঠানে কীর্ত্তনীয়া তখনও কীর্ত্তন গাইছে। ছোট বাবাজি শুনছেন, আর তাঁর চক্ষু দিয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরছে।

দেখা গেল গৌরহরির সঙ্গীতের উপর যে গভীর উৎসাহ ছিল, তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সে আর বাউলের ভজনের দিকে যাওয়ার নামও করে না। বার বার ডেকে পাঠালেও একটা না একটা কাজের অছিলায় সেখানে যেতে পারে না। অকস্মাৎ সে প্রসাদ বিতরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। ছোট বাবাজির কাছে ব'সে সে কীর্ত্তন শোনে, এবং পুরুষ অভ্যাগতদের প্রসাদ বিতরণ করে।

এক সময়ে একটু নিরিবিলি পেয়ে ছোট বাবাজিকে সে বললে, আখড়াটা আবার তৈরী করব ভাবছি বাবা।

—সে তো ভালো কথা বাবা। বৈষ্ণবের একটা আখড়া থাকা দরকার। নইলে ভজন-সাধনের বিঘ্ন হয়।

—তাই দেখলাম বাবা। ভাবলাম, একটা আখড়া না থাকলে চলে না। অন্তত মাথা গোঁজবার জন্যেও একটা আখড়া চাই। সময়-অসময় আছে। তা আমাদের গাঁয়ের লোক খুব ভালো। তারাই সব ক'রে দিচ্ছে। আমাকে কিছু দেখতে হবে না।

গৌরহরি পরম উল্লাসের সঙ্গে হেসে উঠল।

ছোট বাবাজি বললেন, আর একটি বৈষ্ণবীও দেখ। আমাদের সাধন ভজনে বৈষ্ণবীও একটি অঙ্গ কি না।

হাত জোড় ক'রে গৌরহরি বললে, আজ্ঞে, সে ইচ্ছেও আছে।

—তাই কর। আমি তো তোমাকে কতদিনই ব'লেছি। ভেসে বেড়ালে তো চলবে না বাবা।

—তাই ভাবছি আজ্ঞে। কেবল···

ছোট বাবাজি আপনমনেই বলতে লাগলেন, আমাদের সাধন-ভজন অত্যন্ত কঠিন কি না। সবাই পারে না। বলে,

মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতী মেয়ের কোল,
বোল হরি বোল।

এ কি সবাই পারে? তার যো কি? কিন্তু তুমি পারবে। আমি বলছি পারবে। তোমার বাবা মহাপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। তার ছেলে হয়ে তুমি যদি না পার আর কে পারবে?

গৌরহরি আনন্দে গদ গদ হয়ে ছোট বাবাজির পায়ের ধূলো নিলে। বললে, আজ্ঞে, সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

—তোমার উপর মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ আছে। তুমি পারবে। আমাদের সমাজে ভালো মেয়ের অভাব নেই। একটি ভালো মেয়ে দেখে মালাবদল কর। আখড়াটি তোল। আর রাধা-কৃষ্ণের নাম কর।

হাত কচলে গৌরহরি বললে, আজ্ঞে সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা।

ছোট বাবাজি মনে মনে হাসলেন। বললেন, তা বেশ করেছ।

ইতিমধ্যে কয়েকজন অভ্যাগত এল।

গৌরহরি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গিয়ে বললে, তিন জনের জল খাবার দাও তো। একটু তাড়াতাড়ি।

তমাললতা তিন জনের জল খাবার সাজিয়ে দিলে। গৌরহরি সেগুলো তাদের দিয়ে এসে আবার ছোট বাবাজির কাছে বসল।

একটু ইতস্তত ক'রে বললে, বাবা, আমার একটি নিবেদন আছে।

—বল।

—আমার একটি জানা মেয়ে—বড় দুঃখী—তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—কি ব্যবস্থা?

গৌরহরি ভালো ক'রে বসল। বললে, ব্যবস্থা আর কিছুই নয়, সামান্য। আপনি মনে করলেই হয়।

—ব্যাপারটা বল। রাধারাণীর যদি ইচ্ছে হয় তো হবে।

গৌরহরি ব্যাপারটা বললেঃ

—নাম বিনোদিনী। বড় ভালো মেয়ে। আমাদের গাঁয়েই বাড়ী। এক সঙ্গে কত খেলা ক'রেছি। বিয়েও হয়েছিল বড় ভালো জায়গায়। সে এখন বড় বিপদে পড়েছে বাবা।

—কি বিপদ?

—স্বামীর সঙ্গে বনছে না।

—কেন?

—তা ঠিক বল্‌তে পারব না বাবা। মনে হয়, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করে।

—কেন?

—তা জানি না। মেয়েটি কিন্তু ভালো।

ছোট বাবাজি চুপ ক'রে রইলেন।

গৌরহরি বললে, কি কষ্টে যে মেয়েটি আছে বাবা, সে যদি দেখতেন! দেখলে চোখে জল আসে।

—কোথায় আছে?

—ভায়ের কাছে। আর কোথায় যাবে?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, মনের ঘেন্নায় স্বামীর ঘর ছেড়ে আমার বোনের আখড়ায় গিয়ে উঠেছিল। তারপর মা আর ভাই গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে।

ছোট বাবাজি বুঝতে পারলেন না, এই দাম্পত্য সমস্যার সমাধান কি ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করছে। তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

গৌরহরি বললে, আপনি যদি একটা ওষুধ দেন বাবা।

—ওষুধ! কিসের ওষুধ!

—সে কি আমি জানি বাবা! যাতে মেয়েটির স্বামী আবার মেয়েটিকে ফিরে নেয় এমনি কোনো ওষুধ।

সে রকম ওষুধও ছোট বাবাজির কাছে আছে। কিন্তু নিতান্ত বিশ্বস্ত লোক ছাড়া, আর নিতান্ত প্রয়োজন না বুঝলে এ সব ওষুধ কাকেও বড় তিনি দেন না।

বললেন, কিন্তু এ সব বড় কঠিন ওষুধ গৌরহরি। মেয়েটির স্বভাব চরিত্র যদি সত্যই ভালো না হয়, তাহ'লে দিই না।

হাত জোড় ক'রে গৌরহরি বললে, আজ্ঞে সত্যিই ভালো না হ'লে আমি কখনও চাইতাম!

—মেয়েটির চরিত্রে কোনো দোষ থাকলে কিন্তু তারই খারাপ হবে গৌরহরি। বুঝে দেখ।

—আজ্ঞে বুঝে দেখাই বটে।

অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে ছোট বাবাজি বললেন, আচ্ছা তা দোব। কাল অমাবস্যা। পরশু দিন নিও।

—তাই হবে আজ্ঞে।

গৌরহরি ভক্তিভরে ছোট বাবাজির পায়ের ধূলো নিয়ে মুখে মাথায় ঠেকালে।

আশ্চর্য্য মেয়ে কিন্তু তমাললতা!

গৌরহরি সমস্ত দিনের মধ্যে কতবার কত ছলে যে তার কাছে গেল তার ঠিক নেই। কিন্তু সে একবার চোখ মেলেও তার দিকে চাইল না। গৌরহরি তার

সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করলে, অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে, সে কিন্তু একটা কথারও উত্তর দিলে না। গৌরহরি যা চায়, নিঃশব্দে সে তা যুগিয়ে যায়।

মেয়েটি যে খুব লজ্জাবতী তাও মনে হ'ল না। মাথায় তার ঘোমটা নেই, চাল-চলনেও সঙ্কোচ নেই। কিন্তু বোধ হয় কথাই কম বলে। গৌরহরি লক্ষ্য ক'রে দেখলে, ছোট বাবাজির সঙ্গেও সে বিশেষ কথা কয় না। যেখানে কথা না ব'লে চলে, সেখানে আর মুখ খোলে না। এইটুকু বয়সে এমন স্বল্পভাষী গম্ভীর মেয়ে সাধারণত চোখে পড়ে না। ওর সম্বন্ধে গৌরহরির সমীহ এল।

কে যে ওর তমাললতা নাম রেখেছিল কে জানে! তমাল তো কালো। আর ওর রঙ হ'ল কনক-চাঁপার মতো।

এক সময় নিরিবিলি পেয়ে সেই কথাটাই গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে। বললে, তোমার নাম তমাললতা কে রেখেছিল বল তো?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তমাল চেয়ে রইল।

গৌরহরি একটুকু হেসে বললে, তমাল তো কালো।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তমাল হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিছু বললে না।

সন্ধ্যার সময় তমাললতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর কণ্ঠে গাইলে :

আমি তমাল বড় ভালোবাসি,
কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো,
তাই তমাল বড় ভালোবাসি।

তথাপি তমাললতার কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না।

অবশেষে হতাশ হয়ে গৌরহরি বাউলের ভজন যেখানে হচ্ছিল সেই দিকে গেল। সেখানে তখন সঙ্গীত এবং গঞ্জিকার ধুম চলছিল। গৌরহরি গাঁজা বড় একটা খায় না। কিন্তু কি ইচ্ছা হ'ল একটু খেলে। তারপর মহোৎসাহে গান গাইতে আরম্ভ করলে।

তার গানের খ্যাতি আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ জমিয়ে তুললে। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এতক্ষণ সে ছিল কোথায়? সে না থাকলে জমে?

কিন্তু বেশীক্ষণ সে সেখানেও ব'সে থাকতে পারল না। কখন এক সময়

সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে চ'লে এল। যেখানে বড় বড় 'জোলে' অন্ন পাক হচ্ছিল সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল।

সেখানে একটা সমারোহ চলেছে। ভোর থেকে রান্না আরম্ভ হয়েছে, এখনও চলছে। কত লোক যে খেলে এবং আরও কত লোক যে খাবে তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমাগতই 'দীয়তাং ভুজ্যতাম' চলছে। এখানে জাতিবিচার নেই। দলে দলে লোক আসছে, যে যেখানে পাচ্ছে ব'সে খাচ্ছে আর খেয়ে উঠে যাচ্ছে। আবার এক দল আসছে।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বড় বড় জোলে রান্না চ'ড়েছে। বড় বড় হাঁড়িতে ভাত, বড় বড় কড়াইয়ে ডাল, তরকারী। এই নামছে, এই চাপছে। ওদিকে কুটনো কুটা হচ্ছে। সেও তরকারীর এক একটা ছোট ছোট পাহাড়। এক দল স্থূলাঙ্গী বৈষ্ণবী সেখানটা জমিয়ে ব'সেছে। তারা কলহে, কোলাহলে, হাস্যে, গল্পে স্থানটা সরগরম ক'রে রেখেছে।

থেকে থেকে ধ্বনি উঠছে 'জয় জয় মহাপ্রভুকী জয়'। এধ্বনি উঠছে অন্নক্ষেত্র থেকে। ভোজন পরিতৃপ্ত জনতার কণ্ঠ থেকে। তাদের জয়নাদে সমস্ত স্থানটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

আমগাছের নীচে, তমালগাছে এবং তারই অদূরবর্ত্তী মধুমালতীগাছের নীচে এক এক দল হুঁকা হাতে ব'সে এক সঙ্গে খোস গল্প এবং রান্নার তদারক করছে। এরা প্রাচীনের দল। দীর্ঘ জীবনকালে যে যত বড় বড় মহোৎসব দেখেছে তারই বর্ণনা করছে। সে বর্ণনা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনায় জড়ানো ঃ

—বলরামপুরে মা-গোঁসাই মচ্ছবে পরিবেশন করছেন। হটাৎ মাথার ঘোমটা গেল খ'সে। হ্যাঁ, মা-গোঁসাই বটেন! এই বয়সেও পাকা আমের মতো টুক টুক করছে রঙ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। যেন সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিচ্ছেন। তা ঘোমটা গেল খ'সে। দুই হাতই এঁটো। কি করেন? হঠাৎ আর দুই হাত বের ক'রে ঘোমটা টেনে দিলেন। যাদের পুণ্যিবল ছিল তারা স্বচক্ষে দেখলে।

সবাই ভক্তিভরে এই সব অলৌকিক কাহিনী শুনছে এবং বিশ্বাস করছে। কেউ সন্দেহ করছে না, প্রশ্ন করছে না, এমন কি এর মধ্যে কোথাও যে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে তা পর্য্যন্ত তাদের মনে উদয় হচ্ছে না।

গৌরহরি এদের কাছে দাঁড়িয়ে অনেক গল্প শুনলে। কিন্তু বেশীক্ষণ তাও ভালো লাগল না। অবশেষে সেখান থেকে উঠে এল কীর্ত্তনের আসরে। সেখানে তখন কীর্ত্তনীয়া হাঁটু গেড়ে গাইছে,—

আমি কালোরূপ আর হেরব না গো।

শ্রীমতীর কালোরূপের উপর বিতৃষ্ণা এসেছে। তাঁর যত দুর্গতির কারণ তো চিকণকালো। বলছেন, আমি কালো রূপই আর দেখব না। চাইব না আর যমুনার কালো জলের দিকে, কালো মেঘের দিকে। মাথার কালো কেশজাল তাও ফেলব কেটে।

—আর তোমার আয়ত নয়নের তারা?

—তাও ফেলব উপড়ে।

—তাহ'লে যে কাণা হবে।

শ্রীমতী হঠাৎ হেসে ফেললেন। বললেন, আমার কাণাই ভালো। অকস্মাৎ খোলের বাদ্য জোরে জোরে বেজে উঠল।

গৌরহরি মহোল্লাসে ব'লে উঠল, বাঃ! বাঃ!

আসরে একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে সে সেইখানেই ব'সে পড়ল কীর্ত্তন শুনতে।

বাড়ী যাওয়ার দিন উঠতে গৌরহরির অনেক বেলা হয়ে গেল। এই দু'দিন যে পরিশ্রম গেছে তাতে ঘুমের দোষ নেই।

গৌরহরি উঠে দেখলে, যে ঘরে বাউলের আখড়াই ব'সেছিল সেখানে কারও ঘুম ভাঙেনি। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর রোদ এসেছে ঘরে। তারই মধ্যে বহুলোক যে যেখানে পেয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। কয়েকজন বৈষ্ণবীও তারই মধ্যে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। কারও কারও নাসিকাগর্জ্জনও হচ্ছে।

গৌরহরি উঠে ভগবানের নাম করতে করতে ঘাটে গেল মুখ ধুতে। চেয়ে দেখলে ঘরের দাওয়ায়, আমগাছের নীচে, এমন কি একখানা গরুর গাড়ীর নীচে পর্য্যন্ত লোক শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

আপন মনেই বললে, লে বাবা! মানুষে শোবার আর জায়গা পায়নি দেখছি!

লোকও তো কম আসেনি। কীর্ত্তন ভেঙে গেছে। সেই আসরে চাঁদোয়ার নীচে যে কত লোক ঘুমুচ্ছে তার ঠিক নেই। বহু লোক খোলা উঠানে আঁচল বিছিয়ে শুয়েও ঘুমুচ্ছে।

একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে সে ঘাটে চলল।

গিয়ে দেখে তমাললতা কয়েকটা বাসন ধুতে ঘাটে এসেছে।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, বাবা উঠেছেন ?

তমাললতা ঘাড় নেড়ে জানালে, উঠেছেন।

—তিনি বুঝি খুব ভোরেই উঠেন ?

তমাললতা আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

গৌরহরি উৎসাহ না পেয়ে আপন মনেই বললে, আমিও খুব ভোরেই উঠি। কিন্তু এই ক'দিন রাত জেগে আর পরিশ্রম ক'রে এমন হয়েছিল যে, শুলাম কি মড়ার মতো ঘুমুলাম।

তমাললতা ভালো-মন্দ কোনো কথা না ব'লে নিজের কাজ সেরে চ'লে গেল।

গৌরহরিও হাত মুখ ধুয়ে গুণ গুণ ক'রে গানের একটা কলি গাইতে গাইতে আখড়ার দিকে গেল।

ছোট বাবাজি একখানি কম্বলের আসনের উপর দাওয়ায় একা ব'সে। গৌরহরি গিয়ে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে।

ছোট বাবাজি বললেন, গৌরহরিকে জল খাবার দাও তমাল।

গৌরহরি বললে, আমি এখনই যাব মনে করেছি বাবা।

—এখনই যাবে ? এ ক'দিন তো যা পরিশ্রম হ'ল, একটা দিন বিশ্রাম ক'রে গেলে হ'ত না ?

গৌরহরি হাত জোড় ক'রে বললে, আজ্ঞে না। আমাকে আবার আখড়াটার ব্যবস্থা করতে হবে।

—ও হ্যাঁ। তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তা বেশ, মধ্যে মধ্যে দেখা ক'র।

—আজ্ঞে সে তো নিশ্চয়ই।

তমাললতা শালপাতায় করে জলখাবার এনে দিলে।

ছোট বাবাজি বললেন, বড় বাবাজি গেলেন। আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে।

এ সময় তোমরা পাঁচ জন মাঝে মাঝে খবরটা নিও। দুদিন তবু তোমাদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে পাব।

গৌরহরির চোখ ছল ছল করে উঠল। একটা কথাও সে বলতে পারলে না। মুখ নীচু ক'রে খেয়ে যেতে লাগল।

খাওয়া দাওয়া সেরে ছোট বাবাজিকে প্রণাম করে যখন সে উঠতে যাবে, ছোট বাবাজি বললেন, সেই ওষুধটা নিয়ে যাবে না বাবা ?

তাই তো! আসল কথাই গৌরহরি ভুলে গিয়েছিল।

বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটা চাই বই কি।

—তমললতা!

তমললতা কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস গৌরহরির পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে গেল।

ছোট বাবাজি বললেন, এইটে মাতুলী ক'রে হাতে পরতে হবে মেয়েটিকে। আর রোজ সকালে স্নানের সময় এই মাতুলী ধোয়া জল একটু পান করতে হবে। খাওয়া দাওয়ার নিষেধ কিছু নেই। কেবল লঙ্কার ঝালটা চলবে না। বাস্!

গৌরহরি ঔষধটা যত্ন করে পেট কাপড়ে গুঁজে আর একবার ছোট বাবাজির পায়ের ধুলো নিলে। যাওয়ার আগে চারিদিকে একবার চাইলে। কিন্তু তমাল-লতার কাপড়ের প্রান্তটুকুরও দেখা পেলে না। সে বোধ হয় তখন ভাঁড়ারের কোণে ব'সে ভাঁড়ারের কাজে ব্যস্ত।

গুণ গুণ ক'রে কৃষ্ণনাম করতে করতে সে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

ভালোবাসা

তোমার অধুনাতম চিঠি নিয়ে বসে আছি
ভেবে পাচ্ছিনে কী জবাব দেব।
তোমার প্রশ্নের চিরন্তনত্ব অস্বীকার করিনে
অতলস্পর্শী ওর গভীরতা, অসামান্য ওর মূল্য।
প্রশ্ন কোরেছ ভালোবাসার মানে কী,
কী ওর সত্যিকারের যথার্থতম সংজ্ঞা।
পৃথিবীতে এর চেয়ে সহজতর প্রশ্ন আর নেই
এর চেয়ে কঠোরতর প্রশ্নও চোখে পড়ে না।

প্রেমের ব্যাপারে আমাকে তুমি প্রথম পড়ুয়া মনে করনা, আমি জানি।
তা হোলে নির্ব্বিচারে মুখস্ত বলে যেতেম—
ফ্রয়েডীয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
আর রাবীন্দ্রিক কথার কুজ্ঝটিকা।
দেশ বিদেশের কথা-ভাণ্ডারীদের ভাণ্ডার হোতে
সংগ্রহ করা চল্‌ত ভালোবাসার অসংখ্যবিধ টীকা-টিপ্পনি,
কিন্তু তুমি তা' চাওনি।
কারণ ওগুলির কোন কিছুই তোমার অজানা নেই।
আমার কাছে চেয়েছ আমারই স্বকীয় ব্যাখ্যা—
সম্পূর্ণ ওরিজিন্যাল, পরিপূর্ণ নতুনতম,
পৃথিবীতে আর কারো কলম দিয়ে কখনো যা বেরোয়নি।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি হে মহিমাময়ী,
কতো কী-ই তো তুমি জানো, শুধু এটুকুই কী অজানা
'ওরিজিন্যালিটি বলে কিছুই নেই পৃথিবীতে' ?
'সৃষ্টিছাড়া প্রশ্নে মানুষকে বোবা বানিয়ে রাখায় বিদুষীত্ব নেই ?

লোভ হোচ্ছে পরাজয় স্বীকার করি।
ব্লাঙ্ক পেপার সাবমিট কোরে বলি ঃ
'হে পরীক্ষিকা, ক্ষমা করো অক্ষমতা যতো'।
কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, পৌরুষের মৃত্যু।
তাই ও লোভ আমি জয় কোরবো।

ভালোবাসা মানে—চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে
চুপে চুপে কানে কানে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে যাওয়া।
ভালোবাসা মানে—তোমার অনুরোধে, তোমাকে লক্ষ্য কোরে
অক্ষর গুণে গুণে চতুর্দ্দশপদী প্রেমের কবিতা লেখা।
ভালোবাসা মানে—ফির্‌তে একটু রাত হোলে
কুটিল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করা ঃ 'মুখে গন্ধ কিসের, গেছলে কোথায় ?'
ভালোবাসা মানে—মুহুর্মুহু সুধাকণ্ঠে সুধানো
'আমাকে ভালোবাসো কিনা ?'
ভালোবাসা মানে প্রশ্ন করা ঃ 'ভালোবাসার মানে কী ?'
ভালোবাসার অর্থ জবাব দেওয়া, 'ভালোবাসার মানে ভালোবাসাই'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আর্টের সৃষ্টি না আর্ট-সৃষ্টি

একটা প্রশ্ন ঃ 'ক্রিয়েটিভ' কথাটার অর্থ কী? বায়োলজির ক্ষেত্রে এর অর্থ আজকাল অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এতদিন ধরে যে তুমুল গণ্ডগোল চলছিল, লয়েড মর্গান তার কিছুটা সমাধান করেছেন। অবিশ্যি কেমিস্ট্রির সাহায্যে। দুই বা ততোধিক পদার্থের সংযোগে যদি কিছু "emerge" করে, স্বসমুত্থ হয়, তাহলে সেই কাজটাকে বলা হবে ক্রিয়েটিভ। কথাটা পরিষ্কার করা দরকার। এটা যোগফল নয়—সমষ্টিগত একটা অঙ্কমাত্র নয়। জল আর তেল মেশালে সেখানে কিছুই "emerge" করবে না। কিন্তু এক অংশ অক্সিজেন ও দুই অংশ হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে দিব্যি কয়েক ফোঁটা জল দেখা দেবে। এই যে একটা সম্পূর্ণ নূতনে রূপান্তর, একেই বলা হয় স্বয়ম্ভূতি (emergence)। আর এই রূপান্তরীকরণকে বলা হয় 'ক্রিয়েট' করা। পদার্থ এই অর্থে ক্রিয়েটিভ, জীবন এই অর্থে ক্রিয়েটিভ, শুক্রাণু (spermatozoa) ও ডিম্বাণু (ovum) এই অর্থে ক্রিয়েটিভ।

কিন্তু আর্টের বেলায় কী বলবো? "ক্রিয়েটিভ লাইফ" কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেলেই কি সঙ্গে সঙ্গে "ক্রিয়েটিভ আর্ট" কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়? জলের ফরমূলা কি এক্ষেত্রে খাটে? খুব সহজেই বলা যায়—না। মহাভারতকে যদি ব্যাসমুনি আর শালপাতা, খাগের কলম, কালী ও কল্পনার সমাবেশের দরুণ একটা স্বসমুত্থ পদার্থ (emergent something) বলতে হয়, তাহলে সেটা বড় জোর হাস্যরসের খোরাক জোগাবে, আর কিছু নয়।—তবে আর্টকে 'ক্রিয়েটিভ' বলবো কোন অর্থে?

*

একটা পথ অনুসরণ করা যাক্। ধরে নি, জীবনকে অনুকরণ বা অনুসরণ (reproduce) করার উপরেই নির্ভর করে আর্টের সৃজনীশক্তি। পুঞ্জ পুঞ্জ জীবন ছড়িয়ে রয়েছে। ভাষার সাহায্যে, কিম্বা তুলির সাহায্যে, কিম্বা উডকাটের সাহায্যে এর যে কোনো একটি পুঞ্জকে প্রতিবিম্বিত (reproduce) করতে পারাই হচ্ছে আর্টের ক্ষেত্রে 'ক্রিয়েট' করতে পারা। কাজটা ঠিক ভাষার, তুলির ও উডকাটের

সাহায্যে সম্ভব নয়। আরো একটা জিনিসের দরকার—কল্পনাশক্তির। কিন্তু জীবনের অনুবাদ করাই যদি সৃজনীশক্তির নমুনা হয়, তাহ'লে যে প্রচলিত অর্থে "কল্পনাশক্তি" কথাটা চলে আসছে, তার পরিবর্ত্তন দরকার, অর্থাৎ যে কল্পনাশক্তি পরীর দেশের জন্মদাতা —ভাষান্তরে কল্পনারই জন্মদাতা—তাকে বাতিল করতে হবে। জীবনকে অনুবাদ করবার জন্যে চাই জীবন-সম্পৃক্ত কল্পনা। আসলে তা কল্পনাই নয়; তা অভিজ্ঞতারাশির চাপে চাপে যে সংস্কার (impressions) জমে যায়, ভাষা ইত্যাদির সাহায্যে হুবহু সেগুলোকে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা। দেখা যাচ্ছে, এই অর্থে শুধু বস্তুতান্ত্রিক আর্টই ("বস্তুতন্ত্রে"র প্রশস্ততম অর্থে, অর্থাৎ, expressionismও এই গণ্ডীতে পড়ে) টিঁকে থাকে, আর সব না-মঞ্জুর করতে হয়। কেন না, বস্তুতন্ত্র ছাড়া অন্য সকল ধারাই মূখ্যতঃ প্রাধান্য দিয়েছে কল্পনাকে। তাদের সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে কল্পনা। সেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকলেও তা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আমরা এতক্ষণ যা বিশ্লেষণ করে এলাম, তাতে কল্পনাকেই করতে হয় জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে কল্পনাও জীবনের একটা অংশ হয়ে পড়ে। আলেক্‌জাণ্ডার ডুমাস্ অথবা তুর্গেনিভ্-এর রাজ্যে যত নর-নারীর বাস, তাদের ধমনীতে, আমাদের মত, তাজা, লাল রক্ত প্রবাহিত হয় না—যা হয়, তা কল্পনা-রস—প্রচুর, এবং স্বীকার করতেই হবে, প্রগাঢ়।

কিন্তু সে যাক। জীবনকে অনূদিত করতে পারলেই কি "ক্রিয়েটিভ আর্ট"-এর সন্ধান মিলবে? ভাল করে ভেবে দেখতে হয়। অনুবাদে কী পাওয়া গেল? সত্যিকার জীবনকে, "জীবন্ত" জীবনকে একটা ভিন্ন ক্ষেত্রে পেলাম—"কল্পনা"র ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে। এই যে "সৃষ্ট" জীবন এইটাই কি আর্টের সৃষ্টি? আর্টের সৃষ্টি কি আসলে জীবনের পুনরাবৃত্তি (re-creation)? প্রশ্ন উঠবে ঃ—সৃষ্টি-প্রণালী আর পুনরাবৃত্তি-প্রণালী এক কিনা। সৃষ্টিকার্য্যের ভিতর দুটো জিনিষ লক্ষ্য করা যায় ঃ—স্বতঃপ্রবৃত্তি (spontaneity) আর দৈব-ঘটিত অনিয়ম (haphazardness)। সৃষ্টি-প্রণালীটা স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং এর গতির ভিতর নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব। কিন্তু পুনরাবৃত্তির বেলায় স্বতঃপ্রবৃত্তি যদিও বা থাকে, অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা থাকতেই পারে না। আর্টিষ্ট-এর সৃষ্টির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে একটা প্রাক্-নির্ব্বাচনের ঝোঁক। আর স্বতঃপ্রবৃত্তি-ও যে অব্যাহত থাকে, তাও অন্য অর্থে। সৃষ্টির বেলায় সৃষ্টি-

প্রণালীটাই স্বতঃপ্রবৃত্ত, আর্টিষ্ট্-এর বেলায় সৃষ্টি করবার ইচ্ছাটা। পুনরাবৃত্তি করবার মূলে যে ইচ্ছাটা থাকে তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত, পুনরাবৃত্তি-প্রণালীটা নয়। আসলে পুনরাবৃত্তি ব্যাপারটা হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের নির্ব্বাচন, যে নির্ব্বাচনের মূলে থাকে স্বতঃপ্রবৃত্তি।

এ ছাড়া আর্টের পুনরাবৃত্তিতে, অর্থাৎ জীবনকে ঠিক ঠিক আঁকতে পারার ব্যাপারে, কতকগুলো ব্যাবহারিক অসুবিধা আছে। জীবনকে হুবহু নকল করা যায় কি? অতি বড় রিয়ালিষ্টও এ কথা বলতে পারে না।

প্রথমতঃ,—যেটা চিরকালই আমার কাছে একটা সমস্যা—জীবনের অশ্লীলতার দিকটা আর্টের ক্ষেত্রে উহ্য রাখতে হয়। প্রকৃত অশ্লীল জীবনকে কে আঁকতে পারে? রিয়ালিষ্টদের লেখায় যে সব অশ্লীল চিত্র দেখা যায়, তা রীতিমত ভাবে aesthetically perverted বা aestheticised। ডি, এইচ্, লরেন্স এর "ভাল্‌গারিজম্"কে তাঁর "আদিমতাপ্রীতি" অনেকাংশে বিকৃত করেছে। তিনি জীবনের অশ্লীলতাকে অশ্লীলতার কেন্দ্র থেকে দেখেননি। তাঁর অন্তরে যে একটা বিশুদ্ধ, আদিম জীবনের প্রতি টান্ ছিল, যে love for the naked simplicity ছিল, সেই আদিম জীবন বা নগ্ন, সরল জীবনেরই একটা অংশ হচ্ছে তথাকথিত অশ্লীল জীবন। তাই তাঁর জীবনে বা সাহিত্যে অবিমিশ্র অশ্লীলতার প্রকাশ কোনো দিনই হয়নি। Aestheticization-এর দৃষ্টান্তও দিতে পারি। বেশী দূর যেতে হবে না। ধরা যাক্ রসেটি বা বুদ্ধদেব বসু (পূর্ব্বের)। সুন্দরী নারীর উলঙ্গরূপ এঁরা দু'জনেই কল্পনা করেছেন এবং করে প্রচুর আনন্দ (আত্ম-শ্লাঘাও) পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কল্পনা ও আনন্দলাভ দু'টোই অতি-শারীরিক। রবি ঠাকুরের "বিবসনা" বা "বিজয়িনী" পড়তে পড়তে আমার শরীর এতটুকু চঞ্চল হয়নি। বরং আমার ঘুম পেয়েছিল ঃ—একটা মধুর জড়তা এসেছিল।—আর অশ্লীলতা বলতে আমি শুধু নারীর উলঙ্গরূপই বুঝি না। আমি বুঝি সেই অশ্লীলতা, যা সহরতলীর কোনো নোংরা, ঘিঞ্জি গলির ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলে প্রকট হয়ে ওঠে; যা বেশ্যাপল্লীর "বাস্তব" জীবনে পাওয়া যায়; যা ছেলেবেলার homosexual ব্যাপারেও রীতিমত সত্য। রবি ঠাকুর, রসেটি, হাইনে—এঁদের অশ্লীলতা একটা 'পোজ্'—অভিজাত শ্রেণীর ঢঙ মাত্র। এমন কি কিউপ্রীন, আর্টজিবেজেভ্—যাঁদের নাম এই শ্রেণীর সাহিত্যের কথা উঠলে প্রথমেই উল্লিখিত হয়—তাঁরাও এ ব্যাপারে শেষ

পর্য্যন্ত পিছিয়ে পড়েছেন, লিখতে লিখতে কলম তুলে নিয়েছেন। আসলে যে জঘন্য ভাব ও আনন্দঘন ভাব অশ্লীল জীবনের নাড়ীতে নাড়ীতে মিশে আছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া এক রকম অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ আর্টের বংশপরিচয় খুঁজলে, আর্টকে genetically দেখতে গেলে দেখা যায় আর্টের আদিতম যে প্রেরণা, তা এসেছিল আনন্দ থেকে, beatitude থেকে। চরম আনন্দঘন অবস্থায় মানুষ যা উপলব্ধি করতো তাই হতো তখনকার আর্টের বিষয়বস্তু। আরিষ্টটল বলেছিলেন ঃ—যেখানে অভিনেতা ও অভিনীত জীবন "এক" হয়ে যাবে, সেখানেই নাটকের স্বার্থকতা। এর পরের যুগের আর্ট এক ধাপ নেমে এল। আনন্দতন্ময়তার (beatitude) বদলে এল কল্পনা। আর্টের ক্ষেত্র তখন মনের জগৎ। এই অধ্যায়ের নাম Mental Realism বা 'মানসিক বস্তুবাদ'-ও দেওয়া যায়। মানসিক সামঞ্জস্য-বিধানই তখন একমাত্র কাম্য। কল্পনার প্রাসাদ তুলবো, কিন্তু এলোপাথাড়ী ভাবে বা স্ববিরোধী ভাবে নয়। এই অধ্যায়ের আরো একটি সূত্র আছে, যা মেটারলিঙ্ককে স্মরণ করিয়ে দেয়, তা হচ্ছে 'সিম্বল' বা রূপক-প্রীতি। কল্পনার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাস্তবকে আঘাত দেবার চেষ্টা করা, অনেকটা। মানসিক বস্তুবাদ-এর পরের ধাপে আর্ট আরো নেমে এলো ঃ—আর্টের প্রেরণা ও ক্ষেত্র হ'ল জীবন।—এই বংশবৃত্তান্তটুকু আলোচনা করবার উদ্দেশ্য, আর্ট যে এখনো তার আদিতম প্রেরণা অর্থাৎ beatitude-এর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি—তাই দেখানো। অন্ততঃ, এতটা সম্ভব না হলেও আর্টের রূপ থেকে যে সৌন্দর্য্যের প্রলেপ একেবারে মুছে ফেলা যায় না, তা সত্যি। বহু যুগের সংস্কারবশতঃই হোক, বা কোনো সূক্ষ্ম 'সাইকলজিকাল্' কারণের জন্যই হোক, আজ সে চেষ্টা করা বৃথা। আনন্দ (beautitude) যেতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের (beauty-র) প্রাধান্য অবধারিত। আর সেই জন্যেই জীবনকে অনুবাদ করবার চেষ্টা অংশত ব্যর্থ হবেই। আমার এ বিশ্বাস শুধু প্রচলন দেখে নয়, আধুনিক সাহিত্যের আওতায় বেড়ে ওঠা দু'একজন সাহিত্যিকের থিওরী দেখেও। নজীর-স্বরূপ আনাতোল্ ফ্রাঁস্ তাঁর "Life and Letters"-এর একটা রচনায় কী বলেছেন, তুলে দিচ্ছি, "·········যে কোনো অর্থেই যখন যাথার্থ্য অথবা রিয়ালিজ্‌ম্ অসম্ভব··· তখন কেন আমরা আদর্শ-প্রধান (idealistic) সাহিত্য গড়ে তুলবো না" ?

অবিশ্যি আদর্শ ("idealistic") বলতে তিনি বার্ণার্ড শ'র মতন আর্টকে প্রপাগাণ্ডা-এ পরিণত করতে চাননি, চেয়েছেন, আমাদের ভিতর যে আদর্শ (ideal) বা সুন্দর বৃত্তিগুলো আছে, সাহিত্যে শুধু তারই রূপ দিতে। এখানে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বস্তুবাদ অপরিণত বলে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই; তাকে পূর্ণতর করে তুলবার কোনো ইচ্ছাও প্রকাশ পায়নি। পরন্তু সেই গতানুগতিক সৌন্দর্য্যকেই তিনি সাহিত্যের আসরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। জীবনকে ঢেলে সাজানো তাঁর কাছে প্রধান বস্তু নয়।—দ্বিতীয় নম্বর নজীর অল্ডাস্ হাক্সলী-র "Vulgarity in Literature"। তাতে তিনি "beauty-truth"-এর স্থান সবার উপরে দিয়েছেন। অশ্লীলতা জিনিষটা তাঁর মতে ডিগ্রীর ব্যাপার। ধাপে ধাপে মানুষ উপরে উঠে আসছে, মানে, সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে শিখছে। কিন্তু, তবু সাহিত্যে beauty-truth ছাড়া আর কোনো সত্য নেই। এখন কথা হচ্ছে সুন্দর আর সত্য এই দু'টো অর্থের সম্বন্ধকে একটা হাইফেন দিয়ে নির্দ্ধারিত করা যায় কিনা। আমার বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে subjectivity-র (মনোজগতের) সম্বন্ধ গভীরতর। পক্ষান্তরে, সত্যের সাথে objectivity-র (বস্তুজগতের)। দু'টো জিনিষ দু'টো আলাদা জগতের—যে দু'টো জগতের সম্বন্ধ অনেকক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। কার্য্যতঃ সুন্দর আর সত্যের কোনো অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নেই। সৌন্দর্য্য এক বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সর্ব্বত্রই সত্যকে বিকৃত করে থাকে।

এছাড়া শেষ বয়সের প্রভাব, নিঃসঙ্গতার প্রভাবও কম নয়। শেষ বয়স এবং নিঃসঙ্গতা—দু'টো অবস্থাই ভয়ানক আবেগ-ঘেঁসা। উঠ্‌তি বয়সে বন্ধুবান্ধবী-দের সাথে কল-গুঞ্জন করবার সময় আমরা খুব কাটা কাটা কথা বলতে পারি; কোদালকে কোদাল বলতে পারাও তখন খুব সহজ। কিন্তু যখনই রক্তের জোর কমে আসে, কিম্বা একা একা থাকি, তখনই অনিবার্য্যভাবে চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগ ঘনায়। আর যারা একটু ভাবপ্রবণ তাদের সম্বন্ধে তো কোনো কথাই নেই। আর্টের ব্যাপারের প্রথম বাধাটা সাময়িকভাবে কাটিয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয় বাধা? আর্ট সৃষ্টির ব্যাপারের এ একটা অপরিহার্য্য সর্ত্ত।

*

'ক্রিয়েটিভ্' কথাটার আর একটা অর্থ করা যায়। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা

আনন্দ বেদনার অনেকখানি মগ্নচৈতন্যে ঢাকা থাকে। মানসিক বিষয় সম্পত্তি হয়তো সবারই সমান। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তাদের অনেকাংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকে না। আর্টিষ্ট তার পাঠকগোষ্ঠীকে সেই সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। আর্টের সাহায্যে আমরা নিজেদের চিনতে পারি। এই যে চিনিয়ে দেওয়া, এই যে জাগিয়ে তোলা—এই কাজ করে আর্ট। এই জন্যেই তা 'ক্রিয়েটিভ্'। ফ্লবেয়ার তদানীন্তনকালের ফরাসী নারীমনকে গড়ে তুলেছিলেন, তার মানে, ফ্লবেয়ার তাদেরকে নিজরূপ সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন। চেতনা ও আত্ম-চেতনা এক কথা নয়। জীবন চেতনাময়, কিন্তু সর্ব্বত্র আত্ম-চেতন নয়। আর্টের কাজ হচ্ছে চেতনা থেকে আত্ম-সচেতনতায় পৌঁছে দেওয়া। আর তাই তা ক্রিয়েটিভ্।

কিন্তু "পৌঁছে" দেওয়া কেমন করে সম্ভব? কী করলে পাঠককে একটা অনুরূপ অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যায়? একটু ভাবলেই দেখতে পাব এখানেও সেই জীবনকে অনুবাদ করার পদ্ধতিটা সক্রিয় আছে। জীবনকে ঠিক ঠিক আঁকতে না পারলে পাঠকের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে পুনরাবৃত্তি-প্রণালীটা সক্রিয় থাকলেও সেই জন্যেই আর্ট ক্রিয়েটিভ্ নয়। এখানে অনুবাদ আর্টকে ক্রিয়েটিভ্ করতে সাহায্য করে মাত্র। আর্ট ওরই সহায়কতায় মানুষের "ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে" ক্রিয়েটিভ্ আখ্যা পায়।

প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার:—"ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া"র অর্থে যদি ক্রিয়েটিভ্ কথাটা প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে ভাষাতাত্ত্বিকরা "ছি ছি" করে উঠবেন। নিরুক্ত-শাস্ত্র (etymology) ঘাঁট্‌লে দেখব "to create"-এর অর্থ "to bring into being or existence"। অর্থাৎ যে জিনিষটার, স্বরূপে (as such) কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাকেই অস্তিত্বময় করে তোলা। মানুষের অচেতন মন সচেতন হয়ে উঠবার পথে কি কোনো পদার্থগত পরিবর্ত্তন ঘটে? কলম্বসের আবিষ্কারের পর কি আমেরিকা যা ছিল তা আর থাকলো না? কথাটাকে সরল করে আরো সাধারণ ভাষায় বলা যাক। আবিষ্কারের, "to discover"-এর, অর্থে কি "to invent" কথাটা ব্যবহার করতে পারি? এবার নিঃসন্দেহে বলতে পারবো;—না। এবং একথা মনের সম্বন্ধেও বলা সম্ভব হবে। বলতে পারবো যে অচেতন মন সচেতন হবার পথে অবিকৃতই থাকে, "as such"-ই থাকে। আর সেই জন্যেই এটা কেবল একটা আবিষ্কার মাত্র, সৃষ্টি নয়।

কিন্তু এখানেই তর্ক থামেনা। আর্ট মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, তাকে আত্ম-সচেতন করে তোলে—এটা কতদূর সত্য ? মানসিক ক্রিয়ার দিক দিয়ে লক্ষ করলে তো এর উল্টো প্রমাণ পাওয়া যায়। রেমব্রান্ট বা টার্ণার-এর ল্যাণ্ডস্কেপ দেখতে দেখতে কি ঘুম ভাঙ্গে না ঘুম পায় ? বিভূতিবাবুর "অপূর্ব্ব ইতিহাস" পড়তে পড়তে কে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়বার লোভ সম্বরণ করতে পারে ? আর্ট-এর ব্যাখ্যা যদি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় তাহলে expressionismকে সমূলে বিনাশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। রঁলা বুনিন বিভূতি বন্দ্যো—এঁদের ক্ষমতা ঘুম ভাঙ্গানো-র নয়, ঘুম পাড়ানোর। এক অদ্ভুত শক্তির চাপে এঁরা বিশ্বচেতনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যান। ছেলেবেলায় ঠাকুমার কোলে শুয়ে এক বিরাট, অদৃশ্য হাতের চাপে যেমন ঘুমিয়ে না পড়া অসম্ভব হতো, এঁদের এই শক্তির স্রোতের সাম্নেও তেম্নি জাগরণ অসম্ভব। কিন্তু এঁদের মূল্য তাহলে কেমন করে নির্দ্ধারিত হবে ? এঁরা কি আর্টিষ্ট নয় ? কিম্বা আর্টিষ্ট হলেও "creative" নন্ ?

এখানে কিন্তু অপর পক্ষের একটা যুক্তি আছে। এক্সপ্রেশনিষ্টরা যে ঘুম পাড়াতে পারেন, সেটা তাঁদের উপরি লাভ। আসলে তাঁরা করেন বিশ্লেষণ। আর এই বিশ্লেষণ যেখানে আছে, সেখানে আত্ম-সচেতনাও আছে। এক্সপ্রেশনিজম্ প্রচলিত হবার পর আর্টের ক্ষেত্রে মন সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। যথা—গভীরতম মন বিবেক-বুদ্ধিহীন, স্ববিরোধী এবং সেখানে পশু প্রকৃতিটাই প্রভাবান্বিত। বাস্তবিক কি এক্সপ্রেশনিষ্টদের বই পড়তে পড়তে আমাদের ঘুম আসে, না ঘুম আসাটা নির্ভর করে পড়া হয়ে গেলে সেই সম্বন্ধে কল্পনা করবার উপর। আমাদের সাধ্য কি রঁলা কিম্বা বুনিন্ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি ? বরঞ্চ তখন আমরা আরো সজাগ হয়ে উঠি।

এই যুক্তিটা মূল্যবান। ঘুমভাঙ্গার অর্থে যদি আর্টকে ক্রিয়েটিভ্ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে এ যুক্তিটা বোধহয় অখণ্ডনীয়।

*

ক্রিয়েটিভ্ আর্ট-এর আরো অর্থ করা যেতে পারে। আর্ট ক্রিয়েটিভ্ যেহেতু তা রসসৃষ্টি করে। বাংলাতে যাকে আমরা রস বলে থাকি, ইংরেজীতে তাকেই বলতে হয় 'beauty'। আমাদের মনে যখন এই রস বা beauty-র সঞ্চার হয় তখনই আর্ট-এর সৃষ্টিকার্য্য সার্থক—সে রস বা beanty যে কোনো উপায়েই

জোগাড় করা হোক না কেন। এই রস জিনিষটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। শরীরতত্ত্বের ভাষায় রস জিনিষটা আর কিছুই নয়, আমাদের বুকের ভিতর-কার ডায়ফ্রাম্‌টা (সুখে) অবশ হয়ে আসা। যে ঘুমপাড়ানোর কথা বলেছিলাম, সেটা ঠিক সাহিত্যিকদের "উপরিলাভ" নয়। রসের সাথে আর ঘুমের সাথে একটা অভ্যন্তরীণ (intrinsic) সম্বন্ধ আছে। রস-সঞ্চার হওয়া মানেই, শরীরতত্ত্বের ভাষায়, দেহযন্ত্র অবশ হয়ে আসা। আর অবশ হয়ে এলেই শরীরময় একটা সঙ্কোচনের অনুভূতি, feeling of contraction, জন্মায়, যার পরের ধাপই হচ্ছে—ঘুম।

এখানেও কিন্তু ক্রিয়েটিভ কথাটা খাটে না। রস জিনিষটা তো আছেই। মানসিক অর্থে বা বস্তুগত অর্থে—যে অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন, রস আর্টে-তর জীবনেও সম্ভব। কেবল আর্টের সাহায্যে তাকে গভীরভাবে পাওয়া যায়।

*

এইবার আমি উপসংহার টানবো।

আর্টকে ক্রিয়েটিভ্‌ কি বলতেই হবে? আমার মনে হয়, যে-মানসিক অবস্থা বা বস্তু আর্ট সৃষ্টি করে বলে কথিত আছে, তা আর্ট-এর "সৃষ্টি" নয়, তাই আর্ট। আর্ট হচ্ছে তার "সৃষ্টজগৎ"। জড়ের, matter-এর সৃষ্টি জীবন, জীবনের সৃষ্টি আর্ট। ব্যস্‌, ঐ পর্য্যন্ত। আর এক পা'ও এগুনো সঙ্গত নয়। Art creative নয়, art is created। Art creates না বলে বলা উচিত: One creates art। আর্ট-এর কোনো ক্ষমতা নেই, আর্টই একটা ক্ষমতা। বায়োলজির ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ্‌ কথাটা বললেও এক্ষেত্রে অচল।

শ্রীরণেন মজুমদার

কাঁটা-তার

প্রাতঃকালীন চায়ের পর খবরের কাগজখানার ওপর তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়েই অপূর্ব্ব বাবু তাঁর থিসিসটা নিয়ে ব'সেছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরলোকবাদ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা—গত তিন বৎসর ধ'রে তিনি এই কাজে ব্যস্ত। দুপুর বেলাটা কলেজ এবং বিকেল বেলাটা একটু বেড়ানো ছাড়া প্রায় সকল সময়ই তিনি তাঁর ছোট্ট পড়ার ঘরটিতে এই একান্ত গুরুবিষয়ক লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

অপূর্ব্ব বাবু অধ্যাপক এবং উগ্রপন্থী প্রজ্ঞাবাদী ব'লে ছাত্র ও বন্ধু-সমাজে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। এই খ্যাতির সব টুকুই যে তাঁকে বুঝে এমন কথা মনে ক'রবার কোনই হেতু নেই—কিন্তু যেহেতু তিনি যে-কোন প্রচলিত সংস্কার, মত বা পথকে এক কথায় বাতিল ক'রে থাকেন এবং তার স্থলে নিজের আদর্শ ও পরিকল্পনা মতো একটা নবতন ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ক'রতে পারেন, সেইজন্যে সকলেই তাঁকে একজন দিগ্‌গজ শ্রেণীর লোক মনে করে। অপরের এই ভয়-মিশ্রিত অনুরক্তির সুযোগটুকু তিনিও নষ্ট হ'তে দেন নি—তিনি এপর্য্যন্ত কাগজে-পত্রে চোখাচোখা বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে ধর্ম্ম, সমাজ ও কৃষ্টির সুনিয়ন্ত্রিত ভিত্তি টলতে পারে। তাঁর বর্ত্তমান থিসিসটির জন্মও অনুরূপ একটি উদ্দেশ্য থেকে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সংসারে তাঁর স্ত্রী অরুণা এবং শ্যালী লিলি—আর কেউ না। অরুণা শিক্ষিতা এবং রুচিদুরস্তাও বটে, কিন্তু তার বাবা ছিলেন অতিরিক্ত রকম হরিভক্ত। পিতার সেই পারমার্থিক নিষ্ঠা বৈজিক সূত্রে অরুণার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে পূজো করে, ব্রত উপবাস করে, গুন্ গুন্ ক'রে ভজন গায়—এমন কি তার একটি ছোট্ট পাথরে গড়া রাধাগোবিন্দের বিগ্রহও আছে ব'লে শোনা যায়—সেটি সে অবশ্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখে। কারণ তার ছোট বোন লিলি বা স্বামী অপূর্ব্ব বাবু—কারুর চোখেই কোনদিন এটি পড়ে নি।

ছোট বোন লিলিকে নিয়ে আমাদের কোন হাঙ্গামা নেই। তার বয়স বছর কুড়ি-একুশ হবে এবং সে কলেজে পড়ে—মিস ডোরোথি লীজেল্ নামে এক ফিরিঙ্গী মেয়ে তাকে সকাল বিকেল পড়িয়ে যায়, বাকী সময়টা সে হয় কবিতা লেখে, নয় পড়ে। তার সম্বন্ধে এইটুকু ব'ললেই বোধ করি সবই বলা হ'য়ে যায়। মোটের উপর এই সব কারণে স্ত্রীর চেয়ে তার বোনটির সঙ্গেই অপূর্ব্ব বাবুর মনের মিল হয় বেশী। কিন্তু এই পর্য্যন্ত—এই জল্পনাকে আর অধিক দূর টেনে নিয়ে যাবার মতো কোন কিছু নেই এর পেছুনে, কারণ অপূর্ব্ব বাবু বিশেষ সহৃদয় ব্যক্তি এবং অরুণা সুন্দরীও বটে, বোধহয় লিলির চেয়ে বেশীই!

বিয়ের পর প্রথমে অপূর্ব্ব বাবু ভেবেছিলেন, অরুণার বাল্য সংস্কারগুলোকে আস্তে আস্তে শোধন ক'রতে ক'রতে একদিন তাকে ঠিক নিজের আদর্শেই এনে উপস্থিত করবেন। সে চেষ্টাও

তাঁর ছিল এবং স্ত্রীলোকেরাও নাকি স্বভাবতই অবস্থানুগামী। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর অনন্যনির্ভর সংসার-যাত্রার মাঝখানে ছিল একটি বৃহৎ বাধা—তৃতীয় একটি বহিরঙ্গ প্রতিবন্ধক—তা হ'চ্ছে গোঁসাই।

এই গোঁসাই লোকটির ইতিহাস অল্প যা শোনা গেছে তাতে জানা যায়, তিনি কোন্ বিশিষ্ট জমিদারের পুত্র—জীবনে কোন নারীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে যৌবনেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং যে প্রেম নাকি পার্থিব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মুখ চায় না, যাতে নেই দেশাচার লোকাচারের বিদ্বেষকলুষিত অসূয়া-দৃষ্টি, সেই প্রেমকে সম্বল ক'রেই তিনি পরিব্রজ্যা ক'রে বেড়াচ্ছেন। শোনা যায় লেখাপড়া এককালে তিনি খুব ক'রেছিলেন এবং চেহারায় তাঁর মাধুর্য্য এবং সৌকুমার্য্য যে যথেষ্ট আছে একথা স্বয়ং অপূর্ব্ব বাবুই স্বীকার করেন।

অরুণার পিতা যখন হাজারীবাগের সেটল্‌মেণ্ট অফিসার, সেই সময় একদা গোঁসাই তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হন। তারপর থেকে ঘন ঘনই তাঁর আসা-যাওয়া চল্‌তে থাকে এবং বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী ছেলেমেয়ে নির্ব্বাচারে তাঁকে প্রভু করে তোলে। গিন্নী মারা গেলেন, অরুণার বাবা অপ্রকাশ বাবু ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রভুর সঙ্গে উন্মাদ আনন্দে নৃত্য ক'রতে লাগলেন—এক বিন্দু জল এলো না তাঁর চোখে। মেয়ের বিয়ে দিলেন—সেই সঙ্গে দিলেন একটি বিগ্রহ আর দিলেন গোঁসাইকে তার অভিভাবক ক'রে।

অরুণা হেঁট হয়ে বাপের পায়ে প্রণাম ক'রলো। বাপ ব'ললেন গোবিন্দ, গোবিন্দ!

তারপর অরুণার দাদা ছুটি বিলেত গেলো এবং অপ্রকাশ বাবুর নিরাসক্তি দিন দিন বেড়েই চ'ললো। এ অবস্থায় বয়স্থা মেয়ে নীলিমা—যাকে তার ভগিনীপতি লিলিতে রূপান্তরিত করে-ছেন—তাঁর পক্ষে হয়ে দাঁড়ালো একটা প্রকাণ্ড ভার। অবশেষে মেয়ে-জামাইয়ের পরামর্শ-ক্রমে তাকে অরুণার সংসারেই এনে ফেলা হ'ল। এরপর থেকে গোঁসাই যখন-তখন অরুণার আশ্রয়ে আসেন এবং কয়েকদিন করে থেকে যান। গোঁসাইয়ের এই আকস্মিক শুভাগমন ও স্থিতির ফলে অরুণার আধ্যাত্মিক জীবন দিন দিন হয়ত উৎকর্ষই লাভ করেছে, কিন্তু তার দাম্পত্য জীবনের বাঁধন যে যথেষ্ট আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে, এটা লিলিরও চোখ এড়ায় নি। সে যথাসাধ্য চেষ্টায় এই বাঁধনটা একেবারে বিশ্লিষ্ট হ'তে দেয় নি বটে, কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি অকুণ্ঠিত একাত্মতা স্থাপন তার পক্ষে অসম্ভব। স্বামী তাই একান্ত ভাবে পড়েছেন থিসিস নিয়ে, আর স্ত্রী গেছেন গোবিন্দের হেপাজতে—মাঝখানে লিলি আর তার গবর্ণেস্ মিস ডোরোথি।

অধ্যাপক-সংসারের ওপর দিয়ে যখন এই ত্রি-মুখী দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েন চল্‌ছে—তখন থেকেই আমাদের উপাখ্যানের আরম্ভ।

সকাল বেলা অপূর্ব্ব বাবু সবেমাত্র লেখার আয়োজন ক'রে প্রস্তুত হ'চ্ছেন, এমন সময় নীচে সশব্দে গোঁসাইয়ের আবির্ভাব ঘোষিত হ'ল। গোঁসাই এলেন, সঙ্গে তাঁর গুটি কয়েক চেলা চামুণ্ডা।

বলাবাহুল্য গোঁসাই সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বাবুর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নেই। তিনি মনে করেন, মানুষ ঘোরতর রকম নিউরটিক্ না হ'লে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে স্বপ্ন নিয়ে ডুবে থাকৃতে পারে না। তাই সাধন-তত্ত্ব জিনিষটার ওপরেই তাঁর সবিশেষ বিরক্তি। বস্তু-সংসারে মানুষের সীমা-বদ্ধ শক্তি যখনই যেথানে কোন বাধা পেয়েছে, সেখানেই একটা অদৃশ্য বৃহত্তর শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছে—এই কল্পনা থেকেই এসেছে জন্ম-মৃত্যু ও ঘটনাচক্রকে আশ্রয় ক'রে ভগবানের সম্বন্ধে চেতনা। দোষের হ'ক, গুণের হ'ক, এর একটা মানে হয়। কিন্তু এই কল্পিত ভিত্তির ওপর একটা মনগড়া ইমারত খাড়া ক'রে, তাই নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কোন মানে হয়?

অরুণাকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অরুণা বোঝে নি। সে শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। হতাশ হ'য়ে অপূর্ব্ব বাবু ভেবেছেন, যা সত্য নয়, যা নেই—তাকেই অবলম্বন ক'রে মানুষ কি করে বাস্তবকে ফাঁকি দিচ্ছে! কিন্তু আর তিনি ঘাঁটান নি। তাঁর নিজের মনে বিশেষ কষ্ট হ'য়েছে—অরুণাকে পেয়েও তিনি পান নি ভেবে। তাঁর মনে হ'য়েছে তাঁর দাম্পত্য-জীবনের মাঝখানে র'য়েছে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান, প্রকাণ্ড একটা বঞ্চনা। স্বামী ও স্ত্রীর মনোধর্ম্ম ব'য়ে চলেছে পরস্পর-বিরোধী দুই খাতে—মধ্যে যে দূরত্ব মাথা তুলে উঠেছে, তার বিস্তার অনন্ত!

বেশ ক'রে ভেবে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, এর মূল গোঁসাই। পিতৃভবন থেকে অরুণা যেটুকু ভগবদনুরক্তির বীজ সঞ্চয় ক'রে এনেছিল, অপূর্ব্ব বাবুর সংসারের প্রজাতান্ত্রিক ঊষর ভূমিতে তা একদিন অপচিতই হ'ত হয়ত—কিন্তু গোঁসাই তাকে নৃত্যের কর্ষণা ও অশ্রুপাতের অভিসিঞ্চনে পল্লবিত করে তুললো। এখন এই মহা মহীরুহের ছত্রচ্ছায়ায় নিঃশব্দে নিদ্রা দেওয়াও যত কঠিন, একে সমূলে উৎপাটন করাও তেম্নি। অবশ্য অপূর্ব্ব বাবু একথা স্বীকার করেন যে মানুষ মাত্রেরই স্বকীয় মনোধর্ম্মের অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার আছে—তাতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধিকার বোধ ব্যাহত হ'লে কিই বা করা যায়? কিন্তু তাই ব'লে যেখানে পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন আত্মসমর্পণের ওপরই গড়ে ওঠে একটা সম্বন্ধ—সেখানে নিঃশব্দ বিদ্রোহের পদসঞ্চারও যে স্বাস্থ্যকর নয়, একথাও তিনি স্বীকার করেন।

কাজেই গোঁসাইয়ের আগমন সম্বন্ধে তাঁর মনে ঘোরতর একটা বিরুদ্ধ মত বরাবরই ছিল। এ বিষয়ে লিলিও তাঁর সঙ্গে এক মত। অপূর্ব্ব বাবুর যেমন মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বশে বিদ্বেষ—লিলির অবশ্য তা নয়। লিলি লোকটার নেড়ামাথা, তার ওপর তরমুজের বোঁটার মতো একটা লম্বা টিকি, অর্দ্ধ উলঙ্গ বেশ ও তিলকলিপ্ত দেহটাকে সহ্য ক'রতে পারে না—আর ঐ খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন শুনলেও তার সর্ব্ব শরীর জ্বালা করে। সে এক কথায় বলে লোকটা আস্ত ভণ্ড! তার এই রুচিবিগর্হিত বেশবাস ও চালচলনকে লিলি বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখে এবং খুব লুকিয়ে হ'লেও সে মনে করে, তার দিদিও অল্প বিস্তর ভণ্ড।

অপূর্ব্ব বাবু কলম গুটিয়ে ব'সে ব'সে রাগে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'তে লাগলো,

তাঁর সংসারটাকে ছারখার ক'রবার জন্যেই এই দুষ্টগ্রহ তাঁর পিছু নিয়েছে। এর প্রতিকার কি, তাও তিনি স্থির ক'রতে পারলেন না। কারণ গোঁসাই সম্বন্ধে বিরক্তি তাঁর যতই প্রবল হ'ক্, কোন দিন স্পষ্ট ভাবে সে কথা তিনি অরুণার কাছে ব'ল্‌তেই পারেন নি—আর যতই বাইরে থেকে তাঁকে চেপে যেতে হ'য়েছে, ততই ভেতর তাঁর বিরূপ হ'য়ে উঠেছে—বলা বাহুল্য এ সন্দেহ নয়, এ ঘৃণা নয়—এ হ'চ্ছে আত্ম-প্রসারের খর্ব্বতা! অরুণাকে তিনি ভালোবাসেন এবং অরুণাও তাঁকে ভালো না বাসে তা না—কিন্তু তবু ছ'জনের মধ্যে এই দূরত্বের পর্দা! এ শুধু পাথরের নিশ্চল গোবিন্দ এবং তাঁর সচল প্রতিনিধি গোঁসাইয়ের প্রভাবে!

অরুণা ইতিমধ্যে কখন এসে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে। পাংশু মলিন মুখ—বোধ করি কোন অভ্যর্থনার আশা না ক'রেই সে এসেছে। কিন্তু অপূর্ব্ব বাবু তাকে চেনাই দিলেন না—তিনি যেমন গম্ভীর হ'য়ে খাতা-কলম নিয়ে ব'সেছিলেন, তেমনই রইলেন। অগত্যা অরুণাকে ব'লতে হ'ল, গোঁসাই এসেছেন।

অপূর্ব্ব বাবু গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লেন, আনন্দের বিষয়—তার পর? এ রকম কথার জন্যে অরুণা প্রস্তুত ছিল না। তার সাড়ে চার বৎসরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর এই ভারীক্কে কণ্ঠস্বর ও এই প্রচ্ছন্ন বক্রোক্তি-বিলাসের অভিজ্ঞতা মোটেই নেই।

অপূর্ব্ব বাবু পূর্ব্ববৎ ব'ল্‌লেন, সৌভাগ্য আমার। তাঁর দিব্যানন্দ সম্ভোগে অংশীদার হ'তে পারলে আরও খুসী হ'তাম। কিন্তু আমার গায়ে অত জোর নেই।

এবার অরুণার চোখ ফেটে কান্না আসার মতো হ'ল। দাঁতে দাঁত চেপে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনে হ'ল, তার স্বামী আজ তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে ধ'রে পদাঘাত ক'রলেও এত কষ্ট হ'ত না তার।

সে আস্তে আস্তে ব'ললো, তোমার কি মত নেই?

ঘটা ক'রে হেসে অপূর্ব্ব বাবু ব'ললেন, মত নেই? আলবৎ আছে। কত ভাগ্যে এই দীনের ভবনে তাঁর মতো মহাত্মার পদরজ প'ড়েছে। আমার কত জন্মের পুণ্যের ফল!

তারপর সংযত কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, মতামতের কথা ব'লছো অরুণা? আমার মতামতে যায় আসে কি? এ বাড়ীতে আমার যেমন কিছু অংশ আছে, তেম্নি তোমারও কিছু আছে —বোধ হয় বেশীই আছে, কারণ তুমি গিন্নী। আমি যদি আমার ইচ্ছেয় একটা ফিরিঙ্গী গবর্ণেস, একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান, একটা উড়ে ঠাকুর রাখতে পারি ত তুমিও তোমার ইচ্ছেয় গোটা কয়েক কর্ত্তাভজা বোষ্টম রাখতে পারো। কিন্তু আর কিছু কি তোমার ব'লবার আছে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণা নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য ক'রেছিল। এবার সে চট্‌লো। সে বল্‌লো, বাড়ীতে কা'র কতটা অধিকার তার চুলচেরা হিসেব আমি কোন দিন করি নি। বরাবর জেনে এসেছি এ বাড়ী তোমার, সর্ব্বস্ব তোমার—আমিও তোমার। তাই আমি যাই করি, মনে করি তারই পেছুনে আছে তোমার অনুমোদন। আজ বুঝ্‌ছি তুমি তুমি, আর আমি আমি—এবং

আমাদের অধিকারের একটা ক'রে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই দিকে চোখ রেখে আমাদেরকে চ'লতে হবে। এই যদি সত্যি হয়, তবে তোমার মতো আমারও পছন্দ-অপছন্দ, মত-অমত থাকতে পারে।

—পারেই ত। সে কথাই ত আমি ব'লছি।

—তাহ'লে আজ আমিও এ কথা ব'লতে পারি না কি যে আমার বিশ্বাসকে মতকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আঘাত করার তোমারও কোন অধিকার নেই! স্বামী হিসেবে আমার কাছে যা তোমার প্রাপ্য, তার ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করার জন্যে তোমার চেষ্টার অভাব দেখিনি—অথচ সেই তুমি আমার নিজস্ব ব'লে এক আনাতেও গররাজী। এই স্বার্থপরতাই যদি তোমার মতে স্বামিত্ব হয় ত ব'লতে পারিনে—তবে গোবিন্দ ও গোঁসাই নিয়ে তোমার সঙ্গে আর আমি দ্বিরুক্তি ক'রতে চাইনে।

এত কথা অরুণা বোধ করি ব'লতো না। তার মধ্যে এই জাতীয় অপভাষণের শক্তিই ছিল না কোন কালে। কিন্তু সময় সময় মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যায় এবং এই যাওয়ার ফলে তার পূর্ব্ব-সংস্থানের সঙ্গে যে সংযোগ তাকে এতদিন ধ'রে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তাও ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যায়। সকাল থেকেই অরুণা ভেবেছে গোঁসাইয়ের আবির্ভাবটা কি ক'রে স্বামীর গোচরে আনা যায়—অবশেষে আনা যখন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে, সেই সময় সে ওপরে এসেছে। অপূর্ব্ব বাবুর বিরূপতাও ঠিক সেই সময় একেবারে এমন প্রান্তে এসে ঠেকেছিল যে তাতে একটু টোক্কর লাগ্‌বা মাত্র বিস্ফোরণ ঘটে গেলো।

অরুণার মনে হ'ল সে এখুনি অপূর্ব্ব বাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে—বলে এর একটিও তার প্রাণের কথা নয়—এ সে উত্তেজনার মুখে ব'লে ফেলেছে। কিন্তু কি একটা সঙ্কোচ তাকে পেয়ে বসলো। বলা কিছুই হ'ল না।

অপূর্ব্ব বাবু ব'ললেন, বুঝলাম অরুণা। এত স্পষ্ট ক'রে আগে কোন দিন বুঝি নি। আমি কোন রকম ঘোর-প্যাঁচের পক্ষপাতী নই—যখন দু'জনের মধ্যে সদ্বিশ্বাসের বন্ধনই র'য়েছে আগে থেকে ছিঁড়ে, তখন বৃথা মোহে তাকে জোড়াতালি দিয়ে রাখার কোনই মানে হয় না। তুমি এবার থেকে অবাধে হরিনামের আবাদ করো—আমিও আমার নিজের রাস্তা দেখি।

—মানে? আমাকে কি তুমি পায়ে ঠেল্‌বে?

—পায়ে ঠেলা? তুমি গোবিন্দের সেবাদাসী, আমি হীনমতি নাস্তিক—আমি পায়ে ঠেল্‌বো? তা নয়, আমি তোমার মুক্তি দিলাম। আমার সমস্ত অধিকার, সমস্ত জুলুম জবরদস্তি, সমস্ত একরোখা মত ও মন্তব্য থেকে আজ তুমি অব্যাহতি পেলে—আজ গোবিন্দ ও গোঁসাই নিয়ে তৈরী তোমার সৌর-জগৎ থেকে এই ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রের অপমৃত্যু ঘট্‌লো জান্‌বে।

—তুমি কি আমায় ত্যাগ ক'রলে?

—মোটের উপর তাই।

—কি দোষে ?

—কোন দোষে নয়। আমি শক্তিমানের জীবনাধিকারে বিশ্বাস করি। আমার চেয়ে তোমার গোবিন্দ ও গোঁসাইয়ের শক্তি অনেক বেশী—তারা তোমায় অধিকার ক'রেছে। আমি বৃথা প্রত্যাশায় দিনের পর দিন আর তোমার পথ আট্‌কে থাকি কেন ?

অপূর্ব্ব বাবু আর কোন কথা না ব'লেই উঠে জামা-কাপড় প'রতে সুরু ক'রলেন। তারপর অরুণার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অরুণার ইচ্ছা হ'ল চীৎকার ক'রে কাঁদে, ছুটে গিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত শক্তি গেছে তার নিঃশেষ হ'য়ে—সে শুধু দাঁড়িয়ে রইলো আর চোখ দিয়ে তার অবিশ্রান্ত ধারায় প'ড়তে লাগলো জল।

অনেকক্ষণ টেবিল ধ'রে অরুণা হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কি ক'রে তারই চোখের ওপর দিয়ে, তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই এত বড় বিসদৃশ ব্যাপারটা তাকে উপলক্ষ্য ক'রেই ঘটে গেলো ! অথচ এর এক বর্ণও সে ব'লতে চায়নি—স্বামীর প্রভুত্ব, অধিকার বা মতগত মৌলিকতার বিষয়ে মনে স্পষ্টত কোন দিন ছিল না তার কিছুমাত্র অভিযোগ ! এবং গোবিন্দ ও গোঁসাই সম্বন্ধে মনের একান্তে সে যে অপরিমেয় মমতা লালন ক'রে এসে এসেছে—সেটা তার মনে হ'য়েছে স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত অভিযান ব'লে, অথচ, সে না পেরেছে গোবিন্দ এবং গোঁসাইকে পরিহার ক'রতে, না পেরেছে স্বামীকে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে ! তার সংস্কার, শিক্ষা এবং বুদ্ধি জেনেছে এ তিনকে অভিন্ন ব'লে, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা দেখেছে কার্য্যত এরা পৃথক। তখন সে নিজেকে ভাগ ক'রে ফেলেছে দুটো দিকে—একটা সংসারের ব্যাবহারিক দিকে, একটা ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর পাথরের—তাঁর বাদ প্রতিবাদ নেই, কাজেই তিনি যতটা পেয়েছেন তাতেই খুসী—কিন্তু স্বামী পাথরের দেবতা নন্, তাঁর দিক থেকে পাওনার অঙ্কে যেখানে যে তালভঙ্গ হ'য়েছে, সেটাই তিনি হিসেব ক'রে গেছেন। এই হিসেবের খাতায় হয়ত পুঁজির চেয়ে খরচই বেশী—পুঁজি হয়ত নেইই ! তাই কি স্বামী তাকে আজ তার সমুচিত শাস্তি দিলেন ?

অরুণার বুকের ভেতরটা দুর্নিবার ব্যাথায় আলোড়িত হ'তে লাগলো। সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বেলা তখন খানিকটা বেড়েছে—সকালের রূপালী রৌদ্রে পৃথিবীর দেহ থেকে রাত্রির সমস্ত মালিন্য গেছে ধুয়ে। কিন্তু অরুণার চোখে পৃথিবী ঠেকতে লাগলো দুঃসহ অন্ধকার ব'লে, এর কোনখানে কোন জিনিষ যেন তার পঁচিশ বৎসরের জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিচিত নয়—সে যেন সমস্ত পরিচিতি, সমস্ত প্রাক্‌লব্ধ সংস্কার ও বৃত্তির খেই হারিয়ে ফেলেছে।

সে রেলিং ধ'রে সেখানেই ব'সে পড়লো। তার মনে পড়লো তার পিতা এবং গোঁসাই দু'জনেই তাকে ব'লেছেন স্বামী ও গোবিন্দে কোন তফাৎ না ক'রতে। মনে মনে সে ত কোন

দিনই তা করে নি—কিন্তু বস্তু-সংসারে এ দু'য়ে সত্যিই তফাৎ আছে, এত বেশী যে দুয়ের সমন্বয় সম্ভব নয়, তাই একের কাছ থেকে তাকে অন্যকে আড়াল ক'রতে হয়েছে এবং তা হ'য়েছে ব'লে সে উভয়ের কাছেই চিরদিন সেবাপরাধ থেকে চেয়েছে ক্ষমা—তবু তাকে আজ এই প্রায়শ্চিত্তের সম্মুখীন হ'তে হ'ল!

তার মনে আছে, তার স্বামী ঠাকুর-দেবতা বা পূজো-আচ্ছায় আস্থাবান নন্। তিনি বলেন, বিশ্ব-সংসারে অণু-পরমাণু থেকে স্বরু ক'রে বৃহত্তম গ্রহ-নক্ষত্রে পর্য্যন্ত জড় ও চৈতন্যের এক দুজ্ঞের্য় লীলা চ'লছে—এ লীলার বিরাম নেই, জন্ম মৃত্যু, আলো অন্ধকার, শীত গ্রীষ্মের অফুরন্ত চক্রে ঘুরে ঘুরে একই লীলা চ'লছে দিনের পর দিন—বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল-ফল, তার থেকে আবার বীজ—এ যে কি করে হ'চ্ছে, কিসের শক্তি, কিসের চেতনা র'য়েছে এর পেছুনে, কেউ জানে না—একটা ক্রিয়াশীল, মননশীল শক্তি আছে এই পর্য্যন্ত বোঝা যায়—এর বাইরে সবই কল্পনা। সেই কল্পনা তোমার আমার, আর পাঁচ জনের—যাদের সকলের শক্তিই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এর ওপর নির্ভর করা যে চলে না, তাও ঠিক। মানুষ নিজের কল্পনা আন্দাজ ও রুচি দিয়ে এই শক্তিকে কেউ লোকোত্তর পুরুষ, কেউ লোকোত্তর নারী রূপে গ'ড়ে নিয়েছে—এবং এই গঠনকে কেন্দ্র ক'রে এক একটা সম্প্রদায়ও গ'ড়ে ওঠে, যেমন শাক্ত, যেমন বৈষ্ণব। মানুষ মনে ক'রেছে মানুষেরই মতো এই শক্তি রুষ্টি, তুষ্টি, অনুরক্তি, বিরক্তির অধীন—তাই জুগিয়েছে এর পূজো…ক'রেছে এরই ওপর এক একটা শাস্ত্র খাড়া। কিন্তু আসলে এ ত তার নিজেরই সৃষ্টি! বরং যারা এই শক্তিকে অচিন্ত্য অব্যক্ত নির্গুণ ব'লেছে, তারা কিছুটা সম্ভাব্যতার কাছাকাছি গেছে মনে হয়—কারণ এর ত বিশ্লেষণ হয় না! বিজ্ঞান এবং দর্শন-এর সুস্পষ্ট হদিশ দিতে পারে না!

অরুণার মনে হ'য়েছে স্বামীর কথাগুলো অসঙ্গতও নয়, অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু কথা-গুলো নির্ভুলও নয়। অনেক লোক আছেন যাঁরা স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে অনন্ত দুঃখের বস্তু ব'লে বর্ণনা ক'রে গেছেন—তাঁরা ব'লেছেন্ এ স্থুল, এ বিকারাধীন, এ ক্ষণিক—এর পেছুনে পশু-সুলভ দৈহিক চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এই পাশবিক উলঙ্গতাটা ঢাকা দেবার আপ্রাণ চেষ্টাতেই মানুষের ইতিহাস। অবাধে এই পাশবিকতার চর্চ্চা করবার জন্যেই লোকে সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস ক'রেছিল—তা'র থেকে ছেলেপুলে ঘরকন্না হ'য়ে সহস্র শাখা দিকে দিকে বের হ'য়ে প'ড়েছে। এটাকে বাঁচাবার জন্যেই মানুষকে আবিষ্কার করতে হ'য়েছে শিল্প, সভ্যতা, ধর্ম্ম! এ কথাও অযৌক্তিক নয়, কিন্তু একথা নিশ্চিত তাদের উক্তি, যারা—নারী হ'লে পুরুষের, এবং পুরুষ হ'লে নারীর—ভালোবাসার মমতাময় আবেষ্টনে কোন দিন বাঁধা পড়তে পায় নি। এও একটা দর্শন, কিন্তু এ হ'চ্ছে বঞ্চিতের দর্শন।

কিন্তু এই বিতর্কের চোরাবালির চেয়ে বিশ্বাসের সুনিশ্চিত ভূমি ঢের বেশী কল্যাণকর এবং বিতর্ককে অন্ধভাবে এড়িয়ে সুলভ আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যেই যে এ বিশ্বাস, তাও নয়। মানুষ

নিজের স্বকীয় সত্তা দিয়েই অনুভব ক'রেছে—তার সসীম আত্মাতেই এই অসীম শক্তি প্রেমানন্দময় রূপে মূর্ত্ত হ'য়েছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নইলে কি দেখে উন্মাদ হয়েছিলেন ?

মহাপ্রভুর কথা মনে হ'তেই অরুণার মনে পড়ে স্বামীস্ত্রীতে তাদের এক একদিন কি তর্কই হ'য়ে গেছে তাঁকে নিয়ে। অপূর্ব্ব বাবু বলেন—যে ব্যক্তি জন্মিছে পুরুষ রূপে, দেহ-সংস্থান যার পূরোপূরি পুরুষের মতো, তার মস্তিষ্ক যদি দুষ্ট না হবে—তার বুদ্ধি যদি আচ্ছন্ন না হবে, তবে কেন সে নারীত্ব অবলম্বন ক'রবে এবং "নাথ নাথ" ক'রে কেঁদে বেড়াবে ? অরুণা বলে, পুরুষ আর পরুষ এক জিনিষ নয়, যদিও পরুষতাটাও আছে পুরুষের মধ্যে—কিন্তু কোমলতাও আছে, তাই মানুষ ভালোবাসে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে, নিজের সখের সাধের জিনিষগুলিকে—এইটুকু পুরুষের ভেতরকার নারীত্ব—মহাপ্রভু বলেন, এই সুকুমার মনোভাবটুকুকেই ষোল আনা সার্থক ক'রে তুল্‌তে হবে, অর্থাৎ তাঁকে পেতে হ'লে অহঙ্কার, স্বার্থবোধ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তদ্গত আবেগে উন্মাদ হ'তে হবে। বাধা দিয়ে অপূর্ব্ব বাবু বলেন—অর্থাৎ নপুংসবৃত্তিসম্পন্ন হ'তে হবে। অরুণার রাগ হয় এবং সেখানেই হয় সেই তর্কের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু স্বামী যাই বলুন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য মহাপ্রভুর ত কম ছিল না—কিন্তু তিনি অধীর হ'য়ে কেঁদে কেঁদে যাঁকে খুঁজেছিলেন এবং মনে করা হয় পেয়েও ছিলেন, তা কি শূন্য! আচ্ছা এই যে গোঁসাই—শোনা যায় ইনিও ত ধনীর সন্তান, শিক্ষিত—ইনিও কি প্রতারণা ক'রে চ'লেছেন, অথবা ইনি স্বামীকথিত তথাবিধ নিউরটিক্! না, না, তা হ'তেই পারে না—বিশ্বের প্রত্যেকটি ছোট বড় উত্থান-পতন, ভাঙন-গড়নের মধ্যেই তাঁর লঘু পদসঞ্চার সে নিজেও ত বার বার অনুভব ক'রেছে—মেঘের সুনিবিড় সমারোহে, ঝড়ের ক্ষিপ্ত মাতনে, বসন্তের কুসুমৈশ্বর্য্যে সুখের শুভ্র হাস্যে, অশ্রুর মেঘার্দ্রতায় পেয়েছে বার বার তাঁর ভীমকান্ত রূপের ইঙ্গিত! একি কল্পনা? বাইরের জলস্থল দিঙমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে যে অসীমকে সে অনুভব ক'রেছে, ঘরে তার স্বামীতে সে তাঁকেই দেখতে গিয়েছে সসীমরূপে, পায় নি—সে ব্যথা পেয়েছে, বুক ভেঙে জেগেছে কান্না, তবু সে জেনেছে তার গোবিন্দ এবং স্বামী সেই অসীমেরই অঙ্গ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর অঙ্গ—ভাবতে ভাবতে সমস্তটাই তার দৃষ্টিতে একটা নির্ব্বিশেষ বোধে রূপান্তরিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে স্বামী বলো, সংসার বলো, বিশ্বের জনসাধারণ বলো, সব একাকার!

স্বামীর ছিল এখানেই বাধা। তা'র মনের এই স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি অস্বাভাবিক ব'লে মনে করেছিলেন, মনে ক'রেছিলেন এঁকে তাঁর বিবাহিত অধিকারের পক্ষে বিদ্রোহকর ব'লে এবং এই মতের এবং আদর্শের পরিপোষক ব'লেই গোঁসাইয়ের ওপর ছিল তাঁর বিরক্তি ও বিদ্বেষ। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন দিন এ কথা তিনি স্ত্রীকে খুলে না ব'ললেও, তাঁর সঞ্চিত অসন্তোষ পাথর চাপা ঝর্ণার মতো আশে পাশের রন্ধ্র দিয়ে ছিটকে বার হ'ত। অরুণার মনে হ'ত, তার স্বামী যেন চান্ তার পরিকল্পনার চেয়ে অনেকটা নেমে একান্ত ভাবে তাঁর মুঠোর সে ভেতর চ'লে আসে—কিন্তু তার সংস্কার তাতে সাহস পেতো না। অরুণা ভাবতো তার এই সংস্কারটাকে

ভাঙার জন্যেই বুঝি স্বামী ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ভগবৎপ্রীতিকে এমন ক'রে আঘাত করেন এবং এমন একটা নিরবলম্ব শূন্যমার্গীয় মত প্রচার করেন—নইলে সব দিক দিয়েই যাঁর বিবেচনা এত সূক্ষ্ম, এদিক থেকে তাঁর অবুঝ হবার কি মানে হয় ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অরুণার মনে হ'ল, তাই ত তার স্বামী যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, না খেয়ে না নেয়ে—কোথায় গেলেন এবং কেন গেলেন। সে কি তার ওপর রাগ ক'রে ? বেলা এখন বোধ হয় ন'টা হবে—ওদিকে নীচেয় গোঁসাই ও তাঁর সঙ্গীরা, তাঁদের স্নানাহার আছে, চারিদিকের এই বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলতার ওপর কল্পনায় একবার চোখ বুলোতেই অরুণার অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো। তার নিঃশ্বাস প'ড়তে লাগল ঘন ঘন—তারপর সে কচি মেয়ের মত ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

শিক্ষয়িত্রী বিদায় নেবা মাত্র লিলি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে এসে হাজির—গোঁসাই এসেছেন, এতবড় মুখরোচক ব্যাপারটা অযথা বাসি হ'য়ে যাচ্ছে।

—জামাই বাবু, ও জামাই বাবু।

ওপরে এসেই কিন্তু লিলি স্তম্ভিত। দিদি দু'হাতে মুখ ঢেকে বারান্দায় ব'সে কাঁদ্‌ছে এবং ভগিনীপতি নেই। দিদির কান্না ব্যাপারটা তার কাছে বড় বেশী বিস্ময়কর নয়, কিন্তু ভগিনীপতির অনুপস্থিতিটা রীতিমত অভাবনীয়। তাছাড়া চারিদিকে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব—ঝি চাকরগুলো পর্য্যন্ত ওপরে আসছে না, বোধহয় রান্নাবান্নারও কোন যোগাড় এখনো হয় নি। ব্যাপারটা যাই হ'ক, বেশ সুবিধাজনক নয়—এবং তার সঙ্গে নির্ঘাত গোঁসাইটির কোন যোগ আছে! গোঁসাই ও তাঁর সেবায়েৎ মণ্ডলীর রূপ-লাবণ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি চোখা চোখা রসিকতা সে এক রকম মুখে ক'রেই এনেছিল—কিন্তু ব্যাপারের জটিলতায় রসিকতা যখন মাঠেই মারা গেল, তখন বেচারী প্রথমটা একটু ইতস্তত ক'রলো, তারপর দিদির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলো, জামাইবাবু কোথায় দিদি ?

—কোথায় চ'লে গেলেন না ব'লে।

—কেন ?

—আমায় তিনি আর চান্ না।

—দেৎ! আসল ব্যাপারটা কি বলো ত।

হঠাৎ অরুণা উঠে উন্মাদের মতো লিলির গলা জড়িয়ে ধ'রে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো—লিলি ভাই, আমাকে তিনি ত্যাগ করেছেন। আমি তাঁকে অমান্য করি, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার মুখ চেয়ে কাজ করি না—তাঁকে অবহেলা করে গুরু এবং গোবিন্দ নিয়ে প'ড়ে আছি! আমার কি হবে লিলি ?

লিলি দেখ্‌লে তার নভশ্চারী অনুমান বাস্তবতার মাটিতে ক্রমে থৈ পাচ্ছে। সত্যিই গোঁসাইরূপী শনিগ্রহটি এসে এই সংসারের নিয়ন্ত্রিত জীবন-ধারায় একটা ওলট পালটের সূচনা

ক'রেছে। কিন্তু অপূর্ব্ব বাবুকে মতের দিক থেকে যতটা একরোখা সে জানে, মতির দিক থেকে ততটা ত তার কোন দিন মনে হয় না। বিশেষ ক'রে এমন একটা কি ব্যাপার হ'তে পারে, যার জন্যে এত বড় একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক এক ঘণ্টার মধ্যে এমন অবলীলাক্রমে অভিনীত হ'য়ে যেতে পারে!

সে ব'ললো, যাঃ তাই কখনো হয়! রাগ ক'রেছেন—এখুনি ফিরে আসবেন, তখন বেশ ক'রে পায়ে টায়ে ধ'রে মাপ চাও—আর ঐ আপদ বিদেয় ক'রে দাও, তাহ'লেই মিটে গেলো; তিনি তোমায় যে রকম ভালোবাসেন, তাতে মিটমাট হ'তে দেরী লাগবে না।

অরুণা কিন্তু আশ্বস্ত হ'ল না। সে ব'ললে, আমি খুব ভালো রকম জানি লিলি তাঁকে। দিনের পর দিন মনে মনে গুম্‌রে গুম্‌রে একদিন তিনি সমস্তটা প্রকাশ ক'রেছেন—এ রাগ শুধু আজকের নয়, আজই মিটবেও না—আর তিনি যে শীগ্রী ফিরে আসবেন, তাও আমার মনে হয় না।

লিলির এবার যেন একটা খট্‌কা লাগলো। সে ব'লে ফেললো, রাগ করোনা দিদি, সত্যিই কি তুমি খুব বেশী অপরাধ করো নি? তুমি দিন-রাত্রি তোমার জপ তপ ব্রত উপবাস কীর্ত্তন নিয়েই আছো—আর তোমার প্রত্যাশায় যে বেচারী দিনের পর দিন হা প্রত্যাশা ক'রে রয়েছে, তার ভাগ্যে জোটে শুধু প্রণাম, শুধু পূজো……এতে কি মানুষের তৃপ্তি বা শান্তি হ'তে পারে? সংসার ক'রতে হ'লে সংসারী লোকেরা যা করে, তাই ক'রতে হয়—আর নইলে সন্ন্যাসী হ'তে হয়। এদিকে সাংসারও ক'রছো, আবার সংসারিক দাবী-দাওয়ার দোরে চাবি এঁটে গোবিন্দ গোবিন্দ ক'রছো। এ রকম অস্বাভাবিক ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায়। আমি অনেক আগে থেকেই ভয় করতাম।

লিলির কথাগুলো যেমন তীব্র, তেম্নি মর্ম্মান্তস্পর্শী। তবু অরুণা স্থির হ'য়েই সব শুনলো। প্রতিবাদ সে করলো না, অধীরও হ'ল না। যেন মনে মনে কি সে ভেবে নিলো। তারপর ব'ললো, আচ্ছা লিলি, ভক্তি বা শ্রদ্ধাকে কেউ বড় জিনিষ বলে ভাবে না? যাকে তুই সংসার ব'লছিস তাই কি সব চেয়ে বড়?

—সবই পাত্র বিশেষের কথা। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভেতর শ্রদ্ধা জিনিষটা থাকে দেহের ভেতর কঙ্কালের মতো—দেহটাকে চেঁছে ফেলে কঙ্কালটা বার ক'রলে সেটা আর দেহ থাকে না, তখন সেটা কঙ্কালই। কেবল মাত্র শ্রদ্ধাসর্ব্বস্ব হ'লে, দাম্পত্য-জীবন তেম্নি হাড়সার নিষ্প্রাণ ও বন্ধনহীন হ'য়ে পড়ে— তাই হ'য়েছে তোমাদের।

—তাই কি?

—হ্যাঁ তাই। পাথরের দেবতার ওপরে ঢের জুলুম সয়, কিন্তু সুখ দুঃখের, আশা আকাঙ্ক্ষার অধীন মানুষের অত সইবে কেন? সে চায় প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে নিজেকে বিকশিত ক'রতে—বিয়ে সেই পথের একটা প্রধান উপকরণ; কিন্তু তুমি তাকে বার বার আঘাত ক'রেছো

শ্রদ্ধা দিয়ে, পূজো দিয়ে। পিপাসার বন্যাবেগকে তুমি প্রতিহত করেছো ধর্ম্মের খাড়া পাথর দিয়ে।

অরুণা বিহ্বল কণ্ঠে ব'ললো, তাহ'লে ?

লিলি ব'ললো, তাই ত!

—আচ্ছা লিলি, তুই ত আমার চেয়ে ঢের ছোট, তুই কি ক'রে এমন সহজ রাস্তাটা চিনেছিস ? আমিই বা তা পারি নি কেন ? তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা ত কম হবার কথা নয়।

লিলির মুখটা একবার নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলো। তারপর সে পূর্ব্ববৎ ব'ললো, বয়স দিয়েই অভিজ্ঞতার পরিমাপ হয় না দিদি। ঘা খেলেই মানুষ প্রাজ্ঞ হয়। কিন্তু যাক সে কথা—একটা কথার তুমি উত্তর দেবে ?

—কি ?

—তোমাদের মধ্যে কোন দিন তথাকথিত দাম্পত্য-সম্বন্ধ ছিল কি ?

—না।

—কেন ?

—অপর পক্ষ থেকে উৎসাহের অভাব ছিল না—কিন্তু আমি মনে করেছিলাম তা একান্ত প্রাকৃতজনোচিত ইন্দ্রিয়-সেবা, তা আধ্যাত্মিকতার পক্ষে অনিষ্টকর—স্বামীর ভগবত্তা ক্ষুন্ন হ'য়ে তা থেকে বিকৃত ইন্দ্রিয়াধীন মানুষ প্রকাশ পায়।

লিলি চম্‌কে উঠ্‌লো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে অসাবধানে বেরিয়ে গেলো, অসম্ভব! নিউরটিক!

নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে ব'ললো, দিদি তুমি গুরুজন কিছু মনে করো না—কিন্তু এতবড় ভুল তোমার মাথায় যেই চাপিয়ে থাকুক সে তোমার প্রকাণ্ড শত্রু। তুমি আর তোমার স্বামীর সত্যিকার মিলন থেকে কত ছেলে-মেয়ে জন্মাতে পারতো! পৃথিবীকে সেই প্রত্যাশিত সন্তান দেবার জন্যেই স্ত্রী পুরুষের মিলন—তারাই ত গড়ে মানুষের ইতিহাস; তারাই আনে ধর্ম্মের বন্যা, তারাই দেয় বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যে নিত্য নূতন সম্পদ! কি অধিকার আছে আমাদের সেই ন্যায্য দেয় থেকে জগৎকে বঞ্চিত করার ? ভেবে দেখো তোমার কথা, তোমার গোঁসাইয়ের কথা, তোমার মহাপ্রভুর কথা—তাঁরাও ত এই জান্তব উপায়েই জন্মিয়েছেন। যদি পৃথিবী শুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ এক মুহূর্ত্তে তোমার মন্ত্র গ্রহণ করে, কালকে মানুষের ঘরে বাতি দিতে কে থাক্‌বে ? কি দাম থাক্‌বে তখন এই ধর্ম্ম-কর্ম্মের, এই আচার-নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষার! ওটা ভুল, ওর চেয়ে ভুল আর হ'তে পারে না। সাধু সন্ন্যাসীর কথা ছেড়ে দাও—তারা স্বাভাবিক জীবন-ধারা থেকে একটা কোন ধাক্কা পেয়ে অস্বাভাবিকে এসে পড়ে—তুমি কি মনে করো তাদের শান্তি আছে, না তৃপ্তি আছে ? তাদের ভেতর যতই জ্বলে, মুখে তারা ততই জোরে

জীবনকে, তার বৈচিত্র্যকে বলে মিথ্যা। ঝোঁকের মাথায় এতটা ব'লে ফেলে লিলি কেমন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো।

তারপর সংযত হ'য়ে আবার বললো, দিদি, আমিও মেয়েমানুষ—অনেক দুঃখে, অনেক ব্যথায় এটা বুঝেছি।

কথাটা বলেই লিলির মনে হ'ল, এটা না ব'ললেও চলতো। একটা দীর্ঘশ্বাস প'ড়লো তার। অরুণা সেটা লক্ষ্য কর'লো। সে বললো, লিলি এ সব আমিও ভেবেছি অনেকবার—কিন্তু মনে হ'য়েছে এ সবকে মায়া ব'লে, মিথ্যে ব'লে···মনে হয়েছে এ জীবন শুধু তাঁকে পাবার, তাঁকে বুঝবার জন্যে—আর কিছুর জন্যে নয়।

এবার লিলি হাস্‌লো। সে বললো, যেটা চোখে দেখছো, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে অনুভব করছো—যার এক কোণায় একটু টান্ পড়্‌লে, সমস্ত ছোট বড় গ্রন্থি এক সঙ্গে ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা আছে, সেটা মিথ্যে—আর যা কোন দিন কেউ দেখে নি, বোঝে নি, জানে নি, তাই সত্যি? এ সব কথা বলেছে ঐ সব গোঁসাইয়ের মতো লোক, যারা আশা করেছে, পায় নি—এবং না পেয়ে ভেবেছে, অন্যেও যেন আর না পায়।

ঠিক অপূর্ব্ব বাবুর কথা। অরুণা স্তম্ভিত হ'ল, একই পিতার কন্যা তারা—একই শিক্ষা-দীক্ষা ও আবহাওয়ায় প্রতিপালিত—কিন্তু কি ক'রে লিলি এমন প্রত্যক্ষানুগামী ও সে স্বপ্নানুসারী হ'য়েছে! সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লো।

লিলি বললো, কিন্তু ওসব তর্ক এখন থাক। তুমি নীচেয় যাও—চান্ টান্ ক'রে কাজ-কর্ম্ম করো গে। উপায় একটা হবেই। জামাই বাবু ফিরুন—তবে হ্যাঁ, তোমার ঐ গোঁসাই ও গোবিন্দকে কিন্তু হটাতে হবে, নইলে কোন দিনই কোন মীমাংসার আশা ক'রো না।

—বলিস কি?

—হ্যাঁ, এ ছাড়া পথ নেই। মনে রাখতে চাও রাখো, কিন্তু ঘরের কোণে ওদের স্থান নেই—তাহ'লে সংসার ছারখার হবে।

অরুণা নিঃশব্দে নেমে চলে গেলো। তার সমস্ত বুদ্ধি ও চৈতন্য যেন অভিভূত হ'য়ে গেছে। আশাতীত রকম নিষ্ঠুর সত্যকথা বলতে পেরেছে এবং সেই বলার ভেতর দিয়ে যে প্রশ্নটা মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গিয়েছে, তার একেবার মর্ম্মস্থলে এসে পৌঁছুতে পেরেছে দেখে লিলি খুব খুসী হ'য়ে উঠলো।

নীচেয় তখন গোঁসাই ও তাঁর চেলারা কীর্ত্তনানন্দ আরম্ভ ক'রেছেন। সকালের সোনালী রোদে ওপরের ঘরের জান্‌লার কাছে ব'সে লিলি শুন্‌তে পেলো কীর্ত্তনের একটি কথা বার বার কেঁদে কেঁদে ফির্‌ছে—বঁধুহে! লিলির বুকের ভেতরটা কি এক অব্যক্ত অনুভূতিতে পাক্ দিয়ে উঠ্‌লো—আজকের এই মধুর সকালটিতে সত্যিই ত অম্নি ক'রে ডাক্‌তে ইচ্ছে করে, বঁধু হে, বঁধু হে।

—গান ব'ল্‌ছে,—

বঁধু হে ফিরে এসো হে,
আমি তোমা বৈ কিছু চাই না হে!

লিলির চোখের জল বাধা মান্‌লোনা—সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর গানের সুরে সুর মিলিয়ে সেও গুণ গুণ ক'রে গাইতে লাগ্‌লো, বঁধু হে ফিরে এসো হে! সমস্ত ইঁট-কাঠ-পাথর ভেদ করে সাত-সমুদ্র তেরো-নদী অতিক্রম ক'রে কোন নিরুদ্দিষ্ট মহাশূন্যে কেঁদে কেঁদে ফির্‌তে লাগ্‌লো তার আকুতি—বঁধু হে ফিরে এসো হে! গোঁসাই আখর সংযোগ ক'র্‌ছেন, আমি ধরম করম চাই না হে, আমি কুলের ভরম মান্‌বো না হে...বঁধু হে, বঁধু হে; লিলিও গাইছে সেই সঙ্গে, গাইছে আর কাঁদছে।

তিন দিন পর্য্যন্ত অরুণা প্রতীক্ষা ক'রেছে স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের। মনের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড়া ক'রে অবশেষে সে স্থির করেছে, স্বামী ফিরে এলে তাঁর পায়ে সে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ ক'রবে—গোঁসাইকে চির দিনের জন্যে বিদায় দেবে, আর তাঁরই হাতে দেবে গোবিন্দকে বিদায়। ভাবতেও তার চোখে জল আসে—তারপর সে কারুকে না জানিয়ে তিল তিল ক'রে ক'র্‌বে আত্মোৎসর্জ্জন—অনাহারে অনিদ্রায়! গুরুহীন গোবিন্দহীন এ জীবন রাখা না রাখা তুল্যমূল্য। কিন্তু স্বামীকেও সে অসন্তুষ্ট রাখবে না—তাঁকেও সে নিজের দেহ-মন সমস্তই অকুণ্ঠিত অর্ঘ্য রূপে দান ক'র্‌বে!

এ যে তার পক্ষে কত কঠিন কাজ, তার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেউই তা জানেন না। সে ভেবেছে আর কেঁদেছে—কেন, কেন, হ'লনা তার সংস্কার ও সংস্থানে একটু সুষ্ঠু সমন্বয়। কেন তাঁর গোবিন্দকে দিতে হ'চ্ছে বিসর্জ্জন, গুরুকে বিদায়—আবার স্বামীকে নির্ব্বাসন! অধীর উত্তেজনায় অরুণা ডাকে গোবিন্দ হে! সমাধান হয় না। শেষে তার বিশ্বাসের ভিত্তি নড়তে থাকে—তা হ'লে কি স্বামীর কথাই ঠিক, লিলির কথাই ঠিক! গোবিন্দ কি মানুষের অলীক কল্পনা—কৈ সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বপ্রেমময় কেন তার এই মহাসমস্যার সহায় হ'চ্ছেন না? অথবা একি তার প্রাক্তন কর্ম্মফল!

সারাদিন গিয়ে রাত্রি হ'ল—বিনিদ্র রাত্রি কেটে সকাল এলো স্বামী ফির্‌লেন না। গোঁসাইয়ের গান চলেছে—চলেছে লিলির প্রাত্যহিক পাঠাভ্যাস—সমস্ত সংসার চ'ল্‌ছে তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে, শুধু তারই গতিপথ গেছে অবরুদ্ধ হ'য়ে—তার সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে দুর্ভেদ্য দুরধিগম্য বাধার বিস্তার! আকুল আর্ত্ত কণ্ঠে সে ডাকছে তার ঠাকুরকে—সাড়া নেই, শব্দ নেই।

দুপুর বেলা সে ডেকে পাঠালো লিলিকে। লিলি নিঃশব্দে এসে বসলো তার শিয়রে—বর্ষান্তের কুসুমৈশ্বর্য্যহীন স্তিমিত লতার মতো। অন্য সময় হলে অরুণা বুঝতো তার পরিবর্ত্তন কত স্পষ্ট—কিন্তু অরুণার আজ বোঝার অবস্থা নেই।

সে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো, লিলি তিনি আর এলেন না—আর তিনি আসবেন না লিলি।

সান্ত্বনার স্বরে লিলি বললো, অত উতলা হয়ো না দিদি—আসবেন নিশ্চয়ই। অমন ভেঙে পড়লে ত কোন সমাধানই হবে না—বিপদ যত বড়ই হক্, তাকে অতিক্রমও মানুষেই করে।

—লিলিরে আর আমার সময় নেই—আমি আর বাঁচবো না।

—যাঃ, বাঁচবে না, কি হয়েছে ?

—না, না, আমি ঠিক বলছি—ছাখ তুই আমার গায়ে হাত দিয়ে।

লিলি গায়ে হাত দিয়ে দেখে অরুণার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে দারুণ জ্বরে—তার দুটি চোখ গাঢ় লাল, নিঃশ্বাসের গতি অসমান, সমস্ত মুখ চোখ রক্তাভ !

—তোমার ভয়ানক জ্বর হয়েছে দিদি—তুমি শুয়ে পড়ো। কিছু ভেবোনা তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অরুণা অসহায় বালিকার মতো লিলির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো, আর ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো।

দম্ নিয়ে নিয়ে সে বললো, গোঁসাইকে সব বুঝিয়ে বলেছি—তিনি বিকেলে চলে যাবেন, সেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন গোবিন্দকে। কিন্তু তিনি এসে দেখলেন না, আমি কেমন অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তাঁর ক্ষমা পেয়ে যাওয়া হল না আমার। তুই ত থাকবি লিলি, আমার হয়ে তাঁর কাছে তুই ক্ষমা চাস—বলিস আমি তাঁর অবাধ্যতা করেই মরি নি।

লিলি বললো, না দিদি গোঁসাই থাকুন, গোবিন্দও থাকুন—জামাই বাবু আসুন তারপর সব হবে।

—না না, যদি তিনি কখনো আসেন, যেন দেখেন তাঁর অরুণা তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করে নি !

লিলির চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো। গোঁসাই ও গোবিন্দ—দুটির একটিকেও সে কোন দিন ভালো চক্ষে দেখে নি, কিন্তু তার অজ্ঞাতে কি কোন অদৃশ্য যোগ স্থাপিত হয়েছে তার সঙ্গে ওদের ? আর দিদি ? অভাগিনী দিদি ! লিলি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

অরুণা ব্যগ্র ভাবে তার একটা হাত চেপে ধরলো। ব'ললো, লিলি ভাই, একটা কথা আমার রাখবি ? কোন দিন কোন কিছু চাইনি আমি কারুর কাছে।

—কি দিদি ?

—আমি যখন থাকবো না, তুই ওঁকে একটু ভালোবাসা দিস। উনিও বড় দুঃখী—কিছুরই অভাব ছিল না ওঁর, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, যশ সবই ছিল...শুধু আমিই করতে পারিনি ওঁকে সুখী। আমি যে সাধ ওঁর মেটাতে পারি নি, তুই তাই মেটাস—তুই বুদ্ধিমতী, তুই পারবি—আমি পারি নি।

—না দিদি এ আদেশ আমায় কেন করছো।

—আদেশ নয় ভাই, এই আমার ভিক্ষা।

এতক্ষণ লিলি হতবুদ্ধি হয়ে গেছলো। এখনি যে ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার এবং অবিলম্বে কোন প্রতিকার করা দরকার—সে হুঁসই তার হয় নি। হঠাৎ সেটা মনে হতেই সে অরুণাকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে উঠছে, এমন সময় দোরের কাছে "হরে কৃষ্ণ"!

পেছুন ফিরেই দেখে গোঁসাই—একখানি কানি পরণে, একখানি কাঁধে, গলায় হরিনামের ঝুলি—তিনি চলে যাচ্ছেন।

লিলির ধাঁধা লেগে গেলো। কোন দিন এত ভালো করে, এমন আগ্রহ নিয়ে গোঁসাইকে সে দেখে নি—কি সুন্দর, স্নিগ্ধ, সৌম্য রূপ তাঁর—কি মমতাময় চোখ, আর হাস্যময় মুখমণ্ডল!

গোঁসাই বললেন, মা আমি চলছি।

লিলি বললে, না প্রভু আপনি থাকুন।

এই তার গোঁসাইকে প্রথম প্রভু সম্বোধন। আর গোঁসাই-প্রসঙ্গে এই তার কণ্ঠে প্রথম মিনতির সুর।

গোঁসাই ব'ললেন, না মা—দয়াময়ের প্রকাণ্ড পথ যে আমায় টেনে নিয়ে চ'লেছে—আমি চুপ করে থাকি কি ক'রে?

—গোবিন্দকে কি আপনি নিয়ে চললেন?

গোঁসাই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্লেন, প্রভু হে! তাঁকে কে নিয়ে যাবে? কার এত শক্তি আছে? তিনি যে সর্ব্বঘটে, সর্ব্বস্থলে……তাঁকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবো মা?

—দিদির বড্ড জ্বর হয়েছে—জামাইবাবু নেই…।

—ভয় কি,বিরাম হবে—গোবিন্দ আছেন; তিনিও কি কাঁদছেন না—তাঁর বুক কি পাথরে তৈরি? আহা…।

শেষের দিকে গোঁসাইয়ের কথাগুলো ভেঙে ভেঙে জড়িয়ে গেলো—তিনি অবিরল অশ্রু-পাত ক'রতে লাগলেন। অরুণা কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে যেমন নিষ্কম্প হয়েছিল, তেম্নি রইলো—টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলো না। বোধহয় জ্ঞানই ছিল না তার—নইলে বোঝা যেতো তার বুকে ভূমিকম্পের কি দুর্দ্দান্ত দাপাদাপি চল্‌ছে!

লিলি বললো, প্রভু।

—কি মা।

দিদি ভালো হবে ত?

—গোবিন্দ বলো মা।

অভিভূতের মতো লিলি বলে উঠলো, গোবিন্দ, গোবিন্দ!

গোঁসাই দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন,—

তুমি ভব-ব্যাধির ঔষধ
তুমি হে পরম বৈদ্য !

গাইতে গাইতে গোঁসাই বেরিয়ে গেলেন—ঘর থেকে পথে, তারপর দূর থেকে আরও দূরে। কিন্তু লিলির কানে বাজতে লাগলো, তুমি হে, তুমি হে, ! আচ্ছন্নের মতো সে বলতে লাগলো, গোবিন্দ, গোবিন্দ !

একটু পরেই তার হুঁস হল—সে ডাক্‌লো, দিদি !

উত্তর নেই। তাড়াতাড়ি লিলি তখন ওপরে গেলো ডাক্তারকে ফোন করতে।

সন্ধ্যার মুখে অরুণার অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়ালো। একটু একটু ক'রে তার সমস্ত সংজ্ঞা যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ডাক্তার এসে দেখে-শুনে কিছুই স্থির করতে পারলেন না। তবে তিনি এটা অনুমান করলেন যে রোগিণীর অবস্থা বেশ আশাপ্রদ নয়। তাঁর বিশ্বাস দীর্ঘদিন থেকেই তার একটা কোন চাপা অসুখ চলছে এবং সেটা মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-মণ্ডল সম্পর্কীয়। যতদূর তাঁর মনে হ'ল তাতে রক্তের চাপ খুব বেশী এবং একটা কোন আকস্মিক উত্তেজনায় একাধিক স্নায়ুবন্ধ ছিঁড়ে মস্তিষ্কে রক্তস্রাব হতে সুরু হয়েছে—অর্থাৎ তাঁর পক্ষে করণীয় আর বিশেষ কিছুই নেই, রক্তের চাপ হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষভাবে রোগিণীর পরিচর্য্যা করতে হবে। অত্যন্ত বেশী জ্বর থাকায় এই সঙ্গে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাবার ভয় দেখা যাচ্ছে—তা যদি হয়, তাহলে হঠাৎ উঠতে বসতে বা দাঁড়াতে গেলে হৃদ-যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হতে দেরী হবে না।

শুনতে শুনতে লিলির সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না—তালু এবং জিভ যেন অসাড় হয়ে গেছে—সমস্ত বাড়ী-ঘর, আলো-আকাশ তার চোখে ঘোলা আর ধোঁয়াটে হয়ে ক্রমাগত দুলছে। অতি কষ্টে সে একটা চেয়ারের পেছুনে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিলো।

ডাক্তার বললেন, আমি সকালে এসে যা হয় বিহিত করবো। উপস্থিত দুটো ইন্‌জেক্‌সন্ করছি এবং দু'জন নার্স আনিয়ে তাদের উপযুক্ত রকম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি—কোন বিশেষ সঙ্কট দেখা দিলে তারাই আমাকে খবর দেবে। প্রফেসার রায় কোথায় ?

—তিনি ক'দিন হ'ল বাইরে গেছেন।

—বিপদের কথা বটে। বাড়ীতে ত তা'হলে একমাত্র মানুষ আপনি—আর ঝি-চাকর।

এই সময় অরুণা একবার মোচড় খেয়ে বেঁকে-চুরে উঠে বসার চেষ্টা করলো। ডাক্তার এগিয়ে এসে ধরলেন। লিলির কিন্তু দিদির দিকে ফিরে তাকাতেও আর সাহস হয় না। তার মনে হ'ল দিদি নিশ্চয় মারা যাচ্ছে এবং তা যাচ্ছে ভাবতেই তার সমস্ত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে একটা দুর্ব্বার কান্না ঠেলে বেরুবার উপক্রম হ'ল।

সে বললো, বাঁচবে ত ডাক্তার বাবু?

ডাক্তারের সে সম্বন্ধে ভরসা খুব বেশী আছে মনে হল না।

তিনি বললেন, চেষ্টা ত করতে হবে, ফল অন্যের হাতে।

—অসুখটা কি দাঁড়ালো?

—সেটা ঠিক করাই কঠিন—তবে ম্যানিন্‌জিয়াল ফিভার বলে সন্দেহ করছি। আচ্ছা ওঁর কি হিষ্টিরিয়া ছিল কোন দিন?

—হিষ্টিরিয়া? না, তবে মেজাজটা একটু হিষ্ট্রিওনিক্ ছিল বরাবরই। একটু অস্বাভাবিক ধরণের মন—মানে হঠাৎ কাঁদা, হঠাৎ আকুল হওয়া এবং কল্পিত জিনিষে অস্তিত্ব আরোপ করে তাই নিয়ে মেতে থাকা—অথচ সত্য জিনিষে উপেক্ষা, মানে এই···!

ডাক্তার টেকো মাথাটি নেড়ে বললেন, বুঝলাম। ছেলেপুলে বোধহয় হয় নি?

—না ঐ যে বললাম প্রকৃতিটা অন্য সব দিক দিয়েই অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু তার গতিবিধি ছিল একটু অসাধারণ রকম।

ডাক্তার আবার বললেন, বুঝলাম। তবে সচরাচর অবদমিত রতি-বাসনার চাপে পরে উন্মাদনার সূত্রপাত হয়ে থাকে—কিন্তু এ ধারায় আসাটা ত তেমন বেশী দেখা যায় না!

—বাসনার তাগিদই ছিল না বিশেষ করে, কাজেই অবদমনের প্রশ্নই ওঠে নি বড়একটা। স্বভাবতঃই মনটা ছিল ওদিকে অসাড়, অথচ উপকরণাত্মক পরিতৃপ্তির ঝোঁকও ছিল—দেবতা নিয়ে।

ডাক্তার শুধু ঘাড় নাড়লেন এবং মনে হল তিনি বিশেষ বুঝলেন না।

তিনি বলিলেন, মোটের ওপর একটা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। এবিষয়ে তাহলে প্যাথলজিষ্টের পরামর্শ কাজে লাগতে পারে—বিকলতাটা ঠিক কোনখানে তা ধরতে পারলে হয়ত তার অপসারণ সোজা হত, চিকিৎসাও কঠিন হত না।

এর পর লিলি আর কিছু বললো না। অতি কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করে ওপরের কথা কটি বলেছিল—আর বেশী বলার মতো সাহস বা ধৈর্য্য তার নেই। তার সমস্ত অন্তরাত্মা এদিকে ভয়ে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। তার মনে হচ্ছে এই নির্ব্বান্ধব প্রকাণ্ড বাড়ীতে এই মরণাপন্ন হতচেতন রোগী নিয়ে নিঃসম্পর্ক ঝি-চাকরের সঙ্গে তাকে এই দুরন্ত রাত্রি কাটাতে হবে। যদি নিশি রাত্রেই হঠাৎ···না সে কথা ভাবতেও তার সাহস হয় না।

ডাক্তার ইতিমধ্যে তাঁর কর্ত্তব্য সমাধা করতে ব্যস্ত হয়েছেন। তিনি যথারীতি ইন্‌জেক্‌সন্ সেরে, ওপরে গিয়ে টেলিফোন্ করলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যেই দু'জন শিক্ষিতা নার্স এসে পড়বে।

হঠাৎ লিলি তাঁর হাতের আস্তিনটা চেপে ধরলো—আট বছরের ছোট্ট মেয়েটির মতো।

—ডাক্তারবাবু।

—কি মা?

—নার্সেরা না-আসা পর্য্যন্ত আপনি যাবেন না, আমার বড্ড ভয় করছে।

ডাক্তার হাসলেন, টাকাগুলি পকেটে পুরতে পুরতে তিনি বললেন, ভয় কি? রোগ শোক জন্ম মৃত্যু এ বাদ দিয়ে ত জীবন নয়। তবে লড়তে হবে প্রাণপণ, তাতে পিছিয়ে এলে ত চলবে না। হ্যাঁ আপনার ভাগিনীপতিকে কিন্তু রাত পোহালেই টেলিগ্রাম করবেন এবং আত্মীয়-স্বজন লোকজন আরও চাই—কারণ বিপদে জনবলও একটা বিশেষ বল।

অরুণা তখন বিড় বিড় করে কি বলা স্থুরু করেছে।

লিলি তার মুখে কথা দেখে একটু ভরসা পেলো—সে এগিয়ে গিয়ে বললো, দিদি কি বলছো?

কিন্তু দিদি কোন উত্তরই দিলো না। তার কথা যে শুনতে পেয়েছে, তাও মনে হল না।

ডাক্তার বললেন, তুমি বসো মা, ও কথা নয়, প্রলাপ।

—এঁ্যা? দিদি…

—ওরকম অধীর হ'লে ত চ'লবে না মা, বিপদে ধৈর্য্য…তা হ্যাঁ আমার-ত আর থাকা চলে না, আমার আবার হাতে একটা মরণাপন্ন টাইফয়েড্ রোগী।

লিলি একথার উত্তরে কিছুই ব'লতে পারলো না—শুধু নিষ্প্রাণ তড়িৎস্পৃষ্ট দেহের মতো খাড়া রইলো।

সকালের দিকে দোরে একখানি গাড়ী এসে থামলো। অপূর্ব্ববাবু ডাকলেন, লিলি! লিলি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

কতকটা ডাক্তারের মুখে এবং অনেকটা লিলির মুখে শুনে অপূর্ব্ববাবু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি একটুও অধীর হলেন না—কেমন একটা নিস্পৃহ জড়তা তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছে। কিছুতেই যেন আর কিছু যায় আসে না—অরুণা কেন, নিজের জীবন সম্বন্ধেও তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

সংসারের সঙ্গে আপন দেনা-পাওনার হিসাব খতিয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত একটা নিশ্চিত মীমাংসায় এসে পড়েছেন মনে হয়। এ অবস্থায় তাঁর মনে হল, অরুণার মৃত্যুর জন্যে তিনি হয়ত একটুও দায়ী নন্—কারণ আসন্ন মৃত্যুকে বুকে আড়াল করেই অরুণা এতদিন ঘর করে গেছে। তা বলে অরুণার ওপর তাঁর আকর্ষণ বা অনুরাগ ছিল না এমন নয়—বেশী রকমই ছিল। তবু অরুণা যেন ছিল সাজানো জিনিষের মতো—যাতে শোভা সৌকুমার্য্যের অভাব নেই, কিন্তু তা হাতের ভর সয় না! দূর থেকে দেখে অধীরতা জাগে—কাছেও ছুটে যেতে হয়—কিন্তু ভেতর থেকেই কি একটা অদৃশ্য টান পড়ে, আর এগুনো হয় না! অবশ্য বিরাগ ছিল এজন্যে, বিরহও ছিল—তবু তা কোনদিন অসহ্য হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সহ্যের সীমা-লঙ্ঘন হ'ল গোঁসাইয়ের আবির্ভাবে। বলা বাহুল্য—তাঁদের দাম্পত্য সম্বন্ধের আকর্ষণ-বিকর্ষণে গোঁসাই ছিল একান্তই পট়-

ভূমিতে—কোনদিন প্রত্যক্ষ সজ্ঘাতে তার হাতের ছাপ দেখা যায় নি, তবু যেন মনে হয়েছে এখুনি সে সাম্নে এসে পড়বে এবং সে এসে পড়লেই সব ভেস্তে যাবে।

সুতরাং নিজেকে অপরাধী ভাবতে অপূর্ব্ববাবুর প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্য গোঁসাই ও গোবিন্দের বিতাড়ন বা তার এই মারাত্মক পরিণতির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না—কোনদিন এটা কল্পনাও করেন নি। তবু ঘটনাচক্রে যখন তাই ঘটলো তখন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেও ভালো লাগলো না।

তাঁর অবস্থা এখন জুয়াড়ীর মতো—সর্ব্বস্ব খোয়ানোর পর শুভানুধ্যায়ী কেউ অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ বাঁচাবার পরামর্শ দিলে, সে ভাবে—না, এটুকুও শেষ ক'রে ফেলি—এরও আর কোন সার্থকতা নেই—সর্ব্বস্ব খোয়ানোর আনন্দই তখন হয় তার একমাত্র পুঁজি! অপূর্ব্ববাবুর মনেও একটি নির্দ্দয় উল্লাস প্রকাশ পাচ্ছে—তাঁর এই অন্তঃসারশূন্য বন্ধ্য বিরহের ধ্বংসস্তূপে আর এই ভগ্নাংশটুকু টিঁকে থাকার লাভ কি? অরুণাতে আর কাজ কি? একটি বিস্মৃত গানের কলির মতো স্মৃতির ঝাপ্সায় অরুণা ছড়িয়ে জড়িয়ে থাক, প্রত্যক্ষ সংসারে আর তাকে তাঁর দরকার কি?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে মাথা তুলে ওঠে একটা নির্লিপ্ত কঠোরতা—বাইরে সেটা গোপন থাকে না। এতদিন অন্তরের গহন অন্তরালে যে উত্তাপকে তিনি সযত্নে লালন করে-ছিলেন, আজ তা ধূম্রল বাষ্পের আকারে তাঁর বহিঃপ্রকাশকে আচ্ছন্ন করেছে।

লিলি এটা বুঝলে—কিন্তু এ নিয়ে বাক-বিনিময় করতে তার ইচ্ছে হয় না।

দিদির মৃত্যুকবলিত অস্তিত্বটা তারও অসহ্য হয়ে উঠেছে—হয় জীবন, নয় মৃত্যু। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর এই সমমাত্রিক টানাটানি তার অন্তরকে উদ্ভ্রান্ত করেছে।

কিন্তু লিলির জীবনধারায় এখনও সম্ভাবনীয়তার অঙ্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি—সে এখনও একটা কিছু অপ্রত্যাশিতের মুখ চায়। তাই শোকের সন্নিকটতা তার কাছে যত তীব্রই হ'ক, তাকে ছাপিয়ে ওঠার উদ্যম তার আরও বেশী। অপূর্ব্ববাবু কিন্তু বেলাভূমিতে পরিত্যক্ত—জোয়ারের প্রতীক্ষা তাঁর এবারের মতো শেষ হয়েছে।

তাই জীবিত দু'জনের মধ্যে যেমন তফাৎ—তাদের সঙ্গে জীবন্মৃতের তফাৎও তদ্রূপ।

অনেকক্ষণ একমনে ভাবতে ভাবতে অপূর্ব্ববাবু ক্রমে যেন অসাড় হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সমস্ত চিত্তবৃত্তি, সংজ্ঞা যেন মস্তিষ্কের পুরোভূমিকে ছেড়ে অন্তরালে সরে দাঁড়িয়েছে।

বৈরাগ্য, পারমার্থিকতা, মৃত্যু, জীবনচক্রের তিনটি কুয়াসাচ্ছন্ন প্রশ্ন---প্রত্যক্ষ দিয়ে যার কোনটারই বিচার হয় না, অথচ প্রত্যক্ষের বাইরে কি আছে, তাও দুর্জ্ঞেয়! প্রাপ্তি, স্বীকৃতি ও সম্ভোগ থেকে এরা কতদূরে···অথচ তারা সত্য, সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণুপরমাণু প্রতিনিয়ত আর্ত্ত চীৎকারে ঘোষণা করছে তাদের দাবী···তবু তারা নিরর্থক। কেন? তাও দুর্জ্ঞেয়!

চিন্তার আবর্ত্তে আলোড়িত হ'তে হ'তে সত্য-অসত্য, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত তাঁর কাছে একাকার হ'য়ে যায়! মনে হয় তাঁর অনুভূতি ও বোধবৃত্তি বুঝি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে লিলি উঠে এলো, জামাইবাবু শীগ্রী আসুন—দিদির নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না—হাত-পা হিম !

অপূর্ব্ববাবু নিঃশব্দে নেমে এলেন—ডাক্তার নাড়ি ধরে বসে—আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী নিঃশব্দে বসে। প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের শব্দও গুণে নেওয়া যায়, এমনই অখণ্ড ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সে নিস্তব্ধতা।

অরুণার ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপছে—চোখের দীর্ঘপক্ষ্ম পাতা দুটি ঘুমে অসাড়, তার পাশ দিয়ে নেমে এসেছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু—বুকটা অনেক দেরীতে দেরীতে একটু কাঁপছে !

ডাক্তার বললেন, মৃত্যু ! অপূর্ব্ববাবু যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন, মৃত্যু ! লিলি ডাকলো, দিদি। মহিলারা ডাকলেন—তারপর চারিদিকে কান্না সুরু হ'ল।

অপূর্ব্ববাবু বললেন, কোন শব্দ করো না—একটুও না।

অরুণার তখনও ঠোঁট কাঁপছে—তার নিষ্প্রভ মুখমণ্ডলে তখনও অস্ত-গোধূলির একটু আলো···কিন্তু দেহ তার শান্ত, ঝঞ্ঝা শেষের সমুদ্রের মতো !

অপূর্ব্ববাবু বললেন, লিলি কীর্ত্তন গাইতে পারো ?

—পারি, কিন্তু কেন ?

—গাও লিলি-কীর্ত্তন গাও, কীর্ত্তন গাও···ও তাই ব'লছে, বিশ্বাস করো, না করো গাও—ওকে শান্তিতে যেতে দাও—জীবনে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক—কে ঠকেছে, কে জিতেছে, কে জানে লিলি ? আর কিছু বলা হল না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

লিলি ব'ললো, কীর্ত্তন ? জামাইবাবু, দিদি অনেকক্ষণ দেখাশোনার দেশ ছাড়িয়ে গেছে—আর তার কোন ভয় নেই।

—না।

ডাক্তার বললেন, মুখটা ঢেকে দাও।

মেয়েরা বললেন, সতীলক্ষ্মী, পুণ্যবতী স্বামী রেখে ঘর-সংসার রেখে চলে গেলো।

অপূর্ব্ববাবু বললেন, লিলি ?

—কি ?

—এসো আমরা চলে যাই—এখান থেকে চলে যাই। মৃত্যুর পর আর কি থাকে ? স্মৃতি ? সে মিথ্যে, অথচ জীবনে তা মস্ত অভিশাপ।

নিঃশব্দে লিলি সরে এলো অপূর্ব্ববাবুর কাছে। অপূর্ব্ববাবু ধরলেন তার একটি হাত—অবসন্ন দেহভার তার কাঁধে ন্যস্ত করে তিনি বললেন, অরুণা, আজ থেকে পৃথিবীতে আর অরুণা বলে কেউ নেই। কিন্তু কোন দিনই কি কেউ ছিল ? তা'হলে কেন সে সমস্ত রহস্য নিজের মধ্যে এমন ভাবে আড়াল করে রেখেই চলে গেলো ?

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রাতচরা পাখীরা

রাতচরা পাখীরা ঘরে ফিরছিলো,
তখন তুমি ঘুমিয়েছিলে।
ধূসর অন্ধকারে
পা টিপে টিপে আলোর প্রথম উঁকি
পড়লো এসে তোমার ঠোঁটে।
কাঁপছিলো,
কাঁপছিলো তোমার ঠোঁট, পাণ্ডুর ঠোঁট।
কাঁপছিলো ভীতু ভুরু।
রাতচরা পাখীরা সব তখন ঘরে ফিরছিলো,
আর তুমি ঘুমিয়েছিলে।

সমুদ্র কি ঘুমোয় না ?
সমুদ্র কেঁদেছে কাল সারারাত।
তার আর্ত্তনাদ
হাহাকার করে ফিরে গেছে কাল সারারাত
তোমার মুদিত চোখের পাতায় ঘা খেয়ে।
চোখের পাতার দুই পারে দুই সমুদ্র।
তোমার মুদিত চোখের পাতার তলায়
ক্ষুব্ধ কান্নার সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে রইলো।

সমুদ্র যে ঘুমোয় না
সারাক্ষণ, সারারাত।
রাতচরা পাখীদের ডানার ঝাপট বাজে
সারাক্ষণ, সারারাত।
ঝরা পালক আর ঢেউভাঙা ফেনার খেলা
সারাক্ষণ, সারারাত।
তবু রাত হোলো সারা, আর রাতচরা পাখীরা ফিরলো ঘরে,
তুমি রইলে ঘুমিয়ে।

ঘুমোয় না রজনীগন্ধা।
জাগে, জাগে,
তোমার এলো-মেলো চুলে জড়ানো
একটি রজনীগন্ধা জাগে।
তার গন্ধ,
সে যে রাত্রির অন্ধকারকে ভারাক্রান্ত করে
দিলো পাড়ি
সমুদ্রের অলীক ওপারে,
যখন রাতচরা পাখীরা সব ঘরে ফিরলো,
আর ঘুমিয়ে রইলে শুধু তুমি।

যুবনাশ্ব

সুপ্তা

Roy Campbell-এর অনুসরণে

সে ঘুমায় নিস্তব্ধ নিশ্চল,
বাতাসে চঞ্চল শুধু কালো কেশদল
ঘুমের সমুদ্র তীরে মূরছিয়া পড়ে,
ঘুমের সৈকত ভূমে চূর্ণ চূর্ণ মৃদু গন্ধ ঝরে।

রুদ্ধশ্বাস শুভ্র সুপ্তি নেমেছে কি সর্ব্ব অঙ্গে তার,
অথবা এ গাঢ় মূর্চ্ছা আমারি আত্মার?
রৌপ্য-শুভ্র রূপ তার কাক-জ্যোৎস্না যার কাছে মানে পরাভব,
তাহারে ঢাকিতে পারে সুষুপ্তির কোথা এত তিমির-বৈভব?

অচপল অপলক,
দীর্ঘ নীল রাত্রি ভরি' জেগে রয় রূপ-জ্যোৎস্নালোক,
সাথে সাথে জেগে রয় আমার অতন্দ্র আঁখি-তারা
আজিকার রজনীর দিবা-শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে হারা।

ব্রজকান্ত ঘোষ

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

জয়দেব বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী কবি। জয়দেবের অপূর্ব্ব সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ শ্রীগীতগোবিন্দ কেবলমাত্র বৈষ্ণবদিগের নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ। কিন্তু এই কাব্যটি সর্ব্বজন-সমাদৃত ও সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহার রচয়িতার অন্য কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে নানা প্রকার অলৌকিক আখ্যায়িকাদ্বারা মহাপুরুষ এবং কবিদিগের জীবনের সত্য অংশটুকু একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। সুতরাং একমাত্র তাঁহাদিগের স্বরচিত কাব্য ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের সত্য পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। যে ভাবরসে কবির প্রাণ কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে, সেই রসের আবেগ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কবির কাব্যে স্থান লাভ করে। মানুষের অন্তরের কথা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া তাহার কাব্যে প্রকাশ পায়,—সুতরাং কবিকে প্রকৃতরূপে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্যপরিচয়ই যথেষ্ট এবং সত্য।

অলৌকিক আখ্যায়িকা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের আড়ালেও কবি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট, সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা হইতে বুঝিতে পারি, দেশবাসী তাঁহাকে এবং তাঁহার কাব্যকে কতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রকৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। চন্দ্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত 'ভক্তমালা', নাভাজী কৃত হিন্দী 'ভক্তমালা' এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের বাঙ্গালা 'জয়দেব-চরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের কিংবদন্তীমূলক জীবন-কাহিনী বিবৃত হইলেও ঐতিহাসিক মূল্য ইহাদের কিছুই নাই। বৈষ্ণব ভক্তেরা জয়দেবকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সকল বিবরণ হইতে সুন্দররূপে বোঝা যায়, কিন্তু এগুলি ইতিহাস নহে। কবির কাব্য হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রাধাদেবী বা বামাদেবী। পরাশর ছিলেন তাঁহার পরম সুহৃদ যাঁহার কণ্ঠে কবি গীতগোবিন্দের গীতমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গে কবির জন্মস্থানের পরিচয় পাই।—

'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন'—

কেন্দুবিল্ব বা বর্ত্তমান কেন্দুলি আজ পর্য্যন্তও কবির জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরবর্ত্তী। এই গ্রামে অদ্যাপি জয়দেবের মেলার উৎসব প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া এখনও ভক্তমণ্ডলী কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে।

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে কবি তাঁহার পত্নীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।—

'—জয়তি পদ্মাবতী—রমণ জয়দেব কবিভারতী—ভণিতমতিশাতম।'

পদ্মাবতী তাঁহার পত্নীর নাম। ইহা ব্যতীত কাব্যের অপর একস্থলেও পদ্মাবতীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—

'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী—'

এখানে পদ্মাবতী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী এবং চরণ-চারণের সেবা মাত্র অর্থ বুঝাইলেও, প্রবাদ আছে যে ভক্তিপরায়ণা পদ্মাবতী নৃত্যগীতেও সুনিপুণা ছিলেন। জয়দেব যে শুধু তাঁর চরণ-চারুতার প্রয়াসী ছিলেন তাহা নহে, তিনি পদ্মাবতীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের তালও রাখিতেন। সেই কথাই নাকি এই শ্লোকে শ্লেষের ছলে বলিয়াছেন। জয়দেবের পত্নী গ্রহণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক তথ্য না হইলেও ইহা উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতীর পিতা একজন ভক্তি-পরায়ণ দক্ষিণ দেশীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহুকাল অপুত্রক থাকার দরুণ পুত্রলাভার্থে বহু সাধনা করেন। এই সাধনার ফলে তিনি পদ্মাবতী নাম্নী কন্যা লাভ করেন। কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পিতা শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশে জয়দেবের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হন। অজয় নদীতীরে আশৈশব সন্ন্যাসাবলম্বী ব্রাহ্মণ জয়দেব ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে একমাত্র হরির আরাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী জয়দেব ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীহরির আদেশ শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

জয়দেব বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ এবং তাঁহার পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে তিনি উমা-পতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও ধোয়ী কবির উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এটুকু বলা যাইতে পারে যে তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন। জয়দেব বাঙ্গালীকে কেবলমাত্র একখানি কাব্য-গ্রন্থ দান করেন নাই—সেই সঙ্গে তিনি বাঙ্গালা দেশে মাধুর্য্যময় ভগবদ্ভক্তির ধারাও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালী আজ গৌরবান্বিত।

গীতগোবিন্দের গেয় পদাবলীগুলি মাত্রাবৃত্ত-ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু সেগুলি এরূপ প্রাঞ্জল যে, তাহা ভাবানুযায়ী গীত হইলে অর্থ প্রতীতির বিলম্ব হয় না। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও, ইহাদের ধরণ ও রচনা-পদ্ধতি সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে। বরং প্রাকৃত অপভ্রংশ কবিতার মত অন্তে মিল বা rhyme আছে। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে, এই পদাবলীগুলি বোধহয় প্রথমে কোনও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, পরে অক্ষরানুযায়ী সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল। যথা, পাদাকুলক ছন্দে রচিত ষোড়শমাত্রাযুক্ত এই পদটি—'স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্।' অতি সহজেই ছন্দ বজায় রাখিয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত করা যায়—'সুমরই মন-মম কিঅ পরিহাসং।' এইরূপ অন্যান্য পদগুলি অতি অল্প চেষ্টায় সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করিতে পারা যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জয়দেব তাঁহার পদাবলীগুলি সাধারণ বাঙ্গালী শ্রোতার জন্য লিখিয়াছেন এবং সেইজন্য অনেক সময় তাঁহার ষোড়শ মাত্রার পাদাকুলককে দেশী চতুর্দ্দশ মাত্রা (বা অক্ষর) যুক্ত (৪+৪+৪+২) পয়ারে বিভক্ত করিতে সহজেই পারা যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার History & Development of Bengali Literature নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে জয়দেবের অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত দুইটি পদ শিখদের গ্রন্থসাহেবে পাওয়া যায়। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় প্রথম রচিত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির প্রয়োগ সংস্কৃতের অনুযায়ী—প্রাকৃতের নহে। আমাদের মনে হয় যে, গীতগোবিন্দ যে সময় রচিত হইয়াছে সে সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির কাল, এবং অপভ্রংশ ও বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার উত্থানের সময়। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কিরূপে তৎসাময়িক নবোদিত আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কারণ, ঠিক এই সময় অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপভ্রংশ ও আধুনিক

ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মিথিলার কবি উমাপতি শর্ম্মন্ তাঁহার 'পারিজাত হরণ' নামক সংস্কৃত নাটকে মৈথিলী গানের সমাবেশ করিয়াছেন, এবং মৈথিলী সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের উপর সুস্পষ্ট। সমসাময়িক গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত 'গোপাল-কেলি-চন্দ্রিকা' নাটকেও এইরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে সংস্কৃত কবিতার অন্ত্য যমক ছিল। কিন্তু প্রকৃত মিল বা rhyme ছিল না। অপভ্রংশ কবিতায় প্রায় প্রথম হইতেই পাদান্তে মিল বা rhyme দেখা যায়। তাহাতে মনে হয় যে, এই অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাবে, এই সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যেও rhyme-এর আমদানী হইয়াছিল। আরও মনে হয়, এই সকল সংস্কৃত রচনার উপর দেশীয় প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার প্রভাবও বেশ স্পষ্ট। ইহাদের সঙ্গীত-বাহুল্য ও ভাবপ্রবণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নাট্যকলার অভাব, এগুলিকে পুরাতন যাত্রার প্রকৃতির সহিত বেশ মিলাইয়া দেয়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় দেখাইয়াছেন যে সংস্কৃত 'মহানাটক' এই যাত্রার অনুকরণে বা প্রভাবে গ্রথিত। সাধারণ শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য সহজ ভাষায় প্রাকৃত যাত্রার মত 'সংস্কৃত যাত্রা'ও রচিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ তিনি তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে দিয়াছেন। এই সব কারণে মনে হয় যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত এবং পরে ভাষান্তরিত হয় নাই ; বরং প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এখনে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সঙ্গীত-বাহুল্য ও ভাবপ্রবণতায় পুরাতন দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত গীত-গোবিন্দের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা ঠিক কৃষ্ণযাত্রার অনুযায়ী গ্রন্থ নহে। নাটকের আকারে গ্রথিত হইলেও, ইহার নাট্যবস্তু অল্প। যাত্রার জন্য সাহিত্যসৃষ্টি ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, সাময়িক প্রেরণায় রচিত গানে ও অভিনয়ে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু গীতগোবিন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে জনসাধারণের উপভোগ্য হইলেও নিপুণ শিল্পীর ইচ্ছাকৃত রচনা। নাটকের বাহ্য আবরণ থাকিলেও, ইহা গীতপ্রাণ ও গীত-সর্ব্বস্ব ; ইহার মূল প্রেরণা lyrical, dramatic নহে।

বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীগীতগোবিন্দ শুধু একখানি কাব্যগ্রন্থ নয়, ভক্তিরসশাস্ত্র-

বর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ। কারণ ইহার নায়ক এবং নায়িকা স্বয়ং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়তমা রসিকেশ্বরী রাধা। গীত-গোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তথায় তিনি অংশাবতার নহেন—স্বয়ং ভগবান্—পরবর্ত্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। জয়দেব গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

'দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।'

অর্থাৎ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দশাবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাকে নমস্কার করি। কিন্তু যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পরবর্ত্তী শ্রীচৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সময়ে মধুর ভাব বা মধুর রসের আকার ধারণ করিয়াছিল—সেই মধুর রসের আকর শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদি শ্লোকগুলিতে ঐশ্বর্য্যের দেবতারূপে অর্চ্চিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ভক্তগণের চক্ষে তিনি মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদিগের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস সমস্তই মধুরতায় পূর্ণ। কিন্তু গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে সেই মাধুর্য্যের অবতার ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'শ্রীতকমলাকুচমণ্ডল' শীর্ষক দ্বিতীয় স্তোত্রটিও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক। ইহার মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীই কীর্ত্তিত হইয়াছেন—রাধার নাম নাই। লক্ষ্মীপতির ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাই এই সঙ্গীতের রসপুষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দের আদিতে তিনি ঐশ্বর্য্যের দেবতা হইলেও ক্রমশঃই পরে তিনি মধুর রসের দেবতারূপে বর্ণিত হইয়া সেই রসের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন।

এই বিষয়ে বনমালী দাসের 'জয়দেব-চরিতে' সুন্দর একটি গল্প আছে। কবি জয়দেব প্রত্যহ শ্রীরাধা-মাধবের পূজার জন্য ফুল তুলিয়া দেবসেবা করেন—পরে ভোগ সমাপন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন—এবং গীতগোবিন্দ লিখিতে বসেন। এই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। একদিন তিনি এইরূপে গীতগোবিন্দের একটি শ্লোক 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং'—এই অবধি লিখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কবি সঙ্কোচ বোধ করিয়া ভাবিলেন—

কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে।'

শ্রীরাধার পায়ে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে মস্তক স্পর্শ করাইবেন। মহা সমস্যার সমাধান আর হইল না—তিনি পুঁথিতে ডোর দিয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন—শ্লোক অসমাপ্ত

পড়িয়া রহিল। ভক্তবৎসল শ্রীহরি জয়দেবের বেশে আসিয়া কবির অর্দ্ধসমাপ্ত পদের অপরার্দ্ধ পূরণ করিয়া লিখিলেন—'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।' পরে পদ্মাবতীর বিশ্বাসের নিমিত্ত জয়দেবের নির্দ্দিষ্ট নিত্য-অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি একে একে সম্পন্ন করিয়া আহারান্তে শয্যা গ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী কিছুক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিয়া রন্ধনশালায় আসিয়া প্রসাদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন। স্ত্রীকে তাঁহার আহারের পূর্ব্বেই আহার করিতে দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন—

"একচিত্তে গ্রন্থপাত খুলিয়া ঠাকুর।
অর্দ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পুর।
পাদপূর্ণ দেখি মনে হইলা প্রত্যয়
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আশয়।"

তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না—তিনি শয্যাগৃহে ছুটিয়া চলিলেন—তথায়

"শয়নের চিহ্নসব দেখিল শয্যাতে—
শয্যামাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে।"

কবি তখন পুণ্যবতী পত্নীর ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া ভক্তিসহকারে আহারে বসিলেন। এই গল্পটি ভক্তেরা বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হউক বা না হউক, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জয়দেবের আদি ধারণা ও তাঁহার পরিবর্ত্তন বেশ স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বাঙ্গলা বৈষ্ণবধর্ম্মের রসশাস্ত্র জয়দেবের অনেক পরবর্ত্তী। এই শাস্ত্রের আদর্শে তাঁহার গ্রন্থ রচিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। পরবর্ত্তী চৈতন্যানুযায়ী বৈষ্ণবগণ যে রসে যেটি খাটে, জয়দেবের পদাবলী-গুলির সেইরূপ ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু রূপ গোস্বামীর মত, জয়দেব রসশাস্ত্রের উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই। তাঁহার মধ্যে আধুনিক বৈষ্ণবভাব একেবারেই ছিল কিনা সন্দেহ। অনেকগুলি গল্প রচনা করিয়া বিদ্যা-পতির মত তাঁহাকেও পরম বৈষ্ণব করিয়া তোলা হইয়াছে। জয়দেব সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্য্যের আকর, এবং আদিরসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। তাই তিনি

রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। এখানে রাধাকৃষ্ণ তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একথা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সভাসদ, কবি ও গীতবিশারদ জয়দেবও রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কাব্য রচনা করিলেও গোস্বামী-মতের গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। আদিরসের গানে ধর্ম্মের ভাব বা ধর্ম্মের আবরণ দেওয়া সে সময়কার প্রচলিত প্রথা ছিল। সুতরাং জয়দেব সর্ব্বত্র হরিগুণ গানের কথা বলিলেও, তাহাতে বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। হয়তো তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন, কিন্তু একমাত্র রসশাস্ত্রের মাপকাঠিতে তাঁহার গীতকবিতাগুলি মাপিলে চলিবে না। জয়দেবের ভাবমূলক পদাবলী চৈতন্য-দেবের প্রিয় ছিল বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে যে জয়দেবকে বিদ্যাপতির মত ভক্তিরসশাস্ত্রের কবি করিয়া সাজাইয়া তোলা হইয়াছে।

জয়দেব যে বৈষ্ণব ছিলেন না একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাঁহার কল্পনা ও প্রকৃতি ছিল কবিধর্ম্মী। আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পর চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত আধুনিক বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রচার এত পরে হইয়াছিল যে তাঁহার কবিতাকে সেই ছাঁচে ঢালিয়া বুঝিলে ভুল হইবে। চৈতন্য-দেবের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম কি আকারে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ছিল তাহা বুঝিতে হইলে জয়দেবের সংস্কৃত 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডিদাসের বাঙ্গালা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' আমা-দের প্রকৃষ্টতম অবলম্বন। উভয় গ্রন্থের মূল ভাব ও প্রকৃতি একরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট।

কিন্তু অতি প্রাচীনকালে গুপ্তবংশীয় রাজাদের আমল হইতেই বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহারা ভগবান বাসুদেব বা চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পর্ব্বতে উৎকীর্ণ সমসাময়িক চন্দ্রবর্ম্মার লিপি হইতে জানা যায় যে এই পরাক্রান্ত নৃপতি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু ভোজবর্ম্মার বেলাবলিপিতে 'মহাভারত সূত্রধার' গোপী-শত-কেলিকার শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'অংশ-কৃতাবতার'—স্বয়ং ভগবান নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বোধ হয় তখনও বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয় নাই। বাঙ্গালার সেন রাজাগণ যে

রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, তাহা তাঁহাদের আশ্রিত আর্য্যা শপ্তশতীর কবি গোবর্ধনাচার্য্য, গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব ও সদুক্তিকর্ণামৃতের সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীধরের রচনাবলী হইতে অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের বর্ণিত বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ প্রাচীনতর বৈষ্ণব পুরাণে পাওয়া যায় না। ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত কোন ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে মনে হয় যে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাধা-প্রসঙ্গ বর্জ্জিত কৃষ্ণগোপীলীলা জয়দেবের উপজীব্য নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সরস ও রাগবহুল রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই তাঁহার কবিকল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এখানেও ভগবদুপাসনার ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের দুইটি ভাব সমান ভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উত্তর খণ্ড রাধা-কৃষ্ণের মধুর-রস-উপাসক নিম্বার্ক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ শৃঙ্গার-রাগমূলক উপাসনা দেখা যায় না। নিম্বার্কের সময় ঠিক জানা যায় না; তবে নিম্বার্ক যদি জয়দেবের সমসাময়িক হয়, তাহা হইলে তাঁহার সময় বাঙ্গালাদেশে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রভাব স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে বোধহয়, বৈষ্ণবভক্তির এই নূতন ধারা সেই সময় হইতে জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বিশেষ প্রভাবে পরবর্ত্তী সাহিত্যে ও ধর্ম্মে দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

ভক্তিশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল কাব্য হিসাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য। জয়দেবের স্বগৃহীত 'কবিরাজরাজ' আখ্যা নিতান্ত নিরর্থক নহে। শৃঙ্গাররসের আধিক্য সত্ত্বেও, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকৃত নায়ক নায়িকার ভাব ও ভাষায় মধুর করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। রূপক হিসাবে, রসশাস্ত্রের আলোকে বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কাব্যটিকে না বুঝিলেও, ইহার অন্তর্গত মধুর প্রেম ভাবটি মানবোচিত বাসনার অকৃত্রিম গাঢ়তায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। উজ্জ্বল ও গীতময় শব্দচিত্র-পরম্পরায় যে বিলাস-লীলা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের উপযুক্ত ও অধিগম্য। বৃন্দাবন লীলার মাধুর্য্য-পিপাসু কবি-হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সুপরিচিত মানব লীলার ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মানব হৃদয়ের একটি নিগূঢ়, মধুর প্রবৃত্তিকে রূপান্তরিত করিয়া ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়গত ও অতিন্দ্রিয় ভাবের মিশ্রণে কাব্যের মূল ধারণাটি অতি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে। এখানে

ভক্তির সঙ্গে প্রীতি, মানবীর সঙ্গে দেবী, কল্পনার সঙ্গে স্মৃতি, একাকারে মিশিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব করিতার এই মূলগত ভাবটি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

'প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই—
তাই দেই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !'

বৃন্দাবন গাথার মান অভিমান, পূর্ব্বরাগ অভিসার, বিরহ মলিন দীনমর্ত্ত্যবাসীর প্রতিদিনের প্রাণের ক্ষুধায় রঞ্জিত হইয়া বৈকুণ্ঠের দেবতার জন্য উৎসৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা শুধু বৈষ্ণবের আদরের সামগ্রী নহে, সাধারণ পাঠকেরও উপভোগ্য।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কাব্যহিসাবে গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে নহে, ইহার উৎকর্ষ ইহার রূপে ও ভাঙ্গিমায়। সংস্কৃত কাব্যে প্রেমলীলার বর্ণনা নূতন নহে ; গীতগোবিন্দে এমন কোন ভাব বা অবস্থা বর্ণিত হয় নাই যাহা পূর্ব্বগামী কবিগণ তাঁহাদের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করেন নাই। কিন্তু এই সমস্ত পুরাতন কথা নূতন ভাবে নূতন করিয়া বলা, তাহাকে নূতন কাব্যে নূতন রূপ দেওয়াই, আমাদের কবির সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব। পুরাতন কাব্যসমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃতরস জয়দেব তাঁহার কাব্যে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আপন হৃদয়ের কামনারসে সঞ্চিত, পদলালিত্যে ও গীতমাধুর্য্যে স্বচ্ছন্দ, কবি-মানসের অনুভূতির ধারায় নূতন করিয়া অভিষিক্ত। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়, সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদ তিনি সত্যই সুরভিত ও মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। কবি শুধু একটি মনোরম নিত্য বৃন্দাবন সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি নিজ অনুভূতি ও প্রীতির রঙ্গে তাহা রঙ্গীন ও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রাধা শুধু ভক্তকবির কল্পলোকের কল্পনারূপিণী নহেন, তিনি তাঁহার সমস্ত বাস্তব অনুভূতির অন্তর-লক্ষ্মী। পরোক্ষভাবে কবি নিজ বাস্তব সুখ দুঃখ তাঁহার ইষ্টদেবতায় আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গীতকবিতার রসরূপটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, সুকুমার কবিহৃদয়ের সত্যে সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। ইংরাজী পরিভাষা গ্রহণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যদি গীতপ্রাণতা ও আত্মগত ভাবনাই lyric-এর আদি লক্ষণ হয় তবে জয়দেবের পদাবলীগুলি প্রকৃত lyricএর লক্ষণযুক্ত এবং ইংরাজীতে pictorial art বা চিত্রাঙ্কন শক্তি যাহাকে বলে, তাহা তাঁহার শব্দময় আলেখ্য লিখনে যথেষ্ট সহায়তা

করিয়াছে। যাহা কিছু বিচিত্র মধুর ও ঐশ্বর্য্যময়, যাহা রূপে, রসে, স্পর্শে, গন্ধে প্রাণ মন মাতাইয়া দেয়, তাহাকে তিনি কবিহৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির সহিত মিশাইয়া কাব্যের সম্পৃক্ত বাগার্থপরম্পরায় সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুখের যাহা কিছু সুধারস, দুঃখের যাহা কিছু প্রাণস্পর্শী আভাস, তাহা তাঁহার ভক্তির ও কল্পনার সূত্রে গ্রথিত শব্দমন্ত্রে, ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যে ও গীতঝঙ্কারে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

কবি কীট্‌স্ বলিয়াছেন—poetry must surprise by its fine excess। গীতগোবিন্দে এ কথাটি খুব খাটে। ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্য্য তো আছেই, কিন্তু fine এই কথাটির দ্বারা শিল্পীর যে সংযম ও নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাও গীতগোবিন্দের লিপিকুশলতায় বর্ত্তমান। শব্দ-সৌন্দর্য্যে ও শব্দ-ঝঙ্কারে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী—তাহার সুদক্ষ প্রয়োগে কবি-শিল্পী জয়দেবের তুলনা সাহিত্য-জগতে বিরল। সেই জন্য তাঁহার কবিতা ভাষান্তরিত করা দুরূহ—কারণ তাঁহার সুনির্ব্বাচিত শব্দগুলির অন্য প্রতিশব্দ পাওয়া সুকঠিন। শব্দমান্ত্রে তিনি যেমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, গীত-ছন্দেও তেমনি তাঁহার অসামান্য অধিকার। কিন্তু এরূপ নিখুঁত কারিগরি থাকিলেও তাঁহার কবিতা এত প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ যে তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের মধ্যে কোথাও কৃত্রিম চেষ্টা বা চাতুরীর আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয় না। এ শিল্পনৈপুণ্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গ-মাত্র। তাহা শুধু তাঁহার ধ্যানধারণার অশরীরী বাণীকে রূপে ও রসে মূর্ত্তিমান করিয়াছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের সুষমায় অভিষিক্ত করিবার যে প্রেরণা তাঁহার কবিতার মূলে ছিল, তাহার উৎস ছিল তাঁহার কবি-হৃদয়ের আন্তরিক সৌন্দর্য্য, কল্পনা ও সুখদুঃখের বাস্তব অনুভূতি ; তাহাকেই তিনি তাঁহার অসামান্য শিল্প-কৌশলের দ্বারা বিচিত্র চিত্রে ও গানে অপরূপ করিয়া রূপরসের সীমানার বিশিষ্ট আকার দিতে পারিয়াছিলেন। এই হিসাবে তিনি ভারতীয় কাব্যে একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতগোবিন্দের প্রায় বারো-তেরোটি অনুকরণের পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু পূর্ব্ব-বর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সাহিত্যে ইহার অনুরূপ একটি কাব্যও সৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকপরিচয়

The Book of Margery Kempe (1436)—A modern version—by W. Butler-Bowdon (Jonathan Cape)

আলোচ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য চসারের রচনার সমতুল্য বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না, কিন্তু উভয় ব্যক্তি প্রায় সমসাময়িক হলেও প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রভেদ এতই প্রকট যে তুলনা চলে না। চসার ছিলেন কবি। তৎকালীন অশিক্ষিত সমাজের দুর্ব্বলতার প্রতি ঔদার্য্য ও কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ছন্দের সঙ্গে যোজনা করেছিলেন অভিজ্ঞতা। কোন কিছুর জবাবদিহি দেবার তাগিদ না থাকায় বক্তব্য হয়েছিল নির্ভার ও সুশ্রাব্য। মারজেরির ছিল প্রতিপদে বাধা। তিনি নিজে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা এবং ভদ্রঘরের বধূ হয়েও ছিলেন নিরক্ষর, পরমুখাপেক্ষী; এবং তাঁর আত্ম-উদ্‌ঘাটনের মূল উদ্দেশ্য ইষ্টদেবতার মহিমা-কীর্ত্তন হওয়ায়, পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্য হয়েছিল উপেক্ষিত। আজকালকার পাঠকের কাছে প্রবল ভক্তিবন্যার মত ভারবহ অশ্রাব্য ব্যাপার খুব কমই আছে। তথাপি পাণ্ডুলিপিখানির আবিষ্কার সুধীসমাজে এতখানি চাঞ্চল্য এনেছে তার প্রথম কারণ, ইংরাজী ভাষায় প্রণীত আত্মচরিত-সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি এইখানা; দ্বিতীয়তঃ বিরাট ক্যাথলিক গীর্জ্জা-শক্তির ভাঙন-কালের এতখানি ইঙ্গিতপূর্ণ সমাজ-চিত্র আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

আড়াইশত পৃষ্ঠার হস্তলিপি কিছুকাল পূর্ব্বে মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষজ্ঞদের প্রণিধানকল্পে, কিন্তু সে সাবেকি কালের অক্ষরবিন্যাস সাধারণ পাঠকের অবোধ্য হওয়ায় সংশোধিত সংস্করণ মুদ্রিত হলো। সম্পাদক বলেছেন গ্রন্থটির মূল বচন যথাসম্ভব অপরিবর্ত্তিত রেখেছেন—এমন কি প্রকৃত অর্থবোধ যেখানে অনিবার্য্য সেখানেও সাবেকি শব্দ রেখে দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

বস্তুতঃ আধুনিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে গেলে সে আবহাওয়া বজায় রাখা সম্ভব হতো না। ঘটনার সঞ্চরণ সাবলীল করবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও দীর্ঘায়িত ধর্ম্মালোচনা-গুলিকে একত্রিত ক'রে শেষ ভাগে সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছে।

মারজেরির বর্ণনাক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হলেও ঘটনাসঙ্কুল ও জনাকীর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে দৈববাণী এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ, পতন ও মূর্চ্ছা বরদাস্ত ক'রে এগিয়ে যেতে পারলে দেখা যায় বহু বিচিত্র ও কৌতুকপূর্ণ ঘটনা অপেক্ষা করে আছে।

আখ্যায়িকাটি আগাগোড়া আত্মজীবনচরিত হ'লেও অনুলেখকের অভিজ্ঞতার প্রলেপ প'ড়েছে স্থানে স্থানে, তবে নায়িকা নিজেকে সর্ব্বত্র নগণ্য জীব আখ্যায় প্রথম পুরুষে অভিহিত করাতে অর্থবোধে বৈষম্য উপস্থিত হয় নি।

সে সময় অনাধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির ভারে খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সঙ্গে নীতি-শৈথিল্য প্রবেশ করেছে প্রকটভাবে। জনসাধারণের নিকট আদর্শ চরিত্র প্রত্যাশা করা বৃথা।

অন্ততঃ মারজেরি তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ অনাবিল ছিলনা ব'লে আক্ষেপ ক'রেছেন। পাপ-ক্ষালন উদ্দেশ্যে রুটি জল খেয়ে উপবাস করতেন, তবু পুরোহিতের কাছে স্বীকার ক'রে ওঠবার সাহস জোগাত না তাঁর। সন্তান প্রসবের পর হঠাৎ প্রবল পীড়ায় আক্রান্ত হ'তে খেয়াল হলো তাই ত'—ডাক পড়তে পুরোহিত প্রবর এলেন, কিন্তু রোগিণী কথাগুলি মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে না নিতেই তিনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। অভিমানিনী চুপ করে গেলেন। তখনকার দিনে নরকের ভীতি কল্পনার বিলাসে পর্য্যবসিত হয়নি, একেবারে বাস্তব ব্যাপার ছিল। বেচারির মাথা গেল বিগড়ে। আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিরা আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেলে রেখে দিলেন দেহলতাটিকে, নিজের হাত কামড়ে ধ'রেছিলেন, সে দংষ্ট্রাঘাত শেষ বয়স পর্য্যন্ত মনে করিয়ে দিত সেই ক্লেশের কথা।

কিন্তু কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। নিদারুণ মনস্তাপ শীতল করে খ্রীষ্ট আবির্ভূত হলেন একদিন। অচিরাৎ নিরাময় হয়ে উঠল দেহ, ফিরে এল লাবণ্য।

ভদ্রমহিলা দেখতে দেখতে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরা-প্রস্তুতকারী হয়ে উঠে প্রভূত অর্থ ও অখ্যাতি উপার্জ্জন ক'রলেন। কয়েকটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প্রথমটি গেল, দ্বিতীয়টি রইল। স্বামীর কাছে ঘটা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে না করতে অর্থলোভ পুনর্ব্বার চিত্তজয় ক'রে অশ্বচালিত পেষণ-যন্ত্রের কারবারে আকৃষ্ট ক'রল। সে চেষ্টাও অচিরে অচল হলো যখন সবল পশু অকারণে কর্ম্ম-বিমুখ হয়ে পড়ল। প্রতিবেশীরা বল্লে, "মূর্ত্তিমতী পাপ—পশু পর্য্যন্ত বিমুখ।"

অতঃপর নারী দুঃখের সাগরে যখন নিমজ্জিতপ্রায় এমন দিনে কর্ণকুহরে প্রবেশ করল অলৌকিক সঙ্গীত-ধ্বনি। মন স্বর্গীয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঙ্কুচিত হলো স্বামী-সহবাস হতে। বেচারি স্বামী—যুক্তির নির্ম্মম আঘাতে ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্রতা অঙ্গীকার করে নিলেন—একবার মাত্র আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লেন, "ভগবান আমাকে নিশ্চয় সে কথা বলবেন, ততদিন—"

সতীর কৃচ্ছ্র সাধনার বহর দেখে প্রতিবেশীরা বল্লে—"সব ভণ্ডামী"।

কঠোর সংযম-চেষ্টার দ্বিতীয় বছরে জনৈক প্রিয়পাত্র এসে যাচ্ঞা করে বসল অবৈধ সঙ্গম। ব্রতচারিণী প্রত্যাখান করলেন, কিন্তু রাত্রে নিদ্রা এল না —স্বামীর স্পর্শ চেষ্টা পর্য্যন্ত বিষদুষ্ট বোধ হলো। পরদিন ভগবদ্ চিন্তায় একাগ্রতা এল না। পদযুগল টেনে নিয়ে গেল প্রেমাস্পদের সন্নিকটে। নির্ব্বোধ ব্যক্তিটি সে প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করল না, এবং আর একটি তাপদগ্ধ দিনক্ষয়ের পর মুখ ফুটে নিজকে সমর্পণ ক'রতে হলো। লগ্ন তখন ভ্রষ্ট—লোকটি জোর গলায় জানিয়ে দিলে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে এ কদর্য্য কার্য্যে প্রলুব্ধ করতে পারে না— কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেল্লেও রাজী হবে না সে।

নিদারুণ অবমাননায় ক্লিষ্ট নারীকে তখন খ্রীষ্ট এসে ব'ল্লেন—"প্রতি শুক্রবার মদ্য মাংস আহার পরিত্যাগ ক'রে ধ্যানে নিমগ্ন হও; আমি তোমার স্বামীর লালসা সংহার করব"। বেচারি স্বামী!

ঈশ্বরের কৃপার খবর লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল, যখন গীর্জ্জার ছাদ হ'তে একখণ্ড প্রস্তর ও একটি ছোট কড়িকাঠ খ'সে পিঠের ওপর প'ড়ে ধ্যানমগ্ন নারীর ইহলীলা সাঙ্গ ক'রে দিতে পারল না। দেহে কোনও ক্ষতচিহ্নও দেখতে পাওয়া গেল না। ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীরা তবু বল্লে, "এ হচ্ছে ভগবানের মার।"

এর পর মারজেরি তীর্থ-ভ্রমণ উদ্দেশ্যে দেশত্যাগের জন্য আদিষ্ট হলেন। স্বামীটি বলিষ্ঠতর প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রে অনুগামী হলেন পদব্রজে।

সংবাদপত্র, রেল, টেলিগ্রাফের বহু পূর্ব্বের ঘটনা হলেও লোকপরম্পরায় খ্যাতি অগ্রগামী হয়ে গেল দম্পতিদ্বয়ের—বহুস্থানে সাদরে সমাদৃত হলেন; এবং তৎজনিত সুখাবহ আত্মগর্ব্বকে চিত্ত হতে দূর করবার চেষ্টা করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন মহিলা;—হাতে বিয়ারের বোতল—এমন সময় গ্রীষ্মের মাদকতায় স্বামীর মৌন ভঙ্গ হলো:—

"আচ্ছা মারজেরি—এই ধর আমার মাথার ওপর তলোয়ার উচিয়ে কেউ যদি বলে, স্ত্রী সহবাস করো না, হ'লে দেব মাথা উড়িয়ে—তুমি কী পরামর্শ দেবে ?"—

"ওসব পাপ কথা মুখে এন না—এই মাস দুই ত দিব্যি পবিত্র রয়েছি"।

"আমি শুধু তোমার মনের কথা জানতে চাই"।

স্ত্রী প্রগাঢ় দুঃখের সঙ্গে বল্লেন—"তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল"।

কাহিনী এমনি ভাবে গিয়ে জন-আলোড়নের আবর্ত্তে পড়ল। তীর্থস্থানগুলি কলহপ্রবণ অশ্লীলভাষী সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ। পথে ইতর লোকেরা 'লোলার্ড'-শিকারের জন্য ব্যগ্র—জীবন্ত মানুষ পোড়াবার মোহ কম কথা নয়। মারজেরি কয়েকবার শাসিত হলেন, কিন্তু তাঁর সাহস ও স্পর্দ্ধা ছিল অপরিসীম। কোনও মঠের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ব্যভিচার পরিত্যাগ করবার পরামর্শ দিলেন। কোনও বিশপের সভাসদ্‌দের পাণ্ডিত্যের ছটায় বিস্মিত ক'রে দিলেন। কোনও বিশপের কাছে দীক্ষা গ্রহণের জন্যে আবদার ধরে বসলেন। ক্যাণ্টরবেরীর আর্চবিশপের পার্শ্বচরদের মুখে পাপপূর্ণ বাক্য শুনে তীব্রভাবে তিরস্কার করে বসলেন—স্বয়ং কর্ত্তাকেও গৃহসংস্কার করবার পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। এদিকে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী হাতেনাতে ফলে যেতে অনেকে চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

কিন্তু কাল হলো বুকফাটা চীৎকার ও মূর্চ্ছা—কথা উঠল ভক্তির এতখানি উৎকট উচ্ছ্বাস যখন স্বর্গীয় সেণ্টমহলেও বিরল তখন এ নিশ্চয় শয়তানের কারসাজী।

তার ওপর আর একটি সন্তান প্রসব হওয়াতে খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে স্বপ্নাদেশ দিলেন, "এবার থাম, আর নয়—তার চেয়ে আমার জন্মভূমি আর লীলাক্ষেত্রগুলি দেখে এস।

ক্রমশঃ স্বামীর সঙ্গ নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠল। অর্থ জুটে যেতে লাগল আকস্মিক ভাবে—যাত্রা আরম্ভ হ'লো সমুদ্রপথে।

নৌকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিকট ভাবাবেশ সঙ্গীদের শান্তিভঙ্গ করাতে অনেকে রসনা-চালনা সুরু করে দিল তীব্রভাবে। পরিচারিকা পর্য্যন্ত সঙ্গ ছাড়ল লজ্জিত হয়ে এবং কন্স্‌টান্সে পদার্পণ করবার পর সকলে মিলে অঙ্গে চাপিয়ে দিল চটের গাউন। আহারের সময় টেবিল হ'তে নামিয়ে দিল নিম্নস্থানে।

কিন্তু ভক্তিরসে পরিপ্লুত নাগরিকেরা বস্ত্রের দীনতাতে আকৃষ্ট হ'লো বেশী করে। সেখান হ'তে বোলোনা—বোলোনা হ'তে ভেনিস্ হয়ে জেরুসালেমে উপস্থিত হবার সময় ক্রন্দনের বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল—মূর্চ্ছিত হয়ে পথে পড়তে দুষ্টলোকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করল; বল্লে 'কুকুর', 'শয়তান'। সহযাত্রীরা তাঁকে পথপ্রান্তে ফেলে সরে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বেথলেহেম, জর্ডন, পাহাড় পর্ব্বতের যেখানেই তারা যায়, দেখে রাক্ষুসী পা টেনে টেনে আসছে।

মারজেরির ভাষায় স্বজাতির নৃশংসতার বর্ণনার মাঝে মাঝে অপরিচিত সারাসেনের দয়ার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বীকারোক্তি শরৎকালের হাল্কা বৃষ্টির মত তৃপ্তি দেয়।

রোমেতে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ জনৈক যাজকের সঙ্গে অশিক্ষিতা মহিলাটির সৌহার্দ্দ্য গড়ে উঠল নিছক প্রার্থনার জোরে। অবোধ্য ভাষার অন্তঃস্থ ভাবটুকু পরস্পরের হৃদয়ঙ্গম হ'তে লাগল। এই অলৌকিক ব্যাপারটি পরখ করে দেখবার জন্যে এলেন বহু পণ্ডিত ও পুরোহিত।

নিঃস্বের সেবা ইত্যাদি কয়েকটি ব্রত উদ্‌যাপন করে তিনি দেশে ফিরলেন।

বিজাতীয়দের তুলনায় স্বজাতির বর্ব্বরতা উৎকটরূপে বিকাশ হ'লো যখন তিনি লিষ্টার নগরীর মেয়রের দ্বারা ধৃত হলেন। অশ্রাব্য গালিগালাজ ক্ষান্ত হ'লে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করবার আজ্ঞা হলো। সেখানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা না থাকায় হৃদয়বান্ কারাধ্যক্ষ দয়া-পরবশ হয়ে নিজের গৃহে স্থান দিলেন, কিন্তু প্রধান রাজকর্ম্মচারী এসে তাঁকে একটি নিভৃত কক্ষে নিক্ষেপ করে সতীত্ব নষ্ট করবার উদ্যোগ করলেন।

বহু কষ্টে ইয়র্কের আর্চবিশেপর কাছে প্রাণভিক্ষা সংগ্রহ হ'লো, কিন্তু বিতাড়িত হলেন সে অঞ্চল হ'তে।

স্বগ্রামে ফিরে আসা কারো মনে আনন্দ সঞ্চার করল না। উপরন্তু বিশ্ব-বিখ্যাত এক বাগ্মী সন্ন্যাসী এসে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল অন্দোলন সৃষ্টি করলেন।

ক্রমে চিত্ত বিকৃত হ'য়ে মৃত্যুকামনা ও কুষ্ঠরোগী চুম্বন করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে উন্মাদবৎ করে তুলল। স্বামীর মৃত্যু হ'লো অপঘাতে।

দুঃখের যখন চরম অবস্থা, পুত্র ফিরল সর্ব্বাঙ্গে উপদংশের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। জননীর পুণ্যের ফলে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে জনৈক জার্ম্মান ললনার পাণিগ্রহণ

ক'রে ঘরজামাই হয়ে রইল বিদেশে। কায়ক্লেশে গড়িয়ে চলেছিল বৃদ্ধার দিন, কিন্তু ঘূর্ণি তখনও ছাড়েনি। পুত্র দেশে প্রত্যাগমন করেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'লো। পুত্রবধূ ও নবজাত পৌত্রকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে তিনি পুনর্ব্বার সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ স্বীকার ক'রে নিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় ভ্রমণবৃত্তান্তটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হ'লেও বিচিত্রতর।

জার্ম্মানীর উপকণ্ঠে ভিখারীদলভুক্ত হ'য়ে চলেছেন পদব্রজে। লোকালয়ের বাইরে এসে সঙ্গীরা বিবস্ত্র হ'য়ে কীটমুক্ত ক'রে ফেলে বেশভূষা হ'তে; বৃদ্ধা লজ্জায় কাতর হ'য়ে কত দিনরাত্রি দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন অথচ অসংখ্য তীর্থযাত্রিণীরা সদলবলে অতিক্রম ক'রে চ'লে যেত।

জীবনের শেষ ভাগটিও শান্তিতে কাটল না। প্রতিপদে লাঞ্ছনা, সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা শরীরকে পিষে ফেললে। তবু তিনি জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করেন নি। শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহ জাগ্রত ছিল পারত্রিক পুরস্কারের আশায়; কিন্তু অনুলেখকের ধৈর্য্যও কম বিস্ময়ের কথা নয়।

কাহিনীর একটি স্থূল ধারা বলে গেলাম। আগাগোড়া চুম্বক দিতে গেলেও আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করবার আবশ্যক হত।

বিদেশ যাত্রার বিবরণগুলি সহযাত্রীদের দুর্ব্যবহারের কথায় পরিপূর্ণ, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। তবু গ্রন্থখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবেও সার জন মাণ্ডেভিলের রচনা হ'তে মৌলিক এবং বিশ্বাসজনক।

মানুষ হিসাবে মারজেরি কেমন ছিলেন, কিম্বা নিজের মনকে কতখানি প্রবঞ্চনা ক'রেছেন, অথবা তাঁর সমসাময়িক প্রতিবেশীরা কেমন ছিল বিচার করতে যাওয়া অন্যায় হবে। ভালয় হোক মন্দে হোক অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা যে আবর্ত্তের সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে পঙ্কিলতার অংশই থাকে বেশী। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ-চেষ্টা না ক'রে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ করলে ঐতিহাসিক মূল্য অবধারণ হবে।

সে সময় লিঙ্কনের বিশপ রেপিংটন এবং ক্যান্টরবেরীর আর্চবিশপ আরুণডেল উভয়েই সাতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। রেপিংটন ছিলেন চতুর্থ হেনরীর আন্তরিক বন্ধু এবং আরুণডেলের বংশমর্য্যাদা ছিল রাজকীয়—দুজনেই মারজেরির তীব্র ভৎর্সনা প্রশান্তভাবে শ্রবণ করেছিলেন; এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত

বাক্যালাপ ক'রে সময়ক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। রেপিংটন মারজেরিকে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করতেও উৎসাহিত ক'রেছিলেন। অথচ নিজেদের অনুচরদের দ্বারা নির্য্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁরাই যখন মারজেরিকে বুঝতে না পেরে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গেছেন তখন আজকালকার পাঠকের কাছে সহানুভূতি আশা করা বৃথা। তবে সেই মসীলিপ্ত যুগের উপকণ্ঠে একটি আলোকখণ্ড রেখে যাবার জন্যে কে না কৃতজ্ঞ হবে ?

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Flowering of New England (1815-1865) —by Van Wyck Brooks (Dent)

এই পুস্তকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমি আমেরিক্যান কাগজে পড়েছি। আমার অবশ্য ভালই লাগল, কিন্তু রচনাভঙ্গীটি ছাড়া। নভেলের রূপে জীবনী লেখার ঢেউ তুলেছিলেন লিটন ষ্ট্রেচী, এমিল লাডভিগ, ও আঁদ্রে মরোয়া। প্রথম প্রথম মন্দ লাগত না, কিন্তু এখন সইতে পারি না। ব্রুক্স্ মুখবন্ধে লিখেছেন যে তাঁর রচনা মোটেই ঐ প্রকারের নয়। কিন্তু অনেক স্থানে এমন নাটকী উচ্ছ্বাস আছে যে বই বন্ধ করতে হয়।

অথচ বইএর বিষয়টি সত্যই মনোজ্ঞ। বোষ্টন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই আমেরিক্যান পরিশীলনের প্রতিষ্ঠাতা, অন্ততঃ সিভিল ওয়ারের আগে পর্য্যন্ত। বোষ্টন ছিল একটি ছোট্ট সহর, তারই সামনে ও পাশে হারভার্ড ও কনকর্ড দুটি গণ্ডগ্রাম। এই তিনে মিলে একটি সৌর-জগৎ সৃষ্টি হল। তারই আলোক পড়ল সারা যুক্তরাজ্যে, সমগ্র পৃথিবীতে, এমন কি এই বাংলা দেশেও। আমার পরিষ্কার মনে আছে যে আমার ছাত্রাবস্থায় গুরুজনের আদেশে আমাকে প্রেস্কট, মোট্লে, ব্যান্‌ক্রফ্‌ট-এর ইতিহাস, এমার্সন, লাওয়েল, থোরোর রচনা, হোম্সের কথোপকথন, এমন কি লংফেলোর কবিতার অনেকাংশই পড়তে হয়। এঁদের অনেক পুস্তকই আমাদের পারিবারিক গ্রন্থগারে ছিল। সুদূর বাংলা দেশেও যখন বোষ্টন ব্রাহ্মণদের

প্রভাব পড়ে তখন স্বীকার করতেই-হবে এঁদের মাহাত্ম্যকে। এখনও অনেক বৃদ্ধের কাছে এমার্সন, হোম্‌স্‌, মোট্‌লের নাম করলে তাঁদের গায়ে কাঁটা ওঠে। সে-যুগটি সত্যই ছিল ও-দেশের নবজীবনের উন্মেষকাল।

কিছুকাল পূর্ব্বে বিখ্যাত দার্শনিক স্যাণ্টায়ানার The Last Puritan নামে নভেল ও য়্যাডাম্‌স পরিবারের একজনের শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ ও চিঠিপত্র পড়ি। সে দুটি বই আমার এই বইএর চেয়ে ভাল লেগেছিল। তখন সন্দেহ হয়েছিল যে পিউরিট্যানিজমের মধ্যেই বুঝি বা নবজীবনের বীজ লুকিয়ে থাকে। অন্ততঃ বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের কাছে বাংলার বর্ত্তমান সংস্কৃতি খুবই ঋণী। এই প্রকার ধর্ম্ম-গোঁড়ামির মধ্যে যে একাগ্রতা, যে ব্যক্তিত্ববোধ, যে দেশপ্রেম ও তারই সাথে দেশাতিরিক্ত মানবিকতা আছে তার সাহায্যে অনুকূল পরিবেশে জাতীয় উৎকর্ষ অনিবার্য্য।

ব্রূক্‌স্‌ সাহেব একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। নিউ-ইংলণ্ডীয় পরিশীলনের স্তর-বিভাগ ক'রে তিনি বলছেন যে তার উন্নতি-অবনতি স্পেঙ্গলারের চক্রানুসারে চলেছে। প্রথমে বোষ্টন ছিল পল্লীসমাজ, পরে পল্লী হয়ে উঠল সহর, জমির সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ ছিন্ন হল, সেইজন্য নোঙ্গর ছিঁড়ে শেষকালে অনেক লেখক, চিত্রকর, স্থপতি য়ুরোপের আঘাটায় ঠেকল। এই প্রকার ভাসমান অবস্থা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অকল্যাণকর। মধ্যযুগে ফ্লোরেন্সের ঐ দুরবস্থা ঘটে। এক এক সময় মনে হয় কথাটা খাঁটি। গ্রাম থেকে সহর, সহর থেকে বিদেশ-বাস—এই পর্য্যায়ে এসে সভ্যতার মেরুদণ্ড ঝুঁকে পড়ে। হথ্‌র্ণের নভেল আর সেদিনকার ইংলণ্ড-প্রবাসী হেনরী জেমসের নভেল পড়লে অন্ততঃ তাই মনে হয়। এটাই এলিয়টের শুচিবাই-এরও একটি কারণ অন্ততঃ। তাই প্রবাসের পর স্বদেশবাস নিতান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি আমি আংশিকভাবে গ্রহণ করি। তার পিছনে অন্য একটি যুক্তি আছে। গ্রাম সহরে পরিণত হয় কেন? বুদ্ধিমানেরা দেশত্যাগী হন কেন? বোষ্টন ব্রাহ্মণরা ছিলেন জাতিতে বৈশ্য—আটলাণ্টিক উপকূলে তাঁদের ছিল বিস্তর কাপড়ের কল। গ্রামের গাছপালা, পশুপক্ষীকে চেনা ও ভালবাসা, কিংবা ওয়ালডেন পুকুরের ধারে কুঁড়ে ঘরে বসবাস এক কথা, আর জমিদারী চালানো অন্য কথা। এই হিসাবে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশের অধিবাসীরা, যাঁরা তুলার চাষ করে বোষ্টন ব্রাহ্মণদের কলের খোরাক যোগাতেন, তাঁরাই ছিলেন জমির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে

সম্পৃক্ত। বোষ্টন ব্রাহ্মণদের বেষ্টনী ছিল কলকারখানার প্রথম যুগ, তারই দৌলতে তাঁদের কৃষ্টি। ১৮৩০ সাল থেকেই এই প্রকার বৈশ্যবৃত্তির বিপক্ষে মনোভাব ফুটে উঠছে। সকলেই প্রায় আক্ষেপ করছেন, দেশ উৎসন্ন গেল টাকা-টাকা করে। যাঁরা এই আবহাওয়া সহ্য করতে পারেন নি তাঁরাই য়ুরোপে পালালেন। সেই থেকে আমেরিক্যান সাহিত্যের য়ুরোপীয়ান যুগ, অর্থাৎ ব্রূক্‌সের মতে অবনতি। কেউ গেলেন রোমে, ফ্লোরেন্সে, কেউ প্যারিসে, লণ্ডনে। এখনও জুলিয়ান গ্রীন ফরাসী ভাষায় নভেল লেখেন, পরে আমেরিক্যান ভাষায় অনুবাদ হয়। গত কয়েক বৎসরে খাঁটি আমেরিক্যান সাহিত্য গড়ে উঠেছে, যার ভূগোল মধ্য ও দক্ষিণাংশ।

আমার বিশ্বাস স্পেঙ্গলারী ব্যাখ্যার চেয়ে হ্বেবার, টনি সাহেবের ব্যাখ্যা এই ক্ষেত্রে বেশী সন্তোষজনক। বোষ্টন ব্রাহ্মণদের র‍্যাশনালিজম ও এথিক্যাল মনোভাব ধনিকতন্ত্রের প্রাথমিক যুগেরই মনোভাব, যার প্রধান কথা, হ্বেবারের ভাষায়—a system of rationalistic ethics। এক প্রকার পরিশীলন আছে, তার আন্তরিক ও ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী, যার সঙ্গে ধনোৎপাদন-পদ্ধতিতে যন্ত্রের আগমন ও প্রচুর মূলধনের ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবেই আবদ্ধ। বোষ্টন, কনকর্ড ও হারভার্ড বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর হয়ে ওঠেনি নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের আবহাওয়ায় ছিল কলের ধোঁয়া। তাই ভদ্রলোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হল। পালালেন য়ুরোপে। এটা nostalgia নয় ঠিক।

ব্রূক্‌স্ এইরূপ ব্যাখ্যার ইঙ্গিতই দিয়েছেন, তার বেশী কিছু বলেন নি। সেই জন্য বইখানি অসম্পূর্ণ। রচনাভঙ্গীর একটি দোষ আমি পূর্ব্বে বলেছি। আরেকটি মাত্র বলব। লেখার গতি আমি পছন্দ করি, কিন্তু এ-যে চিরপ্রস্রবণ! তাও ঘোলোটে জলের।

তবু বলছি সকলের বইখানি পড়া উচিত বিষয়ের জন্য। এ রকম দ্বিতীয় শ্রেণীর বইও বাংলায় লেখা হয় নি। ব্রজেন বাবু লিখুন না? 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় অনেক মালমশলা যোগাড় হয়েছে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Life of George Moore—by Joseph Hone, (Gollancz).

জর্জ মূরের জীবনচরিত লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই—যেমন ইয়েটস্ বা জন্ এগলিন্টন্—যাঁদের সঙ্গে মূরের এককালে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, মূরকে প্রচেতার পর্য্যায়ে ফেলতে পারেন নি। মূরের মত সরল, অর্দ্ধশিক্ষিত, কিশোর মন যে Esther Waters বা Evelyn Innes-এর সৃষ্টি করতে পারবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল তাঁদের পক্ষে। এ হল মূরের জীবনের ডাবলিন্-অধ্যায়ের কথা, যখন তিনি Irish Movementএ যোগদান করেন। কিন্তু এর পরও তাঁকে বহুদিন বাঁচতে হয় কঠোর সাহিত্য-সাধনা করে এবং শেষদিন অবধি সম্পূর্ণ সৃজনক্ষম হয়ে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর নিরবচ্ছিন্ন এই সৃজনক্ষম অবস্থা বহন করা অনেক লেখকের পক্ষেই দুঃসহ হত। কিন্তু মূরের প্রাচ্যসুলভ ঐকান্তিকতা ও কৃচ্ছ্রসাধনে এ সম্ভব হতে পেরেছিল। আরও আশ্চর্য্য হতে হয় এই দেখে, তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখার ক্রমোন্নতি অক্ষুণ্ণ ছিল শেষ পর্য্যন্ত। মনে হয় তিনি যদি আরও দশ বৎসর বাঁচতেন, তাহলে তাঁর শেষ মহৎ কীর্ত্তি Aphrodite in Aulisকে ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। এ অজর 'যযাতি-শিরার' প্রতি শ্রদ্ধাই হয়।

সমস্যা ওঠে মূরের জীবনী লেখা নিয়ে। এককালে এ নিয়ে মূর নিজেই অনেক মাথা ঘামান। স্তাবকবৃন্দের অন্ধস্তুতি তাঁকে খুসি করতে পারে নি কোনো কালে এবং শ্রীমতী মিচেলের ব্যঙ্গচিত্র বা ইয়েটস্-এর ব্যাজস্তুতি পেয়েও তিনি কষ্ট পেতেন নিশ্চয়। মোটামুটি চার্লস্ মরগ্যানের ওপর তাঁর জীবনী লেখার ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ বয়সে জোসেফ হোনের মত বুদ্ধিমান শ্রোতা এবং সুলেখকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। যার ফলে তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনীর সৃষ্টি সম্ভব হল এবং হোনের বহু কঠোর সত্য ও তথ্যভাষণের অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে জর্জ মূরের চরিত্রচিত্র শ্রদ্ধেয় ও সজীব হয়েই রইল। এ বিষয়ে হোনের কৃতিত্ব অবি-সংবাদিত সন্দেহ নেই।

কিন্তু, এ কৃতিত্বে মূরের দানও আছে যথেষ্ট। তাঁর বায়রনী self-dramatisation-এর প্রবৃত্তি তাঁর জীবন ও আর্টের ওতপ্রোত সঙ্গম ঘটিয়েছিল। ফলে তিনি আজীবন যেন 'জর্জ মূর' নাটকের সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত অভিনয় করে গেছেন—সে অভিনয় pose নয়, তাঁর জীবনের ও মনের অন্তরতম রূপ। হোন মূরের

শৈশব কাল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, যত চিঠি, লেখা, কথোপকথন, সে-সমস্তের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা কৌশলী শিল্পীর মত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ফলে জীবনীটা হয়েছে উপন্যাসের মত মনোজ্ঞ, অথচ প্রামাণ্য। এ উপন্যাসের নায়কের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মরূপায়ণের ওপর হোনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমাদেরও আছে। নিজের সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত মত তিনি পোষণ করতেন না, ফলে পেটার সম্বন্ধে তিনি বলতে পেরেছিলেন—"No man can write beyond his own mind and Pater had a finer mind than mine—"। এরকম সহজ সত্যভাষণ নিজের সম্বন্ধে, তাঁর জীবনের দিকে একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত দেয়। তাঁর শক্তি ও সীমা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এবং স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মাচরণ হতে ভ্রষ্ট তিনি হন নি কখনও। এর সমর্থনে তিনি কিশোর যুগের জোলা-র নেতৃত্ব বর্জ্জন করে পেটারের শরণাপন্ন হন। এ গুরুত্যাগের মূলে, তাঁর স্বাধর্ম্ম্যের স্বাজ্ঞ নির্দ্দেশ ছিল। এবং পেটারের মীমাংসা—that sensation is the touchstone of value—তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন, পেটারের জটিল কান্ত-তত্ত্বের অন্যান্য নির্দ্দেশগুলি বাদ দিয়ে। নিজে দুজ্ঞের্য়বাদী না হলেও, এই তাত্মাত্রিক অনুভূতি ও রূপায়ণ তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত সৃষ্টিগুলিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ 'Heloise and Abelard'এ।

মূরের জীবন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির—যা প্রজ্ঞাপ্রসূত নয়—সূত্র অনুসরণ করে তাঁর শৈশবের দিকে তাকাতে হয়। তাকিয়ে দেখা যায় যে তাঁর শিক্ষার মূলসূত্র কোন বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কিন্তু আর একটা জিনিস—যাকে বলা যেতে পারে—' Echo-angery'। এ শুধু ভাষাশিক্ষার নয়, সমগ্র মানুষটির মূলসূত্র এইখানে। বহির্জগতের সব কিছুই প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর ভেতর সহজে, সমগ্র ভাবে। সব কিছুর ভেতর নিজকে অতি সহজেই প্রসারিত করতে পারতেন। কিন্তু সময় বুঝে তিনি আবার সম্বরণ করতেন নিজকে। এ এক অদ্ভুত কূর্ম্মবৃত্তি। হাতের তলায় সাগ্রহে রিটার্ণ টিকিটটা চাপা থাকতো, প্রব্রজ্যার শেষে কখন আবার ফিরবেন তাঁর চিরপরিচিত ছোট্ট গুহায়—যার নাম 'জর্জমূর'।

বইটার পরিশিষ্টে ডেসমণ্ড শ' টেলার, অনবদ্য ভাষায় জর্জ মূরের এই অবস্থাটা প্রকাশ করেছেন। উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারলুম না—He resembled rather an observant—old gentleman who takes a

bus ride into the remotest suburbs and slums of humanity, seeing all and rejecting nothing, but clutching tightly in a benevolent palm his return ticket—।

সাংসারিক জীবনে তিনি ভয়ানক অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক ছিলেন ; কিন্তু এই রিটার্ণ টিকিটটা কখনও হারান নি। এবং এইখানেই তাঁর সৃষ্টিগুলির সাহিতিক মূল্যের সীমা। বাল্‌জাক্‌, টলষ্টয় বা অন্যান্য মহারথীদের পংক্তিতে মূরকে ফেলা যায় না।

আজ আমরা মূরের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যকে অতিক্রম করে বহু দূর চলে এসেছি। সমরোত্তর যুগের মূল্যবিচার ও মূল্য নির্ব্বাচনের আলোড়নের ফলে, মূরের সাহিত্যের স্থান কোথায় বলা শক্ত। মূরের পাঠক-সংখ্যা খুব অল্প। যাঁরা এখনও ল্যাণ্ডর, ষ্টার্ণ বা জেরেমি টেলার পড়ে আনন্দ পান, তাঁরাই বোধ হয় মূরের বই পড়েন। ভবিষ্যতে, দুঃখের বিষয়, মূরের সৃষ্টিকে ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাবে না বোধ হয়।

কিন্তু বক্তব্য এখানে মূরের সাহিত্য নয়। প্রধান বক্তব্য হোনের বই, যা অনবদ্য ও সার্থক হয়েছে জীবনচরিত হিসাবে। যাঁরা মূরের জীবন জানতে উৎসুক তাঁদের এই বই না পড়ে উপায় নেই। পরিশিষ্টে শ' টেলারের প্রবন্ধও সুচিন্তিত এবং সুলিখিত।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

Science Front 1936—by Gerald Heard (Cassell).

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিণ্ডালের বইয়ে পড়েছিলাম যে বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ শুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিচর্য্যার বিষয় নয়; বৈজ্ঞানিক শুধু প্রাকৃতিক বিধি বিধানের ব্যাপারী। টিণ্ডালের এ মত বিংশ শতকের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রামাণ্য ছিল। আজকাল কিন্তু জগতে এই বৈজ্ঞানিক ছুঁৎমার্গের স্থান নেই। যখন দেখি কলিকাতা শহরেও একজনের চোখ তুলে নিয়ে অপরের চোখে বসিয়ে দিয়ে অন্ধের দৃষ্টিদান সম্পাদিত হচ্ছে অথবা পিটুইটারিন গ্রন্থি শরীরে প্রবিষ্ট করে দিয়ে দুর্ল্লভ যৌবন প্রত্যার্পিত হচ্ছে তখন শুদ্ধ ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের জাত-

বিচারে শিরঃপীড়া সৃষ্টি করতে আর আমরা উদ্যত হই না। শিল্পের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের দখল এতই বিস্তৃত যে, প্রাচীন শিল্পকার ও কারিগরের বৃত্তি এখন অদল-বদল হয়েছে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে। এখন আমাদের চিরআবশ্যক অত্যাবশ্যক ও বিলাসদ্রব্য প্রায় সব কিছুই অতি নিষ্ঠান্বিত ও একাগ্র বিজ্ঞান-পরিচর্য্যায় ফলে প্রাপ্ত। নাক্ষত্রিক জগৎ সম্প্রসারিত কি সঙ্কুচিত হচ্ছে শুধু এই শ্রেণীর প্রসঙ্গই আমাদের বৈজ্ঞানিক ঠাকুর-সেবাবৃত্তি কেন উদ্বুদ্ধ করবে ও লোহার সঙ্গে কাচ জোড়া দেওয়ার পন্থা বা রেস ঘোড়ার প্রজনন বিদ্যা কেন যে কারবারী সংসর্গে পড়ে জাত খুইয়েছে বলে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারবারী বিজ্ঞান আলাদা নয় এবং শুদ্ধ বিজ্ঞান যদিও আমাদের কৌতূহল-লিপ্সার তন্ত্রীতে বেশী করে বেজে ওঠে কারবারী বিজ্ঞান অপর দিকে আমাদের ব্যাপকতর জীবন ও সমাজকে নিবিড় ভাবে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

বিজ্ঞানের দ্রুত পরিসর-বৃদ্ধির হিসাব রাখা প্রায় একটা অসাধ্য ব্যাপার। বাৎসরিক হিসাব দাখিল করা তেমন অসম্ভব না হতে পারে যদিও একটা পূর্ণ অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনা করলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হিসাবদাখিল করা নিঃশেষিত হয় কিনা সন্দেহ। গ্রন্থকার তাই বাছাই করে শুধু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের একটা চলনসই বৈজ্ঞানিক কলেবরবৃদ্ধির চিত্র রচনা করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এ রকম একটা চলনসই চিত্রের সঙ্গে পরিচয় সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। জগতে এমন যুগ অল্পই এসেছে যাতে আজকালকার তুল্য এত বহুল ও যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এমন ভিড় করে এসেছে ও যার সম্বন্ধে সাধারণ লোক এমন অজ্ঞ। এ সব আবিষ্কারের খবরদারী করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার অথচ যা আজকের দিনে শুধু আবিষ্কার মাত্র তা কাল হয়ে উঠবে চলতি জ্ঞান, এদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া চাইই কেবল শুদ্ধ জ্ঞানলিপ্সার তাগিদে নয়, বরং এই কারণে যে অসতর্ক সমাজের ওপর এ সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বোমা পড়ার সম্ভাবনায় সমুদ্যত হয়ে আছে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের যে সব বৈজ্ঞানিক সমাচার গ্রন্থাকার বাছাই করে নিয়েছেন তারা হোল খাদ্য, বস্ত্র, স্থাপত্য, স্বাস্থ্য, রোগ-প্রতিরোধ, পদার্থ-বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তি সংক্রান্ত। বলা বাহুল্য খাদ্যের সমস্যা হোল জগতের এক মহাসমস্যা কিন্তু চির-পরিচিত উপায় পরিহার করে শস্যোৎপাদন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনে বহু গুণে

পরিণত করা অসম্ভব নয় এবং ঠিক এই কাজই করেছেন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক Dr Tritsin, সহজাত বন্য ঘাসের সঙ্গে গমের এক বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করে। এর ফসল দু'মাসেই পাওয়া যায় ও তা বর্দ্ধিতায়তন এবং তার ওপর সাম্বৎসরিক। এ পন্থায় শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফল কি তা অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে যদি কল্পনা করি যে আমাদের দেশে আমরাও বৈজ্ঞানিক কৌশলে গম ও ধান্যোৎপাদন পাঁচ ছ'গুণ বাড়াতে পারি ও তাদের সাম্বৎসরিক করতে পারি। তুলোকে দ্রবীভূত করে জমাট করা সম্ভব হয়েছে সুতরাং এই জমাট তুলা গুদাম-জাত করা ও যখন খুসী তা থেকে তন্তু ও সুতা তৈরী করা কত অনায়াসসাধ্য। স্থাপত্যে তেমনি সিলিকেট দ্বারা অভিনব নির্ম্মাণকৌশল আয়ত্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্যের এলাকায় নব্য ভিটামিন, নব্য ইন্সুলিন, থাইমাস গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির কথা গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এক নূতন খবর, রক্তসঞ্চিত করে রাখার কৌশল ও সঞ্চিত রক্তের সদ্ব্যবহারঃ—একথা অবিদিত নেই যে রক্তের চেয়ে সঞ্জীবনীশক্তিপূর্ণ পদার্থ আর খুব কমই আছে। তারপর হোল নূতন নূতন ঘুম-পাড়ানী ও সংজ্ঞাহীন করার ঔষধ—এমন যা আসন্ন-প্রসবাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে ও প্রসব ব্যাপার তার কাছে এক সুখনিদ্রার তুল্য মনে হবে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নূতন চিকিৎসা, নব-রেডিয়াম লবণ, নব্য-এক্সরে চিকিৎসা, মস্তিষ্ক-ঊর্ম্মির ফটোগ্রাফী—বিজ্ঞানের এই সব ১৯৩৬-এর অবদান এই অভিনব গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

গত বৎসরের প্রজনন-বিদ্যার উন্নতি আরও চমকপ্রদ। শস্যের বীজের তুল্য গো-অশ্বের বীজও সঞ্চিত করার ও দেশ থেকে দেশান্তরে পাঠানোর পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার প্রয়োগে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর পশুসম্পদ সৃজন করা সম্ভব। গ্রন্থকার বলেন এখানে থামলেই চলবে না—এ আদর্শ ও পন্থা শ্রেষ্ঠতর মানব ও সমাজ গঠনের যোগ্য ও বৈধ উপায় বলে গণ্য হবে না কেন? উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় তবে যোগ্য উপায়কে বৈধ বলে বরণ করা অন্যায় কেন? যুদ্ধের সময় কই আমরা হাতে হাতে শত্রুবধ না করে কামান গোলা গ্যাসের আশ্রয় নিয়ে শত সহস্র শত্রু নিপাতেও বিরত হই না ত! হয়ত স্বাধীন প্রেম ও মিলন শ্রেষ্ঠতর মানব প্রজননের একরূপ স্বাভাবিক সোপান কিন্তু সামাজিক নিগড়ে আমরা তাকে পঙ্গু করে রেখেছি; এ বিষয়ে গ্রন্থকারের টিপ্পনি "mixed motives miss all aims" চিন্তাশীলের কানে

বাজে। পদার্থবিজ্ঞান শাখার আবিষ্কারের মধ্যে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন—সমুদ্রের তলে তিন হাজার ফুট অবধি অবতরণ, দেশ মহাদেশের ভূপৃষ্ঠে সংক্রমণ, নাক্ষত্রিক বিশ্বের উষ্ণতা, নব তারকার জন্ম, নব্য-রেডিয়াম স্পষ্টির যন্ত্র, হাউই-যানে দেশান্তর ভ্রমণ, পকেট রেডিও, শ্রবণসীমাতিরিক্ত ধ্বনির নবাবিষ্কৃত ব্যবহার। সর্ব্বশেষে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন অভিব্যক্তিবাদের নূতন প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত। গত বছর যে সব প্রাগৈতিহাসিক অস্থি, কপালাস্থি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বোধ হচ্ছে যে একটি নয় কয়েকটি শাখার Apes অভিব্যক্তির ফলে Trial Manএ পরিণত হয়েছিল; ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তারা জীবনযুদ্ধে পরাভূত ও লুপ্ত হয়েছে। যে সময়ের অস্থি পাওয়া গিয়েছে তা ১৮৩০০০ হাজার বছর আগেকার বলে অনুমিত হয়, যখন মানব বা আদিমানব জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

উপসংহারে গ্রন্থকার ততঃ কিম্ প্রশ্ন তুলেছেন। খাদ্য স্বাস্থ্য ও বিলাসের প্রাচুর্য্য যদি বিজ্ঞান মারফৎ মানুষের করায়ত্ত হয় এবং তার সঙ্গে যদি ধ্বংসের কলকব্জাও বিরাট আকার ধারণ করে তবে যে পরিস্থিতি উদ্ভব হবে তা কি মানবের পক্ষে মঙ্গলময়? একদিকে প্রজনন বিদ্যার আধুনিক দাবী, অপরদিকে নাৎসী জার্ম্মানী ও ইটালীর প্রাচীন যুগের প্রতি লোলুপদৃষ্টি! গ্রন্থকারের মতে অভিব্যক্তির প্রমাণ এই শিক্ষা দিচ্ছে যে ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চাই নমনীয়তা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝাপড়া। বিজ্ঞানের সম্যক প্রয়োগ বরণ করা চাই, অ-প্রযুক্ত বিজ্ঞান সর্ব্বনাশময়।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

জওহরলাল নেহরু—আত্মচরিত—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা—মূল্য চারি টাকা।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কেননা ঐ মাসের শেষে করাচি কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি সর্ব্বপ্রথম ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রনেতারূপে অবতীর্ণ হন।

উক্ত অধিবেশনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল সরকারের সহিত সহযোগিতা বা অসহযোগিতা—কংগ্রেসের পক্ষে কোন্ নীতি বাঞ্ছনীয়। অসহযোগিতার পক্ষে ভোটের ও উৎসাহের অভাব ছিল না, কিন্তু গান্ধিজি কংগ্রেসকে সহযোগিতার পথে

আহ্বান করিলেন, কংগ্রেস তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধি-যুগের প্রবর্ত্তন করিল। ইহার নয় মাসের মধ্যে গান্ধিজির মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি প্রথম অসহযোগিতার প্রস্তাব কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নেতাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ হইল—তিন মাসের জন্য। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে সমবেত কংগ্রেসমণ্ডলী উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিল অসহযোগিতাই একমাত্র পথ এবং গান্ধিজিই একমাত্র নেতা। অতঃপর গান্ধি-যুগ সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় রাষ্ট্র-আন্দোলনের ইতিহাসে আর কোনও নেতার প্রভাব এরূপ সর্ব্বতোভাবে সমগ্র জনসাধারণের মন আচ্ছন্ন করে নাই। এই গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ সম্পূর্ণ আধিপত্য দেশের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা তাহা হয়তো বিবেচ্য, কিন্তু গান্ধিজির জীবন যাঁহারা ভালো করিয়া জানেন তাঁহাদের পক্ষে এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে তাঁহার মতন একান্তভাবে নিজের সম্পূর্ণ জীবন দেশের মঙ্গলব্রতে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসেও বিরল।

এই বিরল জীবনের ব্যাপক প্রভাব শুধু জনসাধারণ নহে, জননেতাদেরও উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কথিত আছে নেপোলিয়ন একেবারে মাটি হইতে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিদের গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গান্ধিজি ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে কিনা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে গান্ধি-যুগ আরম্ভ হইবার পর যে-সকল রাজনৈতিক নেতা জনসাধারণের চক্ষে অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছেন গান্ধিজির অভ্যুদয় না হইলে তাঁহাদের অনেকের নামই শোনা যাইত না এবং শোনা যাইলেও বিশেষ উচ্চৈঃস্বরে নহে। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশকেও আমি ইহার ব্যতিক্রম মনে করিনা। কেননা একথা যদিও সত্য যে একমাত্র চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে গান্ধিজির বিরোধিতা করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, যে-পরিবেষ্টন হইতে চিত্তরঞ্জন তাঁহার সাফল্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বতোভাবে গান্ধিজিরই সৃষ্ট। এই কারণেই গান্ধিজি বিনা দ্বিধায় বলিতে পারিয়াছিলেন, 'My political conscience is in the keeping of the Swarajists' (রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার বিবেক স্বরাজীদলের জিম্মায় আছে)। কেননা, তিনি জানিতেন যে তাঁহার সহিত মতদ্বৈধের ফলে যে দলের জন্ম, তাঁহারই প্রেরণায় তাহার পরিপুষ্টি।

সাধারণ ও অসাধারণ সকল শ্রেণীর নরনারীকে তাঁহার প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত করার অসামান্য শক্তির ফলেই আজ গান্ধিজি ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেস এই আধিপত্যের বাহন। এক সময়ে কংগ্রেস ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধারমাত্র এবং এই জাতীয় আন্দোলন বলিতে বুঝাইত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নরনারী। কিন্তু এই সকল শিক্ষিত নরনারীর সমস্ত জীবন কংগ্রেস স্পর্শ করে নাই—শুধু তাহাদের জীবনের যে-অংশটুকু ছিল রাজনীতি-সম্পর্কিত, কংগ্রেস ছিল সেই অংশটুকুর বাহ্য প্রতীক্। তখনকার দিনের পলিটিক্স্ ছিল শুধুই পলিটিক্স্ অর্থাৎ পোষাকি বাক্‌বিতণ্ডা। গান্ধিজির প্রভাবে কংগ্রেসের আকৃতি ও প্রকৃতি দুই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কংগ্রেস আজ দেশের অগণিত নরনারীর একান্ত আপন বস্তু; কংগ্রেসের বাণী আজ আর রাজনীতিবিলাসীদের আস্ফালন নহে, ইহা জাতীয় জীবনবেদের পুণ্যমন্ত্র।

এই কথা হয়তো অনেকে মানিবেন, অনেকে মানিবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে জওহরলালের আত্ম-জীবনী পাঠ না করিলে এই কথার যাথার্থ্য আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতাম না। কেননা গান্ধিজির আত্মজীবনী বা অন্যান্য রচনা পড়িয়া মন অভিভূত হয় তাঁহার অসামান্যতায়। এই অসামান্যতা তাঁহার কৃতকর্ম্ম অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। তাই মনে হয় যে-কংগ্রেস তাঁহারই সৃষ্টি তাহার অপেক্ষা তিনি স্বয়ং অনেক মহত্তর এবং ভাবিকালে তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান হইলেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব কখনই খর্ব্ব হইবে না।

জওহরলালের ব্যক্তিত্বও আজ স্বদেশে ও বিদেশে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ইহার পিছনে রহিয়াছে গান্ধিজির ছায়া, গান্ধিজিরই প্রেরণায় আজ জওহরলাল এত শক্তিমান্। কিন্তু, কংগ্রেসের আদর্শ যে-ভাবে জওহরলালের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত আর কাহারও মধ্যে হয় নাই, স্বয়ং গান্ধিজির মধ্যেও নহে, কেন না তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বৃহত্তর এবং ভারতে আজ এই জাতীয় আন্দোলন না থাকিলেও তিনি যে-কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে সগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। আমি কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসরের কথা বলিতেছি, মনের নহে। কেন না, গান্ধিজির মন একদেশদর্শী, জওহরলালের মন বিচিত্র, তাই মানবজীবনের নানা বিভিন্ন আকর্ষণে তাঁহার

মনের গতি বহুধা প্রবাহিত, জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দানের সম্পদে তাঁহার মন ঐশ্বর্য্যশালী। তাই জওহরলাল কাব্যচর্চ্চায় এত অনুরাগী, তাই কংগ্রেস-বিরোধী সোস্যালিজ্‌ম্‌-নীতিতে তাঁহার গভীর আস্থা। কেন না, অভিব্যক্তির আধুনিকতম কীর্ত্তি বলিয়া তর্কবুদ্ধি যাহার সমর্থন করে চিন্তায় তাহাকে বর্জ্জন করা এই মেধাবী ব্যক্তিটির পক্ষে প্রায় আত্মহত্যারই সামিল।

কিন্তু এই বিচিত্র মনটির সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতি, অনুভূতি ও আস্থা আজ একান্তভাবে নিয়োজিত হইয়াছে গান্ধিজি-প্রবর্ত্তিত কংগ্রেস-নীতির প্রচার ও প্রসারে। জওহরলালের মতের সহিত গান্ধিজির মতের বার বার সজ্ঘাত হইয়াছে ও এই সজ্ঘাতের বেদনা তাঁহার লেখনীকে একাধিকবার তীব্র করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোপরি জয়ী হইয়াছে গুরুর প্রভাব, তাঁহার বাণীকে অস্বীকার করিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের কাছে জওহরলাল মানিয়াছেন পরাভব এবং গুরুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নূতন করিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আত্মনিয়োগ করিবার পর কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বিচলিত করে নাই, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের সহিত কংগ্রেসের হইয়াছে সম্পূর্ণ সমীকরণ, এত সম্পূর্ণ যে কংগ্রেস হইতে জওহরলালকে বা জওহরলাল হইতে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব।

একদা কংগ্রেস যখন ছিল পোষাকি, তখনকার আবহাওয়ায় এই সমীকরণ ছিল অসম্ভব। আজ একমাত্র গান্ধিজীর প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে এবং ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় একাধিক জীবনে। কিন্তু জওহরলালের মতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিচিত্র সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী চিত্ত ইতিপূর্ব্বে কখনো কংগ্রেসের এইরূপ একনিষ্ঠ সেবায় নিয়োজিত হয় নাই। এই চিত্ত স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাঁহার আত্মজীবনীতে। বাংলা ভাষায় ইহার সুদক্ষ অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। জওহরলালের জীবনের এই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ দান। কেন না গান্ধিজির যে-প্রভাব তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই চরম প্রকাশ এই আত্মজীবনী। এমন এক শ্রেণীর মনকে ইহা অন্তরঙ্গ-ভাবে স্পর্শ করিয়াছে গান্ধিজির ব্যক্তিত্বে যাহারা মুগ্ধ হইলেও তাঁহার মতামত যাহাদের কাছে নিতান্তই প্রাচীনপন্থী সুতরাং বর্জ্জনীয়, এবং অপর পক্ষে যাঁহারা বিপ্লববাদের চরম যুক্তিকে আশু মুক্তির মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

কিন্তু এই শ্রেণীর ভবিষ্যতে কি অবস্থা হইবে বলা কঠিন। প্রগতির

প্রবল ধারায় ইহারা একেবারে নিমজ্জিত হইবে, না প্রগতি-পরিপন্থী দলের চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নির্য্যাতনের অন্ধকারে অবলুপ্ত হইবে, কে জানে? যাহাই ঘটুক, জওহরলালের রাজনৈতিক প্রভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু এ কথাও সুনিশ্চিত তাঁহার আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য উত্তরকালে সমধিক বৃদ্ধি পাইবে। কেন না, বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় জীবনের যে-সংগ্রাম জওহরলালের সমগ্র হৃদয়মনকে নিয়োজিত করিয়াছে তাহারই অন্তরতম কথা তাঁহার আত্মজীবনীতে হইয়াছে ব্যক্ত, নির্য্যাতিত ভারতবর্ষের বহুবেদনার প্রতিচ্ছবি জওহরলালের লেখনীতে পাইয়াছে মর্ম্মস্পর্শী রূপ এবং যদিও তাঁহার আজিকার দীপ্ত বাণী ভবিষ্যকালের শ্রবণে হয়তো অত্যন্ত ক্ষীণ, অত্যন্ত করুণ শুনাইবে তথাপি তাঁহার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি গভীরভাবেই মানুষের মনকে চিরকাল বিচলিত করিবে।

এই অনুভূতি যে কেবলমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে তাহা জওহরলালের মানসিক উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। এ্যারিষ্টটল্-এর বর্ণিত আদর্শ জীবনের ন্যায় জওহরলালের জীবনও পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে কর্ম্মক্ষেত্রের অতীত চিন্তালোকে। এই পরাকাষ্ঠা যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, তাহার কারণ কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বানে বারবার ধ্যানী জওহরলালের স্বপ্ন ভাঙিয়াছে। কেননা, শক্তির অভাবে কিম্বা অনুভূতির আতিশয্যে যে কারণেই হউক, আদর্শের সহিত বাস্তবের সমন্বয় তিনি করিতে পারেন নাই। এই হইল তাঁহার জীবনের দারুণ ট্র্যাজেডি। তাই উগ্র সোস্যালিষ্ট সম্প্রদায় তাঁহাকে বলেন ভীরু এবং মহাদেব দেশাই-প্রমুখ গান্ধি-পন্থীরা তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলেন, তাঁহার সোস্যালিজম্ দাক্ষিণ্যের ও মহানুভবতারই নামান্তরমাত্র। এই দুই অপবাদের কোন্‌টি সত্য তাহা জানি না, কিন্তু মানুষের গভীরতম উপলব্ধিকে যাঁহারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদের মাপকাঠিতে বিচার করিতে নারাজ তাঁহাদের নিকট বোধ হয় জওহরলাল সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে পলিটিক্স্-এর পঙ্কিল আবর্ত্তে তাঁহার জীবন হইয়াছে আমূল আবিল।

মানুষের জীবনের যাহা মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা সাহিত্যের অপরূপ সৌন্দর্য্যে তাহা অমর হইয়া উঠে। জওহরলালের মহত্ত্ব এইখানে যে তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাজনীতিক্ষেত্রের সকল আবিলতা ভেদ করিয়া পাঠকের মনকে অভিভূত করে যাহার সুকুমার অনুভূতি, বিচিত্র আবেগ।

তাই জওহরলালের বহু পলিটিক্যাল দ্বন্দ্বের স্মৃতি যখন তাঁহার আত্মজীবনীর পাঠককে আর উত্তেজিত করিবে না তখনও হয়তো মনে পড়িবে একদা সিংহলদ্বীপের নিভৃত অবকাশে প্রকৃতির মোহনরূপ তাঁহার দেহমন করিয়াছিল আবেশে আচ্ছন্ন, কৈশোরের কল্পিত মানস সরোবরের তরঙ্গ-দোলায় এখনও তাঁহার মন হয় দোলায়িত ও এই সঙ্কল্প তিনি এখনও পোষণ করেন যে কৈলাসের শুভ্র তুষার কোনো এক শুভদিনে তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিবে; আর হয়তো মনে পড়িবে যে চিরকালের জন্য তাঁহার মৃগয়া-বাসনা হরণ করে এক মরণাহত হরিণের অন্তিম চাহনি এবং সেই সকরুণ চাহনি এখনও মাঝে মাঝে তাঁহার মনকে বেদনায় বিহ্বল করিয়া দেয়।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

শতপর্ণী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত (বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়)
গীতগোবিন্দ—শ্রীশ্রীজয়দেব প্রণীত—অনুবাদক শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ, (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের "শতপর্ণী" কবিতার বই। একশোটি সনেট অবলম্বনে বইটি রচিত। বাক্য ও ছন্দের অপ্রতিহত গতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি যে, বার বার কবিতাগুলি পড়েও কবির মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যে এই মনন-হীন স্বাচ্ছন্দ্য এত বেশী প্রকট যে, স্বভাবতই পাঠকের চোখে তা অস্বাভাবিক ঠেকে—যেমন অস্বাভাবিক বোধ হয় পটুয়াদের হাতে আঁকা দুর্গা প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে। কবিতাগুলি আশ্চর্য্য রকম নিখুঁত এবং আশ্চর্য্য রকম অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ "শতপর্ণী" 'আস্বাদন' করে লিখেছেন, '"পর্ণ" আস্বাদন ভাষাটায় হঠাৎ কানে খটকা লাগতে পারে, কিন্তু যে জিনিষ পাকের যোগ্য রসিক লোকের হাতে তা' কাঁচা থাকতে পারে না, ভদ্র নিয়মেই ভোগ করতে পেরেছি'। কিন্তু যখন পড়ি—

যেওনা যেওনা সখা দুটি পায়ে ধরি,
রাখ এ মিনতি মোর, অতিথি আমার।
ধরেছিলে যে রাগিণী অন্তরাটি তার
এখনো ত শুনি নাই, দাও শেষ করি
আরব্ধ সঙ্গীত তব।

এবং

যৌবনে এলেনা তুমি শিবানী আমার,
বুঝি বুড়া ক্ষেপা বর, রিক্ত সন্ন্যাসীর
ভস্মরাগ জটাভার শতছিন্ন চীর
আকিএকমাত্রঞ্চন কুমারী হিয়ার !
তাই বহুবর্ষ ধরি আছ প্রতীক্ষায়
হে চির কিশোরী মোর অনূঢ়া প্রেয়সী
প্রৌঢ় প্রণয়ীর লাগি।

তখন মনে বাস্তবিকই খটকা লাগে, সন্দেহ হয় আসলে হয়ত রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টাই করেছেন। "শতপর্ণী"কে 'সনেট শতক' বলতে অনেকেরই আপত্তি হবে, কারণ কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র চোদ্দ লাইন ছাড়া সনেটের আর কোনো বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় নি। ফলে কবিতার জাত-নির্ণয় করতে পাঠকদের সব দিক থেকেই বিভ্রান্ত হ'তে হয়।

দ্বিতীয় বইটি শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী বিরচিত গীতগোবিন্দের অনুবাদ। জয়দেবের ভাব, ভাষা ও ছন্দের লালিত্য অনুবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এর জন্য হয়ত কিছুটা দায়ী স্বয়ং জয়দেব এবং কিছুটা সংস্কৃত ভাষা। এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যেতে পারে যে,জয়দেবের 'সংস্কৃত' কবিতার সঙ্গে তৎকালীন বাংলা সমাজের কোনো নাড়ীর যোগ ছিল না—যে নাড়ীর যোগ সুস্পষ্ট চণ্ডীদাসের কাব্যে। ফলে জয়দেব ভক্ত হয়েও কবি হতে পারেন নি এবং কৃত্রিম ছন্দের আশ্রয়ে তাঁকে কবি খ্যাতি লাভ করতে হয়েছিল। কাব্য যেখানে কৃত্রিম হয়ে ওঠে, সেখানে তার তালে তাল রেখে অনুবাদ করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। তবু এমন অনুবাদকও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, যিনি স্বকীয় প্রতিভার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করেন। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান অনুবাদক সে শ্রেণীর নন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর এই অনুবাদ পড়ে সকলেরই মনে হবে যে, যেহেতু তিনি কবি নন অথচ ভক্তলোক, সেই হেতু কাব্যের আসরে তিনি বাদ্য না বাজিয়ে ঢেঁড়া পিটিয়েছেন।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৭।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ—১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪৪

পরিচয়

সৎকার্য্যবাদ (সমর্থন)

বৈশাখের "পরিচয়ে" "হিন্দু ও বৌদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে প্রতিপদে বৌদ্ধ-দর্শন আলোচনা না করিলে ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাস উদ্ধার করা কখনই সম্ভব হইবে না। এক্ষণে তদনুক্রমে ভারতীয় দর্শনের একটি প্রধান theory—সৎকার্য্যবাদ—কিরূপে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। এ উদ্যমে আমার প্রধান নির্ভর Gaekwad Oriental Series হইতে প্রকাশিত "তত্ত্বসংগ্রহ"। এই বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা শান্তরক্ষিত ও তৎশিষ্য কমলশীল। এই দুই প্রথিতনামা বৌদ্ধ দার্শনিকের জীবিতকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় সমস্তই শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় (ইংরাজি ভাষায় লিখিত) সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন দেখি না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বেদান্তের পক্ষ হইতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যাহা করিয়া গিয়াছেন, শান্ত-রক্ষিত-কমলশীল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তত্ত্বসংগ্রহে বিজ্ঞানবাদের পক্ষ হইতে তদপেক্ষা শতগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাই করিয়া গিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থের ন্যায় "তত্ত্বসংগ্রহ"-ও কারিকা ও ভাষ্যের আকারে রচিত; কারিকাকার শান্ত-রক্ষিত, কমলশীল এই কারিকাগুলির উপর তাঁহার বিস্তীর্ণ ভাষ্য (নাম "পঞ্জিকা") রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত কমলশীল যে তাঁহার ভাষ্যে নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, কারণ কমলশীল শান্তরক্ষিতের আপন শিষ্য—তাঁহার কনিষ্ঠতর সমসাময়িক।

তাহার উপর কারিকাগুলি এরূপ যে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সেগুলি একটি বিস্তীর্ণ ভাষ্যের আশাতেই রচিত হইয়াছিল ; কারণ, পাণিনির সূত্রের মতই, সেগুলি বহুস্থলেই দুর্ব্বোধ্য—এমন কি অবোধ্যও বলা যাইতে পারে।

সৎকার্য্যবাদের খণ্ডন দিয়াই শান্তরক্ষিত তাঁহার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ; কিন্তু খণ্ডনের পূর্ব্বে সৎকার্য্যবাদের সপক্ষে যাহা বলিবার আছে শান্তরক্ষিত তাহা সংক্ষেপে কয়েকটি কারিকায় বলিয়া গিয়াছেন। এই কারিকাগুলিই (কমলশীলের ভাষ্যসহ) বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। কিন্তু বৌদ্ধগণ সৎকার্য্যবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করার পূর্ব্বে জানা দরকার হিন্দু দার্শনিকগণ স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। পাঠকবর্গের অনেকেই নিশ্চয়ই এ বিষয় অবগত আছেন ; কিন্তু তথাপি প্রবন্ধারম্ভে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইউরোপীয় দর্শনের সহিত তুলনামূলক আলোচনা খুব লোভনীয় হইলেও তাহা হইতে এ স্থলে বিরত থাকিতে হইবে।

সুসংবদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতে প্রাচীন ঋষিদের মনে সৎকার্য্যবাদ না হউক, তদনুরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল মনে হয়, কারণ ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও পরমপুরুষের ইচ্ছামাত্রকে অবলম্বন করিয়াই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় নাই—Bible-এ যেরূপ করা হইয়াছে। Ex nihilo nihil fit—ইহা ইউরোপের কথা ; কিন্তু কথাটির যৌক্তিক ও দার্শনিক অববোধন সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, ইউরোপে নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় মনীষিগণ ex nihilo কোন কিছুর উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন, পুরুষসূক্তের পরমপুরুষকে তাই আত্মদেহ দান করিয়া তবে জগৎপ্রপঞ্চের "সৃষ্টি" করিতে হইয়াছিল। "সৃষ্টি" কথাটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার প্রকৃত অর্থ "ত্যাগ" বা "ত্যক্তাংশ", creation নহে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের ঋষিগণও ex nihilo কোন কিছুর উদ্ভব স্বীকার না করিয়া অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান কোন আদি বস্তুর অবস্থান্তর গ্রহণকেই জগদুদ্ভবের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাই সৎকার্য্যবাদের মূল কথা।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারে (১) আরম্ভবাদ বা পরমাণুবাদ, (২) পরিণামবাদ বা সৎকার্য্যবাদ এবং (৩) মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ ভারতীয় দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকগণ (অসৎকার্য্যবাদী) বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল বস্তু বা

কার্য্যই অসৎ (non-existent)। কোন কার্য্য উৎপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের মতে তিন প্রকার কারণের প্রয়োজন হয়ঃ—(ক) সমবায়ী কারণ, (খ) অসমবায়ী কারণ ও (গ) নিমিত্ত কারণ। ঘটোৎপত্তির জন্য যে মৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন তাহাই সমবায়ী বা উপাদান কারণ—material cause। কিন্তু মৃৎপিণ্ডকে রূপ দিবার জন্য কুম্ভকারেরও প্রয়োজন আছে, নতুবা ঘটোৎপত্তি সম্ভব হইবে না; ঘটচক্রাদি-সহ কুম্ভকারই সেইজন্য ঘটোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ—efficient cause। মৃৎপিণ্ড ও কুম্ভকার বিদ্যমান থাকিলেই ঘটোৎপত্তি সম্ভব হয়,—সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বলে। কিন্তু কলুর বলদ দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িবে এত বড় সন্দেহ যে সব নৈয়ায়িক করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা যে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইবেন না তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহাদের মতে এক্ষেত্রেও মৃৎপিণ্ড ও কুম্ভকার ব্যতিরিক্ত আরও একটি "কারণে"র প্রয়োজন,—সেটি পার্থিব পরমাণুর সংহতি এবং ঘট ও কপালের সংযোগ। ইহাই অসমবায়ী কারণ—ultimate cause। অসমবায়ী কারণকে নিমিত্ত কারণের অন্তর্ভুক্ত করিতে তাঁহারা নারাজ, কারণ উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কার্য্যোৎপত্তির পর নিমিত্ত কারণ নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না—ঘটনির্ম্মাণের পর কুম্ভকার মরিয়া গেলেও ঘট অটুটই থাকে,—কিন্তু মৃত্তিকার সংহতিধর্ম্ম সর্ব্বাবস্থাতেই বিদ্যমান না থাকিলে ঘটের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। প্রশ্ন উঠিতে পারে সমবায়ী কারণের নাশেও তো উৎপন্ন দ্রব্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে অতিরিক্ত অসমবায়ী কারণের জন্য একটি বিশেষ category কল্পনা করারই বা সার্থকতা কি? ইহার উত্তর, সূত্র ভস্মীভূত হইলে বস্ত্রও নাশ প্রাপ্ত হয় ইহা সত্য হইলেও উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যেরও যে আত্যন্তিক বিনাশ ঘটিয়া থাকে ইহা বলা যায় না, কারণ বস্ত্রের উপাদান বস্ত্রাকারে না হউক অন্ততঃ ভস্মধূমাদির আকারে তখনও বর্ত্তমান থাকে।

এখন আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকের নিকট কার্য্য ও কারণ একান্ত বিভিন্ন (discrete)। Engels যেমন বলিয়াছেন pudding-এর প্রমাণ খাদ্যত্বে, নৈয়ায়িকগণও সেইরূপ বলিয়া থাকেন ঘটের প্রমাণ তাহার জল-ধারণের সামর্থ্যে—সুতরাং মৃৎপিণ্ডের সহিত ঘটের অনন্যত্ব সমর্থন করা যায় না, কারণ মৃৎপিণ্ড জলধারণ করিতে পারে না। ফলকথা কার্য্য উৎপন্ন হইলে তবেই তাহাকে সৎ (existent) বলা যাইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে—ইহাই অসৎকার্য্য-

বাদীর মূল কথা। সৎকার্য্যবাদী (বা পরিণামবাদী) কিন্তু বলিবেন কার্য্য চিরকালই আছে, যেহেতু উহা কারণেরই রূপান্তর মাত্র—কারণের অভিব্যক্তির নামই কার্য্য। কারণ যদি অসৎ হয় তবে তাহা কোনক্রমেই সৎ হইতে পারে না। তিল হইতে তৈল হয় ইহার অর্থ তিলের রূপান্তরিত অবস্থার নামই তৈল। আরম্ভবাদী প্রশ্ন করিবেন তিল ও তৈল যদি অনন্যই হয় তবে তিল হইতে তৈলোৎপাদনের জন্য এত প্রয়াস কেন? উত্তর ঃ—তিল হইতে তৈল কখনও "উৎপন্ন" হয় না, উহার কার্য্যাবস্থা অভিব্যক্ত হয় মাত্র,—অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে অন্বেষিত বস্তু হঠাৎ আলোক-পাতে যেরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। ঘটপূর্ব্বাবস্থায় ঘটের আররক তাহার পিণ্ডাবস্থা; এই অবস্থার অপসারণের জন্যই মানুষ প্রয়াস করিয়া থাকে, ঘটোৎ-পত্তির জন্য নহে। প্রশ্ন হইতে পারে মৃত্তিকার পিণ্ডভাবই যদি ঘটাবস্থার বাধক হয় তবে মুদ্গরাঘাতে পিণ্ডকে চূর্ণ করিলেই ঘটোৎপত্তি হয় না কেন? এরূপ প্রশ্ন কিন্তু বুদ্ধিমানের মত হইল না, কারণ পিণ্ডাবস্থার মত চূর্ণাবস্থাও তো ঘটাবস্থার বারক ও বাধক হইতে পারে। ইহাই সৎকার্য্যবাদের মূল কথা। এখন দেখা যাউক শান্তরক্ষিত ও কমলশীল কিরূপে এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন, সৎকার্য্যবাদের প্রতিবিধান করাই যখন ইঁহাদের প্রকৃত উদেশ্য তখন নিশ্চয়ই ইঁহারা তাহার সমর্থক সকল যুক্তি যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত করিবেন না। ইহা কিন্তু সত্য নহে। সৎকার্য্যবাদে প্রকৃতই যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাও (যথা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্র) ইহা অপেক্ষা প্রবলতর যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। পরে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যদিগের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত প্রথমে সাংখ্যমতটিই ব্যক্ত করিতেছেন ঃ—

অশেষশক্তিপ্রচিতাৎ প্রধানাদেব* কেবলাৎ।
কার্য্যভেদাঃ প্রবর্ত্তন্তে তদ্রূপা এব ভাবতঃ ॥ (সপ্তম কারিকা)

অর্থাৎ, জগতে যে নানা প্রকার বিভিন্ন কার্য্য দেখা যায় সেগুলি স্বভাবতঃই সেই অশেষ শক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত অদ্বিতীয় আদি বস্তুরই বিভিন্ন রূপ মাত্র।

এ কারিকাটি আদৌ দুর্ব্বোধ্য নয়; তথাপি কমলশীল তাঁহার পঞ্জিকায় ইহার

* সাংখ্যের "প্রধানে"র সহিত Aristotle-এর Formless Matter-এর তুলনা করা যাইতে পারে। প্রধান=প্রকৃতি=অব্যক্ত=the causeless cause, by nature unmanifested.

উপর অনেক কথা বলিয়াছেন ঃ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা যে "প্রধানের" লক্ষণভূত তাহা হইতেই মহদাদি (পঞ্চবিংশ তত্ত্ব) উদ্ভূত হইয়া থাকে—ইহাই কপিল শিষ্যগণের মত। "প্রধানাদেব" বলার উদ্দেশ্য কাল, পুরুষ প্রভৃতি অপরাপর শক্তির অপহার, এবং "কেবলাৎ" বলার উদ্দেশ্য সেশ্বরসাংখ্যে পরিকল্পিত ঈশ্বরের নিরসন। "উৎপন্ন হইল" না বলিয়া "প্রবর্ত্তিত হইল" বলার কারণ কি? সাক্ষাৎ উৎপত্তি ও পরম্পরানুক্রমে উৎপত্তি—এই উভয় প্রকার উৎপত্তি ব্যক্ত করা।

এখন কারিকায় যে বিভিন্ন কার্য্যাবলির কথা বলা হইয়াছে সেগুলি কি? তাহাদের প্রক্রিয়া এইরূপ ঃ—প্রধান হইতে প্রথমে বুদ্ধির উৎপত্তি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ) ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের (কর্ণ, ত্বক, নাসিকা, জিহ্বা ও চক্ষু—এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়; বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; মন একাদশেন্দ্রিয়) উৎপত্তি। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি ঃ—শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রস হইতে জল, এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী। ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তন্মাত্রগণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥ [সাংখ্যকারিকা ২২]

এখানে "মহান্" এই কথাটি দ্বারা বুদ্ধি বুঝাইতেছে (তত্র মহানিতি বুদ্ধেরাখ্যা)। বুদ্ধি কাহাকে বলে? এইটি ঘট, এইটি পট এইরূপ বিশেষ বিশেষ নির্দ্ধারণের চেষ্টাকেই বলে বুদ্ধি। মহান্ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি; কিন্তু অহঙ্কার কি? "আমি সৌভাগ্যশালী", "আমি সুরূপ" এইরূপ চিন্তাই অভিমানের লক্ষণ। মনের লক্ষণ সংকল্প। যথা, যদি কোন ব্রাহ্মণ শুনিতে পায় যে গ্রামান্তরে ভোজনের সম্ভাবনা আছে, তবে তাহার সংকল্প হইবে "আমি (তথায়) যাইব; কিন্তু সেখানে গুড় দধি পাওয়া যাইবে, না কেবল দধি!" এইরূপ সংকল্পই (deliberation) মনের বৃত্তি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

কথিত হইয়াছে—

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র যত্রাশ্রমে রতঃ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥*

* সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদও এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও বলেন নাই এটি কাহার রচিত।

প্রধান হইতে প্রবর্ত্তিত এই যে সকল বিভিন্ন কার্য্যের কথা বলা হইল সেগুলি কিন্তু বৌদ্ধদিগের* অভিমত নহে, কারণ বৌদ্ধমতানুয়ায়ী কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (অত্যন্তভেদিনঃ) ; পরন্ত, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মতই এস্থলে আলোচিত হইতেছে। কারিকাধৃত "তদ্রূপাঃ" কথাটির অর্থ "প্রধান"ই যাহাদের রূপ বা আত্মা তাহারা। অর্থাৎ কার্য্যসকল ত্রৈগুণ্যাত্মক হওয়ায় সেগুলি প্রকৃতি হইতে অভিন্ন (ত্রৈগুণ্যাদিরূপেণ প্রকৃত্যাত্মভূতাঃ)। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝা যায় যে কার্য্য কারণেরই অনুরূপ হইয়া থাকে, যেমন কৃষ্ণ সূত্রদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণই হইয়া থাকে, শুক্ল সূত্রদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রও সেইরূপ শুক্লই হয়। "প্রধান"-ও সেইরূপ কেবল যে ত্রিগুণাত্মক তাহাই নহে, ইহা বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মকও বটে—সুতরাং কারিকার "তদ্রূপাঃ"কথাটি যুক্তিযুক্ত। ত্রৈগুণ্য (সত্ব, রজঃ, তমঃ) হইতে মহদাদির পার্থক্য করাও অসম্ভব (অবিবেকি) ; কারণ যাহা গুণাবলি তাহাই ব্যক্ত এবং যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণাবলি। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উভয়ই কিন্তু এ স্থলে "বিষয়ীভূত" কারণ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (? ভোগ্যস্বভাবত্বাৎ)। মল্লজাতীয়া দাসীর ন্যায় (মল্লদাসীবৎ) ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই সকল পুরুষের ভোগ্যবস্তু (সামান্যং চ সর্ব্বপুরুষাণাং ভোগ্যত্বাৎ, মল্ল-দাসীবৎ)। তদুপরি ত্রৈগুণ্য অচেতন, কারণ ইহার সুখ, দুঃখ ও মোহের অনুভূতি নাই (সুখ দুঃখমোহাবেদকত্বাৎ)। পরন্তু ইহা প্রসবধর্ম্মী, কারণ "প্রধান" হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; তন্মাত্র হইতে মহাভূতাবলির উৎপত্তি ! সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সকল বিভিন্ন কার্য্য আদি ত্রৈগুণ্য হইতে অভিন্ন,—কারিকোক্ত ভাষায় "তদ্রূপাঃ"। (সাংখ্যকারিকাতেও) কথিত হইয়াছে ঃ—"যাহা ব্যক্ত তাহা ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী (অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য হইতে তাহার পার্থক্য করা যায় না), সর্ব্বসম্পর্কে সাধারণ বস্তু (সামান্য), অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী। "পুরুষ" অংশতঃ ব্যক্ত এবং অংশতঃ "অব্যক্ত" (ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপ-রীতস্তথা চ পুমান্ ॥)।

এখন বিভিন্ন কার্য্যাবলি যদি "তদ্রূপ"ই হয় তবে শাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্তের

* এতদ্দ্বারা কমলশীল অন্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদিগের মত উদ্ধৃত করিতেছেন।

বৈলক্ষণ্য বর্ণিত হইয়াছে কেন ? কারণ ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—হেতুমদনিত্যম-ব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥ ইহার অর্থ এই*—যাহা ব্যক্ত কেবলমাত্র তাহাই হেতুমৎ অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। বুদ্ধির হেতু "প্রধান", অহঙ্কারের হেতু বুদ্ধি, এবং পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশেন্দ্রিয়ের হেতু অহঙ্কার, এবং ভূতাবলির হেতু তন্মাত্রসকল। কিন্তু যাহা অব্যক্ত তাহার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না, কারণ অপর কিছু হইতে তাহার উৎপত্তি হয় নাই (তস্য কুতশ্চিদপ্যনুৎপত্তেঃ)। যাহা ব্যক্ত তাহা অনিত্য, কারণ তাহার "উৎপত্তি" হইয়াছে ; অব্যক্ত কিন্তু অনিত্য নয়, কারণ তাহা অনুৎপন্ন। প্রধান ও পুরুষ যেরূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ ব্যাপিয়া অবস্থিত, "ব্যক্ত" কিন্তু সেরূপ নহে, কারণ তাহা অব্যাপী। সংসার কালে (দুইটি প্রলয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে) ত্রয়োদশবিধ বুদ্ধি অহঙ্কারাদি বিশিষ্ট শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া, সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া ব্যক্তবস্তু বিবিধ রূপে ক্রিয়াশীল হয় (সংসরতি), অব্যক্ত বস্তু কিন্তু ক্রিয়াশীল হয় না যেহেতু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া (বিভুত্বেন) ইহার সক্রিয় হওয়ার কোন অবকাশ নাই। বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি ভেদে "ব্যক্ত" বস্তু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু "অব্যক্তে"র পক্ষে একথা প্রযুজ্য নয়, কারণ সেই এক অব্যক্তই লোকত্রয়ের কারণ। যাহা ব্যক্ত তাহা পরতন্ত্র, কারণ যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন সেই বস্তু তাহারই "আশ্রিত"। অব্যক্ত কিন্তু এরূপ নহে, কারণ তাহার কার্য্য নাই (অর্থাৎ উৎপত্তিস্বরূপ যে কার্য্য তাহা অব্যক্তের ধর্ম্ম নহে)। যাহা ব্যক্ত তাহা "লিঙ্গ", কারণ তাহা লয় প্রাপ্ত হয় (লয়ং গচ্ছতীতি কৃত্বা)। প্রলয়কালে ভূতাবলি তন্মাত্রে, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে, বুদ্ধি "প্রধানে" বিলীন হয় ; অব্যক্ত কিন্তু কদাপি লয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ তাহার "কারণ"ই নাই। যাহা ব্যক্ত তাহা সাবয়ব, কারণ তাহা শব্দ স্পর্শ রস রূপ ও গন্ধের সমবায়ে গঠিত। অব্যক্ত কিন্তু এরূপ নহে, কারণ "প্রধানের" মধ্যে শব্দাদির উপলব্ধি অসম্ভব। উপরন্তু, পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র যেরূপ স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণায়ত্ত বলিয়া ব্যক্তও সেইরূপ পরতন্ত্র ; অব্যক্ত কিন্তু সেরূপ নহে, কারণ তাহা কখনই কারণাধীন নহে। এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়াই কারিকাতে"ভাবতঃ"এই কথা প্রয়োগ করা হইয়াছে। "ভাবতঃ" তাদ্রূপ্য বলিতে "পরমার্থতঃ" তাদ্রূপ্য বুঝিতে হইবে ; সুতরাং (পূর্ব্বোক্ত

* কমলশীল নিজেই ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পন্থায়) প্রকৃতির বিকারভেদে যে বিশেষ বিশেষ পরিণামের উদ্ভব হয়—ইহা (মূল বচনের) পরিপন্থী নহে। "ভাবতঃ" বলিতে কিন্তু ইহাও বুঝাইতে পারে যে আপন স্বভাববশতঃই ত্রৈগুণ্যরূপে তদনুযায়ী কার্য্যাবলি প্রবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ঔৎকট্যানৌৎকট্যাভেদে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাহাই মহদাদি-ভেদে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা উপপন্ন হইল যে কারণের মধ্যেই কার্য্য নিহিত থাকে (কারণাত্মনি কার্য্যমস্তি)।

পরবর্ত্তী কারিকায় প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে, কিরূপে জানা যায় যে উৎপত্তির পূর্ব্বেই কার্য্য বর্ত্তমান থাকে:—

যদি ত্বসম্ভবেৎ কার্য্যং কারণাত্মনি শক্তিতঃ।
কর্ত্তুং তন্নৈব শক্যেত নৈরূপ্যাদ্বিয়দব্জবৎ ॥৮॥

কমলশীল:—সৎকার্য্যবাদ প্রমাণ করিবার জন্য অন্য দার্শনিকেরা পাঁচটি হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন:—

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসংভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্ ॥*

এই পাঁচটি হেতুর প্রথমটি সমর্থন করাই এই কারিকার উদ্দেশ্য। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেই কারণের মধ্যে কার্য্য নিহিত না থাকিত তবে কোন কার্য্য উৎপন্ন করা আকাশকুসুম উৎপন্ন করার মতই অসম্ভব হইয়া পড়িত। সুতরাং বলা যাইতে পারে:—যাহা অসৎ তাহা কাহারও করা সম্ভব নয়; আকাশকুসুম উৎপাদন করা যায় না তাহার কারণ ইহা বাস্তবিকই অসৎ। বিরুদ্ধ পক্ষের মত (ছাপা হইয়াছে "পরমতে ন"; কিন্তু "পরমতেন" না পড়িলে সদর্থ হয় না) যদি বলা যায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ তবে ব্যাপকের (invariable concomitant) সহিত উপলব্ধির অসামঞ্জস্য ঘটিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কিন্তু ঘটে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে তিলাদি দ্বারা যে তৈলাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে। "(কারণের মধ্যেই কার্য্য যদি) শক্তিরূপে† (নিহিত না থাকে)"—একথা বলা হইল কেন? একথা বলার কারণ এই যে কপিল-শিষ্যগণও মনে করেন না যে

* ইহা সাংখ্যকারিকার একটি বিখ্যাত বচন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কমলশীল এখানে ঈশ্বরকৃষ্ণের নামোল্লেখ করেন নাই।

† In latent form.

(উৎপত্তির) পূর্ব্বে সত্বের (অস্তিত্ব) ব্যক্ত (manifest) থাকে ।—কারিকান্তর্গত নৈরূপ্য কথাটির অর্থ নিঃস্বভাব (unreal)।

সাংখ্যকারিকোক্ত হেতুপঞ্চকের দ্বিতীয়টি (উপাদানগ্রহণাৎ) সমর্থনের উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত পরবর্ত্তী কারিকায় বলিলেন ঃ—

কস্মাচ্চ নিয়তান্যেব শালিবীজাদিভেদতঃ ।
উপাদানানি গৃহ্ণন্তি তুল্যেঽসত্ত্বেঽপরং ন তু ॥৯॥

কমলশীল ঃ—কার্য্য যদি অসৎ হয় তবে লোকে কখনই কেবল যথাযোগ্য উপাদান সংগ্রহ করিত না ; ধান্যার্থী ধান্যের বীজ বপন করিয়া থাকে, কোদ্রবের বীজ বপন করে না ; "কাল আমার গৃহে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবেন" এই কথা স্মরণ করিয়া যাহারা দধি প্রস্তুত করিতে উদ্যত হয় তাহারা তজ্জন্য দুগ্ধই সংগ্রহ করে, জল সংগ্রহ করে না । এখন শালিবীজে ধান্য যদি সম্পূর্ণই অসৎ হয় তবে কোদ্রববীজের সহিত তাহার পার্থক্য রহিল কোথায় ? শালিফলাদির অসত্ত্ব যদি সর্ব্বত্রই সমান হয় তবে কেন বিশেষ করিয়া শালিবীজাদি রোপণ করা হয় ? যাহারা ধান্য সংগ্রহ করিতে চায় তাহারা এরূপ স্থলে কোদ্রব বপন করিবে, (যেহেতু ধান্য ও কোদ্রব উভয়ই) অসৎ (সুতরাং) অনন্য ! কিন্তু (কোদ্রবে) সেই ফল না থাকায় তাহা (ধান্যার্থীদের দ্বারা) উপ্ত হয় না । আর (অসৎকার্য্যই যদি সত্য হয়) তবে ধান্যার্থিগণ ধান্যের বীজই বা বপন করিবে কেন, কারণ সবই তো ফলশূন্য ! কোদ্রববীজের ন্যায় ধান্যের বীজও নিষ্ফল হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে (কারণের মধ্যেই) কার্য্য নিহিত থাকে।

তৃতীয় হেতু (সর্বসম্ভবাভাবাৎ) সমর্থন করিবার জন্য শান্তরক্ষিত পরবর্ত্তী কারিকায় বলিলেন ঃ—

সর্বং চ সর্বতোভাবাদ্ভবেদুৎপত্তিধর্ম্মকঃ ।
তাদাত্ম্যবিগমস্তেহ সর্ব্বস্মিন্ন বিশেষতঃ ॥১০॥

(অর্থাৎ, উৎপন্ন হওয়াই যাহার ধর্ম্ম এরূপ প্রত্যেক বস্তুই তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইবে, কারণ কোন বিষয়েই কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকায় যে কোন বস্তু অপর যে কোন বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িবে।) কমলশীল ঃ—যদি আপনাদের ইহাই মত হয় যে কার্য্য বাস্তবিকই অসৎ, তবে যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হওয়াতেই বা বাধা কি ? ছাই ভস্ম ইত্যাদি হইতে

সুবর্ণরজতাদিরও উৎপত্তি হইবে। ইত্যাদি। সাংখ্যকারিকোক্ত চতুর্থ হেতুর (শক্তস্য শক্যকরণাৎ) সমর্থক একাদশ কারিকার ভূমিকায় কমলশীল বলিতেছেন :—যদি কার্য্যানুযায়ীই কারণের "শক্তি" প্রতিনিয়ত (determined) হয় তবে সৎকার্য্য ব্যতিরেকেও তো কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইবে,—কেবল আকাশকুসুমের মত কার্য্য যেখানে অলীক সেখানেই উৎপত্তি সম্ভব হইবে না; এতদনুযায়ী যে কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন না হউক—হওয়ার প্রয়োজনও নাই—উভয়ের মধ্যে যেখানে consistency রহিয়াছে (যদেব সমর্থম্) সেখানে কার্য্যোৎপত্তি হইতে বাধা কি? এই বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন ও চতুর্থ হেতু সমর্থনের জন্য পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

শক্তীনাং নিয়মাদেষাং নৈবমিত্যপ্যনুত্তরং।
শক্যমেব যতঃ কার্য্যং শক্তাঃ কুর্বন্তি হেতবঃ ॥১১॥

অর্থাৎ "শক্তি সকল নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় (যে কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে) না" (বৌদ্ধদিগের) এরূপ উত্তর যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অনিয়ন্ত্রিত "শক্তি"-সম্পন্ন হেতুসকলও যাহা শক্য তাহাই কেবল করিতে পারে, যাহা অশক্য তাহা পারে না।

(এতদুত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন) "কে বলিয়াছে যে 'যাহা অশক্য তাহা করা হয়' (কেনৈতদুক্তমশক্যং কুর্ব্বন্তীতি) যে আপনি তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন? কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে ("শক্তি"-সম্পন্ন হেতুসকল) অসৎ কার্য্যও করিতে পারে; কারণ তদ্বিষয়ে তাহারা শক্যক্রিয়"। এই কথাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইতেছে :—

অকার্য্যাতিশয়ং যত্তু নীরূপমবিকারি চ।
বিকৃতাবাত্মহান্যাপ্তেস্তৎ ক্রিয়েত কথং নু তৈঃ ॥১২॥

এ কারিকাটির অর্থ মোটেই সুস্পষ্ট নহে, তবে "পঞ্জিকা"য় কমলশীল ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—যাহা অসৎ তাহা কোন কিছুতে পরিণত হইতে পারে এ কথার অর্থ এই যে (হেত্বাবলি) এমন কিছুকে সৎ করিয়া তুলিল যাহার সৎ হওয়ার ক্ষমতা ছিল না (অশক্যক্রিয়ং কুর্ব্বন্তি)। যাহা অসৎ তাহা রূপহীন ও নিঃস্বভাব; যাহা রূপহীন তাহা শশশৃঙ্গাদির মতই কোন প্রকার কার্য্য হইতে উৎপন্ন নয় (অকার্য্যাতিশয়ম্); যাহা কোন প্রকার আধেয় হইতে উৎপন্ন হয় নাই

(অনাধেয়াতিশয়ম্) তাহা আকাশের মতই অবিকারী। যাহাতে কোনক্রমেই কোন প্রকার বিশেষ রূপ আরোপ করা যায় না তাহা কিরূপে কোন কিছুর দ্বারা কৃত হইয়া থাকিতে পারে? যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে সদবস্থা সম্ভব হইল, তথাপি তাহার বিকার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কারিকায় বলা হইয়াছে "বিকৃতাবাত্মহান্যাপ্তেঃ"; অর্থাৎ বিকৃতি যদি ঘটে তবে তাহাকে আর রূপহীন বলা চলিবে না। অসৎ তাদ্রূপ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সতে পরিণত হইতে পারে এরূপ আপত্তিও অযৌক্তিক। এবং তাদ্রূপ্য পরিত্যাগ করিলেই যে অসৎ সতে পরিণত হয় একথাও বলা যায় না। সদ্রূপ ও অসদ্রূপ সম্পূর্ণ পৃথক,—একটিকে পরিহার করিলে তবে অপরটির সিদ্ধি। সুতরাং যাহা অসৎ তাহা অশক্যক্রিয়। আকাশকুসুম সৃষ্টি করার ন্যায়ই যাহা অশক্য তাহা সম্পাদন করা অসম্ভব।

এইবার সৎকার্য্যবাদের শেষ (পঞ্চম) হেতু (কারণভাবাৎ) সমর্থনোদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত কারিকা করিলেন ঃ—

কার্য্যস্যৈবমযোগাচ্চ কিংকুর্ব্বৎ কারণং ভবেৎ।
ততঃ কারণভাবোঽপি বীজাদের্ন বিকল্পতে ॥১৩॥

অর্থাৎ, কার্য্য ও কারণের মধ্যে যদি বাস্তবিক কোন যোগই না থাকে তবে কারণ করে কি (অর্থাৎ, কিসের উপর কাজ করে)? তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে বীজাদি কারণ নয়, যেহেতু তাহাদের কার্য্য অবিদ্যমান; বীজাদি তাহা হইলে আকাশকুসুমের মতই অলীক বস্তুতে পরিণত হইবে। ইহা যখন ঠিক নয় তখন স্বীকার করিতে হইবে যে উৎপত্তির পূর্ব্বেই কার্য্য সৎ। (কমলশীল এই অল্প কথাতেই কারিকাটির ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন।)

সাংখ্যকারিকায় যে সৎকার্য্যবাদের সপক্ষে পাঁচটি যুক্তি দেখান হইয়াছে সেগুলি এতদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধ পক্ষ হইতে কিন্তু এখনও প্রশ্ন করা চলিতে পারে, "প্রধান" হইতেই যে বিভিন্ন কার্য্যাবলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কোথায়। ইহার উত্তর পরবর্ত্তী কারিকায় দেওয়া হইতেছে ঃ—

সুখাদ্যন্বিতমেতচ্চ ব্যক্তং ব্যক্তং সমীক্ষ্যতে।
প্রসাদতাপদৈন্যাদি কার্য্যস্যোপলক্ষিতঃ ॥ ১৪ ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শান্তরক্ষিত ইচ্ছা করিয়া কারিকাটিকে দুর্ব্বোধ্য

করিয়াছেন, নতুবা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই অর্থে "ব্যক্ত" কথাটি উপর্য্যুপরি দুইবার প্রয়োগ করার আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহাই হউক কমলশীলের কৃপায় ইহার অর্থোদ্ধার সম্ভব ঃ—"দেখা যায় যে ব্যক্ত জগৎ সুখাদিসমন্বিত, কারণ পৃথিবীতে সুখদুঃখদৈন্যাদির উপলব্ধি হয়।" এই কারিকার উপর মন্তব্যচ্ছলে কমলশীল বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রধানের" অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য এই পাঁচটি প্রমাণ দেখান হইয়া থাকে, যথা ঃ—ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। কারণকার্য্যবিভাগা-দবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য। কারণমস্ত্যব্যক্তম্॥ (সাংখ্যকারিকা ১৫-১৭)। ইহার অর্থ এই* ঃ—"প্রধানের" অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাহার ভেদসকল পরিমাণবদ্ধ। পৃথিবীতে দেখা যায় যে যাহারই কেহ কর্ত্তা আছে তাহারই পরিমাণও আছে, যেমন কুম্ভকার পরিমিত মৃৎপিণ্ড হইতে পরিমিত ঘট নির্ম্মাণ করে। মহদাদ্যাত্মক ব্যক্ত জগৎও পরিমিতাকারেই দৃষ্ট হয়, যথা "একটি" বুদ্ধি "একটি" অহঙ্কার, "পঞ্চ" তন্মাত্র, "একাদশ" ইন্দ্রিয়, "পঞ্চ" ভূত ইত্যাদি। সুতরাং অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে (অনুমানেন সাধয়ামঃ) যে ব্যক্ত জগতের উৎপাদক কোন "প্রধান"ও আছে, এবং এই প্রধানই পরিমিত ব্যক্ত জগতের উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি প্রধান না থাকিত তবে জগৎও নিষ্পরিমাণ হইত।

প্রধানের অস্তিত্ব আরও এই কারণে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভেদসকল বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়, এবং এই সমন্বয়ের হেতু এই যে উৎপন্ন দ্রব্য যে জাতীয় তাহার কারণও সেই জাতীয় না হইয়া পারে না। ঘট ও শরাবাদি বিভিন্ন হইলেও মৃজ্জাতিকত্বে তাহাদের সাধর্ম্ম্য। এখন ব্যক্ত জগৎও সুখ দুঃখ মোহাদি জাতিসমন্বিত, কারণ জগতে (সুখ দুঃখ, মোহাদির অনুযায়ী) আনন্দ, দুঃখ, দৈন্যাদির উপলব্ধি হয়। সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রসাদ, লঘুতা, প্রেম, হর্ষ, ইত্যাদি ; সুখই সত্ত্ব। রজোগুণের কার্য্য তাপ, ভেদ, উদ্বেগ প্রভৃতি ; দুঃখই রজঃ। তমোগুণের কার্য্য দৈন্য, আবরণ, অবসাদ, বীভৎস ইত্যাদি ; মোহই তমঃ। এখন প্রসাদ, তাপ, দৈন্যাদি মহদাদিরই কার্য্য। সুতরাং অনুমান হয় মহদাদি সুখ, দুঃখ, মোহ এই তিনের বিশেষ বিশেষ সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের

* এখানেও কমলশীল স্বয়ং সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রসাদাদি কার্য্য হইতে এতদ্বারা প্রমাণিত হইল এগুলি সুখাদ্যন্বিত (belonging to the category of সুখ etc.); মহদাদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত সমজাতীয় হওয়ায় (তদন্বয়াৎ) আরও প্রমাণিত হইল যে মহদাদি সত্ত্বরজস্তমোময় "প্রকৃতি" হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। একথা স্বীকার করিলে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে যাহা প্রকৃতি তাহাই প্রধান।* প্রধান আছেই, কারণ ভেদাবলির মধ্যেও অন্বয় (harmony) পরিলক্ষিত হয়।

প্রধানের অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ এই যে কার্য্যাবলির প্রবৃত্তি তাহাদের শক্তি† অনুযায়ী হইয়া থাকে। পৃথিবীতেও দেখা যায়, যে বিষয়ে যাহার প্রবৃত্তি সেই বিষয়েই তাহার শক্তি—যেমন তন্তুবায়ের শক্তি পটকরণে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে প্রধানের এমন শক্তি আছে, যাহা হইতে ব্যক্তজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই শক্তি কিন্তু নিরাশ্রয় হইতে পারে না। অতএব শক্তির আশ্রয়স্বরূপ একটি প্রধান আছেই। প্রধানের অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ এই যে কার্য্য ও কারণের মধ্যে বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। যথা মৃৎপিণ্ড কারণ এবং ঘট কার্য্য; এই ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে বিভিন্নস্বভাব, কেননা ঘট মধূদকাদি ধারণ করিতে পারে কিন্তু মৃৎপিণ্ড তাহা পারে না। এইরূপ মহদাদি কার্য্য লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রধান আছে,—যাহা হইতে মহদাদি কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানের অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ এই যে বৈশ্বরূপ্যের মধ্যে বিভাগ নাই। ত্রিলোকের নাম বৈশ্বরূপ্য। প্রলয়কালে ত্রিলোকের মধ্যে আর বিভাগ থাকেনা, তখন সমস্তই প্রধানে মিলিত হইয়া এক হইয়া পড়ে। অবিভাগের অর্থ অবিবেক (non-discrimination); দুগ্ধ যতক্ষণ অবিকৃত থাকে ততক্ষণ যেমন এইটি ক্ষীর, এইটি দধি—এইরূপ পার্থক্য করা যায় না। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে প্রধান আছে, প্রলয়কালে যাহার মধ্যে মহদাদি সম্মিলিত হইয়া আপনাপন স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিতে পারে।

আচার্য্য (শান্তরক্ষিত) স্পষ্টতঃ কারিকায় (ঈশ্বরকৃষ্ণোক্ত হেতুপঞ্চকের মধ্যে) কেবল "সমন্বয়াৎ" এই হেতুটিরই উল্লেখ করিয়াছেন; অপর হেতুগুলির স্পষ্ট উল্লেখ

---

* তৎসিদ্ধৌ চ সামর্থ্যাগ্যাসৌ প্রকৃতিস্তৎ প্রধানমিতি সিদ্ধম্।

† শক্তি কথাটি সর্ব্বত্র latent energy অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

না থাকিলেও সেগুলি ইহারই মধ্যে implicit রহিয়াছে (পরিশিষ্টানামুপলক্ষণার্থঃ)। কারিকার "সুখাদি"শব্দান্তর্গত "আদি" শব্দ দ্বারা দুঃখ ও মোহেরও গ্রহণ বুঝাই-তেছে। কারিকায় "ব্যক্তম্" এই শব্দ দ্বারা মহদাদি ও ভূতাবলি বুঝাইতেছে; "ব্যক্তং সমীক্ষ্যতে" ইহার অর্থ "স্পষ্টই উপলব্ধি হয়"।

এইরূপে (সাংখ্যকারিকোক্ত) 'সমন্বয়াৎ' এই কথাটির দ্বারা উদ্দিষ্ট হেতুর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া পরবর্ত্তী কারিকায় তাহার প্রমাণ দেখান হইতেছে ঃ

তততন্ময়সম্ভূতং তজ্জাত্যন্বয়দর্শনাৎ।
কুটাদিভেদবত্তচ্চ প্রধানমিতি কাপিলাঃ॥ ১৫॥

কমলশীল ঃ—"তন্ময়সম্ভূতম্" এই কথার অর্থ সুখাদিময় (ত্রৈগুণ্য) কারণ হইতে যাহা উদ্ভূত। ইহাই হইল সাধ্যনির্দ্দেশ (probandum)। "তজ্জাত্যন্বয়দর্শনাৎ" —ইহাই হইল হেতু। অর্থাৎ, যাহা তন্ময়সম্ভূত তাহা ত্রৈগুণ্যানুগত। 'কুটাদি' কথাটির অর্থ 'ঘটাদি'। (সমস্ত কারিকাটির অর্থ* তাহা হইলে দাঁড়াইল এই ঃ— অভিজ্ঞতা হইতে যেহেতু জানা যায় যে জগৎ ত্রৈগুণ্যজাতীয়, সুতরাং জগৎ এই ত্রৈগুণ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। জগতে যে নানা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—তাহা একই মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত বিভিন্ন ঘটের পার্থক্যেরই অনুরূপ। জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর মূল উপাদানকেই কপিল-শিষ্যগণ 'প্রধান' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন)।

ইহাই হইল সৎকার্য্যবাদের সমর্থন। এখন তাহার প্রতিবিধান আরম্ভ হইবে।†

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

---

* ইহার আক্ষরিক অনুবাদ হইতে কোন অর্থই পাওয়া যাইবে না।

† এই প্রবন্ধটির ভূমিকাংশে শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

কিন্নর দল

পাড়াটায় ছ' সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরের কাছে পরস্পরে ধার ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না!

পূর্ব্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারাও খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়ীটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর বড় ছেলে পশ্চিমে চাকুরী করে, মেজছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোটছেলেটি জন্মবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড়ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড়ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড়ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দুদিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাং হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার বাড়ীতে ভাঙ্গা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায় গিন্নী, মুখুয্যে গিন্নী, বোস গিন্নী, চক্কতি গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্প বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরণের চর্চ্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরণের অপ্‌টিমিষ্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁঠাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের কাঁটাল যখন পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক আধখানা যদি থাকে, তো বলি যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছের, তো বলে কিনা রোজ রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলোতো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এদের এই মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুজ্যের মেয়ে শান্তি—ষোল সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো—ওঃ, সে কথা আর বোলোনা খুড়ী মা, কি ব্যাপক মেয়ে মানুষ ওই মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি ক্ষুরে নমস্কার বাবা, বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তার পর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না এমন সময় রায় বাড়ীর বড়বৌ হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা

শোনোনি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেচে! বট্‌ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে। সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌লো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানা রূপ প্রশ্ন করতে লাগলো।

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হলো না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মন-মরা ভাবটা এক মুহূর্ত্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা ও ঘোঁটের আভাস এরা পেলে রায় বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে, ভেতরে তাহোলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস্ গিন্নী বল্লেন—তাই বল। নইলে এম্‌নি কোথা কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে একি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটা? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তা হোলে রগড়টা আরও জমে।

রায়বৌ বল্লেন, হিঁদুই—মেয়েটা বদ্দির বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দির বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা এক প্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ তা অনেক! শুনচি চব্বিশ পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত! রামো ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন, তা হোলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বল্লেন, বিধবা না তো?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন, আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো—তারপরে বাকী সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নূতন ও ভারী মজার খবর বটে মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হোল। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘট্‌লো। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ীর চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগলো। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগগির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেন নি—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তাঁর দাদাও কলকাতায় বদ্‌লি হবার চেষ্টা করচে।

মেয়ে মজলিসে সবাই তো অবাক্। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস্ না হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিষ্টানি কাণ্ড কারখানা, কালে কালে হোল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা! যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন্ সাহসেই বা আসবে!

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ীতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করে নি। একদিন একখানা নৌকা এসে গ্রামের ঘাটে তুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকা থেকে নাম্‌লে শ্রীপতি, তার নব বিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর, ও তুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি বোঝাই টুকিটাকি জিনিষ। ঘাটে তু একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বল্লে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ী গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ীর মেয়েরা অত সহজে রেহাই

পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও-পিসিমা, ও-বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছকাছির দু'তিন বাড়ীর মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সরলা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ীর উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরণের দামী সিল্কের শাড়ী দেখে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্ব্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরণের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটামত মাগী আধ ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখলে এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি...। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি গিন্নীকে জিগ্যেস্ করলেন—

—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলো—চমৎকার, খুড়ীমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন. সত্যিই অদ্ভুত ধরণের ভাল।

নিতাই মুখয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে না, সত্যিই বলছে। বল্লেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি গিন্নী নিজেই বল্লেন—না বৌ, যা ভেবেছিলাম, তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, সহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘসছে, পাউডার ঘসছে, তোমার আমার মত রাঁধতে হোত, বাসন মাজতে হোত তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় থাকে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত-যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার ও সাবান ঘসলে যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির এ কথা মনে হোল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন, আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজ্‌লিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু মত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চল্‌ছে।

—ধরণ ধারণ যেন কেমন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়,। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হোলে ওহাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় লেক্‌লেস্ ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ্ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দির বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাত পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর সপক্ষে বল্লে কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, তোমরা কারো ভাল দেখতে পারো না বাপু। কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দরলোকের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোনো ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে ? সাদাসিদে শাড়ী সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়-চোপড়—ময়লা একেবারে হু চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে; ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে। আয়না, পিক্‌চার, দোপাটিফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতি দা'র বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট্ গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্ত্তে আলো হয়ে উঠে, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালোকোলো, আধ-ময়লা সাড়ী পরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা পরিহিত মূর্ত্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক-ছাঁদে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ী ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজ্‌নেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছে এটা খাপছাড়া বলে মনে হোল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবাটার ইতিহাসে।

রায় পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আহা, বৌ তো নয়, যেন পির্‌তিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন বাজ্‌তে! না ওহাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস্ আছে! হাত দেখেই বুঝ্‌ছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করছে। ইতিমধ্যে শ্রীপতির কল্‌কাতায় বদলি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ী থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটে হয়ে পড়লো। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচিহালুয়া খেতে দেয় নি।

একদিন কমলা বল্লে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড় মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্য্যন্ত করিনি কেন জানো, গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ী বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি?

একটু পরে রায়গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ীর মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার বৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ী কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এস্‌রাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা বাজিয়ে শুনিয়েছিল—

রায় বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারি চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোনো ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস করো না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ সে আর তোমায় কি বলবো খুড়ীমা, বৌদিদি যা বাজালে, জীবনে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তাঁহোলে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ী চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো !

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এস্রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ী বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জোৎস্নাভরা ভেতর বাড়ীর রোয়াকে বসে বৌ এস্রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেছে। শ্রীপতি বাড়ী নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজগে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেছে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি ?

—না ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজি, ম্যয় গিরধর কে ঘর যাঁহু
গিরধর ম্হারা সাচে প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আল্‌গোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ী দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দীগান গাইলে শ্রীপতির বৌ, এরা অবিশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো—শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখলে।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হোল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুসিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিষটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে। কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখে নি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপনপর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়ীতে চক্কত্তি গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি গিন্নী একটু অবাক হোলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এসো, এসো মা আমার এসো। থাক্, তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করে বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথার চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হোল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ীর যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে! এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোণালি রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুয্যে বাড়ী পূজো হয় প্রতি বছর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ী আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগ্‌লা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্ব্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শিখ্‌বার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর তা দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক্! থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিষটার নাম শুনেছে বটে সে কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে—কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল!

শ্রীপতির বৌ হেসে বল্লে— সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—ছাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ী আসে, তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটী ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়েদুটির মধ্যে যেটির

বয়েস বছর তেরো, সেটি তত দেখতে সুবিধে নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্ত মাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কতি গিন্নী তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিণ্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয় সব কেমন আছিস্? ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি—

—ওঃ কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদা বাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ রং ও গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়েসের তফাৎ। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই বোন্, বাকী সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই বোন্।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক্। এসব পড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে মেয়ে কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিণ্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোষাক এনেছে, সিক্ত নীল পোষাক, সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটশুদ্ধ মেয়েরা বোস্ গিন্নী, মণ্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার

গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব্ব অনুভব করে, যখন পিণ্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আসুন বাড়ী যাই।

পূজো এসে পড়লো। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসবই নেই পূজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পূজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পূজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্য্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব আমোদ নেই এখানে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধহয় সেইজন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ীর লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ বসিয়ে দড়ি টাঙিয়ে হল্‌দে শাড়ী ঝুলিয়ে ষ্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাইবোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাট্‌ছে।

শান্তি বল্লে—তুমি এত জানলে কি করে বৌদি?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়ীতে থিয়েটার হয় দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠমশায়?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশাইয়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভাল বেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দুজনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নবযৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হোল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্ত্তকী হিসেবে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা। রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান যুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো ষ্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা, পিণ্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য। অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হোল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি গিন্নী ও শান্তির মা ও মণ্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ওপাড়ার রাম গাঙুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! কি চমৎকার করলে বৌমা! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মন্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুক্রো। যেমন সব চেহারা তেমনি গান,—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছুপিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই যুঁইফুলের মালাটি বৌদিদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয়নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিন্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!...

শান্তির মা বল্লেন—পিন্টু খাচ্ছে না ছাখো সেজ বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো খিদে পেয়ে গিয়েছে।...কি চমৎকার মানিয়েছিল পিন্টুকে না সেজ বৌ—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে...

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলে মানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুসি হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হোল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বল্লে—নামটি বেশ কিন্নর দল না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বল্লে, কৃত্রিম গর্ব্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক বালিকার দল সকলে একযোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠ্‌লো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি, কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে. তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এম্‌নি হাসিখুসি মিষ্টি স্বভাব সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য্য কি?

মন্টুর মা ভাবলেন কিন্নর দলই বটে!...

ওদের খেতে খেতে হাসিগল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বল্লে, আসুন বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ী যাবেন কেন? গল্প করে কাটানো যাক্।

শ্রীপতি বাড়ী নেই সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রে যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেই জন্যে সকলেই বল্লে তা ভালো কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বল্লে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা এক সঙ্গে গাইলে।

একটি মাত্র তেড়োপাখী বাঁশ গাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাকতে আরম্ভ করেছে। রাত ফর্সা হোল।

সেই মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরণের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিষ্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েছে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চ্চা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক, বাজনার ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে তুমি কোথাও যেওনা বৌদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেছে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেছে। গান বাজনায় আজ কাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না শান্তির সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েইসে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ী থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াশুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদিদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন

শ্রীপতির বৌ বল্লে—জানিস্ শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে সুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক্ ওসব, কি যে বল বৌদি।

···　　　　···　　　　···

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাট্‌লো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন্ এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি বাণপুর, ওর শ্বশুর বাড়ীতে। গ্রামের অন্য অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এগাঁয়ে করতে দেখা যায়নি। রায় গিন্নী, চক্কত্তি গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে তুদিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল স্বভাবে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্ত্তন যে কতখানি, এই সময়ে গ্রামের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কত্তি বাড়ীর তুপুর বেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, তুদিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্‌খনো করেনি,...আহা! আমার কপাল পোড়া, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে হেসে 'আমরা কিন্নরের দল, খুড়ীমা' শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল।···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান...ও কি আর মানুষ, মা?

কথা বলতে বলতে মণ্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এ সবের মধ্যে কবল কথা বলতো না শান্তি। তোর বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ী এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পূজোর পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ী এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ, কেউ জানে না। মুখে সে সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

... ...

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটীছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ী থেকে শান্তিদের বাড়ী বেশী দূর নয়, দুখানা বাড়ী পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতি দাদাদের বাড়ীতে কে গান গাইচে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতে সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

বিরহিনী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠ্‌লো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্ত্তে ছুটে গেল। কখনো ভুলবো জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোস্না রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল। সেই অপূর্ব্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণ-ঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেচে। ফুট্‌ফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ী তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা, মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ী এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্চে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাহিরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কল, কলকাতা থেকে আজ চেয়ে আনলুম্। ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বল্লে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হোল তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পূজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বৌদিদি বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগ্‌লো!

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পেন ও ব্রিটিশ বৈদেশিক-নীতি

(১)

মহাসমরের পুনরাগমন আমাদের মনে আসন্ন আশঙ্কারূপে উদিত হবার পর ছয় বৎসর কেটে গেছে। বিভীষিকা এখনও সত্যে পরিণত না হ'লেও উল্লাসের বিশেষ কারণ নেই। জগদ্ব্যাপী সঙ্ঘর্ষের আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া নিশ্চয়ই কিছু সময়সাপেক্ষ; বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েক বছর ধরে যে-রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, আমরা এখন তারই পুনরাস্বাদনে নিযুক্ত আছি। এক হিসেবে সঙ্ঘাত আরম্ভ হয়ে গেছে এ কথাও বলা চলে। ইথিওপিয়ায় ইটালির অভিযান, স্পেনের অন্তর্বিরোধে সহস্র সহস্র বিদেশীর যোগদান, চীনের উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে সংহার-লীলা পরে হয়ত মহাসংগ্রামের ভূমিকারূপেই গণ্য হবে। এই অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হ'লেও আমাদের বিপদ অবসান হয় না। সমরসজ্জা ও অস্ত্র-আস্ফালনের মধ্যে যে-অশান্ত অনিশ্চয়তা নিহিত থাকে তার অন্তরালে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা থেকে দৃষ্টি অপসারিত হ'লেও সে অবস্থার গুরুত্ব বেড়েই চলে এবং এ পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির সকল অঙ্গই যে বিকল হয়ে পড়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক শান্তি-ভঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ১৯৩১-১৯৩২ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নির্ব্বিবাদে অবহেলা করে। তারপর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু নাৎসি প্রভাবের ফলে জার্মানি রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ ও সন্ধি সর্ত্ত অগ্রাহ্য করে' অস্ত্রশক্তির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করল; জার্মান বৈদেশিক-নীতির এক লক্ষ্য হ'ল মধ্য ইয়োরোপে পুরাতন প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অপর উদ্দেশ্য নৌবল ও উপনিবেশের পুনরভ্যুত্থান। অন্যদিকে ইটালি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-বিস্তারে ও ভূমধ্যসাগর নিজের করায়ত্ত করবার চেষ্টায় উদ্যত হ'ল। গত দেড় বছরে এই তিনটি দেশের অগ্রগতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইটালি আবিসিনিয়া বিধ্বস্ত করল গ্যাস-প্রয়োগে, ব্রিটিশ নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরাজয় ও তার প্রভাবের অবসান হ'ল। জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষরিত লোকার্ণোচুক্তি

ভঙ্গ করে' রাইন্‌ল্যাণ্ড অধিকার করে' বস্‌ল ; জার্ম্মান প্রভাব প্রবলতর হয়ে উঠল পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীসে; চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপদ তাই ঘনীভূত হয়ে এল ; অবস্থা দেখে বেলজিয়ম্ ফ্রান্সের সঙ্গে নিবিড় সখ্য পরিবর্ত্তিত করে' ফেল্‌ল নিরপেক্ষ নীতিতে। জার্মানি ও ইটালির মিলিত সাহায্যে বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো স্পেনে প্রদেশের পর প্রদেশ দখল করতে লাগলেন। আর এখন জাপান জার্মানির সঙ্গে সাম্যবাদবিরোধী এক চুক্তি করবার পর সাড়ম্বরে চীনদেশকে গ্রাস করবার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে উপরোক্ত ঘটনাবলীর কি পরিণাম দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে কল্পনা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু এর উল্লেখমাত্রেই সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

আজকের আন্তর্জাতিক অবস্থা জটিল করে তুলেছে তিনটি শক্তি—জাপান, জার্মানি ও ইটালি। এদের স্বপক্ষে বলা সম্ভব যে অন্য বিরাট রাষ্ট্রগুলি অন্যায় ভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ আয়ত্ত করে' এদের বঞ্চিত করে' রেখেছে কিন্তু এদের পূর্ব্বতন নীতিও কি কোন অংশে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অধিক প্রশংসনীয় ছিল ? যুদ্ধের প্রবর্ত্তনা করে' ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই এদের উদ্দেশ্য, এ যুক্তি কি হাস্যাস্পদ নয় ? চীন, স্পেন, আবিসিনিয়া প্রভৃতি যারা এদের প্রকোপ অনুভব করছে তাদের কি কোনও ন্যায্য অধিকার নেই ? শোনা যায় আর্থিক দুরবস্থার চাপই এই রাষ্ট্র তিনটিকে এত উদ্ধত করেছে। একথা অবশ্যই সত্য কিন্তু অপর জাতির উপর অত্যাচারের পরিবর্ত্তে এই দেশগুলিতে আমূল আর্থিক সংস্কার ও নূতন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাও ত' সম্ভব ছিল। তবে কি সে সম্ভাবনার পথরোধের আশাতেই আজ ইটালি, জার্মানি ও জাপান যুদ্ধের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে ? এই তিন দেশেই শাসকেরা ফাশিষ্ট-ভাবাপন্ন আর ফাশিস্‌মোর মূল নীতিই হ'ল শ্রমিক-সাধারণের অসন্তোষ প্রকাশের সম্ভাবনা দমন। গণতন্ত্রের আপেক্ষিক উদার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যখন আর ধনিকপ্রভুত্ব বজায় থাকে না, তখনই ফাশিষ্ট কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন হয় ; আর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে রাজ্য ও প্রভাব প্রসারের ফলে আভ্যন্তরীণ দুরবস্থার হ্রাস সাধনই কি ফাশিষ্ট আধিপত্যের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ?

(২)

সমসাময়িক অন্য সকল ঘটনার চাইতে স্পেনের অন্তর্বিরোধই আজ মনকে বেশী নাড়া দেয় এর বৈধ কারণ আছে। অবাধ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় আস্থাবান

আধুনিক লোকের চোখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শোচনীয় পরিণাম স্বাভাবিক বলেই প্রতীয়মান হয়। কূটনীতির বলে সুহৃদ্‌-ভেদের পর নূতন দলগঠন বৈদেশিক উদ্যমের চিরা-চরিত প্রথা। আবিসিনিয়া বিজয় কিম্বা দুর্ব্বল চীনের উপর আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদের অভ্যস্ত উদাহরণ মাত্র। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধে আজ অন্ততঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগসন্ধি প্রতিভাত হয়েছে। এর মধ্যে ফাশিষ্ট্‌ ও সাম্যবাদীর বিরোধ নিহিত আছে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সে সঙ্ঘর্ষই হয়ত এ সংগ্রামের মূল কথা। কিন্তু স্পেনে সমস্ত দেশ আজ ব্যাপকতর মতভেদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। একদিকে পুরাতন সভ্যতা ও বিধি ব্যবস্থার রক্ষক ও সমর্থক সকলে ফ্রাঙ্কো ও তাঁর মিত্রশক্তিদের আশ্রয় নিচ্ছে; অপরদিকে প্রগতিকামী সকল-জাতীয় সংস্কারক জনসাধারণের সম্মিলিত দলগঠনে ব্যস্ত। এ প্রভেদ আজ সকল দেশেই অল্পবিস্তর প্রবল। তাই স্পেনের বিরোধ আজ সমস্ত ইয়োরোপের দ্বিধামূর্ত্তি মুকুরিত করছে। সাম্প্রতিক সাহিত্য পর্য্যন্ত এর প্রতিধ্বনিতে মুখর। ইয়োরোপীয় ইতিহাসে এর অনুরূপ অবস্থা একেবারে বিরল নয়। চার শতাব্দী আগে ক্যাথলিক্‌ প্রটেষ্টান্টের সংগ্রাম বহুবর্ষ ধরে সকল দেশকে মথিত করেছিল একথা সকলেই জানে। একশত বৎসর আগেও অবাধ রাজশক্তি ও উদার জনতন্ত্রের সঙ্ঘর্ষ সমস্ত মহাদেশটিকে ক্ষুব্ধ করে-ছিল। আজকের দিনেও যদি তাই শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রসারের আদর্শের বিরোধ ঘটে তবে এক হিসাবে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে একথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নয়। সারা জগতের দক্ষিণ ও বামপন্থার বৈরীভাব আজ স্পেনে মূর্ত্তি নিয়েছে,—তাই সকলের দৃষ্টি আজ এই বন্ধুর মালভূমির উপর নিবদ্ধ।

(৩)

ইতিহাসের মূলধারার সন্ধান করলেই তার বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয় না। তাই স্পেনেও নানা জটিল সমস্যার আবর্ত্ত ও স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত সহজেই চোখে পড়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে বিশিষ্ট মতবাদের প্রতি আন্তরিক টান বা ঝোঁক ছাড়াও সংকীর্ণতর নিজস্ব স্বার্থের সন্ধানচিহ্ন নিশ্চয়ই সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সব দেশে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয়নি সেখানে গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে চঞ্চল জনমতের প্রভাবে পররাষ্ট্রের প্রতি ব্যবহারেও মাঝে মাঝে আংশিক পরিবর্ত্তন আসতে পারে। তাই স্পেনে

এখন দক্ষিণ ও বামের দ্বন্দ্ব অন্য প্রশ্নের আড়ালে লোকচক্ষুর থেকে সাময়িক ভাবে অন্তর্হিত হ'লেও তাতে কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই—শুধু তাতে আসল সমস্যার সমাধান হ'ল না একথা মনে রাখা উচিত। ভূমধ্যসাগরে শক্তিসাম্য ও নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা কিম্বা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার প্রয়াস ও জার্মানির হৃতরাজ্য উদ্ধারের বাসনা এইভাবে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

স্পেনের আনুকূল্য ইটালির ভূমধ্যসাগরে প্রতিপত্তির পক্ষে প্রধান সহায়। এই সমুদ্রের পূর্ব্বকোণে ইটালি-অধিকৃত ডোডোকানেস্ দ্বীপমালা সাবমেরিন্ ও বিমানের আশ্রয় হিসাবে উৎকৃষ্ট ; পশ্চিম অঞ্চলে স্পেনের বালারিক্ দ্বীপপুঞ্জ সেই ভাবে ব্যবহার করতে পারলে ইটালির পক্ষে দ্বিগুণ সুবিধা। ভূমধ্যসাগরকে ইটালিয়ান্‌রা বলে আমাদের সমুদ্র ; তাছাড়া প্রয়োজনীয় নানা জিনিষের আম্‌দানি ও আফ্রিকায় নূতন "রোমান সাম্রাজ্যের" সঙ্গে যোগরক্ষার জন্যও ইটালি এখানে প্রাধান্য চায়। ১৯৩১ সালে স্পেনে রেপাব্লিক স্থাপিত হবার পর গণতন্ত্রের প্রসার ইটালির চক্ষুশূল হয়েছিল, কেননা পূর্ব্বতন রাজা ও ডিক্‌টেটার অনেকখানি ইটালির অনুগত ছিলেন এবং রেপাব্লিকান স্পেন শক্তিশালী হয়ে উঠলে ফাশিষ্ট ইটালির বিপক্ষাচরণই তার পক্ষে স্বাভাবিক মনে হ'ত। তাই ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইটালির সাহায্য অপর্য্যাপ্ত ভাবে এসে উপস্থিত হ'ল এবং আন্তর্জাতিক নানা চেষ্টা সত্ত্বেও সে সাহায্যের এখনও বিরাম নেই।

জার্মানির পক্ষে স্পেনে কর্ত্তৃত্ব অতটা আবশ্যক নয় তাই মোটের উপর ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে জার্মান সহযোগিতার পরিমাণও কিছু কম। হিট্‌লার অবশ্য সাম্যবাদের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ ঘোষণা করে বারবার বলছেন যে বল্‌শেভিক্ স্পেনের প্রতিষ্ঠা জার্মানি কখনই সহ্য করবে না কিন্তু স্পেনে যে-রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে হিট্‌লার যোগ দিয়েছেন তাকে বল্‌শেভিক্ বলা চলে না ; রেপাব্লিক ও গণতন্ত্র যে সাম্যবাদের সামিল এ কথা ফাশিষ্ট্ নেতারই উপযুক্ত। ফাশিষ্ট্ মনোভাব যে শুধু কমিউনিজম্ নয়, সাধারণ উদার মতবাদকেও ভয় করে' চলে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিট্‌লার নিজেই দিচ্ছেন—Popular Front-এর সার্থকতা এর চেয়ে আর কি বেশী হ'তে পারে? বর্ত্তমান অবস্থায় মধ্যপন্থার পৃথক অস্তিত্বও তাই বজায় রাখা দুরূহ, তাতে করে সম্ভবতঃ শুধু ফাশিষ্ট্‌দেরই সাহায্য করা হবে। জার্মানিরও অবশ্য সংকীর্ণতর স্বার্থসন্ধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র এ অঞ্চলে রয়েছে। উত্তর স্পেনের

খনিজ পদার্থ লোভজনক ; মরক্কো প্রদেশে নষ্টপ্রভাব পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয় ; স্পেনের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করা সহজ কারণ ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত বহুদিন ধরে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে ; কেনারি দ্বীপমালায় সাব্‌মেরিন্ ও বিমান রাখতে পারলে জার্মানেরা বিরোধী জাহাজের আফ্রিকা প্রদক্ষিণও বিপদসঙ্কুল করে তুলবে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে স্পেনের ব্যাপারে বিব্রত করে তুললে হয়ত ভের্সাই সন্ধিতে সমর্পিত উপনিবেশের কিছু কিছু জার্মানির হাতে ফিরতে আসতে পারে, এই ধরণের একটা আশাও হিট্‌লারের মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয়।

স্পেনে ঠিক এখন সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পথে বাধা রয়েছে একথা কমিন্‌টার্ণের অগোচর নেই আর সে দেশে রুষরাষ্ট্রেরও কোন সাক্ষাৎ স্বার্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও রাশিয়াকে স্পেনের গভর্ণমেন্টের সাহায্যে যথাসম্ভব অগ্রসর হতে হয়েছে। ফাশিষ্ট্ বিদ্রোহ সফল হ'লে ইয়োরোপের আর একটি দেশ থেকে সাম্যবাদীদলের উচ্ছেদ হবে এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরিপন্থী দল সর্ব্বত্র পুষ্টিলাভ করবে। জার্মান ও ইটালির শক্তিবৃদ্ধি সোভিয়েটতন্ত্রের পক্ষে সম্যক্ বিপজ্জনক একথা কারো অবিদিত নেই তাই স্পেনের সংগ্রাম-ফলের উপর রাশিয়ার আত্মরক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করছে। ১৯৩৩ এর নাৎসি-অভ্যুদয়ের পর থেকে আত্মরক্ষার ভাবনাই সোভিয়েট্-শক্তির মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীর মূল কারণই হ'ল তাই। দেশে দেশে ঠিক এই মুহূর্ত্তে বিপ্লবের অধীর উদ্যমের চাইতে বল্‌শেভিক্‌দের এখন বেশী আবশ্যক হয়ে পড়েছে সম্মিলিত জনশক্তির উদ্বোধনে ফাশিষ্ট্ অগ্রগতির নিরোধ প্রচেষ্টা। আজ কমিউনিষ্ট দলের ফ্রান্স ও স্পেনে বুর্জ্জোয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা সেইজন্য সম্ভব হয়েছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ষ্টালিনের নীতির উপর ট্রট্‌স্কির উগ্র আক্রমণ অনেকখানি অবাস্তব ও অসঙ্গত। ট্রট্‌স্কি-আন্দোলন শুধু রুষরাষ্ট্রকে এবং সম্প্রতি ক্যাটালোনিয়ায় স্পেন সরকারকে বিব্রত ও দুর্ব্বল করবার চেষ্টা করে ক্ষান্ত হয়নি। বিপ্লবের ইউটোপীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ট্রট্‌স্কির বন্ধুরা ফাশিষ্ট্ বিপদকে অবহেলা করে স্থান বিশেষে জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনও বাঞ্ছনীয় ভেবেছেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে ষ্টালিন কখনও এ নীতি উপায়ান্তর থাকলে গ্রহণ করবেন না। অথচ তুখাচেভস্কি প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষেরা জার্মান সেনাপতিদের সঙ্গে এই মর্ম্মে কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন এবং সেই অভিযোগে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হয়। ষ্টালিনের এই কঠোরতা নিজের স্বার্থ-

প্রণোদিত এই বিশ্বাসে অনেকে তীব্র মন্তব্য করে থাকেন; কিন্তু ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্‌ প্রমুখ সমালোচকেরা এই দুর্দ্দিনে ফাশিষ্ট্‌ আক্রমণের দারুণ আশঙ্কা এবং ফাশিষ্ট্‌ বিজয়ের ভয়াবহ পরিণামের কথা ভুলে যান। স্পেনের সংগ্রামকে রুষেরা সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ও ফাশিস্‌মের গতিরোধ চেষ্টার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। কিন্তু রাশিয়ার নৌবল সামান্য ও স্পেন বহুদূরে; তাই স্পেনে রুষ সাহায্যের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত হবার পক্ষে বাধা অনেক।

অন্যদিকে ফ্রান্সের সে সুযোগ আছে। ফরাসী স্বার্থও স্পেনে নিবিড়ভাবে এখন জড়িয়ে পড়েছে। বিদ্রোহীরা জয়লাভ করলে একসময় ফ্রান্সকে হয়ত তিনদিক থেকে ফাশিষ্ট্‌ আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে হবে। আফ্রিকার বিশাল সৈন্য-বাহিনীর উপর ফ্রান্সকে এখন আত্মরক্ষার জন্য নির্ভর করতে হয়। যুদ্ধের সময় বালারিক্‌ কিম্বা কেনারি দ্বীপসমূহে বিপক্ষ সাব্‌মেরিন আশ্রয় পেলে সেই বাহিনীকে ফ্রান্সে নিয়ে আসা কষ্টসাধ্য হবে। মরক্কো প্রদেশ থেকে ফ্রান্সকে সরে আসতে হ'লে আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যেরও হবে বিপদ। ইটালীয় প্রাধান্যে ফ্রান্সের সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরের অন্য প্রান্তস্থিত সীরিয়ার যোগসূত্রও ছিন্ন হ'তে পারে। সে অঞ্চল থেকেই আবার ফরাসীরা পেট্রল সংগ্রহ করে। ফ্রান্স তাই স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরোধী কিন্তু আজকের দিনে শুধু সুদূরবর্ত্তী রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর নির্ভর করে ফ্রান্স যুদ্ধে নামতে পারে না। দেশের মধ্যে ফাশিষ্ট্‌ শক্তি এখন আগের চেয়ে দুর্ব্বল হলেও নগণ্য নয় আর পপুলার ফ্রন্টেও মনে হয় ভাঙ্গন ধরেছে। এ অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের অর্থ ও নৌবল ভিন্ন ফ্রান্সের পক্ষে ফাশিষ্ট্‌ শক্তিদের গতিরোধ করা সহজ নয়।

ইয়োরোপে শক্তিসাম্য অগত্যা বহুলভাবে নির্ভর করছে ইংল্যাণ্ডের উপর। স্পেনদেশে ইংরাজ স্বার্থের পরিমাণও প্রচুর। খনিজ সম্পদের কথা ছেড়ে দিলেও ভূমধ্যসাগরে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ ইংরাজদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সমুদ্রের প্রান্তস্থিত ঈজিপ্ট্‌, প্যালেষ্টাইন্‌ প্রভৃতি দেশ ইংরাজ গণ্ডির মধ্যে পড়ে; সে অঞ্চলের বন্দরেই ইরাক্‌ থেকে পাইপ-লাইনে প্রবাহিত পেট্রল জাহাজে বোঝাই করা হয়। প্রাচ্যে যাতায়াতের দ্রুততম জাহাজ ও বিমান-যাত্রার পথও এখান দিয়ে। ইংল্যাণ্ডের প্রাচ্য বাণিজ্য যদি আফ্রিকা ঘুরে যেতে বাধ্য হয়, তবে জাহাজের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। ভূমধ্যসাগর খোলা রাখবার অভিপ্রায়ে

ইংরাজেরা একদা জিব্রালটর্ ও মল্‌টা দখল করেছিল ; ফাশিষ্ট্ শক্তি বৃদ্ধি পেলে উভয় স্থানই হবে বিপন্ন। কিন্তু তথাপি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে স্পেনে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহযোগে ফ্রাঙ্কোর অভিযানকে বাধা দেবার চেষ্টা করেনি তার কারণ নিশ্চয় অনুধাবন-যোগ্য।

(৪)

স্পেনে বিদ্রোহ আরম্ভ হবার কয়েকদিনের মধ্যে ইংরাজ-নেতৃত্বে সকল দেশই non-intervention-এর নূতন নীতিতে অন্ততঃ মৌখিক সম্মতি জানাল। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা অনুসারে কোন দেশে বিদ্রোহ ঘট্‌লে বিদেশী শক্তিরা সাধারণতঃ সে বিদ্রোহকে অগ্রাহ্য করে ; দেশে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির বিদেশ থেকে সমর-সরঞ্জাম আনিয়ে তখন বিদ্রোহ দমনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। পরে বিদ্রোহীরা প্রবল হয়ে উঠলে তাদের অবশ্য রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমানে লড়বার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে—সে অধিকারকে belligerent status আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তখন বিদেশী রাজ্যের কর্ত্তব্য হয় নিরপেক্ষ নীতি অর্থাৎ neutralityর অনুসরণ ; উভয় দলকেই তখন বাইরে থেকে সাহায্য করা বন্ধ হয়ে যায়। স্পেনে বিদ্রোহীদের কোন দেশ শুধু belligerent বলে এখনও স্বীকার করেনি (এমন কি পরে যখন জার্মানি ও ইটালি ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের ন্যায্য শাসক বলে মেনে নেয় তখন তারা গণতন্ত্রীয় গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব একেবারে অগ্রাহ্যই করেছিল)। অথচ গৃহযুদ্ধের আরম্ভেই ঘোষণা করা হল যে কোন পক্ষকেই সাহায্য করা হবে না এবং তদনুসারে স্পেন অঞ্চলে যুদ্ধের অনেক সাজ-সরঞ্জাম পাঠানো নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

স্পেনের ন্যায়ানুগত রাষ্ট্রশক্তিকে এই ভাবে বিদেশ থেকে যুদ্ধসজ্জা আনতে না দেওয়ার ফলেই বিদ্রোহ সহজে ছড়িয়ে পড়ল। বামপন্থী সমালোচকের চোখে ইংরাজদের এই অভিনব প্রস্তাব গুপ্ত ফাশিষ্ট্ সহানুভূতির পরিচায়ক। কিন্তু ফ্রান্সও এ নীতিতে আপত্তি করার প্রয়োজন বোঝেনি। বল্‌ড্‌উইন্ ও ব্লুম্ মন্ত্রিসভার উদ্বেগ হয়েছিল এই ভাবনা যে স্পেনের অন্তর্বিরোধ তৎক্ষণাৎ ইয়োরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। সে আশঙ্কা অপনোদনের জন্য তাঁরা ভাবলেন যে স্পেন-গভর্ণমেণ্টের অধিকার খর্ব্ব করেও যদি সঙ্ঘর্ষকে স্পেনে আটকে রাখা যায় তবে তাতেই মঙ্গল। যদি সাহস করে তখন তাঁরা ঘোষণা করতেন যে বিদেশ থেকে

কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী ইংরাজ ও ফরাসী রণতরীর সাহায্যে বন্ধ করা হবে তাহলে হয়ত স্পেনের অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত হয়ে যেত ইন্ধনের অভাবে। কিন্তু অতখানি আত্মনির্ভর ভাব ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কারুরই ছিল না—তাই উভয় দেশেই মতভেদ ও অনিশ্চয় নীতির প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল।

সাহায্যবন্ধের প্রস্তাব গৃহীত হলেও ইটালি ও জার্মানি এমন ভাবে ফ্রাঙ্কোকে গুপ্ত সাহায্য আরম্ভ করল যে রাশিয়া ও সম্ভবতঃ ফ্রান্সও তখন অপর পক্ষের সহায় হতে বাধ্য হল। স্পেনে তখন আরম্ভ হল ইংরাজ-নীতির দ্বিতীয় অধ্যায়—তার বৈশিষ্ট্য, স্পেনের সীমান্তে ও উপকূলে পাহারা বসিয়ে বৈদেশিক সাহায্যের স্রোতনিরোধ। জার্মানি, ইটালি ও সর্ব্বোপরি ফাশিষ্ট্ পর্টুগালের বিরুদ্ধাচরণে এ প্রস্তাব বহুদিন গৃহীত হয়নি, যখন হল তার আগেই বিদ্রোহীরা প্রচুর পরিমাণে বাইরে থেকে অস্ত্র-সজ্জার জোগাড় করে ফেলেছে। কিছুদিন পর সীমান্ত পর্য্য-বেক্ষণের ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ল জার্মানি ও ইটালির অসহযোগে। তারপর এখন ব্রিটিশ মন্ত্রিগণ ঝুকেছেন তৃতীয় পন্থার দিকে। ফ্রাঙ্কোকে belligerent বলে স্বীকার করে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবার বোধহয় চেষ্টা চলবে কিন্তু গত পনেরো মাসের নিরপেক্ষতার নমুনার পর এর সাফল্যের প্রতি সন্দেহ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। ইংরাজদের নবতম প্রস্তাব বাধা পাচ্ছে রাশিয়ার কাছ থেকে—রুষ মতানুসারে স্পেন থেকে বিদেশী সৈন্য ও সমরসজ্জা সম্পূর্ণ অপসারিত হবার আগে ফ্রাঙ্কোকে belligerent অধিকার দেওয়া অন্যায়।

(৫)

স্পেনে ইংরাজ-নীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারেনি। গৃহবিবাদ সেখানে অবাধে প্রসারিত হয়েছে; বিদেশ থেকে সাহায্য বাধাপ্রাপ্ত হয়নি; যে-দলের বিজয় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে বিচলিত ও তাদের বহুধা স্বার্থকে বিপন্ন করতে পারে মোটের উপর তারাই এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধে জিত্‌ছে; এবং স্পেনের বিরোধ ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়বার সম্ভবনাও কমেনি। ইংল্যাণ্ডে আজ এই নিয়ে যে তুমুল বাদবিতণ্ডা হচ্ছে তার পরিচয় দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করা যেতে পারে।

শান্তিপ্রিয়তা ইংরাজদের সাবধান-নীতির মূল কথা নয়। শান্তিবাদীরা আজকের সঙ্কটের দিনে নিজেদের হাস্যাস্পদই করছেন। লান্সবারি হিট্‌লার ও মুসোলীনির দরবার করতে ব্যস্ত; নর্মান এঞ্জেল্ বুঝতে চান না যে স্বার্থসিদ্ধির

তাড়না মানুষকে সহজেই যুদ্ধের ভয়াবহ দিক সম্বন্ধে অন্ধ করে রাখতে পারে; রাসেল্ রাশিয়াকে জার্মানির হাতে ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ হবার স্বপ্ন দেখছেন। তাছাড়া শান্তিবাদ গভর্ণমেন্টের লক্ষ্যও নয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ নৌবহরের বিরাট বৃদ্ধির আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস দ্বীপ, মধ্য অঞ্চলে মল্টা, পশ্চিমে জিব্রাল্টর এদের সংস্কার ও শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও চলছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এতদিনে একথাও স্পষ্ট করে বলছেন যে সাম্রাজ্য রক্ষা ও সমুদ্রে যাতায়াতের পথ নিরাপদ রাখার প্রয়োজন হওয়া মাত্র ব্রিটেন্ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সুতরাং সমরে বিতৃষ্ণা ব্রিটিশ বৈদেশিকনীতির নিশ্চেষ্টতার কারণ নয়।

মধ্যপন্থার শ্রেয়স্করতাও ইংরাজ-নীতিকে শাসন করছে না। স্পেনের বিদ্রোহীরা শুধু সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করছে না, তাদের আক্রোশ পপুলার ফ্রন্টের উপর। ফাশিজ্‌ম্ ও কমিউনিজম্ উভয়কে বর্জ্জন করে' যে মধ্যপন্থার অনুসরণ ব্রিটিশ উদ্দেশ্য বলে' ঘোষিত হয়েছে, গণতন্ত্রের থেকে থিওরি হিসাবে তার পার্থক্য কি? অন্যদিকে ডেমক্রাটিক্ ও ফাশিষ্ট্ এ উভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থার অবসর কোথায়? একটা মহান আদর্শে বল্ড্‌উইন বা চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভা চালিত হচ্ছে এ বিশ্বাসের ভিত্তি বড় শিথিল।

বস্তুতঃ স্পেনে ব্রিটিশ-নীতির মূলমন্ত্র নিরপেক্ষতা, শান্তিপ্রিয়তা কিম্বা মধ্য-পন্থার আদর্শানুসরণ নয়—সুবিধাবাদই এর প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবিধাবাদ সব সময় নিন্দনীয় নয়, মূল উদ্দেশ্য অবিচলিত থাকলে নানা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির যদি সহায়তা হয় তবে সে পন্থাতে আপত্তি চলে না। লক্ষ্য স্বার্থ-সিদ্ধি হ'লেও দোষের হয় না, যদি সে স্বার্থ সাময়িক না হয়ে স্থায়ী, সংকীর্ণ না হয়ে ব্যাপক হয়। বর্ত্তমান ব্রিটিশ বৈদেশিকনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনার মূল বক্তব্য এই যে সুবিধাবাদের পরিণাম ভয়াবহ হবার সম্ভাবনাই বাড়ছে। মাঞ্চুকুয়োর ব্যাপারে একবার এর উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিল—তখনকার দুর্ব্বলতার ফলে আজ জাপান চীন গ্রাস করতে উদ্যত, প্রশান্ত মহাসাগরের সকল চুক্তি ও নৌবহর সীমাবদ্ধ করবার সকল আয়োজন আজ ছিন্নপত্র মাত্র। ইথিওপিয়া প্রসঙ্গে ইটালিকে পেট্রল সরবরাহ বন্ধ করার প্রস্তাব সাহসের অভাবে কার্য্যে পরিণত হল না। ফলে শুধু আবিসিনিয়া বিধ্বস্ত হয় নি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাণশক্তিও সেই সঙ্গে নিঃশেষিত হয়েছে আর ইয়োরোপে একটির পর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জার্মানির প্রভাবের মধ্যে গিয়ে

পড়ছে। জার্মানিকে অবাধে ভের্সাই ও লোকার্নো সন্ধি ভঙ্গ করতে দেওয়া হ'ল। তার ফল হ'ল ফ্রান্সের দুর্ব্বলতা ও জার্মান আস্ফালনের চূড়ান্ত প্রসার। স্পেনেও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মিলিত প্রভাব প্রথম থেকে দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হ'লে বিদ্রোহ এতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারত না। ফাশিষ্ট্ আন্দোলনের প্রতি গূঢ় সহানুভূতির অভিযোগ এক্ষেত্রে লোকের মনে যে উদিত হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার নেই।

ব্রিটিশ নিশ্চেষ্টতার পক্ষে একটা যুক্তি থাকতে পারে—অস্ত্রের অভাব। কিন্তু অস্ত্রবৃদ্ধির সঙ্গে দৃঢ় মনোভাব বাড়বে তার স্থিরতা কোথায়? রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা মিত্র-শক্তিদের সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন অস্ত্রের অভাব খানিকটা পূরণ করতে পারত কিন্তু অসহায় সাবধানতা ক্রমশঃ দলক্ষয় করেই এসেছে।

অধ্যাপক কেন্‌স্ সম্প্রতি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করেছেন, তাঁর মতে যুদ্ধ যতদিন এড়ানো যেতে পারে ততই মঙ্গল। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই যে বিশিষ্ট কোন অবস্থায় এই এড়াবার চেষ্টার ফল কি দাঁড়ায়। এই পন্থা বরাবর চলে না। অপর পক্ষের শক্তিবৃদ্ধিরও সম্ভাবনা অনেক সময় কম নয়, ইতিমধ্যে মিত্রদের সর্ব্বনাশও সাধিত হতে পারে। যুদ্ধ দমনের প্রকৃষ্ট উপায় দলবদ্ধ আচরণ, ইয়োরোপে সে সম্ভাবনা ধ্বংস হতে দেওয়ার জন্যই আজকের সঙ্কট এত ভয়াবহ। অবস্থার স্রোতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হ'তে থাকলে বৈদেশিক নীতিতে বিপদ বেড়েই চলে। সেইজন্য ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে স্পেনের অঞ্চলে ব্রিটিশ-নীতি সমস্যা জটিলতর করেই তুলেছে। আর বামপন্থীদের প্রশ্নের ন্যায্য উত্তর দেওয়াও এখন কঠিন—যদি সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতিতে ইংল্যাণ্ড অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত থাকে, তবে স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সামান্য একটু প্রয়াসও কেন সাবধানে পরিত্যক্ত হয়ে আসছে?

শ্রীসুশোভন সরকার

সমুদ্রচিল

সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদ্রের প্রভাতে
কথা ব'লে দেখিয়াছি আমি ;
একবার পাহাড়ের কাছে আসে,
চকিতে সিন্ধুর দিকে যেতেছে সে নামি ;
হামাগুড়ি দিয়ে ভাসে ফেনার উপরে,
মুছে যায় তরঙ্গের ঝড়ে।
দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধূলো কাঁচ হাতে ॥

তরঙ্গের তাড়া খেয়ে চ'লে যায় আরো দূর তরঙ্গের পানে —
ফেনার কান্তারে,
সৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে
তাহার সোনালি ডানা ঝাড়ে ;
যেখানে আকাশ নীল কোলাহলময়,
সমুদ্র করিছে দূর সমুদ্র সঞ্চয়,
দিগন্ত হারায়ে যায় দিগন্তের প্রাণে ॥

চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল ;
ধানের শিষের মত দু'পায়ের শিরা
নাচিছে স্পানিশ টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে ;
হৃদয় করিছে পান মালাবার হাওয়ার মদিরা ;
ট্রম্ ট্রম্ ট্রাম্ ট্রাম্—ড্রামের মতন
শৈলে শৈলে সমুদ্রের রুক্ষ আন্দোলন ;
রৌদ্রে রৌদ্রে ঝল্‌সায় ঝিনুকের ফুল ॥

বিজ্ঞান কি মস্তিষ্কের বাক্সের মতন একাকী ?
তোমার শরীরে জল—দ্রাক্ষার আঘ্রাণ ;
তোমার হৃদয়ে পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের ক্ষেত,
জাগিতেছে নব নব শস্যের সন্তান;
আমরা বন্দরে ফিরি—জনতায়—ঘূর্ণিস্রোতে কুকুরের মুণ্ডে লোল আঁখি

পাবে নাকি লেজ তার ? হো—হো—পাবে নাকি !
পাবে নাকি লেজ খুঁজে কুকুরের মত লোল আঁখি ॥

ছেড়ে দিয়ে উত্তরের বাতাসের প্রাণে
জন্মেছে তোমার ডানা—জেগেছে হৃদয় ;
সহস্র শতাব্দী-গিঁট কাটায়েছি পথ আর ঘরের আঘ্রাণে—
আনন্দের পাইনিক' তবু পরিচয় ;
জন্মেনি ধবল ডানা বিজ্ঞানের অগ্রসর চিরি ;
ভেঙ্গে গেছে আকাশের—নক্ষত্রের সিঁড়ি,
উৎসব খুঁজেছি রাত বিরেতের গানে ॥

পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ, আহা,
আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান ;
অথবা ঘাসের দেহে শুয়ে শুয়ে কুয়াশায়
শুনেছি ঝরিতে আছে ধান ;
অথবা সন্ধ্যার নীল জানালায়
অদৃশ্য কোকিল এসে গায়
এই সব বেদনার কর্কট-রেডিয়ামে মারেনাক' তাহা ॥

মাঝে মাঝে একবার ধরা দেই নক্ষত্রের হাতে,
চ'লে আসি সমুদ্রের পাশে ;
যে ক্ষেত ফুরাতে আছে—ফুরাইয়ে গেছে
তার তৃষ্ণা মিটিছে আকাশে ;
চেয়ে দেখি সেই নীল আকাশের ছবি ঃ
সমুদ্রের অজান্তব জানালার গল্পের সুরভি ;
রৌদ্রের ডানায় ভেসে সেইখানে পৃথিবী হারাতে
চাই আমি ; সমুদ্রচিলের খেলা তুলে নিয়ে হাতে ॥

(২)

রঙীন বিস্তৃত রৌদ্রে প্রাণ তার করিছে বিলাস ;
কোনোদিন ধানক্ষেতে পৃথিবীর কৃষকের প্রাণ
এই রৌদ্র পায় নাই ;—জলপাই পল্লবের ফল,
জ্যৈষ্ঠের দুপুরে মাছি যে উল্লাসে গেয়ে গেছে গান,
কুমারী কোমল ঘাড় নুয়ে চুপে যেই পক্ব রৌদ্রে বেণী করেছে বিন্যাস,
নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস,
তরমুজ ক্ষেতে শুয়ে স্বপন দেখেছে চৈত্রমাস,
তার চেয়ে আরো ঘন গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস।

পৃথিবীতে যেইরূপ কোনোদিন দেখে নাই কেউ ঃ
সিংহলের হীরা রত্ন নারী লুটে নাবিকের দল
ভারত সমুদ্রে নেমে নক্ষত্রের রজনীতে
তারপর ভোরবেলা দেখেছিল স্ফটিকের মত যেই জল ;
তরঙ্গের পরে ঘন তরঙ্গের মধু আর দুধ,
মেঘের গোলাপী মুখ—রৌদ্রের বুদ্বুদ ;—
তবু তারা দেখে নাই পুরুভুজ-বিছানায় নূপুর বাজায়ে নাচে ঢেউ
বারুণীর জানালায় ঃ সিন্ধুচিল—মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাক' কেউ ॥

ধ্বনিত ঢেউয়ের অগ্নি বয়ঃসন্ধি-দিবসের স্তন হয়ে রক্তে নেমে আসে।
তরঙ্গের উষ্ণ নীল তরমুজ ক্ষেতে
আমারে খুঁজিয়া পায় মৃত্যু যেন ;
বিস্মৃতির পথে যেতে যেতে
সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায় রৌদ্রের সাগরে ;
সিন্ধুচিল আর তার বনিতা যেখানে খেলা করে ঃ
মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওয়ার আকাশে ॥

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

ভক্তি ও প্রেম

১

'বৈধী'

দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে সেই 'সত্যং পরং' পরমাত্মাকে দুইভাবে দর্শন করা যায়—নির্ব্বিশেষ ভাবে ও সবিশেষ ভাবে—নির্ব্বিকল্পভাবে ও সবিকল্প-ভাবে—নির্গুণভাবে ও সগুণভাবে—

"Reality may be apprehended in either transcendental or immanental —positive or negative terms"

নির্বিশেষভাবে তিনি পরংব্রহ্ম এবং সবিশেষভাবে তিনি ভগবান্। অর্থাৎ, তিনি একাধারে Principle ও Person—তিনি 'নেতি নেতি' নির্গুণ ব্রহ্ম (the Absolute) অথচ তিনি মহান্‌প্রভুর্বৈপুরুষঃ—(the Infinite Individual)। অর্থাৎ তিনি কেবল 'তৎ' নন—তিনি 'সঃ'। অতএব 'দৃষ্টি' দ্বিবিধ—বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক। এইজন্য বৈদান্তিকের নির্গুণের 'সংরাধন'—প্রণিধান ('awestruck contemplation of the Absolute—the naked God-head') এবং বৈষ্ণবের সগুণের আরাধন্—প্রেম-নিবেদন ('adorable companionship—the mystic marriage of the soul with God')।

এক কথায় পরমাত্মার বিভাব যখন দ্বিবিধ এবং জীবের স্বভাবও যখন দ্বিরূপ (বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবিক)—তখন ভজনের প্রণালীরও দ্বৈরূপ্য অবশ্যম্ভাবী—

"What is the method by which the Contemplative attains his unique communication with the Absolute Life ? That activity, like its result, is of two kinds : personal and affirmative, impersonal and negative."

এই দুই প্রণালীকে আমরা প্রণিধান ও প্রেম বলিতে পারি। এই দুই সাধনা অত্যন্ত বিভিন্ন ও বিপরীত—'দূরম্ এতে বিপরীতে বিষূচী'। প্রণিধান কি ? এক কথায় প্রণিধান = সমাধি—The apotheosis of contemplation—ecstasy। আর প্রেম ? এক কথায় প্রেম—'is the soul's surrender first to the call, finally to the embrace of Perfect Love',

বৈদান্তিক ভাবে ভাবিত সাধক সংরাধন দ্বারা ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া তাঁহার সহিত 'সাযুজ্য' প্রাপ্ত হন—আর বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত সাধক আরাধন দ্বারা ভগবানে পরানুরক্তি বা প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সহিত মিলিত হন। এই যে ব্রহ্ম-সংযোগ—Union with God—ইহাই নিঃ-শ্রেয়স (Summum Bonum), জীবের চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। ইহাই জীবের নির্দ্দিষ্ট নিয়তি (ultimate Destiny)। বর্ষান্তে হ'ক, যুগান্তে হ'ক, কল্পান্তে হ'ক—একদিন না একদিন ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত জীব ব্রহ্মের সহিত পুনর্মিলনের সৌভাগ্যে মণ্ডিত হইবে অর্থাৎ Water will find its level—উৎসের তুঙ্গতার অনুপাতে ধারার উচ্চতা সাধিত হইবে।

এ সাধনায় সিদ্ধ হইবার—এই ব্রহ্ম-সংযোগ লাভ করিবার প্রণালী কি? বৈদান্তিকের প্রণালী প্রণিধান, বৈষ্ণবের প্রণালী প্রেম। যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের আলোচনায় ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে' পাঠকের জন্য আমরা প্রণিধানের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছিলাম—অতঃপর একটু নিবিড় ভাবে প্রেমের আলোচনা করিতে চাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> ঈশ্বরঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া।
> 'পরমেশ্বরকে অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়।'

ঠিক কথা। কিন্তু অনন্যা বা ঐকান্তিক ভক্তি ত' সুলভ নহে। 'আদৌ শ্রদ্ধা'—শ্রদ্ধার পরিপাকে ভক্তি—

> শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী — চরিতামৃত

কিন্তু সে ভক্তি ত্রিবিধ—

> উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী।—

অতএব ভক্তও ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। সেই জন্য চরিতামৃত-কার বলিতেছেন,—

> শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
> উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
> শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
> মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
> যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
> ক্রমে ক্রমে তিহঁ ভক্ত হইবেন উত্তম॥ —চরিতামৃত

এই কনিষ্ঠ ভক্তকে ভাগবত 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়াছেন।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং য শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥　—ভাগবত, ১১।২।৪৫

অর্থাৎ, যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাতে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন কিন্তু ভক্তে অথবা অপরে তাঁহার অর্চ্চনা করেন না—তিনি প্রাকৃত ভক্ত। মধ্যম ভক্ত কে?

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

—ভাগবত ১১।২।৪৪

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভগবানে, ভগবদ্ভক্তে, উদাসীনে ও শত্রুতে—যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম।

আর উত্তম ভক্ত?

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥　—ভাগবত, ১১।২।৪৩

'যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত।'

সেই গীতার প্রাচীন কথা—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥—৬।২৯

'যিনি যোগযুক্তাত্মা, সর্ব্বত্র সমদর্শন, তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন।'

গীতা এইরূপ ভক্তকে জ্ঞানীভক্ত বলিয়াছেন—

'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে'—৭।১৭

জ্ঞানী ভক্তের যে ভক্তি তাহাই একভক্তি, অনন্যাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি—'জানি না কেন যে ভালবাসি'। বৈষ্ণব বলেন, এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও যথেষ্ট নয়—ইহাকে প্রেমে পরিণত করিতে হইবে।

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥

এ জন্য জ্ঞানচর্চা যথেষ্ট নয়—ভগবানে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

—ভাগবত ৭।৫।১৮,২৪

সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভজন বা ভগবদ্ভক্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি।

এইত' সাধন ভক্তি দুইত প্রকার
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর।
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞায়
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

... ...

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্। —চরিতামৃত

চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পবিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংবাদে এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা আছে। রায় রামানন্দ যখন গোদাবরীতীরে রাজমাহেন্দ্রীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন, তখন—

দণ্ডবৎ কৈলা রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কন বসি রহঃ স্থানে॥

মহাপ্রভু বলিলেন,

'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়'

তদুত্তরে, রায় রামাতন্দ প্রথমতঃ বিধিমার্গে ভজন (যাহাকে বৈধী ভক্তি বলে এবং যাহা সাধককে শান্তরতি পর্য্যন্ত লইয়া যায়) তাহার অবতারণা করিলেন।

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা ছিল—'সাধ্যের নির্ণয়'

(উত্তরে) রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

বৈধী ভক্তির ইহাই প্রথম পর্ব্ব—স্বধর্ম্মাচরণ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৮।৯

'সাধক বর্ণাশ্রমের আচার পালন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিবে—ইহাই তাঁহার তুষ্টি সাধনের উপায়।'

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার॥

অর্থাৎ বৈধীভক্তির দ্বিতীয় পর্ব্ব ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। সেই গীতার কথা—

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়। তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—গীতা, ৯।২৭

অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম্ম—অশন, যজন, দান, তপস্যা—শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে।

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥

অর্থাৎ, বৈধী ভক্তির তৃতীয় পর্ব্ব স্বধর্ম্মত্যাগ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ —গীতা, ১৮।৬৪

'সমুদয় ধর্ম্ম (rituals) বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভগবানের আশ্রয় লও।' যে এইরূপ করে সেই শ্রেষ্ঠ সাধক।

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।

—ভাগবত ১১।১১।৩২

অন্যত্র ভাগবত বলিতেছেন,

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

—ভাগবত ৪।২৯।৪৩

অর্থাৎ, ভগবানে নিহিতচিত্ত ভক্ত লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

অর্থাৎ বৈধীভক্তির চতুর্থ পর্ব্ব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—গীতা যাহাকে 'পরাভক্তি' বলিয়াছেন;

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

'ব্রহ্মে স্থিত, প্রসন্ন চিত্ত, শোকে অনুদ্বিগ্ন, অনাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিই ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করেন।'

প্রভূ কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার।

অর্থাৎ বৈধী ভক্তির পঞ্চম পর্ব্ব জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—

জ্ঞানে প্রয়াসম্ উদপাস্য নমন্ত এব
······যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

—ভাগবত, ১০।১৪।৩

'যে ভক্ত জ্ঞানে প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া সেই অজিতের অর্চ্চনা করে, তিনি ত্রিভুবনে তৎকর্ত্তৃকই বিজিত হন।'

ইহাই 'শুদ্ধা'ভক্তি—বৈধী ভক্তির চরম পর্ব্ব। ইহা হইতেই প্রেমের জন্ম।

শুদ্ধা ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

শুদ্ধা ভক্তি কি? মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—

অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হৈ'তে প্রেম হয়
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

এ সম্পর্কে নারদ পঞ্চরাত্রের বচন এই:

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

'ভগবান্‌কে পরাৎপর জানিয়া সকল উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেই হৃষীকেশের যে অমল সেবন—ইহাই প্রকৃত ভক্তি।'

ভাগবতের বচন এই:

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

—ভাগবত, ৩।২৯।১১-১২

অর্থাৎ, 'ভগবানের লীলাশ্রবণে সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশে সাগরগামী গঙ্গা-ধারার ন্যায় ভক্তের যে অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী, অব্যভিচারী চিত্তধারা প্রবাহিত হয়—তাহাই নিগু'ণা বা শুদ্ধা ভক্তি।'

সত্য বটে, ব্রহ্মভূত জ্ঞানীভক্ত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, কিন্তু

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ

এই লীলারস-আস্বাদনই প্রেমের প্রকৃষ্ট সাধন এবং ভক্তকে ঐ সুযোগ দিবার জন্যই ভগবানের লীলাবিগ্রহ-গ্রহণ।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহম্ আশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীং চেষ্টাং যৎ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

—ভাগবত, ১০।১৩.৩৬

শুদ্ধা ভক্তির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু মহোৎসাহে বলিলেন,

প্রভু কহে এহো হয়—আগে কহ আর
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার!

এই প্রেমভক্তিই 'রাগানুগা' ভক্তি—বৈধী ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা—কেবল Devotion নয়, Love of God—প্রেমা।

প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ—পদ্যাবল্লী
সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।—চরিতামৃত

অতএব আমরা দেখিলাম, বৈধী ভক্তির চরম 'শুদ্ধা' ভক্তি এবং ঐ 'শুদ্ধা' ভক্তিরই নাম প্রেম। প্রেমিক সাধক বিধির অতীত। তাঁহার ভক্তি 'রাগানুগা' ভক্তি। আগামী বারে আমরা এই রাগানুগা ভক্তির আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সোম-লতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতেই নেই। বিনোদিনীর তখনও ঢেঁকীশালের কাজ শেষ হয়নি। আরও একটু বাকি।

তাঁতি বৌ এসে গালে হাত দিলে।

—হেই মা! তোর এখনও চান হয়নি!

বিনোদিনী পড়ন্ত বেলার দিকে একবার চেয়ে বললে, এই যে যাই। আর এই ক'টি ঢু'কুটো হলেই হয়।

সস্নেহ শাসনের কণ্ঠে তাঁতি বৌ বললে, বেলা যে আর নেই!

বিনোদিনী হাসলে।

ওঘর থেকে নয়নতারা বললে, রান্না-বান্না হ'ল দিদি?

—কোন কালে। আমি সেই ছোঁড়াটাকে খুঁজতে এসেছি ভাই, ওকে নিয়ে আমার এক জ্বালা হয়েছে।

—কেন, পঞ্চু বাড়ীতে নেই?

জিভ দিয়ে তালুতে একটা শব্দ ক'রে তাঁতি বৌ বিরক্তভাবে বললে, বাড়ীতে থাকবার জ্বালা! সকালে বেরিয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত দাঁতে কুটোটি কাটেনি। একবার কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, মা, মুড়ি দে। তা, আমি বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি নেই। কে বললে, হাবলের কাছে আছে। তাই একবার ভাবলাম...

নয়নতারা বললে, হাবল তো গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছে।

—এই মরেছে! তবে ছোঁড়া তারই সঙ্গে মাঠে গেল নাকি?

বিনোদিনী হেসে বললে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন বৌ, পেটে জ্বালা ধরলে আপনি আসবে!

—সে ছেলে পঞ্চু নয় ভাই। খাবার নামটি করে না। বলি, তোর কি ক্ষিদেও পায় না রে! তা, হাসে। বলে, ক্ষিদে আবার কি!

পর পর অনেকগুলি ছেলে মারা যাবার পর পঞ্চু হয়েছে। ওর জন্যে তাঁতি বৌএর চোখে ঘুম নেই, সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

বললে, দেখি, আবার কাউকে পাঠাই।

তাঁতি বৌ ব্যস্ত হয়ে চ'লে গেল।

একটু পরে কাজ সেরে ঘড়া নিয়ে বিনোদিনী গেল ঘাটে। যাবার সময় গৌরহরির পোড়ো ভিটার দিকে একবার চাইলে। করবী গাছের ঝাড়টা ওইখানেই ছিল বটে। গৌরহরির এখনও ঠিক মনে আছে। আপন মনেই ভাবলে, আখড়া করার সঙ্কল্প এখনও তার আছে কিনা কে জানে। তার তো কথা! তবে এবারে যে সে আর বাধা দেবে না, তা ঠিক। গৌরহরি তার নিজের পৈতৃক ভিটায় ঘর তুলবে তাতে বিনোদিনীর বাধা দেবারই বা কি আছে? কিন্তু সে গেল কোথায়? কারও কাছে খোঁজ না নিয়েও জেনেছে, গৌরহরি গাঁয়ে নেই। কোথাও গেছে। কিন্তু কোথায় যে গেছে জানে না। হয়তো ভিক্ষায় গেছে, যে কোনো একদিন ঝুপ ক'রে এসে পড়বে। কিম্বা হয়তো আর আসবেই না।

আসবেই না ভাবতে বিনোদিনীর কেমন যেন একটু কষ্ট হ'ল। কেন সে আসবে না? বিনোদিনীকে তার অত ভয় কিসের?

একখানা ধানবোঝাই গাড়ী প্রচুর ধূলো উড়িয়ে করুণ আর্ত্তনাদ করতে করতে আসছে। ধূলোর ভয়ে সে পাশ কাটাবার জন্যে আল থেকে নামল। গাড়ীতে এত বোঝাই দিয়েছে যে, গরু দুটো আর টানতে পারছে না। শব্দ উঠছে চাকা থেকে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গরু দুটোই গুরুভারে আর্ত্তনাদ করছে।

গাড়ীখানা একেবারে কাছে এসে পড়তে বিনোদিনী চেয়ে দেখলে তাদেরই গাড়ী।

মুনিষটাকে বললে, অমন ক'রে গাড়ীতে বোঝাই দিতে হয় রে! গরু দুটো টানতে পারছে না।

ধান সমেত খড় একতালা সমান উঁচু হয়েছে। উপরে গাড়ীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে একখানা বাঁশ দিয়ে বাঁধা। হঠাৎ চাকার ফাঁক দিয়ে বিনোদিনীর নজরে পড়ল দু'জোড়া ছোট ছোট পা।

—গাড়ীর আড়ালে কে রে?

কেউ সাড়া দিলে না। কেবল গাড়ীর উপরে মুনিষটা একটু হাসলে।

—হাবলা বুঝি ? আর সঙ্গে কে ? পঞ্চা ?

বিনোদিনী ওপাশ দিয়ে ঘুরে পঞ্চুকে ধ'রে ফেললে। হাবল ছুটে পালাল। ধরা প'ড়ে পঞ্চু বেচারা কেঁদে ফেললে।

এতটা পর্য্যন্ত বেলা কিছুই সে খায়নি। কতকটা ক্ষুধায়, কতকটা ধূলায়, কতকটা রৌদ্রে মুখখানি তার শুকিয়ে গেছে। নগ্ন দেহ ধূলায় ধূসর, মাথার চুল পিঙ্গল বর্ণ। এত বেলা পর্য্যন্ত বোধ হয় মাঠে মাঠে ঝরা ধানের শীষ সংগ্রহ করছিল। পরণের কাপড়খানি খুলে সেইগুলো বেঁধেছে। বিনোদিনী এসে হাত চেপে ধরতেই সে কেঁদে ফেললে।

বিনোদিনী হেসে তাকে ছেড়ে দিলে। বললে, যাও, তোমার মা চ্যালা কাঠ নিয়ে ব'সে র'য়েছে তোমার জন্যে।

পঞ্চু কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমি কি করব ? হাবল বললে,

—হাবলের যা হবার তা তো হবেই। আমি চান ক'রে আসি তো, তারপর দেখাচ্ছি।

বিনোদিনী ঘড়া কাঁখে নিয়ে হাসতে হাসতে ঘাটে গেল। আজ বড্ড বেলা গেছে।

সেইদিন শেষ অপরাহ্ণবেলায় ছেলেদের ময়লা কাপড় ধোবার জন্যে বিনোদিনী খিড়কির ঘাটে এল। ময়লা কাপড়গুলো ক'দিন থেকেই বড় ঘরের এক কোণে প'ড়ে আছে। আকাচা কাপড়ে তার বিছানা ছোঁওয়ার কারও উপায় নেই। মেনী ততটা পারে না বটে, কিন্তু হাবলচন্দ্রের তো আর অগম্য স্থান নেই। আস্তাকুড় থেকে শ্মশান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তার অবাধ গতি। রাত্রে শোবার আগে তাকে কাপড় ছাড়িয়ে, মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে তবে তাকে বিনোদিনী বিছানায় শুতে নেয়।

কাপড়ের পুঁজি মাত্র ওদের একখানা ক'রেই। যে কাপড় রাত্রে ওরা বাইরে ছেড়ে রাখে, সেগুলো খেঁকী কুকুরটা শয্যাহিসেবে ব্যবহার করে। সকালে উঠে সেই কাপড় প'রেই ওরা গন্তব্য অথবা অগন্তব্য স্থানে বিচরণ করে। স্নানের সময় কোনো দিন কাচে, কোনো দিন কাচে না। বিনোদিনীর চোখে পড়লে সন্ধ্যার সময় কেচে দেয়।

শেষ অপরাহ্ণের বেলা। মাঠে তখনও আলো রয়েছে। কিন্তু বাঁশ বনের কল্যাণে বিনোদিনীদের খিড়কির ঘাট অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘাটটা বড় খারাপ। সানখানা পা পড়লেই নড় বড় ক'রে নড়ে। চলাৎ ক'রে খানিকটা জল উঠে কাপড় দেয় ভিজিয়ে।

ঘাটে নামতে নামতে বিরক্ত কণ্ঠে বিনোদিনী বললে, বাবাঃ! কোন্ দিন কেউ খুন না হ'লে এরা ঘাটটা তো সারাবে না!

হঠাৎ তারই অদূরে ঢুপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

বিনোদিনী সচকিত হয়ে চাইলে। ভাবলে, বোধ হয় ব্যাঙ। আবার আপন মনে কাপড় কাচতে লাগল।

আবার একটা শব্দ হ'ল, ঢুপ্।

বিনোদিনীর মনে কেমন ভয় হ'ল।

বললে, কে রে!

চাপা কণ্ঠে উত্তর এল, আমি।

এবারে বিনোদিনী সত্যসত্যই ভয় পেয়ে গেল! পাশে যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এ কথা সে ভাবতেই পারেনি। সে যে বিশেষ কাউকে প্রত্যাশা ক'রে 'কে রে!' ব'লেছিল তা নয়। মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনে সত্যই ভয় পেয়ে গেল।

বললে, আমি কে? ওখানে কেন?

মনে হ'ল কে যেন ডান দিকে উঁচু পাড় থেকে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে আসছে,—কালো একটা জন্তুর মতো, হামাগুড়ি দিয়ে। বিনোদিনীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।

চাপা কণ্ঠে ছায়ামূর্ত্তি বললে, আস্তে বিনোদিনী। ভয় নেই, আমি গৌরহরি।

বিনোদিনীর কাপড় আর ভালো ক'রে কাচা হ'ল না। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে এবার চাপা কণ্ঠেই বললে, তুমি ওখানে কি করছ?

—কিছু করিনি। তোমারই জন্যে ব'সে আছি। একটা দরকারী কথা আছে, বলছি।

বিনোদিনী ভীষণ চ'টে গেল। বললে, দরকারী কথা থাকে, সকালে এস। এখন কেন?

—না একটু বিশেষ দরকারী।

কিন্তু সে পার থেকে ঘাটের কাছে নেমে এসে দেখলে, বিনোদিনী নেই। চ'লে গেছে।

সে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

এত বড় ভুল গৌরহরি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। বিনোদিনীকে সে ভালো ক'রেই চেনে। যে কথাই তাকে সে বলতে আসুক, সন্ধ্যাবেলা তার উপযুক্ত সময় নয়, নির্জ্জন, অন্ধকারাচ্ছন্ন খিড়কীর ঘাটও উপযুক্ত স্থান নয়। কিন্তু কথাটা অবিলম্বে বলবার অদম্য আগ্রহ এমন ক'রে তাকে পেয়ে ব'সেছিল যে, স্থান-কালের কথা বিবেচনা ক'রে দেখবার অবসরই পায়নি। ছোট বাবাজির আখড়া থেকে সে এই মাত্র ফিরেছে। সমস্ত দিন সে খায়নি, নায়নি, এমন কি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রামও করেনি।

এই অবস্থায় এমন আকস্মিক আঘাতে সে যুগপৎ ভীত ও বিমূঢ় হয়ে গেল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপি চুপি রাস্তায় নেমে এল।

দু'ধারে নুয়ে-পড়া বাঁশবনের ভিতর দিয়ে নীচু ডহরের পথ ধূলায় কোমল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পথ নির্জ্জন। গৌরহরি গ্রামের বাইরে একটি পুকুরের পাড়ে এসে বসল। পুকুরের কালো জলের ঢেউগুলি কুল কুল শব্দে ধারে এসে আঘাত দিচ্ছে। অনেকখানি পথ সে হেঁটে এসেছে। হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ধূসর চুল, দাড়ি শাদা হয়ে গেছে।

জল দেখে তার তৃষ্ণা পেল। হাঁটু জলে নেমে সে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে ফেলে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে অনেকখানি সুস্থ হ'ল। ঠাণ্ডা জল তার ভিতর বাহির যেন জুড়িয়ে দিলে। গৌরহরি উপরে উঠে এসে ঝুলি থেকে তামাকের সরঞ্জাম বের ক'রে চকমকি ঠুকে তামাক সাজতে বসল।

কন কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। উত্তর পাড়ের বড় অশ্বত্থ গাছটা সেবারের বড় ঝড়ে সেই যে প'ড়ে গেছে, এখনও সেই অবস্থায় প'ড়ে আছে। পাতা আর নেই, শুধু কাঠ। পূর্ব্ব পাড়ে কামার বুড়ো নতুন দুটি অশ্বত্থ গাছ পুঁতেছে। সে দুটি এখনও নিতান্ত ছোট। গরুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে বুড়ো যত্ন ক'রে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। বেচারার ছেলে পুলে নেই। এই গাছদুটিকে

সে পুত্রস্নেহে লালন করছে। আর একটু বড় হ'লেই এ দুটি প্রতিষ্ঠা ক'রে সে বৈতরণী-পারের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নেবে।

খোলা মাঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব'সে গৌরহরির শরীর সুস্থ হ'ল। তামাক খেতে খেতে সে বিস্মিতভাবে ভাবতে লাগল, কী এমন অপরাধ সে করলে যে বিনোদিনী রাগ ক'রে চ'লে গেল! নিরিবিলি একটা জরুরী কথাও একজন আর একজনকে বলতে পারে না? এ কথা সে বুঝলে না কেন যে, ওই বাঁশবনের ভিতর সাপের ভয় তুচ্ছ ক'রে, মশার কামড় সহ্য ক'রে যে এতক্ষণ ব'সে থাকতে পারে শুধু তারই অপেক্ষায়, তার কথা কত জরুরী!

গৌরহরি এর জন্যে দোষ দিলে বিনোদিনীকে নয়, তার নিজের অদৃষ্টকে। বিনোদিনী তো চিরকালই ওই রকমের। এই মেঘ, এই রৌদ্র। কিসে যে সে রাগে, আর খুসী হয়, তা সে কোনো দিনই বুঝতে পারে নি। সে তো চিরকালই খামখেয়ালী। হয় তো গৌরহরিকে দুঃখ দিয়েই সে আনন্দ পায়। আসলে বোকা সে নিজেই! সমস্ত জেনে শুনেও বার বার অপমানিত হবার জন্যে সেধে বিনোদিনীর কাছে সে যায় কেন? যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই তো নেই।

কতকগুলো শেয়াল ডেকে উঠল। দূরে রেল লাইন দিয়ে ন'টার গাড়ী গেল। গৌরহরি চেয়ে দেখলে, চারি দিকে শূন্য মাঠ চাঁদের আলোয় বিরহিণী-অন্তরের মতো ধূ ধূ করছে। দূরে দূরে ছায়ায় ঢাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন ঝিমুচ্ছে।

ইতিমধ্যেই শিশিরে তার মাথার চুল গেছে ভিজে। সমস্ত রাত এই শীতের রাত্রে এই খোলা মাঠে কাটান অসম্ভব। বোধ হয় বিশ্রামের ফলে তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

একটা শেয়াল অন্যমনস্কভাবে আহারের সন্ধান করতে করতে হঠাৎ তার কাছে এসেই ছুটে পালাল।

এ অঞ্চলে সবই গৌরহরির পরিচিত। কিন্তু সে নিজের গ্রামে না গিয়ে পাশের গ্রামে চলল। রাত্রিটা সেইখানেই যাপন করবে। কিছু আহারও মিলতে পারে।

পরদিন ভোরে,—তখনও কাক ডাকেনি, একটু অন্ধকার আছে,—পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল গৌরহরির প্রভাতী গানে।

রাই জাগ, রাই জাগ, শুকসারী বোলে।
কত নিদ্রা যাও রাধা শ্যামবঁধুর কোলে॥

ছেলে বুড়ো সব ছুটে উঠে এল। গৌরহরি তার পোড়ো ভিটায় আধ অন্ধকারে একটা ঝড়ে পড়া মরা শিমুল গাছের গুঁড়ির উপর ব'সে একতারা বাজিয়ে নতমুখে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তার পায়ের কাছে শিশির ভেজা ঘাসের উপর সত্যই বুঝি কোনো অভিসারিকা ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তাকেই গুরুগঞ্জনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে ঘুম ভাঙাবার জন্যে সাধ্যসাধনা করছে।

গান শুনে পাড়ার লোককে বলতে হ'ল, হাঁ, ইকিই বলে পেভাতী। তা না তো আমাদের কৃষ্ণদাস বাবাজি, হুঁঃ!

—বাবাজি যে ছোটে। ছুটতে ছুটতে গায়। ক'খানা গাঁয়ে তাকে পেভাতী গাইতে হয় খবর রাখ?

—কথা মিথ্যে নয়। সেই এক ভটচাচ্ ছিল, তাকে এক রাত্রে আঠারখানা কালীপূজো করতে হ'ত। একটা ক'রে জবাফুল নিত, আর মায়ের মাথায় ছুঁড়ে মারত। পূজো সারা, যা মর গা!

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

একজন বললে, তা কণ্ঠ বলতে হয় তো আমাদের গৌরহরির। কিবে কণ্ঠ! যেন মধু ঝরে পড়ছে! তা বাবা, তুমি আর কোথাও যেও না। যখন এসেছ, তখন এইখানেই থেকে যাও। আমাদেরও তো আর দিন ফুরিয়ে এল। তোমার দু'দিন সকাল-সন্ধ্যে ভগবানের নাম শুনে বাঁচি।

শিবদাস বললে, আমি তো বলেই দিয়েছি। তুমি এখানে থাক। তোমাকে কুটোটি ভেঙে দু'খানা করতে হবে না। আমরা তোমার আখড়া তৈরী ক'রে দিচ্ছি। তুমি মজাসে খাও দাও, ভগবানের নাম কর ব্যস।

বুড়ো বললে, উঁহুঁ। আর ছাড়া হবে না। যখন এসে পড়েছে, তখন থাকতে হবে। ওহে, কাল থেকে তোমরা ঘর আরম্ভ ক'রে দাও।

গৌরহরি গান শেষ হয়ে গেছে। সে এদের কথার উত্তরে হাঁ, না, কিছুই বললে না। এমন কি এদের কথা তাদের কানে গেল কি না তাই বোঝা গেল না। কিন্তু ওদেরও তখন জিদ চ'ড়ে গেছে। ওরা গৌরহরির সম্মতির অপেক্ষা করার

কোনোই প্রয়োজন বোধ করলে না। তখনই দড়ি চলল গৌরহরির ঘরের মাপ করতে। গৌরহরি শিমুল গাছের গুঁড়ির উপর নিঃশব্দে ব'সে রইল।

একটু পরে দেখা গেল, বিনোদিনী ঘড়া নিয়ে চলেছে ঘাটে। গৌরহরির দিকে সে কটাক্ষেও চাইলে। শুধু অতগুলি লোক দড়ি নিয়ে কি মাপামাপি করছে, সকৌতূহলে তাই দেখতে দেখতে চ'লে গেল।

গৌরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুলে ভুলে একতারায় একটা ঝঙ্কার দিলে।

মাপামাপি শেষ ক'রে জনতা শিবদাসের বৈঠকখানার দাওয়ায় গিয়ে উঠল, সম্ভবত তামাক খাবার জন্যে। চীৎকার ক'রে ক'রে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই।

গৌরহরি কিন্তু সেইখানেই নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে রইল। ভোরের মিঠা রোদ উঠেছে, তাইতেই ওর মন যেন ভ'রে উঠল। ও হঠাৎ একতারা বাজিয়ে গান ধ'রে দিলে:

সখি! হের দেখসিয়ে বা।
চন্দ্রবদনী ঘুমাইয়ে ধনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা॥
নাগরের বাহু শিথান ক'রেছে
বিথান বসন ভূষা।
নাসার নিশাসে বেশর দুলিছে
হাসিখানি আছে মিশা॥

এমন সময় বিনোদিনীকে ফিরতে দেখে ও গান বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল। বিনোদিনী ওর দিকে চেয়ে গান শুনতে শুনতে আনমনে আসছিল। গৌরহরিকে হঠাৎ উঠতে দেখে ওর বুকের ভিতরটা ধ্বক্ ক'রে উঠল।

গৌরহরি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পেট-কাপড় থেকে একটা পুরিয়া বের ক'রে নতমুখে বললে, এই ওষুধটার জন্যেই কাল সন্ধ্যের সময় তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

বিনোদিনী বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে ঔষুধটা নিলে! তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে পারলে না, কি ওটা? কিসের ঔষধ?

গৌরহরি আপন মনে বলতে লাগল, অমাবস্যার রাত্রে পূর্ব্বমুখে একটি ডুব দিয়ে মাদুলী ক'রে পরতে হবে।

বিনোদিনীর সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। হেসে বললে, তারপর ?

—তারপর আর কি! আধি-ব্যাধি সব দূরে যাবে। মনের শান্তি ফিরে আসবে। এই সব আর কি!

—কোত্থেকে আনলে ?

—ছোট বাবাজির কাছ থেকে। অব্যর্থ ওষুধ।

ব'লে গলা নামিয়ে গৌরহরি বললে, যেদিন মাদুলী ধারণ করবে, তার পরের দিন হারাণ আর কোথাও থাকবে না, তোমার পায়ের গোড়ায় এসে হাজির হবে।

বিনোদিনী হেসে ফেললে। বললে, সেই জন্যে তো আমার আর ঘুম হচ্ছিল না কি না!

ব'লে ঔষধটা যত্ন ক'রে আঁচলে বেঁধে রাখলে।

গৌরহরি হেসে বললে, তারপরে কিন্তু মনে ক'রে আমার বকশিস্‌টা দিও।

বিনোদিনীর সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলে উঠল। বললে, তোমার আর বকশিস্ কি বল! কাণা কুকুর মাড়েই সন্তুষ্ট।

কিন্তু তখনই কথাটা ফেরাবার জন্যে বললে, অমন বাহারের গানখানি কোথায় শিখলে শুনি ?

—কেন, ভালো গান নয় ?

—খুব ভালো গান। মনে হচ্ছিল সারাদিন ব'সে ব'সে শুনি।

গৌরহরি সবিনয়ে হাসলে।

বিনোদিনী চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলে, আর তোমার বোষ্টুমীর কি করলে ?

—রাধারাণীর ইচ্ছায় তাও এক প্রকার হয়েছে।

—তাই নাকি ? নিয়ে এস তা'হলে।

—গৌরহরি হেসে বললে, বোষ্টুমী পেয়েছি, কিন্তু নিয়ে আসতে পারব কিনা জানি না।

—সে আবার কি!

—আমার ওই রকমই অদৃষ্ট কিনা! পাই, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারি না।

গৌরহরি ইঙ্গিত পূর্ণ হাসতে লাগল।

বিনোদিনী হাসতে গিয়ে হাসতে পারলে না। হন হন ক'রে চলে গেল।

৫

দেখতে দেখতে গৌরহরির ঘর অনেকখানি উঠে পড়ল। যে লোকটা দেওয়াল দিচ্ছে তার হাত যেন খুলে গেছে। এখানকার অধিকাংশ বাড়ী তারই হাতের তৈরী, কিন্তু এমন নিখুঁৎ দেওয়াল তার হাতে আর কখনও ওৎরায় নি। দেওয়াল দেখে সবাই খুসী হয়ে এই কথাটা বলতে লাগল। অথচ তুচ্ছ একখানা আখড়া-ঘরের দেওয়াল,—এত ভালো না হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু যার ঘর তারই পাত্তা নেই। গৌরহরি হুট্ ক'রে একদিন আসে, দু'দিন থাকে, গান গেয়ে ভিক্ষা করে, রাঁধে বাড়ে খায়, তারপর হঠাৎ একদিন একতারাটা হাতে করে কোথায় যে চলে যায় কেউ জানে না।

শিবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার যে রকম পালাই-পালাই গতিক দেখছি, থাকবে তো এখানে? না, আমাদের কষ্ট করে আখড়া তোলাই সার হবে?

গৌরহরি হাসলে। মৃদুকণ্ঠে বললে, না, পালাব কেন?

—দেখো ভাই। শেষকালে।

—না।

কিন্তু গতিক ওর ভালো নয় সত্যই। কেমন যেন এলোমেলো। কখনও মনে হয়, আখড়া সম্বন্ধে ওর উৎসাহের আর শেষ নেই। ভিক্ষোপজীবী হলেও কায়িক পরিশ্রমে ও একেবারে অপটু তা নয়। কখনও এসে নিজেই দেওয়ালের জন্যে মাটি তৈরী করতে লেগে যায়। যারা দেওয়াল দিচ্ছে তাদের কাজের অনেক সাহায্য করে। পাঁচজন মাতব্বরকে ডেকে এনে ত্রুটি-বিচ্যুতি, সুবিধা-অসুবিধা দেখিয়ে নেয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে শিবদাস এবং তার মায়ের সঙ্গে আখড়া সম্বন্ধে নানারকম আলাপ-আলোচনা করে। আবার কখনও একেবারে চুপ। যে ক'দিন থাকে, আখড়ার দিকে চোখ তুলে চেয়েও দেখে না।

শিবদাস পাঁচটা কথা বললে কখনও একটা নিস্পৃহ উত্তর দেয়; কখনও তাও দেয় না।

এইটে শিবদাসের ভালো লাগে না। সে গৃহী,—গৃহ সম্বন্ধে মানুষের উৎসাহের অভাব তার বিসদৃশ মনে হয়।

একদিন বিকেল বেলায় হতাশভাবে দাওয়ায় গা ছড়িয়ে বসে বললে, মিথ্যে ঘর তুলছি মা, গৌরহরি হয়তো আসবেই না।

গৌরহরিকে তার মধুর কণ্ঠ এবং নিরীহ স্বভাবের জন্যে সকলেই ভালোবাসে। মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, কেন রে! তাই বলে পাঠিয়েছে না কি?

বিরক্তভাবে শিবদাস বললে, বলে আবার পাঠাবে কি? তার গতিক দেখে বুঝতে পারছ না?

গতিক ভালো নয়ই বটে। মা অন্ধকার মুখে চুপ করে রইল।

শিবদাস আপন মনেই বলতে লাগল, সোমবারে ফিরবে বলেছিল। তা দু'সোমবার গেল, বাবুর পাত্তা নেই।

—অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

বিকৃত মুখে শিবদাস বললে, হাঁ!

—তা নইলে এত দেরী তো কখনো করে না।

—তুমিও যেমন! তার কি আর বাড়ী-ঘর বলে খেয়াল আছে? কোথাও বসে বসে দিব্যি মচ্ছব মারছে আর কি!

এ অনুমান মায়ের কাছে সমীচীন মনে হল। বললে, তা হতে পারে।

মাটিতে একটা চাপড় দিয়ে উত্তেজিতভাবে শিবদাস বললে, হতে পারে নয়, নিশ্চয় তাই। আমি তোমাকে বলছি, ও একটা বদ্ধ পাগল।

মা হেসে ফেললে।

শিবদাস বললে, হাসি নয় মা, সত্যিই পাগল! নইলে মানুষের আবার বাড়ী-ঘরের ওপর মমতা থাকে না!

শিবদাসের বৌ অদূরে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। গ্রাম-সম্পর্কে গৌরহরি তার ঠাকুরপো হয়। সেই সুবাদে অস্ফুটস্বরে টিপ্পনি কাটলে, সাধের পাগল! ডাল নইলে ভাত খায় না!

শিবদাস রসিকতাটা বুঝলে না। তার স্বভাবেই রসবোধটা কম। বললে, কে ভাত খায় না? গৌরহরি? তুমি সব জান কি না!

ওর ক্রোধ দেখে মা হেসে বললে, না রে, বৌমা ঠাট্টা করছে।

শিবদাস শুধু বললে, হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বললে, কে জানে আবার বিন্দাবনই চলে গেল কিনা! সেবারও তো এমনি না-বলা না-কওয়া পালিয়েছিল!

—না, বিন্দাবন যাবে কেন? মচ্ছব্ই খাচ্ছে কোথাও।

—হুঁ, তুমি তো সবই জান!

আবার কিছুক্ষণ পরে বললে, কাল আসছে তো আসছে, নইলে পরশু সকালে দেওয়াল্-টেওয়াল সব দোব ভেঙে। যা মর গা!

শাশুড়ীর কানে-কানে বৌ ফিস ফিস করে বললে, হয়তো দেখ, একেবারে বৌ নিয়েই হাজির হচ্ছে।

—তাই নাকি?

কথাটার কিয়দংশ শিবদাসের কানে গিয়েছিল। সে উৎসাহে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলে, কি হল? কি আসছে?

মা বললে, বৌমা বলছে সে নাকি বৌ নিয়ে আসবে।

সাগ্রহে শিবদাস বললে, তাই বলে গেছে না কি?

বৌ ফিস ফিস করে বললে, যাওয়ার আগের দিন শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে তাই বলছিল।

শিবদাস খুশী হয়ে উঠল। হো হো ক'রে হেসে বললে, পাগল! বুঝলে মা, বদ্ধ পাগল! ও সব পারে। ঘর নেই, বাড়ী নেই, হয় তো আস্ত একটা বৌ নিয়ে এসেই উপস্থিত হবে।

বৌ বললে, আস্তা বৌ আনবে না তো কি আধখানা বৌ নিয়ে আসবে?

—তাও পারে। ও পাগলের অসাধ্যি কিছু নেই।

শিবদাস চঞ্চল হয়ে উঠল।

বললে, তা'হলে একটা ঘর তো ঠিক ক'রে রাখতে হয়। এসে উঠবে তো এইখানেই!

এবারে মা ও বৌ দুজনেই হেসে উঠল।

মা বললে, তুইও একটা পাগল বাছা! আগে সে আসুকই তো। তারপর ব্যবস্থা হবে।

শিবদাস উৎসাহের আধিক্যে উঠিতে যাচ্ছিল। অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'সে পড়ল। বললে, তা বটে।

মা ও বৌএর হাসি থামে না। দেখে শিবদাসও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কিন্তু বৃন্দাবনও নয়, অন্য কোথাও নয়, গৌরহরি তখন ছোট বাবাজির আখড়ায়। ভোরে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে ছোটবাবাজির সঙ্গে ভজন করে, তাঁকে গান শোনায়। রান্নাঘরে তমাললতাকে টুকি টাকি কাজে সাহায্য করে। দুপুরে দুটি প্রসাদ পেয়ে ছোট বাবাজির পদসেবা করে তমালতার সঙ্গে। হয়তো একটু নিদ্রাও দেয়। সন্ধ্যায় তৃতীয়বার স্নান করে আবার ভজন-সাধন। এসময় তমাললতাও থাকে। ভজনের সেই সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। রাত্রে দুটি প্রসাদ পেয়ে আবার দু'জনে মিলে ছোট বাবাজির পদসেবা।

এই পদসেবার অধিকার নিয়ে দু'জনে দু'বেলা কলহ বাধে।

গৌরহরি বলে, তুমি তো এইখানেই আছ তমাললতা। যে ক'দিন আমি থাকি, একলা আমাকেই পদসেবা করতে দাও।

তমাললতার তাতে আপত্তি আছে।

বলে, সে কি হয়? তুমি দু'দিনের জন্যে এসেছে। কুটুম মানুষ। খাও দাও, ঘুমোও। আমার কাজ আমিই করি।

ছোট বাবাজি হাসেন। দুটি পা তিনি দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে এই কলহের মীমাংসা করেছেন বটে, কিন্তু তাতে গৌরহরির মনের ক্ষোভ মেটেনি। সে চায় একচেটিয়া অধিকার। আর একটি অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। ছোট বাবাজিকে তেল মাখাবার সম্পূর্ণ অধিকার একা তমাললতার। এটি তার হাত থেকে গৌরহরি কিছুতে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ছোটবাবাজিও সেজন্য তমাললতাকে বিশেষ জেদ্ করেন নি।

কলহে না পেরে গৌরহরি সকাতরে অনুরোধও জানিয়েছিল।

তমাললতা হেসে বলেছিল, তুমি পারবে না।

—আমি তেল মাখাতেও পারি না?

—না।

একথার উত্তের গৌরহরি আর কি বলতে পারে? মেয়েটি বয়সে অল্প বটে,

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত তার কথা, এবং এত স্পষ্ট যে ওর সঙ্গে কথায় পারা গৌরহরির পক্ষে অসম্ভব।

বিনোদিনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সে তমাললতার তুলনা করে। দু'জনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, অথচ দু'জনের মধ্যে কত বড় তফাৎ! বিনোদিনী অত্যন্ত অবহেলায় আপনাকে প্রকাশ করে, আপন দীপ্তিতে সে সহজে দূরত্ব রক্ষা করে। দম্ভ এবং তেজ তার আয়ত চোখের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রেছে। ওকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু চাওয়া যায় না।

ওর সঙ্গে তমাললতার মিল এইখানে যে হাসি-গল্প-কলহের মধ্যেও তাকে কাছে পাওয়া যায় না। এইটুকু বয়সেই, বোধ করি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত খাওয়ার ফলে, আত্মরক্ষার কৌশলটি তমাললতা চমৎকার আয়ত্ত ক'রেছে। ধরতে গেলেই সে কেবলই পিছলে পালায়। এই কিছু কালের অভিজ্ঞতায় গৌরহরি বুঝেছে, ওকে চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পাওয়ার আশা কম।

ছোট বাবাজির নির্দ্দেশে গৌরহরি ওকে গান শেখাবার ভার পেলে। দিন দুই তমাললতা খুব মনোযোগের সঙ্গে গান শিখতে লাগল। তার পর ডেকে ডেকেও আর তাকে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে তার কাজের চাপ যেন অকস্মাৎ বেড়ে গেল।

গৌরহরি ডাকলে, কি, গান শিখবে না?

মুখ না ফিরিয়েই তমাললতা জবাব দিলে, না।

—না কেন? ছোট বাবাজি নিজে বললেন,

—ও আমার হবে না।

তমাললতা হেসে ওর দিকে চাইলে।

—হবে না মানে? তোমার গলা তো চমৎকার!

তমাললতা উত্তর দিলে না। কিন্তু গান শেখায় তার এইখানেই ইতি। সে আর ওদিক দিয়েই গেল না।

হাল ছেড়ে দিয়ে গৌরহরি তার পরের দিন বাড়ী রওনা হ'ল। কত দিন আর সে পরের আখড়ায় থাকতে পারে?

গৌরহরি ফিরে এল, একলা।

শিবদাস সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে কি হে! একলা যে!

গৌরহরি হেসে উত্তর দিলে, একলা না তো কি সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ থাকবে?

—না, না। তা বলিনি। বলছি, বোষ্টুমী কই?

—আসছে।

—কোথায়?

—চতুর্দ্দোলায়। নাও, একটু তামাক খাওয়াও দেখি।

—বিলক্ষণ!

তামাক সেজে এনে শিবদাস বললে, বৌ বলছিল, এবার নাকি তুমি বোষ্টুমী সঙ্গে নিয়ে আসবে। তাই ভাবছিলাম···

—পাগল!

উৎসাহিত হয়ে শিবদাস বললে, আমিও, তাই বলছিলাম। গৌরহরি আসবে বৌ নিয়ে, তবেই হয়েছে!

শিবদাস হাসতে লাগল।

তার পরে বললে, কিন্তু আমি বলি কি···

বাধা দিয়ে গৌরহরি বললে, তুমি আর কিছু বোলো না ভাই। বরং খবর কেমন বল?

—খবর?—শিবদাস হা হা ক'রে হাসতে লাগল। বললে,—এ গাঁয়ে তো আর খবরের পাঠ নেই। গিয়েছিলাম রণপুরে কবির লড়াই শুনতে। তা হ্যাঁ, শুনতে হয় তো নটবরের কবি। ওর কাছে কি গোপাল দাস তাল পায়? ভোর নাগাদ গোপাল দাসের এক হাত জিভ বেরিয়ে গেল।

শিবদাস মহোৎসাহে রণপুরের কবির লড়াই-এর বিশদ বিবরণ দিতে লাগল।

কিন্তু শিবদাসকে কোন কথা জানানর অর্থ গোটা গ্রামে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া। স্ত্রীর কাছ থেকে গৌরহরির বৈষ্ণবী গ্রহণের সম্ভাবনার কথা শোনা মাত্র সে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের কাছে প্রচার ক'রে দিলে যে, গৌরহরি অচিরে বৈষ্ণবী নিয়ে গ্রামে ফিরে আসছে। যেটা ছিল মাত্র সম্ভাবনা শিবদাসের কল্যাণে

তা নিশ্চয়তায় দাঁড়াল। সুতরাং গ্রামের সকলেই একে একে এসে এ সম্বন্ধে প্রশ্নবাণে গৌরহরিকে বিব্রত ক'রে তুললে।

খোঁড়া ভট্চায হুঁকো হাতে এসে যথেষ্ট আনন্দ জানালেন :

—বেশ বাবা, বেশ। শুনে বড় খুশী হ'লাম। বেটাছেলে, উড়ে উড়ে বেড়ালে কি চলে? গৃহ একটা চাই। শাস্ত্রে বলে, গৃহিনী গৃহমুচ্যতে। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ, বেশ।

গৌরহরি এর আর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না। শুধু নীরব ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে।

এর পরে আর গুজবের সত্যতা সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোনোই সন্দেহ রইল না।

বললেন, বেশ, বেশ। বড় খুসী হয়েছি। তাই ভাবলাম, ওই দিকেই তো যাচ্ছি। যাবার পথে তোমাদের দু'জনকে একটা আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। ভালো ভালো।

গৌরহরি মুখ নামিয়ে শুধু একটু হাসলে।

ভট্টাচার্য্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলতে লাগলেন, কিন্তু ভালো ক'রে একটা মচ্ছব দিতে হবে বাবাজি। না, না, এখনই নয়। ঘর-দোর হোক, ধান-পান উঠুক, তারপরে।

গৌরহরি তবু খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল।

খোঁড়া ভট্চায নববধূ দর্শনের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অবশেষে বললেন, তা বৌমাকে দেখছি না যে! ঘাটে গেছেন বোধ হয়।

তিনি অন্দরের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

শিবদাস কি একটা প্রয়োজনে ভিতরে গিয়েছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সকল কথা সে শোনেনি। শেষের প্রশ্নে ভাবলে, ভট্টাচার্য্য বোধহয় তারই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করছেন।

গম্ভীরভাবে বললে, হ্যাঁ, সব ঘাটে গেছে।

ভট্টাচার্য্য অপরাহ্ণের দিকে আবার আসবার ভরসা দিয়ে উঠে গেলেন।

কিন্তু বিপত্তির এইখানেই শেষ হ'ল না। এর পরে আবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনে দলে দলে নরনারী এসে শিবদাসের বাড়ীতে ভিড় জমালে।

বললে, বৌ দেখাও।

—বৌ কিসের ?

—বা রে ! গৌরহরি বোষ্টুমী এনেছে, দেখাবে না ? সিন্ধুকে বন্ধ ক'রে রাখবে না কি ?

শিবদাসের মা হেসে বললে, তোরাও যেমন পাগল হয়েছিস ! বৌ কোথা পাবি ? বৌ কি সে এনেছে ?

—তবে কি সেখানেই রেখে এল ?

—তা কি ক'রে জানব মা ? সেই জানে।

কৌতূহলী জনতা হতাশ হয়ে বিদায় নিলে।

সবাই এল, এল না কেবল বিনোদিনী। সকালের দিকে হয়তো তার কাজের চাপ বড় বেশী। কিন্তু লোকমুখে সে সবই শুনেছে। সে এল বিকেল বেলায় শিবদাসের বাড়ী।

গৌরহরিকে জিজ্ঞাসা করলে, বৌ আনলে না যে ! সুন্দরী বৌ বুঝি ? আনতে ভয় হ'ল ?

গৌরহরি হেসে বললে, নাঃ ! এইবারে সত্যি সত্যি মালাবদল না করলে আর চলছে না দেখছি।

—সত্যি সত্যি মালাবদল করনি নাকি ?

—সত্যি সত্যি কেন, মিথ্যেমিথ্যি মালাবদলও করিনি। গুজবটা রটালে কে বল তো ?

বিনোদিনীর চোখ-মুখ অকস্মাৎ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে মুখ নামিয়ে বললে, তা আমি কি ক'রে জানব বল ? সবাই বলছে, তুমি নাকি মালাবদল ক'রে এসেছ, তাই শুনছি।

—ও !

একটু পরে গৌরহরি বললে, তার কোনো আশা নেই বিনোদিনী।

—কিসের ?

—মালা-বদলের।

—কেন ?

হাতের তালু উল্টে গৌরহরি বললে, কেন, রাধারাণীই জানেন।

বিনোদিনীও চুপ ক'রে রইল তারপরে বললে, কেন, সেই যে বলছিলে, একটি ভালো মেয়ে নাকি পাওয়া গেছে?

—তা গেছে।

—তবে?

—ওই যে বললাম, আশা কিছু নেই। বড় শক্ত মেয়ে।

বিনোদিনী ফিক ক'রে হেসে ফেললে, তোমার অদৃষ্টে কি যত শক্ত মেয়েই পড়ে?

গৌরহরি চমকে উঠল। বোধহয় ঠিক এই কথাই সে মনে মনে ভাবছিল। বললে, সত্যি। ভালো কি মন্দ জানি না, কিন্তু রাধারাণী দেখছি আমার অদৃষ্টে তাই লিখেছেন।

আবার বললে, ইচ্ছা করে তমাললতাকে এনে তোমায় দেখাই। তোমার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল আছে।

সভয়ে চারিদিকে চেয়ে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বললে, থাম, থাম।

গৌরহরি চুপ করলে।

অনেকক্ষণ পরে গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই মাদুলীটা কোথায়?

—মাদুলী কোথায়?

—সেই যে ওষুধটা ছোট বাবাজির কাছ থেকে এনে দিয়েছিলাম।

বিনোদিনী এতক্ষণে বুঝতে পারলে। সেটার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

মুখ নামিয়ে বললে, আছে।

—কোথায়?

—পেটারীতে।

বিনোদিনীর ওর দিকে চেয়ে ফিকা হাসলে। হাসলে বটে, কিন্তু গৌরহরি দেখলে ওর মুখের রক্ত কে যেন চক্ষের পলকপাতে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, ব্যবহার কর না?

—না।

—কেন?

বিনোদিনী জবাব দিলে না। নিঃশব্দে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে গৌরহরিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল।

শেষ অপরাহ্ণের ছায়া দীর্ঘতর হ'তে হ'তে ধীরে ধীরে প্রশস্ত উঠানটি গ্রাস ক'রে ফেললে। একটুখানি হালকা হাওয়ায় পাশের ছায়াচ্ছন্ন তেঁতুল গাছটি বার কয়েক করুণভাবে মাথা নাড়লে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

একটি বুদ্ধিজীবী

Jupiter first deprives of reason those whom he
wishes to destroy.

যাযাবর মেঘ এলো পাহাড়ের বন্দরে,
আর আমাদের জাহাজের উপরে
সেই গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এলো ঃ

শান্তি নেই,
মানুষের অরণ্যে
মূলধনের মত্তহাতী বৃংহিত করে,
ঐশ্বর্য্যের সূর্য্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন।
বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা ;
তাইত গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন,
নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত্ত প্রার্থনায় ;
তাইত ঘরে বসে সর্ব্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত শুনি আর শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি ঃ
'আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
বিপ্লবের পর উদ্ধত শান্তি—
সে ত ভাজার কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুন।'

তাইত ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে খোঁজে আর খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্ব্বশীর অভিশাপ।
মাথার উপরে আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য্য-সংস্কৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।

গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এলো ;
প্রবাসী নাবিক নরকে এখনো ঘোরে।

সমর সেন

'বাস্তব ও কল্পনা'

সমস্তদিন বর্ষণের পর বর্ষণক্ষান্ত আকাশে অপরাহ্ণের আলো সজল এবং বড় করুণ লাগিতেছে। কাটা ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। অস্তগামী রশ্মি মেঘস্তুপের উপর ম্লান হইয়া পতিত হইয়াছে। বাইরের বারান্দায় সমী একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট হাতে চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বর্ষা-অপরাহ্ণের এই আর্দ্রতা এবং স্নিগ্ধতা তাহার ভালো লাগিতেছিল। মনের মধ্যে যে সকল ভাব আনা গোনা করিতেছিল তাহাকে বস্তুতান্ত্রিক ভাবও বলা যায় না অবিমিশ্র কল্পনা বলিলেও হয়তো ঠিকটি বলা হয় না। স্মৃতিতে, বেদনায়, করুণতার সৌন্দর্য্যে তাহা এক প্রকার স্বপ্ন—যে স্বপ্নের ঘোর মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে না লাগিলে তাহার রূপ এবং রঙ দুই-ই ফিকা হইয়া যায়। এমন সময়ে শ্রীমতী দীপ্তি পেয়ালায় করিয়া ধূমায়িত চা লইয়া সেখানে আসিলেন। কিন্তু সমীর এই একটা অত্যন্ত দোষ, মনের ভাব যাহাই থাকুক ঠিক তাহার উল্টা কথাটি বলিয়া দীপ্তির সহিত তর্ক করা চাই-ই। সে বলে এরূপ তর্ক করাটা মানসিক পদচারণা। আজও তাহাকে দেখিয়া সমীর তর্ক করিবার প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিল। চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া সে আর একখানা কেদারা অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, ব'সো। দীপ্তি শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বাহিরের আকাশ একবার সমীর হস্তধৃত চায়ের পেয়ালা এবং আর একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কিন্তু আমি গৃহন্তরে রান্না চড়াইয়া আসিয়াছি তোমার ঐ বলিবার ভঙ্গী হইতে মনে হইতেছে আজ হয়তো তরকারীতে নুন দিয়াছি কিংবা যাইয়া দিব একথাটা আর মনে পড়িবে না। সমী বলিল, তা হোক। আজ ঐ বর্ষণক্ষান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে তরকারীতে যদি নুন কম হয় এবং পানে যদি চুণ বেশী হয় জীবনে সে কথাটা খুব একটা বড় কথা নয়।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, তাই নাকি ?

সমী বলিল, হাঁ তাই। কিন্তু এই মুহূর্ত্তগুলি ক্ষণিক। জীবনের বেশির ভাগ সময়েই আমরা পান হইতে চুণ খসিলে অস্থির হইয়া উঠি। বর্ষার আকাশকে তখন ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া বোধ হয়, মেঘদূতকে এক অলস যক্ষের প্রলাপবাণী

বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞার হাস্য করিয়া থাকি। তখন আমাদের এ সকল অপেক্ষা আপিসের বড়বাবু এবং ব্যাঙ্কের ব্যালান্স্‌কে ঢের অধিক সত্য বলিয়া মনে হয়। আমি এক এক সময় অবাক হইয়া ভাবি আমাদের জীবনে বাস্তবই বেশি সত্য না এই ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠা মুহূর্তগুলি বেশি সত্য? এই কথাটা আজ যাচাই করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

দীপ্তি কহিল, কোনটাই মিথ্যা নয়। তুমি যাহাকে ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত মুহূর্ত বলিতেছ, সেগুলি আমাদের জীবনের আলো। কিন্তু আলোটা সত্য বলিয়া অন্ধকারটাও লেশমাত্র অসত্য নয়। তাই আবার মনে হয় আজকালকার অনেক নব্যপন্থী লেখকরা যে এই আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া সমস্বরে কহিতেছেন, "আলোটা কিছু নয়। অন্ধকারটাই এক-মাত্র সত্য"। এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ দল আরও জোরে বলিতেছেন, "মোটেই না। ওটা তোমাদের শস্তা রিয়ালিজম্, আসলে অন্ধকার যদি বা থাকে তাহাকে অন্ধকারে চাপিয়া রাখা দরকার। আলোটাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করা প্রয়োজন"।—এ ব্যাপারটাও খুবই অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের নায়ক যতীনের মুখের একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যতীন বলিয়াছিল, 'জীবনের সুখগুলি আকাশের ঐ তারার মত। ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। সমস্ত অন্ধকারটা লেপে রাখে না। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি?"—এখন এই সুন্দর কথাটির অর্থ আমরা যদি অনুভব করিতে না পারি, বরঞ্চ কোমর বাঁধিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হই যে, ঐ মিটমিটে তারাগুলির ক্বচিৎ দীপ্তির চেয়ে আকাশের সীমাহীন অন্ধকারের বিস্তৃতিটা ঢের বড় অতএব ইত্যাদি···ইত্যাদি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের চরিত্রে সঙ্গতিজ্ঞান নেই।

সমী চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, স্ত্রীলোকমাত্রেই ভাবপ্রবণ। অমনই তুমি ঠেশ দিয়া নব্যপন্থী লেখকদের কথা পাড়িয়া বসিলে! কিন্তু আজকাল একদল লেখক যে বলেন, জীবনে যাহা ঘটে তাহাকে দেখাইব না কেন? এবং জীবনে যাহা ঘটে না সেই অবাস্তব কথাকেই বা কল্পলোকের রঙ চড়াইয়া দেখাইব কেন?—এ কথাটার মাঝে কি সত্যের লেশ নাই? ধর যদি কেহ বলেন, বাস্তব জগতে কি পথে ঘাটে সুচরিতা বা ললিতার সাক্ষাৎ মেলে, না বাংলাদেশে একমাত্র

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া লাবণ্য বা অমিতরায়ের ছাঁদে কেহ কথা বলিতে পারে?—তা যখন পারে না তখন তাহাদের সৃষ্টি করিবার কৈফিয়ৎটা কি?—তবে তাহার সে কথাটা কি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু?

দীপ্তি ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহাই আমার জানা ছিল না। অমিতরায়, লাবণ্য বা সুচরিতাকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে হয়তো দেখিতে পাইনা, আমাদের জগতে হয়তো তাহারা নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জগতে তাহারা আছে এবং সে জগত হইতে শরীরী হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তুমি কি মনে কর আমাদের বাস্তবজগৎটাই সত্য আর যে জগৎ হইতে সুচরিতা ললিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে সেটা ইহার চেয়ে কিছুমাত্র অসত্য? তা নয়। আমার মনে হয় যাঁহারা এই কথা বলেন, বাস্তবজগৎ বলিতে তাঁহারা কি বোঝেন সে কথাটার নিশানাই হয়তো এখনও স্পষ্ট হয় নাই। আমরা দু'চোখ মেলিয়া যাহা দেখি এবং কাণ পাতিয়া যাহা শুনি সেইটাই কি বাস্তব? ইহা ব্যতীত আর কোন বাস্তব কি নাই? তাই যদি হইত তবে কবির কাব্য কেবলমাত্র আমাদের প্রতিদিনের প্রাত্যহিক ঘটনার দিনলিপি হইত। এবং শীত-শেষের পুঞ্জিত শুষ্ক পত্ররাশির মত তাহাও কিছুকাল পর অবজ্ঞাত হইয়া ঝরিয়া যাইত। অথচ তাহা তো হয়না। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য আমাদের চিরদিনের আনন্দলোকের বস্তু হইয়া থাকে। অথচ সে যদি শুধুই কল্পনা হইত, জীবনমূলের কোন অন্তর্নিহিত গূঢ় বাস্তবের সহিত যদি তাহার সংযোগ না থাকিত তাহা হইলেই বা সে টিঁকিত কেমন করিয়া? আমরা কখনো কখনো বুঝিতে পারি আমাদের বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে কোন এক সৌন্দর্য্যের উৎস আছে। সকল সময় তাহা প্রকাশমান নয়। নানা দৈন্যে নানা অবান্তরতায় তাহার প্রকাশ প্রতিহত। কবির দৃষ্টি সেই দৈন্য ভেদ করিয়া সে অন্তরাল ছিন্ন করিয়া ফুলের মত ফুটাইয়া তোলে আমাদের সংগুপ্ত সুষমা এবং সামঞ্জস্যকে। এ যদি না হইত তবে কেবলই কল্পনাবিলাস লইয়া কবির কাব্য কখনই আমাদের প্রাণের গভীরে আসন পাইত না।

সমী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, ও গেল তোমার বড় বড় কথার বুদ্বুদ মাত্র। প্রাণের গভীরে কি বস্তু আছে আজও তাহা অবধান করিয়া দেখি নাই। বরঞ্চ সাদা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহার কুশ্রীতা লোপ করিয়া তাহাকেই দস্তুরমত সজ্জিত বসন-ভূষণ

পরাইয়া কবি একটা জিনিষ খাড়া করেন। সেটা দেখিতে মনোরম হয় বটে কিন্তু সত্য হয় কিনা কেমন করিয়া বলিব।

দীপ্তি কহিল, সত্য কথাটার আসল মানে কি তাই আগে বলো ত? বেশি কথায় কাজ কি, তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি যখন ভৃত্যকে রুক্ষ ভাষায় তর্জ্জন কর তখন তোমার যে রূপ ফুটিয়া ওঠে সেইটাই কি তোমার জীবনের একমাত্র সত্য আর তুমি যখন তোমার সমস্ত অস্তিত্বকে একটি গানের সুরের মত অনির্ব্বচনীয় করিয়া প্রেয়সী নারীর কাছে নিবেদন কর, তখনকার পরিচয় কি একেবারেই অসত্য? এই মানুষের জীবনের হাটে নিমেষে নিমেষে কত রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কবি জানে কেমন করিয়া রূপ বাছিয়া লইতে হয়। একটা মানুষের ছড়াইয়া পড়া সহস্র বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ পরিচয় হইতে কবির মানসপটে ভাসিয়া ওঠে একটা সমগ্র সত্ত্বা। সে সত্তা হইতে আমরা মানুষকে বৃহৎ এবং সুন্দর বলিয়া জানিতে পারি।

সমী কহিল, কিন্তু মানুষ কি সত্যই তাই?

দীপ্তি কহিল, এ কথার উত্তর আমিও জানি না তুমিও জান না।

সমী কহিল, মানুষের কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, প্রবৃত্তি এ সকল নাই?

দীপ্তি কহিল, অথচ ইহার চেয়েও আশ্চর্য্য যে, এত সব থাকা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে অমৃতের পিপাসা আছে।

সমী বলিল, তবে মানুষের কোন রূপকে সত্যরূপ বলিব?

দীপ্তি বলিল, যে রূপ মানুষের ধ্যানের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সেই রূপই তাহার সত্য রূপ।

সমী বলিল, আমি বাপু তোমার ওসব বড় বড় কথা বুঝিতে পারি না। আরও একটু সহজ ভাষায় বল।

দীপ্তি কহিল, খুব সহজ কথায় বলিতেছি। তুমি যখন গলদঘর্ম্ম হইয়া টাইটা সোজা করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে অফিসে ছোট কিম্বা মশারিটা উট্‌মুখো করিয়া টাঙ্গাইবার জন্য চাকরটাকে যা নয় তাই বলিয়া বকিতে থাক, তোমার তখনকার রূপটা আমার কাছে সত্য নয়। কিন্তু অনেক দিন যে দেখিয়াছি অন্ধকার আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া তোমার মন জীবনের এই অভ্যস্ত উপকূল ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিংবা সূর্য্যাস্তের অতল প্রশান্তির মধ্যে ডুব দিয়া সমস্ত মন উদাস ও বিধুর হইয়া উঠিয়াছে ;—তোমার সেই ক্বচিৎ উদ্ভাসিত হইয়া

ওঠা যে রূপ, তাহাই আমার কাছে সত্য। বিশ্বমানবের সেই ক্বচিৎ দীপ্তিকে প্রকাশিত করিয়া তোলাই কবির সাধনার বস্তু।

রবীন্দ্রনাথকে আজ সমস্ত জগৎ অর্ঘ্য দিয়াছে, তাহার কারণ তিনি এই বস্তুকে তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। অন্ধকার আকাশের ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলি যেমন দেখা যায়, আমাদের প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত কর্ম্মরাশির আচ্ছাদনের বিরল অবকাশে যে স্বর্গের আলো নিভৃতে জ্বলিতেছে, সেই দীপ-শিখাকে তিনি আমাদের নয়নগোচর করিয়াছেন।

ধর ঐ চতুরঙ্গের ননীবালা ও পুরন্দরের ব্যাপারটা। কোন একজন আধুনিক লেখকের হাতে পড়িলে হয়তো তাহার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটা পরিণতি হইতে পারিত। হয়তো ননীবালা বহু বক্তৃতার অন্তে কোন একটা সেবাসদনে আসিয়া ভর্ত্তি হইত। হয়তো এ ছাড়াও আরও অপর অনেক কিছুও হইতে পারিত। এবং হয়তো অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বাহবা দিয়ে বলিতে পারিতেন, 'বাঃ চমৎকার! এই তো সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিবার দুঃসাহসিক রীতি।' কিন্তু শচীশ যখন তাহার ডায়েরিতে ননীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া লিখিল, 'ননীবালা মরিয়া আমাকে নারীর আর এক রূপ দেখাইয়া গিয়াছে। যে নারী মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করিয়া তুলিল'; যখন দেখি উপক্রুত অবমানিত নারীচিত্ত মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছে তাহার স্নিগ্ধ কিরণ ননীবালার কলঙ্কিত জীবনকে ছাপাইয়া বহু বহু দূর দিগদিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তখন রবীন্দ্র-নাথকে প্রণাম করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদিচ সংসারে ঠিক এইরূপটি ঘটে কিনা তাহা আমরা কেহই হলফ্ করিয়া বলিতে পারি না, যদিচ অহরহ চারিপাশে যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে অন্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি অন্যকে কতদূর ঠকাইয়াছেন এবং কি পরিমাণে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন তাহাও নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু নারীর যে পরিচয় জীবন সমুদ্রে একটি পরিপূর্ণ শতদলের মত সৌন্দর্য্যে, করুণায়, অশ্রুতে টলটল করিতেছে এবং জীবনের নানা অবান্তরতায় যাহা আচ্ছন্ন, ক্ষণিকের জন্য অবরুদ্ধ আলোকের সেই যবনিকা তুলিয়া তিনি তাহাই আমাদিগকে দেখিতে দিয়া আমাদের চরিতার্থ করিয়াছেন।

শ্রীআশালতা সিংহ

পুস্তকপরিচয়

As I was going down Sackville Street—By Oliver St. J. Gogarty (Rich and Cowan), 16/-

ইয়েট্‌স তাঁর সম্প্রতি সঙ্কলিত অক্সফোর্ড কাব্য চয়নিকায় গগার্টির সপ্তদশটি কবিতা গ্রথিত করে, মুখবন্ধে, তাঁকে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিদের অন্যতম বলে সমাদৃত করেছেন। ইয়েট্‌স-এর রুচি অনেকের কাছে উৎকেন্দ্রিক প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু একাধারে সুচিকিৎসক, সেনেটার, এয়ারম্যান, নাট্যকার, ইন্‌কিপার ও আড্ডাবাজ ব্যক্তিটির প্রতিভা কোন পরিচয়ের প্রতীক্ষায় অবজ্ঞাত ছিল না।

বহুপূর্ব্বে ডাবলিনের অভিজাত সম্প্রদায় যখন লণ্ডনের পদলেহন পরিত্যাগ করে স্বাধীন ভাবে বিজাতীয় সুধীজনদের আকৃষ্ট করছে তখন গগার্টি ছিলেন সকল সামাজিক অনুষ্ঠানেরই কর্ণধার। তাঁর কথকতার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রসনার একাধিপত্য লেখনীর কার্য্যে কতখানি প্রতিবন্ধক হয়েছে বলা যায় না, তবে সাহিত্যের ক্ষতি প্রকারান্তরে পূরণ হয়েছে যখন জেম্‌স জয়েস্ ও জর্জ্জ মুর একাধিকবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভারাশিকে শ্রবণ-বদ্ধ করে উপন্যাস অলঙ্কৃত করেছেন।

বৈদগ্ধ্য-গর্ব্বে গরীয়ান্ এ হেন ডক্টর গগার্টি যে সম্পূর্ণ মৌলিক ভঙ্গীতে জীবন-বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করবেন তা অনেকের অনুমান-সম্ভব ছিল কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য দুস্তরতর কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে। এতে কালের প্রথাগত গতি হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলভাবে কুণ্ডলীকৃত। জীবনের ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন বা স্ত্রী পুরুষ ঘটিত প্রণয় ব্যাপার হয়েছে মামুলী জ্ঞানে পরিত্যাজ্য। কিন্তু শিশু বা পশুপক্ষী অবলম্বনে নিরীহ কাব্যগ্রাহ্য ভাবালুতা পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত হয়েছে বোধ করি হেয় জ্ঞানে।

বইখানির মধ্যভাগ হতে উদ্ধৃত কথোপকথনটি হতে গ্রন্থকারের দুরাকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি হবে—

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তাঁর সুরামদির কর্ণকুহরে ফিস্ ফিস্ করে অনুরোধ

জ্ঞাপন করলেন মার্কিন রমণী—"আমার স্বামী দেশের একটি বিশাল প্রকাশক সঙ্ঘের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন—আপনি একটি বই লিখে অনুগৃহীত করুন—"

—"কি রকম বই—কি বিষয়ে ?"

—"আত্মস্মৃতি"

—"চিকিৎসকের অন্তরঙ্গ কথা প্রকাশ-যোগ্য নয়।"

—"কেন, আক্‌সেল্-মুন্‌তে কি আত্মচরিত প্রকাশ করে উপার্জ্জিত অর্থে চিড়িয়াখানা তৈরী করান নি ?"

—"আমি নিজে একটি চিড়িয়াখানা বিশেষ—আমার ছোট ছোট ভগ্নীরা—অর্থাৎ সেই চিড়িয়াখানার পাখীগুলো নিশ্চিন্ত চিত্তে জানে আমি প্রতিপালক হয়ে তাদের উদ্বাস্তু করবো না। যদি কখনও লিখি নিজের আশ্রয়-দাতার কথা লিখবো।"

এ হেঁয়ালীর তাৎপর্য্য মার্কিনী মগজে প্রবেশ করলো না। তিনি বল্লেন—"কিন্তু ডাক্তার, চিকিৎসা ব্যাপারের কথা উহ্য রেখেও ত' বই লেখা যায়। এত বড় বিপ্লব আপনার চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গেল—এর আবহাওয়ার ভেতরে থেকেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণের আধারে লিখে রাখলে উত্তরকালের ইতি-বৃত্তিকারের সুবিধা হবে—"

"রামঃচন্দ্র, পরিপ্রেক্ষণ আশা করবেন না আমার কাছ থেকে। আমি যদি আমাদের এই সহরের কথা লিখতে বসি, চীনে চিত্রকর যেমন করে ছবি আঁকে তেমনি করে দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব, নিকটত্ব এবং ঘনত্ব একাকার করে আঁকবো। 'পরিপ্রেক্ষণ' হচ্ছে সুকর ও সহজ। এই ডাবলিন সহরকে নায়ক করে স্বাধীন নিরালম্ব ভাবে প্রকাশ হতে দিলে চৈনিক চিত্রের মতই মহৎ হবে।"

সুসভ্য বহুরূপী ডাবলিনের প্রতীকে আপন হৃদয়-দ্যোতনার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতি-চ্ছায়া দেখা সহজ কিন্তু সমগ্র আইরিশ জাতির হৃৎপিণ্ডরূপ মহানগরীর একদেশদর্শী পরিচয় প্রদান করতে বসে মহৎ চীনা চিত্রের অমরত্ব দাবী করতে যাওয়া আর এক কথা। স্বাধীন বা বিপ্লবক্ষুব্ধ রাজধানীর কথা দূরে থাক নির্জ্জীব কলিকাতা সহরের অধিবাসী পাঠকেরও অধৈর্য্য আসে। মনে হয়, এতবড় সহরের সম্যক্ রূপ

উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। তার ওপর ঘটনার পারম্পর্য্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।

এই সকল কথা চিন্তা করে প্রণিধান-সময়ে বিচারবুদ্ধিকে সচকিত রেখে অগ্রসর হয়েছিলাম কিন্তু ক্রমশঃ ভাষার লালিত্য, প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্ব ও ঘটনার উত্তেজনা আবিষ্ট করে ফেল্লে। কথার স্রোত কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো তার ঠিকানা রইল না। যেন কতই অজ গ্রামবাসী প্রথম সহরে এসে হতভম্ব হয়ে অগ্রগামী সঙ্গিনীর আঁচল চেপে ধরেছি, অথচ রাজপথের জাঁক জমক দেখা চাই। এদিকে অতিকায় ডবল ডেকার বাসের মত কলিন্‌স, গ্রীফিৎ প্রমুখ মহারথীরা মরে গিয়েও ফিরে ফিরে ঘাড়ে পড়ছেন। ডি ভ্যালেরার কাল গ্রহ ওঠা নামা করছে। প্লান্‌কেট, হীলি, কস্‌গ্রেভ, যত্রতত্র বিরাজমান। আশা ভরসার জটিল জাল। তার মাঝে জর্জ্জ রাসেল (এ, ই) ও ইয়েট্‌স্ নিজ নিজ ভঙ্গীতে স্বপ্নমায়া বুনে চলেছেন। জর্জ্জ মূর 'ধরি মাছ না ছুই পানি' গোছ অস্পষ্ট অথচ কদর্য্যভাবে উঁকি ঝুঁকি মারছেন। ঝড়ো হাওয়ার মত এলেন সহৃদয় ইংরাজ লক্ষপতি টালবট্ ক্লীফ্‌ট্‌ন্। ধ্বংসের অগ্নিদাহ হতে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন পশু পক্ষী শিকারের নন্দন কাননে। দাহ্যমান জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকা হতে উত্থিত হলো ভয়াবহ ভৌতিক স্মৃতিমালা। শিশুর মত শান্ত, পেলব ও মধুর, এ,ই কোন আসরে স্বপ্নাবেশে বিভোর হয়ে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করছেন এমন সময় সকলকে চমকিত করে কলিন্‌স-এর রুক্ষস্বর উত্থিত হলো "ইওর পয়েণ্ট মিষ্টার রাসেল", দাঁড়িয়ে পড়েছেন হাতে পকেট বই আর পেন্‌সিল। বিপরীত চরিত্রের এমনি ধারা ঠোকাঠুকি। ইয়েট্‌স তাঁর বিশ্রাম কক্ষে শারীরিক অসুস্থতা উপভোগ করছেন গগার্টিকে দেখেই বলে উঠলেন "ওহে তোমাকেই দরকার ছিল—তোমার কি মনে হয় জর্জ্জ মূর পুরুষত্বহীন—'মেময়ের অভ মাই ডেড্‌লাইফ' পড়ে আমি তাই সিদ্ধান্ত করেছি।" আগন্তুক এই উক্তিটির অনুকূলে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বৃদ্ধকে উল্লসিত করে তুললেন। অজস্র কলগুঞ্জনময় নৈশ ভোজনের একটিতে কে যেন বল্লে, বারনার্ড শ গীর্জ্জায় গেছেন, চাঁদার থালা তাঁর সামনে এগিয়ে আসতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লেন "প্রেস্"। কোথায় যেন অগষ্টস্ জন্ লম্বা আঙ্গুল চালিয়ে লতা ছিঁড়ছেন—কত কথা মনে রাখা যায়!

যথা সময় নাগরদোলা থামতে সেই কৃপণ ইহুদির খেলনার দোকানের

কথা মনে পড়ে গেল। কাঁচের পুতুল, পেয়ালা, পিরিচ, থালা, বাটি কত কি কাতারে কাতারে সাজানো আছে। সন্ধ্যে নামতে দরজায় কুলুপ পড়লো। গৃহাভিমুখ বৃদ্ধের পশ্চাৎদেশটি আড় চোখে দেখে নিয়ে দেওয়াল ঘড়িটি সঙ্কেত করলো ঢং ঢং। অমনি পুতুলগুলো জেগে উঠে, আড় মোড় ভেঙে, নাচন লাগিয়ে দিলো। রাত্রি গড়িয়ে যেতে যেতে আনন্দ এমন সংক্রামক হয়ে উঠলো যে পেয়ালা পিরিচগুলো পর্য্যন্ত দিলো তাল ঠুকতে সুরু করে। সবাই নাচতে চায়। হঠাৎ ছন্দ গেলো কেটে। হুল্লড়ের মাঝে অনেকগুলি ঠ্যাং গেলো ভেঙে। তারপর ভোরের সোনালী আলো চোখে পড়তে ঘড়ি আবার বল্লে "ঢং ঢং"। খোঁড়ারা রইলো পড়ে, বাকি সবাই যে যার যায়গায় উঠে বসলো ভালমানুষটির মত, যেন কিছুই হয় নি।

গগার্টির স্মৃতিখণ্ডগুলি শৃঙ্খল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হট্টগোল করে বটে কিন্তু পরে সবাই সময়ের সেই অমোঘ পারম্পর্য্য ধরেই বসে যায়। পাঠকের মন আপন হতেই গুছিয়ে নেয় অনায়াসে। সে যাই হোক; মজা হচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় স্বয়ং গ্রন্থকার খঞ্জ হয়ে পড়ে আছেন।

তথাকথিত অসভ্য বর্ব্বর ডি ভ্যালেরাই অবশেষে হাতিয়ে নিলেন রাজ্য-চালনার ভার এবং তৎসমেৎ ডাবলিন সমাজ।

এখন অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মহানগরীটির যে-রূপ তিনি আপন বৈদগ্ধ্যের প্রভায় উদ্ভাসিত করেছেন তা ছাড়াও অন্য একটি বড় দিক ছিলো যার সঙ্গে পরিচিত হতে দেয়নি তাঁকে আভিজাত্যের অন্ধ অহংকার, যেদিক কথার মার প্যাঁচের ধার ধারে না।

ধরে নেওয়া যাক, এ, ই এবং ইয়েট্সের অতল ভাবসমুদ্র ও কলিন্স, গ্রীফিৎ প্রমুখ কর্ম্মবীরদের উত্তেজনারূঢ় জীবনের দ্বিপার্শ্বিক স্বাঙ্গীকরণে তাঁর দৃষ্টি ভূভাগ ছেড়ে বুঁদ হয়ে উঠেছিল আকাশে এবং সেখান থেকে আলো ছায়ার খেলা ছাড়া চোখে বিশেষ কিছুই পড়েনি—তবু এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি সাহিত্যের উৎকর্ষে, ঘটনার বৈচিত্র্যে।

যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সৌখীন উন্মাদটি ক্রীকেট খেলোয়াড়ের পোষাকের ওপর এক জোড়া তলয়ার ঝুলিয়ে এগিয়ে আসে তাকে কে না ভাল

বাসবে। জীবনের কলসে এক গণ্ডুষ স্বপ্ন প্রবেশ করে চক্ষু হতে লজ্জা সরিয়ে নিয়েছে—এখন সে হাসে জগৎকে উন্মাদ মনে করে আর সকলকে হাসায়।

ইন্দ্রলুপ্ত বিশাল গম্বুজাকার মাথাটি হেলিয়ে যে লাইব্রেরিয়ানটি বহু তথ্য-পূর্ণ কথার মাঝে চালিয়ে দিলেন সেই পাদ্রী মহোদয়ের কথা, যিনি রৌদ্রালোকে উপাচার্য্য-বধূর গাত্রাবাস উড্ডীন দেখে উচাটন হয়ে পড়েছিলেন—ডাবলিন-বাসী হয়ত তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করে কিন্তু এদেশবাসী একজন ভালও বাসলো।

ব্রাউনিং, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স ইত্যাদি বিশ্ববরেণ্য কবিদের কাব্যচেষ্টার শ্রাদ্ধ সমাপনের সঙ্গে উড়োজাহাজ হতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গ্রহণের মজা ও আনন্দের মিশ্রণ—মন্দ নয়। তার ওপর দেওয়াল-লিপি সংগ্রাহকের অপূর্ব্ব সঙ্কলন ও আক্ষেপোক্তি। জর্জ্জ মূরের চর্ম্মরোগকে উপদংশ জ্ঞানে বিভ্রাট—অনেক কিছুই উপাদেয়।

হরিণ শিকারের এতখানি চমৎকার বর্ণনা আর কোথাও পড়িনি। সেস্থনের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু কবির পক্ষে অশ্বারোহণের চেয়ে পদব্রজে বিচরণই বিধেয়—এই অধ্যায়টিতে মোটরকার-ভক্ত গগার্টি সরীসৃপের মত বুকেও হেঁটে ছিলেন। ক্লীফ্‌টন-কুমারের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার মধ্যে বয়সের ব্যবধান এসে কৌতুক সৃষ্টি করেছে। শুক্রবারের বৈঠকে জর্জ্জ রাসেলের প্রবেশ ও উপবেশনের মাধুর্য্য; বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক সার থর্ণলী ষ্টোকার-এর নৈশ-ভোজন পার্টিতে নগ্নমূর্ত্তি পাগলিনীর আবির্ভাব। অশ্লীল উক্তির জন্য জর্জ্জ মূরের গলহস্ত বহিষ্করণ—সামান্য ব্যাপার, কিন্তু স্থানীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে চিরশ্যামল হয়ে থাকবে।

অস্কার ওয়াইল্ড ইয়েট্‌সকে বলেছিলেন—"আমরা (আইরিশরা) এত বেশী কাব্য-ভাবোন্মাদ যে কবি হতে পারি না। আমরা যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট ফেলিওরস—কিন্তু আমাদের একটা গুণ অতুলনীয়—গ্রীকদের পর আমাদের মত কথার রাজা কেউ হয় নি।"

গগার্টির কাব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার মত অনুশীলন আমার নেই কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে ওয়াইল্ডের উক্তিটির উদাহরণ স্বরূপ পেশ করতে পারি। দুঃখের বিষয় ভাষার অত্যধিক পরিমার্জ্জনে অনেক কিছু অস্পষ্ট থেকে গেছে।

দোষের অভাব নেই। অনেক স্থানে উষ্মা ও খেদ ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন

করে ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করেছে। জাতি বিশেষের ওপর অবজ্ঞা প্রকাশ হয়েছে হীন ও কদর্য্য ভাবে। বার্কেন্‌হেড্‌, অষ্টিন চেম্বারলীন্‌ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব আত্মশ্লাঘার উপযুক্ত কারণ হতে পারে এবং উগ্রসাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসে আপত্তি নেই; কিন্তু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী স্বজাতীয় বন্ধুবর্গকে "বাবু ব্যারিষ্টার" বলে ব্যঙ্গ করার পেছনে দুরারোগ্য ব্যাধির পরিচয় পাই। কৌতুকের বিষয় এ-হেন ইংরাজ ভক্তকেও নিয়তির নিগ্রহে ব্ল্যাক এণ্ড ট্যানের হাতে অপদস্ত হতে হয়েছিল।

মার্কিন ধী-শক্তির ওপর তাচ্ছিল্য চিনির পাকেতে আবৃত করে প্রকাশ করা হয়েছে বলে তদ্দেশবাসী পাঠকেরা চরিতার্থ হয়ে যাবে বলে মনে করিনা; আর আমরা, ভারতবাসীরা, তাঁর সেই সামরিক বন্ধুর গল্প শুনে নিজেদের ধন্য মনে করবো না যিনি নাকি কোন হিন্দু দেবমন্দিরের দেবদাসীর একটিবার মাত্র দেহের আস্বাদন গ্রহণের ফলে যাবতীয় পাশ্চাত্য রমণীর আকর্ষণমুক্ত হতে পেরেছেন্।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

কঙ্কাবতী—বুদ্ধদেব বসু (কবিতা ভবন)

প্রায় কবিরই একটি সময় আসে (বিশেষ করে যৌবনকালে) যখন তাঁর কাব্য রচনা হয় প্রধানত ব্যক্তিগত। তারপর তাঁর রচনা ক্রমশঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাশ কাটিয়ে নৈর্ব্যক্তিক রূপধারণ করে। বুদ্ধদেবের কবিতা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বন্দীর বন্দনা, পৃথিবীর পথে ও কঙ্কাবতীর উৎস কবি নিজে। বন্দীর বন্দনায় যথেষ্ট বিদ্রোহ থাকলেও তার মূল প্রেরণা সামাজিক অব্যবস্থা অথবা শ্রেণি-বিরোধের মধ্যে নয়, কবিরই আত্মবিরোধের মধ্যে। পৃথিবীর পথে ও কঙ্কাবতী দুই-ই প্রেমের কবিতা এবং সেইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মোহ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। তবু ব্যক্তিগত কবিতাও যে কতদূর পর্য্যন্ত ভাল কবিতা হতে পাবে, তা কঙ্কাবতী পড়লে বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব এইখানেই। বাংলা-দেশে অধিকাংশ কবিরই মধ্যে এই ব্যক্তিগত বস্তুটুকুও মেলে না, বুদ্ধদেবের তা আছে এবং সেই জন্যই তিনি অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র। যদিও কঙ্কাবতীর ভাব, ভাষা ও ছন্দ

হালকা ধরণের তবুও পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতার চেয়ে এর স্বকীয়তার দাবী অনেক বেশী করে। এর কতকগুলি কবিতার মধ্যে ছন্দের মাধুর্য্য এত বেশী যে তাকে কবিতা না বলে সঙ্গীত বললেও অত্যুক্তি হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সেরিনাড' নামক কবিতার কিয়দংশ দেখানো যেতে পারে ঃ

জানালার কাচ জ্বলেছে তোমার—জোছনা-কণা,
কঙ্কাবতী !
রাঙা-ভাঙা চাঁদ—খানিকটা তামা, খানিক সোনা,
কঙ্কাবতী !
জানালার নীচে ধূ-ধূ সাদা পথ, আধো-আঁধার,
ধবধবে পথ—শুধু ধূ-ধূ বালি, সাদা ধূলার ;
কঙ্কা শোনো !
ধূলো আর আলো, সাদা আর লাল আবছায়ার !
ঝাপসা ছায়ায় ঝিকিরমিকির আলোক বোনা—
কঙ্কা গো !
ছায়া আর হাওয়া বেহালা বাজায়—যায় কি শোনা !
কঙ্কা শোনো,
কঙ্কা গো !

'রাঙা-ভাঙা চাঁদ' কথাটি আশ্চর্য্য রকমে সরল, ছেলে ভুলান ছড়ার মতই সরল। আশ্চর্য্য ক্ষমতা বুদ্ধদেবের যে, অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকেও তিনি কাব্যমণ্ডিত করতে পারেন। উপরোক্ত কবিতাটির বিষয়বস্তু আদ্যিকালের, তবু কোথাও মনে হয় না যে পুরানো বিষয় নিয়ে পড়ছি। 'কবিতা' নামক কবিতাটিরও বিষয়বস্তু সাধারণ গোছের ঃ

আজ মাঝ-রাতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটবে যখন,
ঘুম ফেলে দিয়ে তুমি চলে এসো এখানে ;—কেমন ?
মুখোমুখি বসে কবিতা পড়বো আমরা দু'জন।
(হেলেনের বুকে মনের বাসনা বেঁধেছে বাসা,
মনের বাসনা সকল কালের সব পুরুষের—
ভেঙে গুঁড়ো হল ট্রয় !)

তারপর চলল পড়া দু'জনের 'পুরানো কবির পুরোনো কবিতা'—বর্ণনার পর বর্ণনা—আকাশ, বাতাস, জোৎস্নার ; হেলেন, ভিনাস, ট্রয়ের। এইরূপে কবিতা-পাঠান্তে ঃ

পূবের সবুজে সাদা হয়ে ফোটে ভোরের আকাশ,
রাতের, দিনের মাঝখানে এসে ঝিমায় বাতাস।
বই শেষ করে চুপ চাপ ব'সে আমরা দু'জন।
(কোথায় ভিনাস ! কোথায় বা সেই বুকের বাটি !
বিশাল বাসনা বুকে জ্বলে তবু সব পুরুষের—
পোড়ে লাখো লাখো ট্রয় !)

এ কবিতাটি কবির হৃদয়াবেগের দ্বারা কোথাও আহত হয়নি এবং বিষয়বস্তু অতি সাধারণ হওয়াতে এর কাব্যগুণ অতি সহজেই বোঝা যায়। পূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতার মধ্যে বুদ্ধদেবের এত সহজ জোর পাওয়া যায় নি।

দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দ শুনি,
(কঙ্কাবতী !)
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামের স্বপ্ন বুনি ;
(কঙ্কাবতী !)
গূঢ় গভীর মন্দির-মাঝে ঘণ্টার মত সুগম্ভীর
পলকে পলকে ধ্বনি বেজে ওঠে—'কঙ্কা ! কঙ্কা ! কঙ্কাবতী !'
আমার মনের গুহার বুকে :
আমার মনের অনেক গুহার চূড়ায় চূড়ায় শব্দ বাজে,
চূড়ায় চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায় ইতস্ততঃ—
দশ দিক থেকে কথা কয়ে ওঠে প্রতিধ্বনি :
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ়কণ্ঠ প্রতিধ্বনি :
আমার মনের অপার আকাশে হাজার-হাজার প্রতিধ্বনি :
ডাহিনে ও বামে, উপরে ও নিচে, এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনি :
প্রতিধ্বনি !
কঙ্কা—কঙ্কা, কঙ্কাবতী—গো—কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী—
এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি।

অতি বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন কবি এই কবিতাটিতে। অন্য যে কোনো লোকের হাতে পড়লে ভাষা ও ছন্দের কি শোচনীয় অবস্থা হত তা' সহজেই অনুমেয়।

এ সব সত্ত্বেও ছিদ্রান্বেষীদের অভাব হয় না। এবং যখন তাঁরা পড়েন :

সাপের মতন জড়ানো মেঘের বুকে জেগে ওঠে সাপের মতন দ্রুত বিদ্যুৎ,
লাল বিদ্যুৎ, দ্রুত বিদ্যুৎ তোমার নামের শব্দে জাগে ;
আকাশ ফাটায়ে লাল বিদ্যুৎ বজ্র বাজায়—'কঙ্কা ! কঙ্কা !
কঙ্কাবতী !
আকাশের কোন্ ফাঁকা কোণ থেকে দেখা দেয় এক তাড়ানো তারা
হঠাৎ ! হঠাৎ !
খসা তারা এক, মরা তারা এক আগুনের মুখ নিয়ে ছুটে যায়,
অবাক ! অবাক !
চোখের পলকে ছুটে চলে যায়, ফুলকি ছড়ায়ে জ্ব'লে পুড়ে যায়,
মুখ থুবড়িয়ে উলটিয়ে পড়ে মাটির পরে,
উবু হয়ে পড়ে ঠাণ্ডা, শক্ত মাটির পরে।—
তবু তার পিছে জ্ব'লে চ'লে আসে লাল আলোকের দীর্ঘ রেখা,
সাপের মতন আঁকা বাঁকা রেখা, দীর্ঘ রেখা।
জ্ব'লে চ'লে আসে, কেঁপে কেঁপে জ্বলে, জ্বলে আর বলে—কঙ্কা ! কঙ্কা !
কঙ্কাবতী !

তখন এ মন্তব্য করতে ছাড়েন না যে, বুদ্ধদেবের ছন্দ আসলে আত্মশ্লাঘারই কার্য্যে নিযুক্ত, রূপসৃষ্টির তাগিদে তার জন্ম হয় নি। কবিতার অস্পষ্টতা দেখাবার জন্য তাঁরা আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখান। যেমন :

একটু সময় হবে ? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।—
(মোদের বাড়ীতে বড়ো লোকজন, বিষম বিভ্রাট,
মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি, করিছে চীৎকার।)
টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে,
নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায় :
সিঁড়ির সুমুখে ঘর, ছোট ঘর, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার,
সেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।
সুতো বুঝি ফুরায়েছে ? বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারা পিঠে,
সাদা সেমিজেরে ঘিরি কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
সাড়ির চওড়া পাড়, সাদা সাড়ি, মিশ কালো পাড়।

ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে,—
একটু সময় হবে ?

* * *

তোমার সে চুল
জড়ানো সুতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন,
তোমার সে-কালো চুল, এলোমেলো, অগোছাল চুল,
ঘুমের মতন ঠাণ্ডা, এক মুঠো জমানো আঁধার—
তোমার সে-চুলগুলি ঢেলে দাও মোর মুখে-চোখে।
জড়ানো সুতার স্তূপ দেবো মুখে অজস্র ছড়ায়ে,
শুকনো চুলের স্বাদ মোর উষ্ণ, বিশুষ্ক অধরে,
দন্তাগ্রে কেশের গুচ্ছ, কাটি তারে তৃণের মতন,
উরজ পুষ্পের মত চুল ছানি দুই হাত দিয়ে ;
—খসখসে চুলগুলি, তার স্পর্শে নাসিকা স্ফুরিছে,
চুলগুলি পান করে মোর উষ্ণ, সতৃষ্ণ নিঃশ্বাস···
ইত্যাদি।

উপরের পঙক্তিগুলির মধ্যে কবিতাগত অর্থ খুঁজতে যাওয়া হয়ত বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু এগুলিকেই বুদ্ধদেবের কবিতার বৈশিষ্ট্য মনে করলে ভুল করা হবে। এ হেন চাঁদের কলঙ্ক লোকসমাজে প্রকাশ করাটা একমাত্র ছিদ্রান্বেষীদেরই সাজে। বুদ্ধদেবের কবিতার আলোক বিকীরণ তাতে কমে না।

বুদ্ধদেবের কবিতা যদিচ একান্ত ভাবে রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ায় মানুষ, তথাপি সত্যসুন্দরের তত্ত্বজ্ঞান কবির পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ; অথচ বুদ্ধদেব কোনো মতেই বাস্তবপন্থী নন। ফলে তাঁর কবিতা না স্থলে না আকাশে। এ 'ক্রন্দসীর উষরতা' থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁর কবিতা আকাশ ও স্থলের দোটানায় ক্রমশই কৃশ হতে থাকবে। বুদ্ধদেবের ক্রটীই হচ্ছে এইখানে যে, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন। তিনি সর্ব্বদাই পলাতক এবং পৃথিবীর দেহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এই ছুৎমার্গের আড়ালে কবির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করবার পক্ষে হয়ত অনেকখানি সহায়তা হতে পারে, কিন্তু কাব্যের সার্থকতা তাতে কমে বই বাড়ে না। বুদ্ধদেবের কবিতায় সেই জন্য চলার বিবিধ ভঙ্গী থাকলেও, তাঁর গন্তব্য স্থান একেবারেই অস্পষ্ট। এবং কবিতার অন্তে যদি বিশ্রামের আয়োজন না থাকে, তাহলে পথশ্রম করতে অধিকাংশ পাঠকেরাই নারাজ হবেন।

আমার এ উক্তি পড়ে কেউ যেন না মনে করেন যে, এতে আমি বুদ্ধদেবের প্রতিভাকে খর্ব্ব করছি। বরং তাঁর অনন্য প্রতিভাকে মেনে নিয়েছি বলেই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমার এ সব সমস্যা মনে হয়েছে। তাছাড়া যখন দেখা যায় যে, তাঁর এই বইয়ের অধিকাংশ রচনাই এমন একটি সময়ে রচিত যাকে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে 'যৌবনকাল', তখন তাঁর প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর মতানৈক্য থাকে না।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

Salavin—by Georges Duhamel (Dent)

দুহামেল বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের একজন নামজাদা লেখক। তিনি ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে 'লুই সালাভঁ্যা' নামে একজন ধার্ম্মিক আত্মসন্ধানীর জীবনেতিহাস নিয়ে পরপর চারখানি নভেল লেখেন। সেইগুলির ইংরেজী অনুবাদ একত্রিত করে ছাপান হল। ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র বইখানির সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। খুবই স্বাভাবিক ; কারণ, যুদ্ধের পর য়ুরোপের মন ধাক্কা খেয়ে হয় চিত্তশুদ্ধি, না হয় পরহিতের সামাজিক রীতি আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকেছে। এই দুটি স্রোতের টান বইখানির মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রথমটির টানই বেশী। দ্বিতীয়টি দুটি খাতে বইছে, মার্ক্‌সিজমের, (তৃতীয় খণ্ডে) ও পরিচিত কল্যাণ-সাধনার (চতুর্থ খণ্ডে)। চেক্-সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে মার্ক্‌সিষ্ট প্রচেষ্টা নষ্ট হল। টিউনীস-অধিবাসীর উন্নতির জন্য লুইএর প্রাণপাত যে সফল হল তাও নয়, কারণ লুই ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে প্যারিসে মারা গেলেন। তবু লুই একজন ধার্ম্মিক হুম্যানিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্য মনে হয় দুহামেল চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জগতের পরিবর্ত্তন সম্ভব বিশ্বাস করেন। লুই আপন সংস্কারেই ব্যস্ত, তার চেষ্টা, আশা ভরসা, অসার্থকতা নৈরাশ্য, জয় পরাজয় সবই ধর্ম্ম-স্তরের ; সে-ধর্ম্ম আবার নিতান্ত ব্যক্তিগত, আচারগত ; এক কথায় এথিক্যাল। তার সঙ্গে যোগধর্ম্মের কোনো যোগ নেই। অতএব বইখানি যুদ্ধের পর লেখা হলেও তার সমস্যা ও বক্তব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টানী সভ্যতার উপযুক্ত। দুহামেলের রচনাভঙ্গীও আধুনিক নয়। ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বহুল

প্রচার সম্ভব। মহাত্মাজী ও তাঁর দু একজন অগ্রণীর কৃপায় আমরা সক্রিয় ধর্ম্ম-জীবনে বিশ্বাসী হয়েছি, যোগধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের জীবনধর্ম্মের সম্বন্ধ ঘুচে গিয়েছে, আমরা হয়ে পড়েছি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় খৃষ্টান। তাই নভেলটি পড়বার সময় মহাত্মাজীকে এক কাপি পাঠাতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বইখানি তাঁরই আত্মজীবনীর কথা স্মরণ করায়। অন্য যুগে অবশ্য লুই-এর একাধিক দোসর ছিল, যেমন সেণ্ট অ্যান্টনি। দুহামেল ফ্লবেয়ার ও আনাতোল ফ্রান্সেরই স্বজাতি। জাতীয় প্রতিভা কি বিচিত্র!

এই প্রকার এথিক্যাল জীবের প্রতি আমার প্রাথমিক সহানুভূতি নেই। আমার প্রিয়-বিরোধ ধর্ম্মাচারে নয়। কোনো রচনা উপভোগের জন্য তার প্রতি-পাদ্যের প্রতি বিরাগ বন্ধ করতে হয়, তার সঙ্গে যথাসাধ্য যোগ স্থাপন করতে হয়। শেষ কাজটি আমার পক্ষে ঠিক অসম্ভব না হলেও রীতিমত কঠিন। অসম্ভব নয় এই জন্যে যে আমি বিশ্বাস করি নভেলের বিষয়বস্তু প্রেম ভিন্ন ধ্যান-ধারণাও হতে পারে, এবং আমি খুবই মানি যে ধর্ম্মাচারের সাথে ধ্যানের কোথাও না কোথাও একটি আন্তরিক যোগ আছে। কিন্তু ধ্যানবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মাচার আমাকে কুতূহলী করে না। লুই মোটেই ধ্যানী নয়, সে নীচুস্তরের জীব, যাকে আমি মানুষ বলি না, যন্ত্র বলি। ধ্যানের অন্তঃশীল প্রবাহ যখন বহির্মুখী হয় তখন ধর্ম্মমার্গের ছুৎ-আচার খড়কুটোর মতন কোথায় যায় ভেসে। পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা: পওহারি বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে পরমহংসদেবের কাছে পালিয়ে আসেন। তবু পওহারি বাবা ছিলেন যোগী। তিনি আচারে আবদ্ধ ছিলেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনের বহতায় ছোট-আমির খড়কুটো জমতে দেওয়া ভাল নয়, ব্রহ্মপুত্রের দুর্দ্দশা হয়, কচুরিপানায় ভরে যায়। লুই-এর ট্র্যাজেডী এইখানে—দুহামেল ধরতে পারেন নি। তাঁর কাছে সমস্যাটি ঘর ও বাহিরের সামঞ্জস্য বিধানে পর্য্যবসিত হয়েছে!

লুইএর প্রতি অবশ্য দয়া হয়। সে একটি সনাতন নিয়মে চলতে গিয়েছিল, অথচ তার মূলধন ছিল কম। গণ্ডী ছিল তার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কেটে পালাতে গেল। আত্মসংশোধনের তাগিদ তাকে বেয়াল্লিশ বছর পর্য্যন্ত চালালে, তারপর তাগিদও গেল ফুরিয়ে; তাই ডায়েরীতে লিখে গেল—'Humanity's only virtue is its need for virtue. Terrible. Terrible.' 'It is eternally necessary to

begin over again. I cannot...'অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাওয়ার সাহসই virtue কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য। অন্ততঃ পূর্ব্বকালের য়ুরোপীয়ানরা তাই জানত। লুই নিজেকেই কাপুরুষ বলেছে। তুহামেল য়ুরোপীয়ান সভ্যতার সমালোচনা করতে গিয়ে স্বধর্ম্মত্যাগ করেছেন। আঁদ্রে জীদ্-এর এক নায়ক—সে অবশ্য বুর্জ্জোয়া ছিল—এলজীয়ার্সে বেড়াতে যায়। সেও সংস্কৃত হয় সেখানে—তার পন্থা ছিল জঘন্য, তবু তার মধ্যে ছিল য়ুরোপীয় সাধনা। ক্যারামজভদের ছোট ভাইকেও বুঝতে পারি—খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রথম যুগের সাধনা ছিল তার মধ্যে। কিন্তু এই খৃষ্টানী শুচিবাই আমি বুঝি না, যেমন বুঝি না আত্মজীবনীর মহাত্মাজীকে। এ-রকম মানুষ জন্মায় না বলছি না, কিন্তু এ-ব্যক্তিরা টাইপ হয় না এ যুগে। যদিও হয় সে টাইপ নিতান্ত নেগেটিভ। তা নিয়ে নভেল লেখাও অসম্ভব নয়, তবে আমার মতন সাধারণ পাঠকের সে-নভেল প্রিয় হবে না। যদি এমন সব দেবতা পৃথিবীতে থাকেন তবে তাঁদের সম্বন্ধে নভেল লিখতে হলে এইভাবেই বোধহয় লিখতে হবে। 'যদি থাকেন'—বিশ্বাসটা যদি না ছিঁড়ে যায়, পড়তে পড়তে তবেই সে-নভেল উপভোগ্য হবে। কিন্তু এই চীজ কোন দেশে পয়দা হয়? একমাত্র সেই দেশে যেখানে আত্মগ্লানির ব্যাধি ধর্ম্মের রূপগ্রহণ করেছে। কী আশ্চর্য্য! এক লুইএর আরব ভৃত্য, মোক্তার ছাড়া নভেলটির আর প্রত্যেক চরিত্রই ভাল লোক। ফ্রান্সে খৃষ্টান-ধর্ম্মের আজ কি এমন তুর্দ্দশা যে তার আশীর্ব্বাদে খ্রীগ ছাড়া অন্য জন্তু জন্মাতে পারে না? সমালোচনায় আমার বিরাগটাই বেশী ফুটল। কিন্তু সত্য কথা এই: কৃত্তিবাসী রামচন্দ্রের বিলাপও আমাকে মুহ্যমান করলেও ভীষ্মদেবের তেজোময় স্বার্থত্যাগই আমাকে স্পর্শ করে। বিনয়, দৈন্য, আত্মগ্লানির সমন্বয়ে যে-রস উৎপন্ন হয় সে-রস আমার নয়—অক্সফোর্ড গ্রুপের জন্যে হোক আমার কোনো আপত্তি নেই। সেইজন্য বইখানির মর্য্যাদা দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তবু পড়ে আমার মনে যা উঠেছে তারই প্রকৃত বিবরণ দিলাম।

কে অস্বীকার করবে যে তুহামেল ভাল লিখিয়ে? এমন ধাক্কা বেশী লেখক দিতে পারেন না যেমন তিনি দিয়েছেন একাধিক দৃশ্যে। একজন বিকৃত মস্তিষ্কের রোগীকে জীবন্ত করে তুলেছেন বলেই না আমার মাথার টনক নড়েছে? এই দৃষ্টিপদ্ধতিতে কোনো বাহুল্য নেই। এইখানেই বইটির সাহিত্যিক সার্থকতা।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Complete Works of Isaac Rosenberg—Edited by D. W. Harding and Gordon Bottomley—(Chatto and Windus).

মহাযুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে অনেক লেখকের দেশভক্তির তীব্রতা আজকাল আমাদের বিস্মিত করে। সভ্য সমাজের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অনেকেই বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাযুদ্ধের প্রখর সমারোহ জর্জ্জিয়ানদের মন্থর জীবনে উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক জোটাল, কয়েকজন ত যুদ্ধকে অভ্যর্থনা করলেন। যথা রুপার্ট ব্রুক। বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান, ইত্যাদি আদর্শের অভাব তখন তাঁদের যে হয়নি সেটা বলা বাহুল্য। এটা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল যে এই সভ্য অভিযানের পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্য কূটনীতি, এবং এর পরিণাম সভ্যতার জীবনপ্রাপ্তি নয়, সুদীর্ঘ মড়ক। দৈনিকপত্রিকা-সুলভ মতবাদে শেষ পর্য্যন্ত আস্থা রেখে যে সব সাহিত্যিক দেশভক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মবিসর্জ্জনে মহত্ত্ব আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাতে বিকারের মাত্রাটাই ছিল বেশী। ধরুন, রুপার্ট ব্রুক। তিনি ত মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদের কবি ছিলেন। তিনি এবং অন্য কয়েকজন লেখক সে সময় ভালো কবিতা লিখে গিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশভক্তির মত, তথাকথিত "ভালো" কবিতাও যথেষ্ট নয়। সমর-কবিদের কয়েকজনের অন্ততঃ ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি অল্পবিস্তর ছিল, যুদ্ধের বিপুল অসারতা প্রথম থেকেই তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। উইলফ্রেড ওয়েনের লেখা সেইজন্যই শুধু "ভালো" কবিতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর উর্দ্ধে উঠেছিল; তাঁর ব্যর্থতাবোধে, তাঁর যুদ্ধের দৈনন্দিন যন্ত্রণার বর্ণনায় বিপুলতর ট্র্যাজিডির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যুদ্ধকে হাততালি দিয়ে তিনি যুদ্ধে নামেন নি। 'হাততালি' বলতে আমি "Blow out, you bugles, over the rich Dead!" —ধরণের কবিতা বুঝি।

রোজেনবার্গ জাতিতে য়িহুদী, তাঁর কবিতায় দেশভক্তির বালাই সেজন্য অনুপস্থিত। রোজেনবার্গের চিঠিপত্র পড়লে এ সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে যুদ্ধের অসুবিধা তাঁকে বিরক্ত করেছিল, যুদ্ধের ট্র্যাজিডি তাঁকে পীড়িত করে নি। চিঠিপত্র থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে নি। স্বালিখিত কবিতা এ্যাবারক্রোমবি, বিনিয়ন ইত্যাদিকে পাঠাবার,

এবং তাঁদের মতামত জানার অবিরাম আগ্রহ; মধ্যমশ্রেণীর কবিতার প্রতি প্রবল অনুরাগ; যুদ্ধের বহু অসুবিধার উল্লেখ; মোটামুটি এই সব বিষয়ে এবং অবিষয়ে তাঁর পত্রগুচ্ছ পরিপূর্ণ। তিনি বারম্বার উল্লেখ করেছেন যে স্বরচিত কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠাবার কারণ তাঁর সাহিত্যানুরাগ। প্রলয়ের সময় সাহিত্যের রক্ষণাবেক্ষণ ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই, কিন্তু লেবু বেশী কচলালে তেতো লাগে।

কিন্তু রোজেনবার্গের যুদ্ধ-কবিতা পড়লে চিঠিপত্রের স্মৃতি থাকে না, তখন তাঁর নিত্যনৈমিত্যিক যন্ত্রণার বর্ণনায় যুদ্ধের ভয়াবহতার সাক্ষাৎ মেলে, এবং যুদ্ধ যে ক্রুজেড নয়, মড়ক, এ কথাটাই বারে বারে মনে পড়ে। রোজেনবার্গের তৎকালীন কবিতার রং চিঠিপত্রের রং থেকে আলাদা। এর কারণ খোঁজার জন্য বেশীদূর যেতে হয় না। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও রোজেনবার্গ স্বভাবতই নিজের তালে থাকতে ভালোবাসতেন, বাইরের পৃথিবীর ছোঁয়াচে বিশেষভাবে আসাটা তিনি অপছন্দ করতেন, অপরাপর বহু প্রাকসামরিক জর্জ্জিয়ান কবির মত আত্মকেন্দ্রেই ছিল তাঁর সমস্ত আনন্দ। চিঠিপত্র, এবং এমন কি ১৯১৪-১৫ পর্য্যন্ত রচিত তাঁর কবিতা এই দিকটার পরিচয় দেয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের সংস্পর্শে এসেও উদাসীন থাকাটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কবিতা যখন অনেকটা অনুভূতির জিনিষ, এবং ১৯১৪-১৮এর অনুভূতি যখন তীব্র হতে বাধ্য, তখন রোজেনবার্গের তৎকালীন কবিতায় মহাযুদ্ধ যে আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। ওয়েনের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না, কিন্তু দেশভক্তি আর সমরকালীন আদর্শবাদের বিকার থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর যুদ্ধ-কবিতা রোমান্টিক নয়, রুপার্ট ব্রুকের মত আদর্শবাদের ক্লিষ্ট করুণ উজ্জ্বলতায় তাঁর লেখার সমাপ্তি হয়নি, এই মর্ত্ত্যলোকে চার বৎসরব্যাপী প্রেতলোকের বিকৃত ইঙ্গিত রোজেনবার্গকে শেষ পর্য্যন্ত হানা দেয়। তখনকার অভিজ্ঞতাকে তিনি বিশিষ্টভাবে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত রোজেনবার্গের অধিকাংশ কবিতা কাঁচা হলেও দু'এক হিসবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকের জর্জ্জীয় কবিতার অনেক গুণ তাতে বর্ত্তমান, এবং রোজেনবার্গের বিশিষ্ট ক্ষমতা মাঝে মাঝে পাঠকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু এ ধরণের কবিতার প্রতি স্থায়ী অনুরাগের পক্ষে তীব্র অন্তরায় আছে। যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে রচিত কবিতার জলবায়ু আমাদের কাছে অত্যন্ত পাৎলা লাগে, কারণ ১৯১৪-১৮এর বিষাক্ত গ্যাস সে জলবায়ুকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে।

তৎকালীন ভালো কবিতা লেখার একান্ত উদ্যমকে প্রলয়ের ঠিক পূর্ব্বে একটি গোলাপ ফোটানোর প্রচেষ্টা বলে মনে হতে পারে। রোজেনবার্গের কাব্য সংগ্রহ না করে তাঁর কাব্য সঙ্কলন করলেই কবির প্রতি সুবিচার করা হত।

ইয়েটস্ সম্প্রতি যুদ্ধ-কবিতার প্রতি তাঁর বিরাগ প্রকাশ করেছেন। যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আবার আসন্ন সেখানে যুদ্ধ-কবিতার মহৎ প্রয়োজনীতা অস্বীকার করা অসম্ভব। সে সময়কার মানষিক যন্ত্রণা এবং বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা যদি বর্ত্তমান মানুষকে যুদ্ধের দুর্য্যোগের পূর্ব্বে জতুগৃহে খনকের মত উদ্যোগী করতে পারে তাহলে সেটাই হবে গত যুদ্ধ-কবিতার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, "passive suffering"এর ঐতিহাসিক মূল্য আর মহত্ত্ব। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অভ্যার্থনা করার মনোবৃত্তি আশা করি তখন অধিকাংশ মানুষের হবে না।

সমর সেন

আবর্ত্ত—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতীভবন

জ্ঞানী সমালোচকের সঙ্গে অন্তত এক বিষয়ে সাধারণ পাঠক সায় দিতে পারে যে চরিত্রপাত্রের মাহাত্ম্যেই উপন্যাসের মুখ্য সার্থকতা। উপন্যাসে চরিত্র-পাত্রের অস্তিত্ব অবশ্য একাধিকলোকেও সম্ভব। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে ঝোঁকটা বহির্জগতের উপর পড়তে পারে, ব্যক্তির উপরেও পড়তে পারে। সেই অনুসারে পাত্র পাত্রীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা গতিচঞ্চল হয়। আবার তাদের স্বভাব অন্তর্মুখ বা বহিরঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

ধূর্জ্জটিবাবু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানী পাঠকের নানারকম আপত্তিতে আমার মতো সাধারণ পাঠকদের কিংকর্ত্তব্যবিমোহ খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে' যখন বোঝা যায় না যে উক্ত জ্ঞানী সমালোচকেরা, যাকে বলে মূল্যজ্ঞান, সেই জগচ্চিত্রজ শ্রেয় প্রেয়ের মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করেন কিম্বা এরিষ্টটেলীয় প্রতিভাসযাথার্থ্য নিরূপণেই তাঁরা ব্যস্ত।

কারণ ধূর্জ্জটিবাবু সম্বন্ধে আমাদের মুস্কিল হচ্ছে যে তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাস লেখক নন, তিনি প্রবন্ধও লেখেন এবং তার প্রসারে এবং প্রসঙ্গে তাঁর

দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যাভিমানীদের আপত্তিও হয়ত ধূর্জ্জটিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেককে দ্বিধান্বিত করে। অবশ্য প্লেটনীয় আপত্তিও তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে কেউ কেউ হয়ত করেন, কিন্তু সে আপত্তি ত সব সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে বর্ত্তমান।

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে আপত্তি বরং আরো বিবেচ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধেও এ আপত্তি উঠেছে নানামুখেই। সেখানে হয়তো খানিকটা ধূর্জ্জটিবাবু দায়ীও। কারণ আমরা তথ্যান্বেষী; পণ্ডিত লেখকের কাছে আমরা পাঠ নিতে চাই, প্রবন্ধে তাই আমরা পাঠশালার আবহাওয়া খুঁজি, শিল্পীর বহুধাভক্ত গ্রন্থবিহারে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি, ভুলে' যাই যে অধ্যাপক শিক্ষকের বিদ্যালয়োত্তর জ্ঞানপ্রচার বেকন কিছু করলেও বার্টন করেন নি, ফ্লোরিওর কাছে শেক্স্পিয়রও কৃতজ্ঞ ছিলেন যদি রেমোঁ সেবোঁ-র পরিচয়ে বিশ্বকোশের কৃপণ সেবকদের তথ্যবৃদ্ধি হয় না। এবং এখানে ধূর্জ্জটিবাবুরও ভুল হয়ে যায়; তাই তিনি ইলিয়া-র চর্য্যা ছেড়ে অধ্যাপকী প্রবন্ধ লিখে ফেলে নিজেকে এবং পাঠককে দু নৌকায় দাঁড় করিয়ে দেন। আর এই দুই ভিন্নজগতের দ্বিধায় তাঁর প্রসঙ্গনির্ণয়, বাক্যবিন্যাসাদি অর্থাৎ এককথায় ভাষা-ব্যবহার বিড়ম্বিত হয়ে' ওঠে; শব্দের অভিধায় তাঁর স্বকীয় ভাষার লক্ষণা হারিয়ে যায়, যে স্থায়ীভাবে তাঁর রচনার পুরুষার্থ, সেই শুদ্ধবাসনামূলক তাঁর সাধারণ্য তথ্যের অরণ্যে, বা ব্যুৎপত্তিতে কণ্টকাকীর্ণ নির্ব্বাহের অন্ধকারে অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু গল্পের বা উপন্যাসের উপলক্ষ্যই অন্য হওয়ায় ধূর্জ্জটিবাবুর ব্যক্তিস্বরূপ ও তাঁর সাধনা সার্থকতর মার্গ পায়। তাঁর দংশন শুধু গ্রন্থলোকেই প্রবল নয়, ব্যক্তিতেও তা ক্লান্তিহীন। যে কারণে উপরোক্ত আপত্তি তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে ওঠে, ব্যক্তিস্বরূপের সেই বিশেষত্বেই সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে তাঁর চৈতন্য প্রখর। সেইটেই তাঁর কীর্ত্তির পক্ষে যথেষ্ট আর কিছু যদি তাঁর নাই থাকে। কারণ আমাদের নতুন সভ্যতায় নতুন সমাজ এই দেড়শ বছর মাত্র দেখতে হচ্ছে। সমাজের নানা স্তর ভাঙছে গড়ছে। তার মধ্যে শুধু কবিতার সরল আদিম চৈতন্যের হৃদয়-সংবেদ্যতায় কাজ গভীরে চললেও তার নানামুখিত্ব চৈতন্যলোকে আনতে হলে দরকার জটিল বহিরাশ্রয়ী সাকার তেত্রিশ কোটীর বাহন গদ্য এবং রসাত্মক গদ্যরচনা। সেই জন্যেই ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা জাতীয়তাঘটিত মূল্য ছাড়াও যা কিছু সামান্য

মূল্য থাকে, নাহলে মাইকেলের মনীষা বা কবিপ্রতিভা যারা বুঝেছে, তারা বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রাহ্য মাত্র করলে কেন? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শিল্প নয়, এই চৈতন্যসঞ্চারেও ফাঁকি দিয়েছেন। আমাদের বর্ত্তমান অতীতে ও ভবিষ্যতে জড়িত, তিনি অতীতকে নিয়েই ব্যর্থশ্রম হয়েছেন। যেহেতু ইতিহাস চলে ভবিষ্যতের দিকেই নাক-বরাবর এবং আমরা সবাই অনিচ্ছায় বা অজ্ঞানেও ইতিহাসের একসঙ্গেই পাত্রাধার, আকাশনীড়, সেই হেতু আমরা রবীন্দ্রনাথকে বারম্বার অদম্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই জন্যেই আমরা অনুরূপা দেবীর ফিল্‌ম্ সাফল্য সত্ত্বেও মোটামুটি শরৎচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের বোধন প্রয়াসে কৃতজ্ঞ হই। কারণ রাস্তায় যখন চলতে হবেই, তখন সঙ্গী যদি পথের আভাস না দিয়ে ভূতেরা কি রকম পিছু হেঁটে বা শূন্যে লাফিয়েই চলে, সে বিষয়ে খুব বাস্তব-পন্থী বর্ণনাও দেন, ত তাতে লাভ কি?

ধূর্জ্জটিবাবুও এই জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞাভাজন। বিভূতিভূষণ হয়তো সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর "পথের পাঁচালী"-তে, কিন্তু সে পথ প্রায় প্রাকপুরাণিক এবং তিনি এই প্রাক্‌পুরাণিক জগতের সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের দ্বন্দ্বে তাঁর অপূকে ট্রাজিক্ হিরো বলে'ও ভাব্‌তে পারেন নি, সে অপরাজিত মাত্র। ধূর্জ্জটিবাবু হয়তো এখনো সিদ্ধিলাভ করেন নি তাঁর সাধনায়, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে জীবনধর্ম্মী, তাই বাংলা সাহিত্যের দুরবস্থায় যথেষ্ট লাভ, বিশেষতঃ যখন দেখি প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেবের মতো দক্ষ লেখকেরা বারবার আশান্বিত করে'ও শেষ পর্য্যন্ত প্রায়ই আশাভঙ্গ করেছেন।

অন্তঃশীলা ও আবর্ত্ত দুই উপন্যাসেই বা এক উপন্যাসের দুইভাগেই তাই দেখি যে, মানুষগুলি সমাজের যে অংশে মনন ভবিষ্যৎঘেঁষা, সেই পাড়ার বাসিন্দা। এবং তাদের নিয়ে যে জগৎ বা অবস্থান, সে বিষয়ে লেখক শুধু সজাগ নয়, সেই পরিস্থিতির উপরেই তাঁর আশা ভরসা বোধহয় জমে' উঠ্‌ছে। তাই তাঁর পাত্র-চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা প্রাণহীন বা যথার্থ্যহীন বলে' আপত্তি করেন; তাঁদের সম্বন্ধে এই বক্তব্য—

But this conclusion is reached without any direct examination of character as an illusion or as a symbol at all, for "character" is merely the term by which the reader alludes to an author's verbal arrangements. Unfortunately, that image once composed, it can be criticized from many

irrelevant angles—its moral, political, social, or religious significance considered, all as though it possessed actual objectivity, were a figure of the inferior realm of life. And, because the annual cataract of serious fiction is as full of "life-like" little figures of such, and no more, significance as drinking water is of infusoria......the meagre stream of genuine literature, being burdened with "the forms of things unknown," is anxiously traced to its hypothetical source—a veritable psychologico-biographical bog.

কারণ পাত্রপাত্রীচরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুত্থ বা ইমার্জেণ্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্য্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দ্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলষ্টয়ের সমর ও শান্তি, হোমারের ওডিসি, বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমন কি প্রুস্তের অতীতের অন্বেষণে-র মতো ব্যক্তিমনসর্ব্বস্ব উপন্যাসেও কার্য্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয় ধূর্জ্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্য্যার্থেই অস্তিত্ব পায়, এ কথা বোঝেন। আর এ কথাও স্বীকার্য্য যে তাঁর অন্তত দু'একটি পাত্র তাদের বিশেষ অবস্থানে থেকেই প্রাণৈশ্বর্য্যে প্রায় স্বয়ম্ভর। খগেনবাবু আজ খগেনবাবুর শত্রুদের কাছেও মূর্ত্ত। সুজনও খানিকটা—যদিচ সুজন অন্তঃশীলা-য় সামান্য দুচার কথায় যে যাথার্থ্য পায়, আবর্ত্ত-তে বহু বাক্যব্যয়েও তার বিপরীত দেখে আশ্চর্য্য লাগে। অন্তঃশীলা-য় ধূর্জ্জটিবাবু আত্মনেপদের আভ্যাসিক আশ্রয়ে অর্থ-নিশ্চিত অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও যে তিনি আবর্ত্ত-তে বহিরাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা করেছেন, সে জন্যে তাঁর শিল্পশ্রদ্ধা ও সাধনার নিষ্কামতা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রথম ভাগে যার সামান্য আভাস আছে দ্বিতীয় ভাগে সেই আভাস তাঁর উপন্যাসের ক্ষতি করে' লেখকের সাহসী উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে' দেয়। অবশ্য বাংলাসাহিত্যের কতটুকু সহায়তা তিনি পেয়েছেন, তা দেখলে তাঁর কীর্ত্তিই শুধু বিবেচ্য হয়ে' পড়ে, ত্রুটি নয়।

আর বিশেষ করে' সে ত্রুটি যদি নেহাৎ শিল্পত্রুটি না হয়, যদি লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষত্বই হয়, তাহলে সে বিষয়ে হাহুতাশ করা নির্ব্বোধ পাঠকের অকৃতজ্ঞতামাত্র। রমলাদেবী চরিত্র যদি পটভূমি না পেয়ে থাকে বা সুজনের জীবিকা ও জীবনযাত্রার চৈতন্য লেখক যদি পাঠকগোচর না করে থাকেন, ত সেটা

তাঁর হাতের বাইরেই ধরতে হবে। হয়তো ধূর্জ্জটিবাবুর জগচ্চিত্র এখনও অস্পষ্ট, হয়তো তিনি পুরুষার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। হয়তো তাই আবশ্যিক ছন্দ তাঁর মধ্যে মধ্যে কেন্দ্রচ্যুত হয়, পাত্রপাত্রী আশ্চর্য্য ঘটনাবিন্যাস সত্ত্বেও সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না। এবং তাঁর কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস যা অনেকের মধুরাভ্যস্ত কাণে খারাপ লাগে কিন্তু যা তাঁর ছন্দের পুরুষার্থের অনন্যগতি, তাও ঘুলিয়ে ওঠে। এবং এমন সব উপমা আসে, যেগুলি সংস্কৃতরীতির সংকেতিতমার্গে হয়তো আশ্চর্য্য দক্ষ, কিন্তু ধূর্জ্জটিবাবুর সক্রিয়, আধুনিক ভাষায় খাপছাড়াই মনে হয়।

মনে হয় এ সমস্তই আসলে ধূর্জ্জটিবাবুর মধ্যে একটা রুচিবাগীশ নীতি-পরায়ণ উত্তরাধিকারের জন্যেই ঘটে। নিরক্ত অলডাস্ হাক্‌স্‌লির মতো ধূর্জ্জটিবাবু ট্রাজিক্ ও সাটিরিকের দ্বিধায় অনিশ্চিত। প্রবল প্রেম বা প্রচণ্ড ঘৃণা কিছুই তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা তাঁর কাছে যেন পায় না। তিনি যেন মনে হয় প্রায়ই ক্লান্ত, বিমুখ। এবং লেখক তাঁর জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ বা bored হবার আভাস দিলে, সে জগতের বাসিন্দারাও প্রায় শুধু bored নয়, bore হবার সম্ভাবনাও এসে পড়ে।

কিন্তু আবর্ত্ত তৃতীয়ভাগের অপেক্ষা রাখে। হয়তো সে ভাগ বেরোলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে ধরলে এসব আপত্তিই অবান্তর হবে। সেই আমাদের আশা এবং সে আশা লেখকেরই ইতিমধ্যের সাফল্যে প্রণোদিত।　　　　বিষ্ণু দে

সু-চরিতাসু—মনীন্দ্র বসু ও সুশীল রায়।—'দি কোটেরি,' ১২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৲

সংক্রান্তি—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, কলিকাতা। ১৲

নারীদেহ বা হিমালয়, গাভী বা সাহারা, কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে কিছুই অগ্রাহ্য নয়। কিন্তু শুধু বিষয়বস্তু দিয়া কবিতা হয় না। কবিতার জন্য চাই আবেগ। আলোচ্য পুস্তক দুইটির প্রথমটির কবিতাগুলিতে এই আবেগ যে-টুকু আছে তাহাতে কবিতা হয় না, ছড়া হয়। দুঃখের বিষয় ছড়া হিসাবেও 'সুচরিতাসু' উপভোগ্য নহে, তাহার কারণ, প্রথমত, ইহার ছড়াগুলির মধ্যে প্রচুর স্পর্দ্ধা, দ্বিতীয়ত, যৌন রসের একঘেয়ে ভানে এই ছড়াগুলির বেশির ভাগই হইয়াছে আদ্যন্ত কৃত্রিম। তাহার উপর রহিয়াছে আবার হাল-ফ্যাশানি ম্যানারিজম্—গোদের উপর বিষের ফোঁটা। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ঃ

সেই সব বে-সরমী তরুণীর দল
বিশ্বমানবেরে যারা করেছে চঞ্চল,
চুলের ফ্যাশানে আর কটাক্ষের পাতে
অর্দ্ধ বক্ষ নগ্ন রেখে তাচ্ছিল্যের সাথে
দেহের সুবাস ভুলে চ'লে যায় যারা
ইত্যাদি

কিম্বা

কোনো দিকে চাহিবনা, বন্ধ হয় হোক তব শ্বাস,
কাকুতি আকুতি স্বরে আপাতত নাহিক বিশ্বাস,
আঁখিজল চাহিনাকো, কর্ণে, আর পশেনা ক্রন্দন,
নগ্ন হও একেবারে, খুলে ফেল বসন ভূষণ।

বিমলাপ্রসাদের কবিতাগুলির মধ্যে খুব গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু যে-টুকু পাওয়া যায় তাহা আন্তরিক এবং ভাষা ও ছন্দের যে-বাহন অবলম্বন করিয়া তাহা পাঠকের নিকট উপস্থিত হয় তাহার স্পর্দ্ধা নাই কিন্তু পরিপাট্য আছে। বিমলাপ্রসাদের লেখনী নিপুণ কিন্তু মৌলিক নহে, তাই তাঁহার কবিতায় নিজের মনোবীণার ঝঙ্কার অপেক্ষা, অপরের রচনার প্রতিধ্বনি বেশি শোনা যায়। এই প্রতিধ্বনি যে নিতান্ত একঘেয়ে শোনায় না এবং প্রায় প্রতি কবিতাতেই মিষ্ট শোনায়—এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুকরণ আর একটু কম হইলে আরো মিষ্ট শোনাইত—বিমলপ্রসাদের তাহা বাহাদুরি। বিরল দুই একটি স্থলে এই বাহাদুরি একটু যেন বেশি হইয়া পড়িয়াছে, ফলে রচনার সূক্ষ্ম মায়াজাল বক্তব্যকে করিয়াছে অস্পষ্ট যথা :—

যারা রঙীন মাছির মতো
উড়ে বসতে চায় গায়ে—
কিন্তু হায়! যায় হারিয়ে
তোমার চোখের গহন বনে
ঘন পাতার ছায়ার মাঝে,
জড়িয়ে যায়,—তোমার ওই
স্বচ্ছ মনের দুর্ভেদ্য মায়াজালে।

শেষ লাইন ছাড়া অন্যগুলি যেন নিতান্ত পদ্য লিখিবনা এই পণ করিয়া গদ্য-কবিতা লেখা।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৬।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

পরিচয়

ভক্তি ও প্রেম

২

'রাগানুগা'

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি যে বৈষ্ণব-ভাবে ভাবিত সাধকের ভক্তি দ্বিবিধ—বিধ্যনুগা ও রাগানুগা। কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে রক্ষিত রামানন্দ-শ্রীচৈতন্য-সংবাদের অনুসরণ করিয়া আমরা গতবারে 'বৈধী' ভক্তির প্রথম স্তর হইতে শেষ স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করতঃ 'শুদ্ধা' ভক্তিতে উপনীত হইয়াছিলাম। এই 'শুদ্ধা' ভক্তিই প্রেম। ইহারই নাম 'রাগানুগা'. ভক্তি—ইহা 'বৈধী' ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা—ইহা কেবল devotion নয়, love of God।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।—চরিতামৃত

ঐ 'রাগানুগা' ভক্তির সাধারণ নাম রতি—রতি = Love of God, মমতা—

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ, মমতা প্রেম-সঙ্গতা—নারদ পঞ্চরাত্র

এই রতি পঞ্চবিধ—

অধিকার ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।

সাধকের হৃদয়ে কিরূপে রতির উদয় হইয়া প্রেমের আকার ধারণ করে, শ্রীরূপগোস্বামী শ্লোকদ্বয়ে তাহা বিবৃত করিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমা ভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাম্ অয়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

কবিরাজ গোস্বামী কৃত ইহার ভাবানুবাদ এই ঃ—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় ।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন ।
সাধনভক্তে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥

এই প্রেমের উদয় হইলে সাধক কি করেন ?

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহুঁ করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ।

'কভু না মিলে'—কেননা এক হাতে ত' তালি বাজে না—এ দিক হইতে যেমন ভজন, ওদিক হইতে তেমনি বরণ চাই—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (উপনিষদ্)

অঙ্‌ঘ্রি পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ ।
বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥
... ...
রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন ।
সেই জন প্রায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি ।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি ॥

যে ভক্ত 'রাগ-পথে' প্রবেশ করেন—

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ।

তাঁহার পক্ষে উপদেশ—

এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
অকিঞ্চন হঞা লও কৃষ্ণের শরণ, ।
(অকিঞ্চন=Naughted Soul)

ইহাকেই বৈষ্ণব পরিভাষায় বলে—'শরণাগতি'।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা, তত্রৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥

—হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্র

অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ। 'আমি তোমারই' এই বাক্যদ্বারা, তাঁহাতেই মনোনিবেশ দ্বারা এবং কায় দ্বারা তদীয় স্থান আশ্রয়—ইহাই শরণাগতি। রাগমার্গে যিনি বিচরণ করেন তিনি বিধিনিষেধের অতীত—তিনি—becomes a law unto himself—তিনি যে গুণাতীত, নিস্ত্রৈগুণ্য !

নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ—শঙ্করাচার্য্য

তিনি বিধিমার্গ ছাড়েন বটে—কিন্তু

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ।

কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীগণে
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ।
... ...
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগ-মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম ।
... ...
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

অর্থাৎ, রাগাত্মিকা সেই ভক্তি—যাহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অপেক্ষা রাখে না—যাহা স্বারসিক (স্বাভাবিক)—যাহা ইষ্টদেবে পরম আবিষ্টতা, প্রগাঢ় পিপাসা, তন্ময়ভাব আনয়ন করে।

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম ॥

এই যে প্রেমভক্তি—তাহার প্রথম পর্ব্ব 'শান্ত' প্রেম—

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত এক জানি।

সেইজন্য 'শান্ত' প্রেমের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলিলেন—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

'দাস্য' প্রেমের কথা শুনিয়া

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

ইহা শুনিয়া—

প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

'বাৎসল্য' প্রেমের কথা শুনিয়া—

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

এই 'কান্তা'প্রেম হইতেই—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

অতএব দেখা গেল—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার
শান্তরতি, দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥

দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয় বিশদ হয়। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন—

শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা, পিতা, গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন॥

—মধ্যলীলা—১৯ অধ্যায়

কিন্তু তাহা হইলেও বৃন্দাবনেই এই রাগাত্মিকা ভক্তির সম্যক্ পরিপুষ্টি হইয়াছিল—কারণ, ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণ হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পরম আত্মীয় ভাবে—প্রভুভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে, কান্তভাবে ভজন করিয়াছিল।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার
চারিভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার।

… …

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,

পতিপুত্রসুহৃদ্ ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোহপীহ নমোনমঃ॥

ইহা ভাগবতের প্রাচীন শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং॥

—ভাগবত ৩।২৫।৩৪

অতএব,

তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই প্রেমভক্তি লইয়া অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন এবং

রতি কিরূপে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাবের সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া অবশেষে 'মহাভাবে' পরিণত হয়, তাহার ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী ইক্ষু ও রসালার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রী, উত্তম মিশ্রী আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি-রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥

অন্যত্র,

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ি স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥

এ প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার উজ্জ্বল 'নীলমণি-কিরণে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ,

ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ।

অতএব প্রেমভক্তির বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন, এই বিধির অতীত রাগমার্গ প্রদর্শন জন্যই চৈতন্য অবতার—

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার
প্রেম রস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাষায়—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ
করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ, রামানন্দ রায় যাহা বলিয়াছিলেন—

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজরস আস্বাদিতে কৈলে অবতার
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।

বস্তুতঃও চৈতন্যলীলায় দেখা যায়—

ভক্তি প্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে
ভক্তভাব অঙ্গীকার, তাহা আস্বাদিতে।
... ...

তাঁহার চিত্তে—

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত?
... ...
প্রেমোন্মদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হাসে নাচে গায়।

কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্ত।

... ...

অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে
চারি দিকের লোক সব করয়ে সিনানে

... ...

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় সমকাল
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম
কভু নেত্র নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন।

... ...

ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী—সবার প্রাবল্য
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।

ঐ যে রতিপঞ্চকের উল্লেখ করিলাম—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল রতি ও মধুর রতি—তৎসম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য আছে। আগামী বারে সে কথা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ফিরিওলা

ফিরিওলার হাঁক শুনলেই নীলিমার মন রাস্তায় ছুটে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয়তো ডাকে—'এই এসো—দোতলায়।' কি হয়তো চাকর দিয়ে ডেকে পাঠায়। পিঠের বোঝা নামিয়ে একটি ঘর্ম্মাক্ত জীব সিঁড়ির ধারে এসে বসে, নীলিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কত জিনিষ যে নেড়ে চেড়ে ছাখে। চার আনার জিনিষ কিনতে আধ ঘণ্টা লাগে। ফিরিওলারা অতি ভালো লোক, অতি মধুর কথা বলে, তা ছাড়া তাদের সঙ্গে প্রায় আজগুবি দরদস্তুর চলে। আর সত্যি, প্রথমে যা চাইলো তার প্রায় অর্দ্ধেক দামেই হয়তো জিনিষটা দিয়ে যায়। তাও বাকিতে।

কী জিনিষ? যেমন ছিটের কাপড়, তাঁতের সাড়ি, কাচের চুড়ি, আর সিঁন্দুর, আলতা, চুলের কাঁটা, কত কী। আর বাব্‌লুর জন্যে পুতুল এটা ওটা। কতগুলো লোক আছে, তারা এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে চীৎকার করে হেঁকে যায়—'চে-য়াই সাবান তরল আলতা!' পিঠের উপর বোঁচকাটার ভারে শরীরের উপরের অর্দ্ধেক তাদের বাঁকানো—ঐ বোঝা নিয়ে এত বড়ো সহরে কোথা থেকে কোথায় তারা চলে যায়, নীলিমার ভাবতে অবাক লাগে।

এদিকে শান্তনু ফিরিওলা পছন্দ করে না। তার বড়োলোকি মেজাজ, জিনিষের দরকার হলে ম্যুনিসিপাল মার্কেটে গিয়ে ঝনাৎ ঝনাৎ টাকা ফেলে নিয়ে এসো—হাঙ্গামা চুকলো। ফিরিওলা, জাপানি খেলো জিনিষ এবং দরদস্তুর—তিনটার উপরেই তার পরম নাক শিঁটকানো ভাব।

অথচ ঝনাৎঝনাৎ-এর অভাব প্রায়ই ঘটে; এবং শান্তনুর মতে চললে ভালো জিনিষ কেনবার আশায় বসে বসে অনেক দরকারি জিনিষ হয়তো কখনোই কেনা হতো না। তা ছাড়া, সংসারে কত জিনিষ দরকার, পুরুষরা তার কী বোঝে!

না বুঝুক, নাক ঢোকানো চাই সবটাতেই। যেমন ধরা যাক্, নীলিমা সেদিন তার ফিরিওলার কাছ থেকে দশ পয়সা করে আট গজ মার্কিন রেখেছে, শান্তনু মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'ওগুলো রাখলে কেন?'

নীলিমা হঠাৎ চটে গিয়ে বললে, 'রেখেছি তো রেখেছি, তুমি চুপ কর।'

শান্তনু সংক্ষেপে বললে, 'পয়সা নষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। এদিকে বালিসের ওয়াড়গুলো সব ছিঁড়ে গেছে, তা নিয়ে প্যানপ্যান করতে তোমাকেই শুনি।'

'ও, এ দিয়ে বালিসের ওয়াড় হবে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এই অভাগিনীর একটা সেমিজ।'

'ঐ মোটা কাপড়ে তোমার সেমিজ! আমাকে যদি বলতে—'

'তোমাকে বললে সেমিজ কিনতে ছুটতে তো হোয়াইটেওয়ে লেডলর দোকানে! তোমার বুদ্ধির দৌড় তো ঐ পর্য্যন্ত। হয়তো আধডজন পিলো-কেসও আসতো।'

'ভালোই তো। ভালো জিনিষ তো ভালোই। তোমার সেমিজের জন্য আমি খুব চমৎকার একটা কাপড় কিনে আনবো দেখো।'

'থাক, থাক, আমি গরিব মানুষ, আমার ওতেই হবে। তুমি আর তোমার ছেলে যত পারো বাবুগিরি কোরো।'

নীলিমা তক্ষুনি মেঝেতে মাত্থর বিছিয়ে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসে গেলো। শান্তনু একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বললে, 'এই খেয়ে উঠলে, এক্ষুনি বসলে কল নিয়ে। ঐ রকম করো বলেই তো মাথা ধরা ছাড়ে না।'

'ওঃ, আমার মাথা—তা ধরলেই বা কী, না ধরলেই বা কী? তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকলেই বাঁচি।' চললো তারপর কলের ঘটরঘটর। শান্তনু আর কী করে রবিবারের ছুপুরবেলায় নভেল হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ।

ছু'জনে কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। শান্তনু যা বলবে, নীলিমা ঝাঁ করে প্রতিবাদ করবে; তারপর এক প্রস্থ ঝগড়া। জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে ছু'জনে একমত।

সকালবেলায় একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে—'আতা ফল চাই! আতা ফল!' তক্ষুনি শান্তনু বলে উঠলো, 'ঐ যে তোমার কৃষ্ণের বাঁশি।'

নীলিমা বললে, 'ঠিক মনে করিয়েছ। আতা ফলের কথা কদিন থেকে ভাবছি। তুমি ভালোবাসো না আতা?'

'ও-সব বাজে ফলটল আমি খাইনে।'

'তা খাবে কেন! মনে করো বারো পেয়ালা চা খেলেই খুব হলো! রাখি কয়েকটা, আপিস থেকে এসে খাবে।'

আতাওলা এলো, ছটা ফল বেচে দিয়ে গেলো। শান্তনু বললে, 'সত্যি আমার এক-এক সময় ফিরিওলা হতে ইচ্ছে করে।'

'বড়ো সুখ কিনা! এই রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে ক' পয়সাই বা রোজগার। আহা—ওরা বড়ো ভালো। ওদের মধ্যে আমি এ-পর্য্যন্ত একটাও খারাপ লোক দেখিনি।'

'ওদের স্ত্রীদের মতটা নিশ্চয়ই অন্য রকম।'

'আহা—ওদের আবার স্ত্রী-পুত্র! কোথায় সব দেশে পড়ে আছে—বছরে বুঝি দেখাও হয় না।'

শান্তনু একটা চিঠি লিখতে সুরু করেছিলো; অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'হুঁ।'

'তোমার মার্কেটের জোচ্চোরদের পয়সা দেয়ার চাইতে ওদের পয়সা দেয়া ঢের ভালো। ওরা যে কী অসম্ভব গরীব ভাবতে পারো না।'

'কেন বলো তো?'

'সেদিন এক বুড়োর কাছ থেকে চীনে সিঁদুর কিনলুম। ও বলে—এ পাড়ার সক্কলে আমার কাছ থেকে নেয়, আপনিও নেবেন মা।'

'ও, তোমার নতুন পুষ্যি হলো বুঝি?'

'ও বলে—আর পারিনে মা রোদে রোদে ঘুরতে, কিন্তু কি করবো। বাবুরা সব বলেন—কত লোক তো সিঁদুর হেঁকে যায়, কিন্তু তোমার মতো জোরে আর কেউ হাঁকে না। আমার ডাক শুনলেই বাবুরা চিনতে পারেন। জোরে কি আর সখ ক'রে হাঁকি মা, জোরে না হাঁকলে কেউ তো ডাকবে না আমাকে। এবারে কিছু পয়সা জমলেই দেশে চ'লে যাবো। জানো, লোকটা হিন্দুস্থানি, দেশ মজফঃরপুরে, বৌ কবে ম'রে গেছে, এক মেয়ে আছে। বলছিলো; দেশে যাবার টাকা জমতে আরো ছ'মাস নাকি লাগবে। আহা—মেয়ের জন্যে মন কেমন করে না! আমি বলেছি, ওর কাছ থেকেই সব সময় সিঁদুর কিনবো, কিন্তু বছরে মানুষের কতটুকুই বা সিঁদুর লাগে।'

শান্তনু বললে, 'এ-রকম কত আছে।'

'এত খাটে, কিন্তু কী পায়? কিচ্ছু না।'

'আমি যত খাটি, আমিই কি তার উচিত দাম পাই।'

'কি যে বলো! সত্যি, মনটা ভারি কেমন লাগে না? জানো, ও বলছিলো কোনো বাড়ীতে কাজ পেলে ফিরি করা ছেড়ে দেয়।'

'তবে আর কী! আমাদের বাড়ীতেই ওকে বহাল করো।'

'তা তো আর হয় না। সত্যি-সত্যি, কেষ্টটা ভারি ভালো, ওকে কী ক'রে ভুলবো? আবার একজন ঝি-ও তো জুটিয়েছ। তিনজন মানুষের জন্য তিনজন লোক রাখবে নাকি? আমি তো আরো ভাবছি সামনের মাসে ঝি তুলে দেব। কিচ্ছু কাজে লাগে না, টাকার শ্রাদ্ধ।'

'তারপর তুমি কোমর টাটিয়ে রোজ ঘরের মেঝে মুছবে তো?'

'ইস্—ঐটুকু কাজ করলে যেন আমি ম'রে যাবো। তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। বরং ঝি-চাকরের পিছন পিছন তাড়না করবার চাইতে নিজের হাতে কাজ করায় অনেক সুখ।'

'বেশ, যা খুসি কোরো' বলে শান্তনু চিঠি শেষ করে উঠলো। তার আপিসের বেলা হয়-হয়। আপিসমুখো ট্রামে বসে-বসে শান্তনু ভাবে, সত্যি আয় বাড়াবার কিছু ব্যবস্থা না করলে চলে না। ভালো লাগে না আর এত টানাটানি। কিন্তু কি করবে? বীমার দালালি? না কি মাসিকপত্রের জন্য গল্প লিখবে?

এদিকে নীলিমার ভাবখানা যেন ভারি নিশ্চিন্ত। পাগল! এই আপিসের খাটনি, তারপর আরো কিছু করতে যাবে নাকি? শরীর বলেও একটা জিনিষ আছে তো মানুষের! কত টাকাই তো আনছো—আরো লাগবে কিসে? নীলিমা যখন-তখন দু'চার পয়সা থেকে দু'চার টাকা পর্য্যন্ত বার করতে পারে—বিছানার তলায়, টেবিলের টানায়, সেলাইকলের বাক্সে—যেখানে হাত দেবে সেখানেই কিছু আছে। হঠাৎ কিছু দরকার হলে শান্তনু জানে, নীলিমা চালিয়ে দিতে পারবেই।

কিন্তু একে অবিশ্যি সচ্ছলতা বলে ভুল করা যায় না। প্রায়ই বেশ খোঁচা লাগে। নীলিমা প্রাণপণে হাসিঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু শান্তনুর মন খারাপ হয়ে যায়।

আয় বাড়াবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সে কি একটা ট্যুশনি পায় না?

সেদিন সন্ধ্যার পর আপিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছে, নীলিমা বললে: 'ছাখো, সেই সিঁদুরওলা বুড়ো আজ আবার এসেছিল।'

'বিনা আহ্বানেই ?'

'আজ হঠাৎ শুনি ও হাঁকছে—চে-য়াই তরল আলতা, হেজলিন পমেটম পাউডার চাই।' অবিকল ফিরিওলার স্থরে বলে উঠলো নীলিমা। শান্তনু হেসে ফেললো।

'ও কি রাতারাতি বড়োলোক হয়ে গেলো ?'

'আমি তো অবাক। ও বললে যে অনেক কষ্টে এ-সব জিনিষ জুটিয়েছে, খালি সিঁদুর বেচে কিছুই হয় না। খুব খুসি লাগলো—এবারে বোধহয় শিগগিরই ওর দেশে যাবার মতো টাকা জমে যাবে—কি বলো ?'

'তোমাদের দয়া ! তা কত চাঁদা দিলে ওকে ?'

'দু' আনা দিয়ে একটা হারমনিয়ম বাঁশি কিনেছি। বাবলু কী খুসি !'

শান্তনু গম্ভীর হয়ে বললে, 'না কিনলেই কি চলতো না ? এমনি করে কত পয়সার অপব্যয় করো।'

'কী যে বলো ! ছেলেটা বাঁশি নিয়ে বাজাতে স্থরু করেছে, কেড়ে নেয়া যায় নাকি ওর হাত থেকে !'

'এ নিয়ে তো বোধহয় পঞ্চাশটা বাঁশি কিনলে। ছেলেটা দু'দিন লাফালাফি করে, তারপরেই হয় ভাঙে নয় ফেলে দেয়। এত পয়সা জোটাতে কি আমরা পারি।'

'তা আর কি করবে শিশুরা ঐ রকমই। তা দু'আনার বাঁশি কবে আর কিনেছি। এক পয়সার বাঁশের বাঁশিগুলো—'

'তা এক পয়সা এক পয়সা করে কম হয় না।'

'ওঃ, খুব তো হিসেব শিখেছ। কবে এত স্থবুদ্ধি হলো ? বড়ো যে বলছো অপব্যয়, ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে কত শস্তায় সব পাওয়া যায় তা জানো !'

'শস্তাও যেমন, পচাও তেমন।'

'তা তো ঠিকই ! সেদিন দেড়টাকা দিয়ে বাক্সওয়ালার কাছ থেকে বাবলুর যে-কোটটা রেখেছি, সাধ্য ছিলো তোমার চার টাকার কমে কোথাও কেনো ! আসল সাটিন, আর কি স্থন্দর ছাঁটকাট। তোমাকে পাঁচশো দিন বলে বলে এই জামাটা কেনাতে পারলুম না। আর্মিনেভিতে যাবার মতো অবস্থা হবে, তবে তো ! তাও কত স্থবিধে—বাকি রাখা যায়, আস্তে আস্তে দিতে গায়েই লাগে না।'

শান্তনু সিগারেট ধরিয়ে বললে ঃ 'এদিকে কত পয়সা যে বাজে খরচ হয়ে যায় তা তো ভাবোই না। খামকা কত কিছু কেনো—সে-সব কোনো কাজেই লাগে না।'

'কাজে কোনটা লাগে আর না লাগে তুমি তার কী জানো! হাজার রকম ছোটোখাটো জিনিষের ব্যবহারের ফল হচ্ছে—তোমার শারীরিক আরাম। সেই জিনিষগুলো তুমি তো আর চোখে ছাখো না—'

'যথা—হাতা, খুন্তি, শিল নোড়া ইত্যাদি। হার মানছি, এবারে একটা পান দিলে বড়ো বাধিত হব।'

'এই তো—সেবারে পুরী থেকে ফেরবার সময় কটক ষ্টেশনে একখানি জাঁতি কিনেছিলাম বলে রাগ করেছিলে। অথচ কী সুন্দর জাঁতিখানা—কী চমৎকার কাজে লাগছে।'

নীলিমা উঠে গিয়ে পান সেজে নিয়ে এলো। একটু পরে বললে, 'জানো, ঐ বুড়ো ফিরিওলা বলে কী। ও আমাদের সমস্ত জিনিষ দেবে---সাবান, পাউডার, এমন কি তোমার সিগারেট, তারপর মাসের শেষে দাম দেবে। আমরা যে-সব সাবান টাবান মাখি তার বাক্সগুলো পেলে ও ঠিক সেই জিনিষ এনে দেবে। তোমার সিগারেটের একটা খালি টিন নিয়ে গেছে।'

মাস ভরে বাকিতে সিগারেট খাবার সম্ভাবনায় শান্তনু একটু উল্লসিত হয়ে বললে ঃ 'বলো কী!'

নীলিমা বললে 'তুমি যদি বলো ওকে ঠিক করি। বাবাঃ তোমার ঐ নবকৃষ্ণ ভাণ্ডার যা চোর! বাকিতে যেমন দেয়, দাম নেয় ডবল। ওদের তুমি এ মাস থেকে ছেড়ে দাও।'

'বেশ। তোমার ফিরিওলা দিয়ে সুবিধে হলেই হয়।'

'ও দিতে পারলে দিক্ না। কী বলো?'

'ভালোই তো। আমার সিগারেট কবে আনবে?'

'বলেছে তো কালই নিয়ে আসবে।'

আর সত্যি, পরের দিন শান্তনু আপিস থেকে ফিরে ছাখে, টেবিলের উপর আস্ত দু'টিন সিগারেট, আর তার সঙ্গে কয়েকটা ছবি আঁকা জাপানি অ্যাশট্রে। একটা বড়ো থালার উপর চারটে ছোটো ছোটো বাটি। নেহাৎ মন্দ না।

'কত দাম নিলে ?'

'পাঁচ আনা বলেছে—এখনো দিইনি। সুন্দর না ? তোমার পছন্দ হয়েছে ? আর শস্তাও ।'

শান্তনু বললে, 'হুঁ ।'

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললে, 'তোমার পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেব। অ্যাশট্রে তো তোমার দরকার।'

সত্যি বলতে ছেলের জন্য এক পয়সার বাঁশি যতটা বাজে খরচ মনে হয়েছিল শান্তনুর নিজের জন্য এই অ্যাশট্রে ঠিক ততটা মনে হলো না। দোমনা ভাবে বললে, 'আচ্ছা রেখেছো যখন—'

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, 'তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমি উপহার দিলুম তোমাকে ওটা।'

'ওঃ, এতই যখন তোমার দয়া, তখন দুটো টাকা আমাকে ধার দিতেও পার। বড়ো উপকার হয়।'

'আমি গরিব মানুষ, দু'টাকা কোথায় পাবো। দু'আনা চার আনা পর্য্যন্ত দৌড়।'

'কেন, সেবার তো আস্ত দুটো টাকা দিয়েছিলে।'

'মনে আছে তাহলে! দু'দিনের কথা বলে দুটো টাকা নিয়েছিলে, আর ফিরিয়ে দিলে না! চোর।'

শান্তনু হেসে বললে, 'গোড়া থেকেই তাই। তোমাকে যখন মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে আনলুম তখন ডাকাত বলতে পারতে।'

নীলিমা বললে, 'ওগো ভালোমানুষ, দয়া করে আমার টাকা দুটো ফিরিয়ে দিতে ভুলো না। আমার কৌটোতে কিছু নেই।'

একটি পাউডারের কৌটো ফুটো ক'রে নিয়ে নীলিমা তাতে বাজার ফেরৎ দু'চার পয়সা ফেলে রাখে, মাঝে মাঝে একটা দু'আনি কি সিকি, কদাচ একটা আধুলি কি টাকা। জিনিসটা এক এক সময় ওজনে খুব ভারি হয়ে ওঠে, কিন্তু তার আসল ভার বিশেষ কিছু নয়, কেননা তার গহ্বরে বেশীর ভাগই তাম্রমুদ্রা। তবু সেটা অনেক সঙ্কট থেকে বাঁচায় এবং সঙ্কট প্রায়ই ঘটে বলে তার উপর এত বেশি টানা হেঁচড়া চলে যে নীলিমার পছন্দ হয় না। সকালে উঠে দেখা গেলো বাজারের

পয়সা নেই, ভৃত্য অপেক্ষমান ; নীলিমা আড়ালে গিয়ে কৌটোটা ঝেঁকে ঝেঁকে পয়সা বার করে—ভৃত্য কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু ঝনঝন শব্দ শোনে কিনা কে জানে। পাউডারের তলানিতে শাদাটে হয়ে যাওয়া এক মুঠো তামার পয়সা চাকরের হাতে দিতেও কেমন লাগে।

কিম্বা হয়তো বাড়িতে হঠাৎ কোনো আত্মীয়েরা বেড়াতে এসেছেন, নীলিমা তাঁদের বসবার ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে একটি আধুলি উদ্ধার করে আনে; মিষ্টিমুখে ভদ্রতা রক্ষা হয়।

একদা সেই কৌটা থেকে দু' দুটো টাকা ধার করে শান্তনু আর ফিরিয়ে দেয়নি। নীলিমা সুযোগ পেলেই সেটা শোনায়।

শান্তনু তার শেষ কথা বললে, 'আমি তো তোমার কৌটার ভরসাতেই আছি—আর সম্প্রতি তোমার ফিরিওলার।'

ঘরে ব'সে ধারে সিগারেট খেয়ে শান্তনুর মেজাজটা বেশ ভালোই যাচ্ছিলো, এর মধ্যে এক কাণ্ড। সকাল বেলায় চা খেয়ে শান্তনু কাগজ কলম নিয়ে বসেছে ; এক বন্ধু বলেছে আধুনিক মেয়েদের বিরুদ্ধে দু' পৃষ্ঠায় সাধুভাষায় অসাধু রচনা লিখতে পারলে দশটা টাকা পাওয়া যাবে। বিষয়টা মোটেই মনঃপূত নয়, কিন্তু দশটা টাকাও ছাড়া যায় না। কিছুতেই লেখা এগোচ্ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট খামকা পুড়ে যায়, এদিকে ঘরের বাইরে নীলিমা অবিশ্রান্ত কার সঙ্গে যেন বকর-বকর করছে।

খানিক পরে তার মনে হলো এ কোনো ফিরিওলা না হয়ে যায় না। রাগে তার মুখ কালো হয়ে গেলো, কার সাধ্য এ-বাড়িতে একটু নিরিবিলি বসে একটা কাজ করে! সব সময় বাজার বসেছে। এখানে সে দশটা টাকার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছে, ওদিকে নীলিমার কাণ্ডটা ছাখো।

ঠিক আধুনিক মেয়েদের মারাত্মক আক্রমণ করবার মতোই যখন তার মনের অবস্থা এমন সময় নীলিমা ঘরে ঢুকে নিচু গলায় বললে—'শোনো, ঐ ফিরিওলা যে টাকা চাইছে।'

'আমাকে কেন বলতে এসছো ও-কথা', বলে উঠলো শান্তনু।

'কাকে বলবো তবে ? শোনো ও বলছে, এত জিনিষ দিয়ে ও আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না,—টাকা না পেলেই ওর চলবে না।'

'তাই বলে এক্ষুনি চাই। এই মুহূর্তে।'

'বড্ড পেড়াপেড়ি করছে। গরিব মানুষ, ঠিকই তো, এত সিগারেট ও কোত্থেকেই বা দেবে। সব শুদ্ধ ছ' টাকা তেরো আনা হয়েছে।'

'এখন মাসের শেষ, কোথায় পাবো টাকা?'

'তাই তো ভাবছি।'

'আগে ভাবলেই ভালো করতে। যত রাস্তার লোক ধরে ধরে জোটাবে, কী বোকার মতো কাজ করো এক এক সময়।'

শেষের কথাটা হজম করে, অতি নিচু গলায় বললে নীলিমা, 'কাল আসতে বলবো ওকে? পারবে জোগাড় করতে?'

কাগজের উপর গোটা ছুই লাইনের আঁকিবুঁকির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর শরীরটা যেন জ্বলে গেলো। চড়া গলায় বলে উঠলো, 'কোত্থেকে জোগাড় করবো? তুমি জানো না আমার অবস্থা? এখন আমাকে ধার করতে ছুটতে হবে তো— আর চাওয়ামাত্র ধারই বা কে দেবে আমাকে।'

নীলিমা প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বললে, 'ও তো বলেছিলো মাসের শেষে নেবে, এ রকম হবে জানলে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফিরিওলারা তো এরকমই। জোচ্চোর, চোর, বাড়ির মেয়েদের ঠকিয়ে ছু পয়সা করাই তো ওদের পেশা। আর তুমিও যেমন! ফিরিওলা ডাকা ছাড়া আর কি সময় কাটাবার উপায় নেই?'

'দরকারেই ডাকি।'

'অদরকারেও ডাকো। জানো কিছু নেবে না, হাতে পয়সা নেই, তবু কত লোককে ডেকে এক ঘণ্টা জিনিসপত্র ঘেঁটে ফিরিয়ে দাও। লজ্জাও করে না। আমি তোমাকে বলছি, কখনো আর এ বাড়িতে ফিরিওলা ডাকতে পারবে না।'

মুহূর্তে ঝলসে উঠলো নীলিমার চোখ। 'বেশ, আর ডাকবো না। এ বাড়ি তোমার, তোমার ইচ্ছামতই সব হবে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যত জিনিষ আমি ওদের থেকে কিনি সব তোমার আর তোমারই ছেলের জন্যে। আমার জন্যে? নেহাৎ যা না হলেই নয়। এই ছ' টাকা তেরো আনার মধ্যে পাঁচ টাকাই তোমার সিগারেটের টাকা মনে রেখো। আর সাবান—তা-ও তোমার। আর বুঝি কয়েকটা কাচের গেলাস, তাও—'

'থাক, থাক, আর হিসেব শুনতে চাইনে। এক্ষুনি বিদেয় করে আসছি ওকে।' এক ঠেলায় চেয়ারটা সরিয়ে শান্তনু বাইরে গিয়ে দেখে, বুড়োমত একটা লোক সামনে প্রায় একটি মনোহারি দোকান সাজিয়ে তার বারান্দায় বসে গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। রাগে শান্তনুর মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে গেলো, 'এই, ভাগো! বাহার যাও! নিকালো! আভি নিকালো।'

শান্তনুর সঙ্গে তার সিগারেট সরবরাহকারীর প্রথম সাক্ষাৎ হলো এইরকম। লোকটা তার কুঁকড়োনো মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকালো শান্তনুর দিকে।

'ক্যায়া? মালুম নেই হোতা? বাহার যাও জলদি।' বলে শান্তনু ওর দু' একটা জিনিষ পা দিয়ে একটু ঠেলেও দিলে বুঝি।

লোকটা একটা কথা বললে না; মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে তার সব পসরা কুড়িয়ে নিয়ে বস্তা বাঁধলে, তারপর সেটা ঘাড়ে করে আস্তে আস্তে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

শান্তনু ঘরে ফিরে এসে বললে, 'আপদ গেছে। কক্ষনো আর ডেকো না বলে দিলাম।'

কথা বলতে গিয়ে নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'খুব তো বীরত্ব করে এলে। তা ওটা আমার উপর করলেই ভালো হতো। ও বেচারা তো কোনো দোষ করেনি।'

নিষ্ঠুরতার একটা নেশা আছে, তারই ঝোঁকে শান্তনু বলে উঠলো, 'নাও, নাও, রাস্তার লোককে অত দয়া না করে নিজের স্বামীকে একটু আধটু দয়া করতে শেখো।'

নীলিমার ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, চোখ ঝকঝক করে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'এটাই তো তুমি জানাতে চাও যে তুমি প্রভু, তুমি প্রভু! এ তো কবেই বুঝেছি যে আমি তোমার দাসী ছাড়া কিছু নই—তোমার সব খুঁটিনাটি মরজি মেনে চললে মাঝে-মাঝে পিঠে একটু হাত বুলোতে পারো বটে। আমার নিজের ব'লে কিছু আছে নাকি? আমি তো সেই রকমই চলি—তুমি যা ভালো না বাসো তা না করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পারবে, আমার নিজের কোনো সখ বলে কিছু আছে, নিজের খেয়ালে একটা টাকা কখনো খরচ করেছি! ভিখিরির মতো কুড়িয়ে কাচিয়ে দু'চার পয়সা যা জমাই তাই দিয়ে

কখনো কখনো এটা ওটা কিনি বলেই তো তোমার এত রাগ। ঐ বুড়োকে তোমার সিগারেটের জন্যই ঠিক করেছিলুম—সব সময় হাতে পয়সা থাকে না, অসুবিধে হয়—'

'জানি, জানি, আমি সিগারেট খেয়ে পয়সা নষ্ট করি, এ-কথা কত আর শোনাবে! আমার বাবুগিরির মধ্যে তো ঐ সিগারেট! তা তুমি যাই বলো, সিগারেট না হলে আমার চলবে না। এত খেটে রোজগার করি, এই সামান্য একটা বিলাসিতাও কি আমার থাকা অন্যায়?'

'থাক, থাক, আর বোলো না। তুমি একা থাকলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে বিয়ে করে গরিব হয়েছো ও কথাটা আর নাই শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, কত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধে সব গেলো, সবই তো জানি! কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত কঠিন দুঃখ কেন দিলে আমাকে। হায়রে, তোমার জীবনের সমস্ত জিনিষের মধ্যে নিজকে প্রাণপণে বিলিয়ে দিয়ে ভাবি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না হলে তোমার কিছুতেই চলতো না, চলবেও না। ভুল, ভুল! আমরা মেয়েরা শুধু মনে মনে খেলাঘর সাজাই, তা ছাড়া আর কী?'

বলতে বলতে নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে শান্তনু হঠাৎ লক্ষ্য করলে ঘড়ির কাঁটা নটা ধরো ধরো। পাগলের মতো ছুটে গেলো বাথরুমে, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে এসে, হাঁকডাকে কেষ্টকে অস্থির করে তুলে, গোগ্রাসে কিছু ভাত গিলে, প্যাৎলুন আর কোট চাপিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে গিয়ে ট্র্যাম ধরলো। নীলিমার সঙ্গে আর একটা কথা বললে না।

বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে গেলো।

আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই শান্তনু পকেট থেকে একটি দশটাকার নোট বার করলে, 'এই নাও, তোমার ফিরিওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ো।' হেসে বললে কথাটা, ঈষৎ ঠাট্টার ঝোঁকে, যেন সকাল বেলার ঘটনাটা এই একটুখানি হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়।

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। 'তোমার কাছেই রাখো।'

শান্তনু আবার বললে, 'নাও, রাখো।'

নীলিমা নিলে নোটটা, কাপড়ের আলমারির দেরাজে রেখে দিয়ে বললে, 'চা খাবে এসো।'

খাবার টেবিলে বিরাট আয়োজন, নীলিমাই বসে বসে ওসব করেছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিলো শান্তনুর, দ্রুতবেগে খেতে সুরু করলে। একটু পরে বললে, 'তুমি খাচ্ছো না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটু শিঙাড়া ভেঙে মুখে দিলে নীলিমা, আধ পেয়ালা চা ঢেলে নিলে। হয়তো সে কেঁদেছে, হয়তো দুপুরে সে খেতে বসেও কিছু খেতে পারেনি। এদিকে শান্তনু আপিসে পৌঁছিয়েই যা হোক্ করে সেই প্রবন্ধ লিখে বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দশ টাকা আনিয়েছে; লাঞ্চের সময় খুব খিদে পেয়েছিলো, তবু ভালো করে কিছু খায়নি, তাহলে নোটটা ভাঙাতে হয়। এমনি করে নোটটি উপার্জ্জন ও রক্ষা করে বাড়ি নিয়ে এসেছে, কিন্তু নীলিমা একবার জিজ্ঞেস করলে না কোথায় পেলে। কথাগুলো সব মনে-মনে সাজানো ছিলো; বলা হলো না।

চাপা গুমোটে কাটলো রাত্রি, কাটলো তার পরের দিন। আপিস থেকে ফিরে শান্তনু জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার ফিরিওলা এসে টাকা নিয়ে গেছে?'

'না, আসেনি।'

'আসেনি? কাল আসবে দেখো—টাকা যখন পাবে, না এসে যাবে কোথায়?' কিন্তু শান্তনুর মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

চারদিন কেটে গেলো, বুড়ো এলো না। শান্তনু বললে, 'নীলিমা, কেমন হলো? আসে না কেন লোকটা?'

'কী জানি!'

'অসুক করলো নাকি? তোমার তো আরো সব ফিরিওলা আছে—তাদের দিয়ে একটু খোঁজ করাও না।'

নীলিমা চুপ করে রইলো।

'রাস্তায় ওর ডাক শুনতে পাও না?'

'কই, শুনি না তো।'

'কাল মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা কোরো।'

কিন্তু পরের দিনও সেই বুড়োর চড়া হাঁক শোনা গেলো না একবারও। তার পরের দিন রবিবার। শান্তনু সারা দুপুর ঘুমোতে পারলে না। প্রায়ই উঠে উঠে বারান্দায় যায়, মনে হয় সেই বুড়োকে বুঝি দেখবে। কিন্তু কোথায়!

এক মাস কেটে গেলো।

'কী আশ্চর্য্য,' শান্তনু হঠাৎ একদিন বললে, 'সেই বুড়ো আর এলোই না।'

'এলো না তো।'

'কী হলো ওর বলো তো?' বড়ো ম্লান দেখালো শান্তনুকে, প্রশ্নটা বড়ো অসহায় শোনালো। 'হয়তো দেশে ফিরে গেছে ওর মেয়ের কাছে—কী বলো?'

'হয়তো গেছে।'

হয়তো গেছে। হয়তো গাড়ি চাপা পড়েছে, হয়তো জ্বর হয়ে মরে গেছে—কি হয়তো কলকাতারই অন্য-কোনো পাড়ায় ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পথে-পথে ঘুরে গলা ফাটিয়ে চীনে সিঁদুর হেঁকে বেড়াচ্ছে, দেশে যাবার পয়সা জমতে এখনো ঢের দেরি। কে জানে!

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

শরৎচন্দ্র ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য

প্রথম যুগে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার অবধি ছিল না। সমালোচকেরা বলতেন শরৎচন্দ্রের কলমের খোঁচায় এবার হিন্দু সমাজটা রসাতলে যেতে চল্ল। শরৎচন্দ্রের আখ্যা হল বস্তুতান্ত্রিক; সমাজের যা খারাপ, যা ক্লেদ, যাকে চেপে গোপন করে যাওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ, শরৎবাবু আনলেন তাই বের করে সমাজের মুখের উপর। আর শুধু তাইতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল পুঁতলেন। তাতে দুর্ব্বল লোকদের এই ধারণা হল যে, যেখানে পাঁক সেখানে পদ্মফুল থাকবেই; তারা ভাবলে, খারাপটা হচ্ছে বাইরের রূপ, ভিতরকার আদর্শ জগৎটাকে তা গোপন করে রেখেছে; দরকার হচ্ছে একটু সাহস সঞ্চয় করে খারাপটার ভিতরে ঢুকে পড়া, তখন ভালটুকু আমাদের হাতে এসে পড়বে সহজেই। পরে স্বভাবতঃই এই ধারণাকে তারা কাজে পরিণত করতে অগ্রসর হল। তারপর? তারপর পণ্ডিতেরা পঞ্জিকা আর খাগের কলম নিয়ে গুণতে বসলেন পোড়া বাংলা দেশটার অধঃপাতে যেতে আর কটা বছর লাগবে।

আমার মনে হয় এই সমালোচকেরা গোড়াতেই ভুল করেছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল শরৎবাবু ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করলেও দৈব বিড়ম্বনায় খানিকটা ম্লেচ্ছ-রক্ত তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তিনি তাঁর রচনায় যা আমদানি করলেন সনাতন প্রথার সঙ্গে তার মিল নেই। আমাদের মধ্যে তা নতুন, বিজাতীয়, তা বৈপ্লবিক। বিদেশীয় সাহিত্যের দ্বারা তিনি অতি মাত্রায় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন; সেই সব বিদেশী ভাবধারাই তিনি বাংলা সাহিত্যে এনে ঢুকালেন। বস্তুতন্ত্র আমাদের দেশে কোনদিন ছিল না। অথচ সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে তাই তিনি আমাদের সাহিত্যে টেনে আন্‌লেন; এটুকু বুঝলেন না যে আমাদের সমাজের সঙ্গে ও জিনিষ মিশ খায় না। শরৎবাবু সম্বন্ধে আধুনিক বাংলার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে। যা নিন্দা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল তার চতুর্গুণ প্রশংসা আজ তিনি পাচ্ছেন; এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে কীর্ত্তিত হয়ে আসছেন। তবু আজও

বস্তুতান্ত্রিক নাম তাঁর ঘুচল না ; সেই হিসাবেই তিনি আজ প্রগতিশীল বাঙ্গালীদের থেকে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করছেন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যে আঘাত করে, দেশবাসীর প্রীতি কি সে লাভ করতে পারে ? দেশবাসীরা তো ঠিক শরৎবাবুর মেয়ে চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় যে তারা অত্যাচারী পুরুষকেই ভালবাসতে মনোনীত করবে। এই হিসাবে দু'চার জন সমঝদার লোক ছাড়া শরৎবাবু আর কারও প্রশংসা আশা করতে পারতেন না। কিন্তু শরৎবাবুর উপন্যাস পড়েনি এবং পড়ে মুগ্ধ হয়নি এমন লেখা পড়া জানা লোক বাংলা দেশে বিরল। বরং আমার দুচার জন পণ্ডিত বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের মধ্যে খুঁৎ বের করতে তৎপর। তাঁরাই বলেন শরৎচন্দ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে সামঞ্জস্যের অভাব আছে ; জায়গায় জায়গায় উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি অতিরিক্ত হয়ে গেছে ইত্যাদি। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, গতানুগতিকতার প্রতীক জনসাধারণের মধ্যেই শরৎবাবুর প্রতিপত্তি হয়েছে বেশী। এবং যদি স্বীকার করি বিরোধের থেকে প্রেমের উদ্ভব হয় না, তা হলে মানতেই হবে যে বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে শরৎবাবুর নিগূঢ় মানসিক সংযোগ আছে। এ বিষয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে ইংরাজ লেখক ডিকেন্সের কিছু মিল আছে। ডিকেন্সের যা নিন্দাবাদ তা তাঁর সত্যভাষী সমালোচকেরাই করেছেন ; ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ চিরদিন তাঁর ভক্ত পাঠক। পণ্ডিতেরা হয়তো থ্যাকারেকে অথবা হার্ডিকে উচ্চতর স্থান দেবেন ; কিন্তু ডিকেন্সের পাঠক সংখ্যা এঁদের চেয়ে অনেক বেশী আছে এবং থাকবেও। শরৎচন্দ্রকেও কোন কোন পণ্ডিত নিন্দা করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন এমন সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু যে কোন লেখক তাঁর পাঠকসংখ্যা শরৎবাবুর পাঠকসংখ্যার সমান্তরালবর্ত্তী করতে চাইবেন, তাঁকেই শরৎচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

যাদের মতে শরৎবাবু বিরোধী ভাবের আমদানি করেছেন, তাঁরা হয়তো বলবেন যে শরৎ-সাহিত্যের যেটুকু সার্ব্বজনীন অংশ, সেইটুকুই বাঙ্গালী পাঠককে আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা হয়তো আরও বলবেন যে সার্ব্বজনীন রস-সৃষ্টিতে শরৎবাবু এত ওস্তাদ বলেই তো বিপদ আরও বেশী ; এর জন্যেই তো তাঁর বিজাতীয় ভাবধারা বাঙ্গালী পাঠকের মনে প্রবেশাধিকার পায় সহজে এবং দেশের

অধঃপতনের পথ হয় প্রশস্ত। সাহিত্যে সার্ব্বভৌম অংশ যে একটা আছে, যা দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের মানুষের মনে সাড়া জাগায় এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জিনিষটা কাব্যে এবং গীতি-কাব্যে যতটা সত্য, নাটকে এবং উপন্যাসে ততটা নয়। এর কারণ খুব স্পষ্ট। কাব্য এবং গীতিকাব্যের কারবার কল্পনা-জগৎকে নিয়ে এবং সব মানুষেরই কল্পনার ধারা প্রধানতঃ এক রকম বলে এদের পক্ষে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া সহজ। কিন্তু উপ-ন্যাসের কেন্দ্র হচ্ছে সমাজ। এখন স্থানকাল ভেদে সমাজের পরিবর্ত্তন হয় অজস্র; এই সমাজের বিভিন্নতা বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন দেশের উপন্যাস-সমাদরের দুস্তর বাধা। মানুষের ভিতরকার সাধারণ রক্ষণশীলতা এত বেশী যে অপর সমাজের ভিন্নতর নিয়ম কানুন কখনো বা মনে হয় হাস্যকর কখনো বা মনে হয় দুর্নীতি-জ্ঞাপক এবং এই মনে হওয়ার শক্তি এত বেশী যে অনায়াসে লেখার সত্যিকারের গুণ তার তলায় চাপা পড়ে যায়। উদাহরণ দিই।

আমার এক বন্ধুর ইংরেজী উপন্যাস কিছুতেই ভাল লাগত না। বহু প্রশ্ন করার পর এর কারণ উদ্ধার করতে পারলাম। ইংরেজদের চেয়ার টেবিলে খাওয়া এবং ওদের বাপ-ছেলে, মা-ছেলে প্রভৃতির পারস্পারিক চুম্বন-বিনিময়, এই দুটো প্রথা তার কাছে এত খেলো মনে হত যে এদের উল্লেখে বই-এর গভীরতম অংশগুলোর আনন্দও ওর কাছে নষ্ট হয়ে যেত। এই ধরণের কারণেই গোর্কির বস্তুতন্ত্র একজনের ভাল লাগে নাই। ওদের কোর্টশিপ প্রথার উল্লেখে বই-এর প্রতি বিরূপ ভাব জেগেছে এমন লোকের সংখ্যা অজস্র। এই দেশ-কালের সংস্কার এত বেশী যে অনেক পণ্ডিতও এর হাত থেকে রেহাই পান না। আর, কোন নতুন দেশের সাহিত্য পড়তে হলে, তার আগে যে সে দেশের ইতিহাস এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ভাল ধারণা জন্মিয়ে নিতে হয়, সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই তা জানেন। তা না হলে সে সাহিত্যের সম্যক আদর করা সম্ভব হয় না।

এ ছাড়া সাহিত্যে একটা অংশ আছে যা বুদ্ধিগত—উপন্যাসের ভিতর দিয়ে কোন না কোন তত্ত্বকথা প্রায় লেখকই প্রচার করেন। নিজের মতের সাথে যদি না মেলে তা হলে এই তত্ত্বকথা পণ্ডিতদের পক্ষে পর্য্যন্ত সাহিত্য-উপলব্ধির বিরুদ্ধে বিস্তর বাধা জন্মায়, সাধারণ লোকের তো কথাই নেই। সকলের শেষে, উপন্যাস-মাত্রেরই একটি বিশিষ্ট attitude বা উপলক্ষণ আছে, যেমন

আদর্শবাদ, বস্তুতন্ত্রবাদ। এদের সবগুলোই এক সমাজে খাপ খায় না। ইংল্যাণ্ডে ঠিক ঠিক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য কোনদিনই চলেনি, তেম্নি আবার রাশ্যাতে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সব চেয়ে বেশী সমাদর পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ধারা পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমাদের দেশেও বস্তুতন্ত্র জিনিষটা মোটেই চলে না। এই রকম কূপমণ্ডুকই যদি হয় সাধারণ মানুষের মন, তা হলে, বস্তুতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও, এবং বিদেশী তথ্যের আমদানি করা সত্ত্বেও শরৎবাবু যে সার্ব্বজনীন সম্মান পাবেন তা কি অসম্ভব নয় ?

আসল কথা হচ্ছে, ডিকেন্সের যেমন একটি মূলীয় ইংরাজ-মনোভাব ছিল, শরৎ বাবুরও তেম্নি একটা মূলগত বাঙ্গালী মনোভাব আছে। শরৎবাবুর মনোভাবটা কি তা হলে এখন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। শরৎচন্দ্রের মূলনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতেই অনেকেই হয়তো তারস্বরে বলে উঠবেন, সমাজ-সংস্কারই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের মূলনীতি। বাংলা সমাজে তো আর আবর্জ্জনার অভাব নেই। কুসংস্কার রয়েছে প্রতি পদে পদে। বর্ণভেদ তো রয়েছে পাষাণ ভারের মত চেপে। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বংশের দোহাই দিয়ে অস্পৃশ্য জাত-গুলোর থেকে যে অন্যায় সুবিধাগুলো ভোগ করছে তার জন্যে তাদের এমন কি কোন চারিত্রিক গুণ পর্য্যন্ত নেই—যদিও চারিত্রিক গুণ কিছু থাক্‌লেও এই অন্যায়কে ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করা চল্‌ত না। এ ছাড়া সামাজিক নীতি বলে যে জিনিষগুলো চলছে আসলে তা সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী। আমাদের সমাজের কাঠামো এমন অবৈজ্ঞানিক বলে শুধু যে একশ্রেণীর লোকের প্রতিই অবিচার করা হচ্ছে তাই নয়, গোটা সমাজটারই পরিবর্ত্তনের পথ বন্ধ হয়েছে, ফলে পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌বার ক্ষমতা আর সমাজের নেই। এর একমাত্র অমোঘ ফল হচ্ছে এই যে জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছি। এই সমস্ত জটিল সমস্যাই শরৎচন্দ্রের দূরদর্শী চোখের সাম্নে ধরা পড়েছে।

সমাজের বিরুদ্ধে শরৎবাবুর অভিযোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সমাজের আকৃতির বিরুদ্ধে ;—সমাজের বাহ্যিক রূপ যে কত কুৎসিত, কত দুর্ব্বল, কত অস্বাভাবিক তা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে ;—সমাজের কাঠামো এত খারাপ যে তলিয়ে দেখতে গেলে সমাজের মূলনীতিগুলোকে

এর জন্যে দায়ী করতে হবে। প্রথম উপন্যাসগুলোয় শরৎবাবু প্রধানতঃ সমাজের আকৃতির পরিচয় দিতেই চেষ্টা করেছেন, যেমন পল্লীসমাজে, অরক্ষণীয়ায়, চন্দ্রনাথে। পল্লীসমাজে শরৎবাবু দেখাতে চেয়েছেন কি করে কূপমণ্ডুক সমাজের নিষ্পেষণে দুটো মহাপ্রাণ নরনারীর জীবন ব্যর্থতায় নিমগ্ন হল। জীবনের রসটা তারা বুঝবে না; মানুষের মহত্ব তাদের চোখে পড়ে না;—শুধু যে করেই হোক সমাজকে তারা বাঁচাবেই। কিন্তু গোড়াতে ভুল করলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ একথা মনে করলে ভুল হবে। এই সমাজরক্ষা-নীতির পিছনে যে স্বার্থপরতা এবং হীন মনোবৃত্তির লীলা গোপনে চল্‌তে থাকে শরৎচন্দ্র তা দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন।

পরবর্ত্তী যুগের রচনার মধ্যে তিনি সমাজের প্রকৃতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। যেমন চরিত্রহীনে, শেষ প্রশ্নে। এই বই দু'খানার প্রধান অভিযান হচ্ছে সতীত্ব প্রথার বিরুদ্ধে। সতীত্ব-প্রথা, বৈধব্য-প্রথা, এ সবের যে চলন হয়েছে, তলিয়ে দেখতে গেলে এর থেকেই আমাদের সমাজের মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের সমাজের মূলনীতি হচ্ছে তাকে অবিকৃত রাখা। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দিকে তাকালে চলবে না; কারণ তার জন্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিধি বাড়িয়ে দিতে হয়; আর তার ফলে সমাজের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা খর্ব্ব করবার জন্য এমন সব নীতি অবলম্বন করা হয়েছে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী যা হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক। এই জিনিষটাকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্যেই শরৎবাবু তাঁর বিষয়বস্তু করেছেন নরনারীর প্রেম-চর্চ্চা। তিনি দেখাতে চেয়েছেন সমাজ যদি প্রকৃতির দাবীকে অস্বীকার করে তার কাজ চালাতে চায়, তা হলে প্রকৃতির (এবং সমাজেরও) কোপ দৃষ্টিতে পড়তে হয় অসহায় ব্যক্তিদের। প্রেম তো একটা সহজ জিনিষ নয়;—শরৎবাবুর মতে প্রেম হচ্ছে মহান, প্রেম হচ্ছে স্বর্গীয়। অথচ সেই প্রেমে পড়ার অপরাধে কত মহৎ প্রাণই না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শরৎবাবু প্রধানতঃ সমস্যারই রূপ দিতে চেয়েছেন তাঁর রচনার মধ্যে; তবে সমাধানের ইঙ্গিতও যে তাঁর মধ্যে একেবারে নেই তা নয়।

এই সমাজ-সংস্কারের বৃত্তি যে শরৎবাবুর মধ্যে যথেষ্ট প্রবল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু কতকগুলো জিনিষের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলো জিনিষ আছে যেগুলো আমাদের কাছে স্বভাবতঃই অদ্ভুত বলে মনে হয়। শরৎবাবুর মূলনীতির সঙ্গে সেগুলোর মিল

নেই ;—তারা তাঁর রচনার মধ্যে একটা ভিন্ন সুরের আমদানি করেছে। তাঁর মনের গাঁথুনি যথেষ্ট দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও,—হয়তো বা সেইজন্যই—রক্ষণশীলতার একটা ক্ষীণ স্রোত যেন তাঁর ভিতরে বয়ে চলেছে। এই রক্ষণশীল দিকটাকে হেঁয়ালী বলে ধরে নেয়াও আমাদের পক্ষে শক্ত, কারণ শরৎবাবুর মধ্যে যে সমস্ত গুণ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে সব কথাতেই তিনি স্বচ্ছ। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

চরিত্রহীনে সুরবালার চরিত্র বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। মহাভারতের প্রত্যেকটি কাহিনী সে অবিসংবাদী সত্য বলে গ্রহণ করে ; সমাজের প্রত্যেকটা কুসংস্কারকেই সে জীবন-যাপনের অঙ্গীভূত বলে মনে করে। এই বিশ্বাসের গভীরত্বের ভিতর একটা স্বর্গীয় ভাব আছে তা স্বীকার করি। কিন্তু শরৎবাবু তো সমালোচক ; তিনি তো সমাজসংস্কারে বদ্ধপরিকর ; স্বর্গীয়ভাব কোথাও দেখলেই যদি তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন, তা হলে তাঁর মূলনীতিতে তো আঘাত পড়বেই। শত্রুপক্ষের কয়েকজন লোককে যদি তিনি আক্রমণে বিরত হন, তা হলে স্বভাবতই তাঁর বিজয়ের আশা সুদূরপরাহত হয়ে আসে। কাজেই এই দুর্ব্বলতা তাঁর শোভা পায় না। কিন্তু তাই তিনি দেখিয়েছেন। কিরণময়ী যখন কিছু সময়ের জন্যে শরৎবাবুর প্রতিভূ হবার অধিকার পেলে, যখন সে পরলোক-চক্রের মিডিয়ামের মত শরৎবাবুর বাণী আউড়ে যেতে লাগল, তখন সে সুরবালার প্রতি দেখালে তার গভীর শ্রদ্ধা। অথচ একথা তো ভুলে গেলে চলবে না যে শ্রদ্ধা দেখান মানেই জিনিষটাকে মেনে নেওয়া।

আর একটা উদাহরণ আছে গৃহদাহের মহিমের সেই আত্মীয়া বধূটির মধ্যে। কী গভীরভাবেই না সে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে, অথচ কী অপরিসীম শ্রদ্ধাই না শরৎবাবু তাকে দেখিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত করে শেষ প্রশ্নের কমলের চরিত্র। বৈধব্য প্রথা এবং সতীত্ব প্রথার মধ্যে কমল কোন মানে খুঁজে পায় না। নরনারীর যৌন সম্বন্ধ স্বভাবতঃই সময়ে শিথিল হয়ে আসে এবং তারা নতুনতর আসক্তির দিকে অগ্রসর হয়। কমলের মতে এতে বাধা দিতে যাওয়াই অন্যায়। আসল কথা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ আসে সুখভোগ করবার জন্যে। ত্যাগ তার পথ নয় ;—ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করবে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। অথচ কমল নিজে ব্রহ্মচারিণীর আদর্শস্থল ; সে বিধবার

মত নিরাড়ম্বর জীবন-যাপন করে; একবেলা নিরামিষ খায়; বাজারের খাদ্য স্পর্শ করে না। এর কারণ কমলকে জিজ্ঞেস করলে কমল এর কোন সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারে না; তার কাছে এটা অনেকটা খেয়ালের মত। আমাদের মনে হয় এটা কমলের খেয়াল নয়; এটা শরৎবাবুর দ্বিধা-বিভক্ত মনের একটা প্রকাশ মাত্র।

বলেছি বস্তুতান্ত্রিক হিসাবে শরৎবাবুর খ্যাতি আছে। যে ব্যক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে সমাজ-সংস্কার তাঁর দৃষ্টি-কোণ বস্তুতান্ত্রিক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতন্ত্র জিনিষটা সম্বন্ধে তা হলে একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার। বস্তুতন্ত্রের মূলকথা হচ্ছে সত্য-দৃষ্টি। সমাজে যা আছে, সমাজে যা চল্‌ছে, রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তাকে দেখলে চলবে না। তাকে দেখতে হবে স্বচ্ছ, সাদা চোখে; তাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে ঠিক যেমন করে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। সমাজকে আমরা হয়তো এই ভাবে দেখতে চাই না; হয়তো এইভাবে ভাবতে গেলে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হয়। কিন্তু তাই বলে সত্যের দিকে পিছন ফিরেই বা কি করে আজ চলে? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের উন্নতিসাধন। তার জন্যে সমাজের বস্তুর রূপটা কি তা আগে জানা দরকার। মানুষের মন আগে ধাঁধামুক্ত হোক, তারা বুঝতে শিখুক কি রকম আবহাওয়ায় তারা আছে। না হলে সংস্কার সম্ভব হবে না। সংস্কার করবার আগে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাটা বোঝা দরকার। এই বোঝানটুকুর ভারই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক নিয়ে থাকেন। স্পষ্টতঃই কাল্পনিকতার বিরুদ্ধে এ একটা অভিযোগ। কল্পনাবাদী পৃথিবীর দুঃখের থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিজের মনোমত আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। রোমান্সের ভিতরে আনন্দ আছে; সেই আনন্দ নষ্ট হবে বলেই লেখক মানুষ সম্বন্ধে সত্যিকথা বল্‌তে ভয় পান। কিন্তু সমাজ-সংস্কার এই লুকোচুরির পথে সম্ভব নয়। শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে সহজেই মনে হবে যে এই জ্ঞান তাঁর আছে; এবং মানুষ সম্বন্ধে সত্যি কথা তিনি অনেক জায়গায়ই বলেছেন।

এই আলোচনার মধ্যে আমরা একটা কথা বাদ দিচ্ছি। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের দৃষ্টি হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। এখন বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর থেকে সাধারণ তথ্যে পৌঁছান। সমাজের বিভিন্ন ঘটনা, তার

বিচিত্র গতিভঙ্গী, এসবের দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু এর থেকে তিনি কতকগুলো খাপছাড়া চমকপ্রদ কাহিনী দিতে মোটেই ব্যস্ত হবেন না। এই সবের ভিতর থেকে তিনি সমাজের মোটামুটি রূপটি ধরতে চেষ্টা করবেন। অনেক ঘটনা আছে, সমাজের সাধারণ রূপের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই, যেমন ভূমিকম্প। এগুলোকে বাদ দিতে হবে। আবার এমন অনেক ঘটনা আছে যার সঙ্গে এই সাধারণ রূপের খানিকটা সম্বন্ধ আছে, যেমন রাজনীতি। এগুলোর অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতে হবে। এম্নি করে শুধু সেই সব ঘটনাই রাখা চলবে যেগুলো সমাজের সত্যিকারের রূপকে প্রতিফলিত করছে। এখানে সত্যিকারের রূপ বলতে আমরা মোটামুটি average রূপটি বুঝব। বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস তাই অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত স্বাভাবিক। যা অত্যন্ত হরহামেশা ঘটছে; সমাজের অধিকাংশ লোকের যা নিত্যনৈমিত্তিক কাহিনী, তাই হচ্ছে বস্তুতন্ত্রের উপজীব্য বিষয়। অবিশ্যি এই সাধারণকে বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে তোলাই হচ্ছে আর্টিষ্টের কাজ। তাহলে বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস হল তাই যা সমাজের অধিকাংশ লোকের জীবন-যাপন, তাদের অবস্থা, এই সব সম্বন্ধে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যথাযথ বর্ণনা দেয়। আসল কথা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যকে গণতান্ত্রিকও হতে হবে।

আমরা একটা একটা করে বিষয় ধরে পরীক্ষা করে দেখব শরৎবাবুর বস্তু-তান্ত্রিকতার সীমা কোথায়। প্রথমতঃ ধরা যাক্ প্লট। প্লটের দিক থেকে শরৎবাবু প্রায়ই সহজ এবং সরল। অযথা জটিলতা টেনে এনে বই-এর গতির সম্ভাব্যতাকে ক্ষুণ্ণ তিনি ক্বচিৎ করেছেন। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কষ্টকল্পনা নেই কোথাও। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিবেশের থেকে ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক গতিতে বেরিয়ে এসেছে। কোথাও তাকে থামতে হয়নি, তার গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে বাইরের জিনিষের আমদানি করতে হয়েছে কদাচিৎ। আমাদের মনে হয় না কখনো যে গোড়াতে যে শক্তি নিয়ে গল্পের সুরু হয়েছিল সে শক্তি গল্পকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পর্য্যাপ্ত হয়নি, মাঝখানে আরও নতুন শক্তি যোগ করে দেবার দরকার হয়েছে। পরবর্ত্তী ঘটনা আগের ঘটনাকে স্বভাবতঃই অনুসরণ করে; একথা আমাদের কখনোই মনে হয় না যে দুটো ঘটনার মধ্যে কোন ছেদ রয়েছে,—যে একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার মধ্যে বেমালুম মিশে যায়নি। এটা একটা মস্ত সুখের বিষয় যে শরৎ-সাহিত্য পড়তে পড়তে থামতে হয় না, এক সঙ্গে গোটা

জিনিষটা পড়ে মনে হয় যে একটা জিনিষই পড়লাম, অনেকগুলো জিনিষের সমষ্টি পড়লাম না।

বস্তুতান্ত্রিক টেকনিকের সঙ্গে শরৎবাবুর এই অবধি মিল আছে। অমিল আছে কোথায় তা এবার দেখাচ্ছি। দুর্ঘটনা এবং দৈবঘটনা, যা খুব কদাচিৎ ঘটে বলে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, এ দুটো জিনিষ শরৎবাবুর মধ্যে যে একেবারেই নেই তা নয়। চরিত্রহীনে সতীশ আর সরোজিনীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা হল তা একটা দস্যু-দুর্ঘটনার দরুণ। সতীশ আর সাবিত্রীর মধ্যে যে যোগাযোগ তাকেও একটা দৈবঘটনা না বলে উপায় নেই। দেবদাসে দেবদাস আর চন্দ্রমুখীর ভিতরে যে গভীর ঘনিষ্ঠতার উদ্ভব হল এটাকেও এম্নি একটা দৈব ঘটনা বলা চলে। বিরাজ বৌ-এ বিরাজ যে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে পারলে এটা আর একটা দৈবঘটনা। এই তালিকা যথেষ্ট বাড়ান চলতে পারে। শরৎবাবুর মধ্যে এমন অনেক ঘটনার অবতারণা দেখা যায় যা নিতান্ত হরহামেশ ঘটে না। কিরণময়ী দিবাকরকে নিয়ে চট্ করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল। এরকম বিদেশ যাত্রা বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় সচরাচর ঘটে না। শেষ প্রশ্নে কমল তার বাগ্মিতায় এবং পাণ্ডিত্যে অধ্যাপকদের হার মানিয়ে দিল। অথচ সে কুলির মেয়ে, কমল বলে তার বাবার কাছ থেকে সে লেখাপড়া শিখেছিল। যে ব্যক্তি কুলিদের মধ্যে কাজ করে সে যে তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিতা করে তুলেছে এমন দৃষ্টান্ত অন্ততঃ খুব বেশী দেখা যায় না।

কিন্তু শরৎবাবুর প্লটের সব চেয়ে বড় দোষ বলতে এখনো বাকী আছে। কোন সামাজিক ঘটনা-পরিবেশের শেষটা যে কি হবে তা যেমন আগের থেকে কোনক্রমেই কল্পনা করা যায় না, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যেও তেম্নি গল্পের শেষটা পূর্ব্বকল্পিত হয়ে থাকা উচিত নয়। এক হিসাবে দেখতে গেলে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের কোন শেষ নেই। কারণ সামাজিক জীবনে আমরা কখনো কোন জিনিষের পরিসমাপ্তি দেখি না। সমাজে একটা ঘটনার শেষ মানে আর একটা ঘটনার আরম্ভ। আসল একখানা বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসে তাই আমরা দেখি যে যেখানে গল্পের শেষ হয়েছে, বাস্তবিক সেখানে এসে গ্রন্থ-মধ্যে-প্রবিষ্ট, বিভিন্ন পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় না। অনেক ঘটনা আমরা পাই যেগুলো খুব অল্পই পরিবর্দ্ধিত হয়েছে ; সেগুলোকে দিয়ে আর একখানা নতুন

উপন্যাস লেখা চলে। এ বিষয়ে নুট্ হামসুন সব চেয়ে ভাল উদাহরণ ; তাঁর মধ্যে একটা ঘটনাস্রোতকে তিনটে উপন্যাসের ভিতর দিয়ে পড়েও আমরা কোন স্পষ্ট, সীমাবদ্ধ পরিসমাপ্তির নির্দ্দেশ পাই না। শরৎবাবু ঠিক এর বিপরীত। তাঁর লেখার মধ্যে যেমন একটা স্পষ্ট আরম্ভ আছে, তেম্নি একটা স্পষ্ট সমাপ্তি আছে, যার পর আমাদের মনে হয় এর পরে আর আমরা কিছু চাই না, এখানে একটা ঘটনা-স্রোতের উপরে পরিষ্কার যবনিকাপাত হল। শরৎবাবুর উপন্যাসগুলো এই রকম সমাপ্তিপ্রবণ বলে তাঁকে ঘটনাস্রোতের সীমা আগের থেকেই ঠিক করে নিতে হয়। এই জন্যে যথেষ্ট চাতুরী সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমরা বুঝতে পারি যে ঘটনারা নিজেরাই চল্‌ছে না, একজন নির্দ্দেশকের অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাদের গতি নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। এই দোষে বিশেষভাবে দুষ্ট উপন্যাসগুলোর মধ্যে দত্তা, পরিণীতা, চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতির নাম করা চলতে পারে। প্লট সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

তারপর আসে চরিত্রগোষ্ঠী। চরিত্র-সৃষ্টিতে শরৎবাবুর অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যের কথা বিস্তৃত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাদের গতিবিধি শুধু বই-এর পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না ; তারা আমাদের চারপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলে ; তাদের গায়ের গন্ধ আমাদের নাকে আসে। কিন্তু তবু তারা কোন্ জগতের চরিত্র সেটাও দেখতে হবে। এরা আমাদের মত জীবন্ত হলেও এদের ডেকে এনে আমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারব না। এরা ভিন্ন জগতের মানুষ ; দূর থেকে এদের দেখেই আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই, কাছে টেনে আনবার সাহস আমাদের নেই। পল্লীসমাজের রমেশের থেকে আরম্ভ করে, বিরাজ-বৌ-এর বিরাজ, বিন্দুর ছেলের বিন্দু; চরিত্রহীনের সাবিত্রী, উপীনদা, গৃহদাহের মহিম, শেষ প্রশ্নের কমল, —এদের কাউকেই আমরা নিজেদের সঙ্গে এক আসনে বসতে দিতে পারি না। এদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি ; এরা আমাদের প্রণম্য। এরা কখনই আমাদের সমস্তরের নয়। এদের দেখে এই কথাই মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত শরৎবাবু রাজারাজড়াদের কাহিনী না আঁকলেও আভিজাত্য বজায় তিনিও রেখেছেন—এ আভিজাত্য হচ্ছে মহত্ত্বের আভিজাত্য।

শরৎবাবুর ভিতরে এই যে অতি স্পষ্ট আদর্শবাদ—এর থেকে আমরা একটা জিনিষ বুঝতে পারি। শরৎবাবুর নায়ক এবং নায়িকারা অতি উচ্চস্তরের।

সাধারণতঃ তারা সর্ব্ববিধ পাপ এবং দুর্ব্বলতার অতীত ; তারা এত ভাল যে পাপ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। যদি ক্কচিৎ কোথাও সামান্য কোন দুর্ব্বলতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তা শুধু মহত্ত্বটাকেই আরও বেশী করে পরিস্ফুট করবার জন্যে। স্বভাবতঃই বস্তুতান্ত্রিক জগতে এই চরিত্ররা স্থান পায় না। বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসে যারা অপরিহার্য্য, সেই সমাজের বেশীর ভাগ মানুষই এই চরিত্রদের মত মহৎ বা উদার নয়। নীচ মনোবৃত্তি যেমন তাদের মধ্যে প্রচুর, তেমনি হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণারও অভাব নেই তাদের মধ্যে। ভাল বৃত্তি তাদের মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে তা শুধু এই মন্দের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়। এই সব মসীময় বাস্তব চরিত্র-গুলো শরৎ-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তাঁর মহৎ নায়ক-নায়িকাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-রত অবস্থায় ; তারা মহত্ত্বকে অবিরত লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করছে এইটেই শরৎবাবু দেখাতে চেয়েছেন। এর ভিতর শরৎবাবুর বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের আভাস পাই শুধু এই অবধি যে ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের বিনাশটা তিনি বড় একটা দেখাবার চেষ্টা করেন নি ; অবিশ্যি মহত্ত্বের সমাদর অন্ততঃ কিছু পরিমাণে যাতে হয় সেদিকেও তিনি বিলক্ষণ দৃষ্টি রেখেছেন ; তবু তাঁর চরিত্র-গোষ্ঠীর আলোচনায় বস্তুতন্ত্রের চেয়ে আদর্শবাদের আভাসই বরং আমরা বেশী পাচ্ছি।

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে কার্লাইলের বীর-পূজার সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা। কার্লাইলের বীর হচ্ছে অসাধারণ কাজের লোক। কাজের লোককে সে নিয়ন্ত্রিত করছে ; অসাধারণ তার দৃঢ়তা এবং আত্মসংযম। সে খৃষ্টের মত ক্ষণজন্মা পুরুষ ; পৃথিবীকে গ্লানির থেকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। সাধারণ লোকের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই বীরদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, তাদের কাজ হচ্ছে এই বীরদের প্রবল নৈতিক এবং কর্ম্মের আদর্শের অনুসরণ করা। কার্লাইলের এই লক্ষণটাকে যদি আদর্শবাদ বলা যায়, যেমন সচরাচর বলা হয়, তা'হলে কিন্তু শরৎবাবুকে আদর্শবাদী বলা চলেনা। শরৎবাবুর মধ্যে "man of action"-এর ভাবটা তেমন প্রবল নয়। তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষের মাপকাঠি হচ্ছে তার হৃদয়াবেগের প্রাবল্য। আদর্শ পুরুষ হচ্ছে সেই যে ভালবাসতে পারে। দুঃস্থের প্রতি, মানব সাধারণের প্রতি যার সহানুভূতি অপরিসীম। ভালবাসার ব্যাপারে আত্মসংযমের কোন মানে শরৎবাবুর কাছে নেই। ভালবাসার বৃদ্ধিতেই, হৃদয়া-বেগের বন্যা ছেড়ে দেওয়াতেই, রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। শরৎবাবুর কাছে বুদ্ধি

প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে অনুভূতি। এখানে শরৎবাবুর সঙ্গে রোমান্টিসিজমের, বিশেষ করে, ফরাসী রোমান্টিসিজমের সাদৃশ্যটা লক্ষ্যণীয়। রোমান্টিসিজমের মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে হৃদয়াবেগকে, যুক্তিকে বাদ দিয়ে মনের অলস কল্পনাকে, এবং সংযমকে বাদ দিয়ে মানুষের উন্নততর passion-গুলোকে, প্রাধান্য দেওয়া ; আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মানবতার, বিশ্ব-মৈত্রীর এবং সার্ব্বজনীন সাম্যের আদর্শ। ঠিক এই জিনিষগুলোই আমরা শরৎবাবুর মধ্যে পাই।

সুতরাং চরিত্রের দিক দিয়ে শরৎবাবুর নায়ক নায়িকারা একেবারেই বস্তু-তন্ত্রের বিরোধী। বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে শরৎবাবুর যে মূলনীতিকে আমরা প্রধানতঃ বস্তুতান্ত্রিক ভেবে এসেছি আসলে তা কল্পনাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত—শুধু প্রকাশভঙ্গীটা একটু বস্তুতন্ত্র-ঘেঁষা, এইমাত্র। সর্ব্বত্রই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির উপরে হৃদয় বৃত্তির প্রাধান্য দিয়েছেন। সতীত্ব-প্রথা, বৈধব্য-প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যা অভিযান, তা হৃদয়ের দিক থেকে। সতীত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ এই ধরণের ; যে স্বামীকে স্ত্রী ভালবাসতে পারে নি তার প্রতি জোর করে আসক্ত হয়ে থাকাটা স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতি জুলুম। স্ত্রী যদি পর পুরুষকে ভালবাসে তো তাকে অবৈধ বলে অপমান করা অন্যায়। স্ত্রীর এই হৃদয়াবেগকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। এবং শরৎবাবু বলতে চেয়েছেন হৃদয়াবেগকে এইরূপ প্রাধান্য দেওয়াতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। একেবারে রুসোর আদর্শ।

যে সব উপন্যাসে শরৎবাবু সমাজের আকৃতির পরিচয় দিয়েছেন সেখানেও আমরা ঠিক এই মনোবৃত্তিরই প্রকাশ দেখতে পাই। শরৎবাবুর নায়ক নায়িকারা হচ্ছে সমাজের আদর্শস্থল ; কিন্তু আমাদের সমাজ এতই কূপমণ্ডূক যে এই সব মহাপ্রাণ মনুষ্যগুলো তাদের মধ্যে পড়ে অসীম দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। অবিশ্যি সমাজের অত্যাচারে এই সব নায়ক নায়িকাদের মহত্ত্ব আরও বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে ; তাদের হৃদয়াবেগ-প্রাধান্য এই সংগ্রামে একটুও হ্রাস পায় নি। শরৎবাবু একথা বুঝতে পারেন নি যে খারাপ সংসর্গের ভিতরে থেকে কখনো আদর্শ চরিত্রের উদ্ভব সম্ভব নয় ; খারাপের চাপে মানুষের সদ্‌গুণরাশি গোড়াতেই নিষ্পেষিত হয়ে যায়। এখানে শরৎবাবুর সত্যদৃষ্টির অভাব রয়েছে। ফল হয়েছে এই যে কার্য্যতঃ তাঁর বস্তুতান্ত্রিকতা

কতকগুলো খণ্ড দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অখণ্ড বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব তাঁর কোন উপন্যাসেই স্ফূর্ত্তি পায় নি।

ফরাসী বা রাস্যার বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসের সঙ্গে ওঁর তুলনা করলে আমরা জিনিষটা আরও ভাল করে বুঝতে পারব। ফরাসী এবং রুষ বস্তুতান্ত্রিকেরা দেখিয়েছেন যে অভিজাতদের অত্যাচারে এবং অন্য অনেক কারণে সামাজিক গতিবিধি অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়লে তার নিষ্পেষণে মানুষ যে শুধু তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই হারিয়ে ফেলে, তাই নয়; তার নীতি-জ্ঞান পায় লোপ, দুর্নীতিকে সে জীবনের অত্যন্ত সাধারণ উপজীব্য বৃত্তি বলে ধরে নেয়। সমাজের আবহাওয়া একবার খারাপ হয়ে গেলে তার হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। পাপের ভিতরে সর্ব্বদা থেকেও যে কেউ নিষ্কলুষ থাকবে এ কখনো সম্ভব হয় না। সংসর্গের অভিশাপ নিদারুণ এবং দুর্ব্বার। সেইজন্যে খারাপের থেকে খারাপই সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়; দশটা খারাপ গুণের চাপে একটা ভাল গুণ যদিই বা থাকে তা গোড়াতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সমাজের এই নিদারুণ বাস্তব চিত্রের থেকেই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এবং এই বস্তুতান্ত্রিকদের দৃষ্টি যে সত্য-ঘেঁষা তার প্রমাণ দেবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। এদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে শরৎবাবুর দৃষ্টিকোণ মূলতঃ স্বতন্ত্র। বাস্তবিক শরৎবাবুর নায়ক নায়িকাদের যে সমাজে কল্পনা করা যায়, সে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের নিরাশ হবার বেশী কিছু থাকে না। সমাজ এই মহাপ্রাণ লোকদের যতই ভুল বুঝুক, এ ধারণা আমাদের মনের থেকে কিছুতেই যাবে না যে যে-সমাজ এদের সৃষ্টি করতে পারে, সে সমাজের শিক্ষার জোর আছে।

রসের দিক থেকে দেখতে গেলে, শরৎবাবুর উপন্যাস যে আমাদের এতটা স্পর্শ করতে পারে, ওঁর নায়ক নায়িকা সৃষ্টি তার একটা বড় কারণ। ওঁর নায়ক নায়িকাদের মহত্ত্বের বিরাটত্ব দেখে প্রথমেই আমাদের মন শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপরে যখন তাদের মহত্ত্বের জন্যই এই নায়ক নায়িকারা সমাজের কাছ থেকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকে, তখন তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি হয় অপরিসীম। বইএর ছোট খাট দোষ ত্রুটি, ছোটখাট অসম্ভাব্যতা আমাদের চোখেই পড়ে না, এম্নি মোহ আমাদের মনে জাগায় এই সহানুভূতি। এই চরিত্রগুলোর দুরবস্থায় আমাদের মন যাতে হতাশায় পূর্ণ না হয় এই জন্যে

শরৎবাবু তাঁর গ্রন্থের উপসংহার এইভাবে করেন যাতে নায়ক নায়িকাদের মহত্ত্বের মূল্য সমাজ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে স্বীকার করে। এই জিনিষগুলো মূলতঃ সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তি-শূন্য।

শরৎবাবুর সহানুভূতিবোধও তাঁর কল্পনাবাদী মনের পরিচয়-জ্ঞাপক। তাঁর যে নায়ক-নায়িকার প্রতি তিনি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে ওঠেন তারা সর্ব্বত্র আদর্শ চরিত্র। যে আদর্শ নয়, শরৎবাবুর সহানুভূতি সে পাবে না। মানুষের ভিতরে মহত্ত্বের অভাব তাঁর কাছে অসহ্য। বাস্তব সম্বন্ধে শরৎবাবুর দৃষ্টি প্রখর নয় বলেই, কল্পনাবাদী হিসাবে শরৎবাবু সমাজের থেকে অতিরিক্ত ভাল আশা করেন বলেই, এই রকম হয়েছে। খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক কিন্তু জানেন যে মানুষের ভিতরে স্খলন পতন বড় বেশী, আর তার জন্যে সব সময় তাকে দোষীও করা যায় না; কাজেই মানুষকে যদি দরদ দেখাতে হয় তা হলে তার ভিতরকার অজস্র গ্লানি থাকা সত্ত্বেও তা দেখাতে হবে। তার দোষ ক্রটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে হবে।

এইবার তাহলে আমরা যেখান থেকে সুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে যেতে পারি, শরৎবাবুর মনোভাবও যা সাধারণ বাঙ্গালীর মূলীয় মনোভাবও তাই। বাঙ্গালী জাত হচ্ছে ভাবুকতা-প্রিয়। সংযমের আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করে না। কোন বিরাট কাজ করবার প্রেরণায় আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি না। আমরা চাই সেই জিনিষটার মধ্যে ডুবে থাকতে বৈষ্ণব কবিরা যাকে লেখনীর দ্বারা অমর করে রেখেছেন, আর চৈতন্যদেব যার ভাবময় রূপ দিয়ে গেছেন। ভাবের বন্যাস্রোতে আমরা ভেসে যেতে চাই,—বুদ্ধি নয়, কাজ নয়, কেবল হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা। এই গভীর অনুভূতি-প্রবণতা কোন এক শ্রেণীর লোকের সম্পদ নয়; অধিকাংশ বাঙ্গালীর সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলার বাপ মা তাদের সন্তানের জন্যে যত ভাবে, বাংলার বধূ তার স্বামীর জন্যে যত ব্যগ্র হয়ে থাকে, এমন আর পৃথিবীর কোথাও নয়। জাতিগত বৃত্তি বলে একটা জিনিষ মানুষের ভিতরে আছে। বাঙ্গালীর জাতিগত বৃত্তি হচ্ছে অনুভূতির প্রবলতা। এখন শরৎবাবু যে বাঙ্গালার হৃদয় এতখানি অধিকার করে আছেন, তার প্রধান কারণ হল যে এই অনুভূতিকেই তিনি অন্য সমস্ত জিনিষের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটা উপন্যাস অনুভূতি-সর্ব্বস্ব। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর রাগ এই জন্যেই যে আমাদের সামাজিক নীতি অনুভূতির যথাযথ স্ফূর্ত্তিতে বাধা দেয়। সমাজের বিরুদ্ধে শরৎবাবুর

এই যে অভিযান, বাঙ্গালীর সার্ব্বজনীন সমর্থন পেতে এর আটকায়নি। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে যাই হোক,বাঙ্গালীর রক্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল এবং বিদ্রোহ-প্রবল; ভাব-জগতের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা তারা চায়, কাজেই রীতি নীতির অসংখ্য বন্ধন তাদের কাছে পীড়াদায়ক হবেই। চৈতন্যের থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বৈষ্ণব কবিরাই সমাজের এই স্থিতিশীলতার নিন্দা করে গেছেন, এবং তার সুর বাঙ্গালীর অন্তরের গোপন প্রাঙ্গণে আজও ধ্বনিত হচ্ছে। তবু যে সামাজিক কূপমণ্ডুকতা এখনো বলবৎ রয়েছে তার কারণ হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যের জন্যেই বাঙ্গালী কর্ম্মে পরাঙ্মুখ। তারা মনে যা ভাবে, কাজে তা করতে তো পারেই না, এমন কি মনে মনেও তা স্বীকার করতে চায় না। এই জন্যই শরৎবাবুর মধ্যে যখন বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হল, দু চারজন পণ্ডিত গোছের লোক ছাড়া সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি তিনি পেলেন।

আর একটা কথা বলে আমার রচনা শেষ করব, অনুভূতিকে তার চরম মূল্য দেবার জন্যে শরৎবাবুর উপন্যাস সময়ে সময়ে ঠিক স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অনুভূতি তার উপযুক্ত মূল্য তার পারিপার্শ্বিকের কাছে পেলে না, কেউ কোনদিন তার কদর বুঝলে না—এ দুঃখ শরৎবাবুর সহ্য হয় না। আসল কথা, সাধারণ বাঙ্গালীর মত শরৎবাবুও তাঁর ভাব-প্রাবল্যের জন্যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। সাহিত্যিকের নিস্পৃহতা, সাহিত্যিকের সত্যনিষ্ঠাও তাঁকে রক্ষা করতে পারে নি। দু' একটা উদাহরণ দি। চরিত্রহীনের মধ্যে চার চরিত্রহীন, সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী এবং দিবাকর। উপন্যাসের প্রায় শেষ অবধি সমাজ এদের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, এদের ভালবাসার এতটুকু মূল্যও দেয় নি। এই তা হলে আমাদের সমাজের সত্যি রূপ। ভালবাসা যত স্বর্গীয়ই হোক তার মর্য্যাদা সে দিতে পারে না। কিন্তু বই-এর শেষে কি হল সেইটে লক্ষ্য করবার জিনিষ। সমাজের প্রতিভূ হয়ে যে উপীনদা তাদের এত নিন্দা করে এসেছে, মরবার সময় সেই আবার এদের মর্য্যাদা এত করে স্বীকার করে গেল কি করে? শরৎবাবু কি বলতে চান যে আমাদের সমাজ বাস্তবিক এই রকম সমঝদার। যদি বলা যায় যে-উপীনদা প্রেমের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিচ্ছে সে সমাজের প্রতিভূ নয়,তাহলেও বস্তুতান্ত্রিক সম্ভাব্যতা দেখতে গেলে এই পরিবর্ত্তন চলে না। আমাদের যে সমাজ তাতে মহত্ত্ব চিরদিনই অনাদরে পড়ে থাকে এইটিই কি বেশী সম্ভব নয়? আসলে এতে লেখকের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে; ফলে বই-এর প্লট তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে

ফেলেছে। এর আগে এক জায়গায় বলেছি শরৎবাবুর প্লটের মধ্যে একজন নির্দ্দেশকের হাত স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়; তার কারণের সন্ধান পাই আমরা এই-খানে, শরৎবাবুর কল্পনাপ্রবণ, স্নেহদুর্ব্বল মনের মধ্যে। বিরাজ বৌতে বিরাজ তো বের হয়ে এল; কুলটা বলে তার নাম তো রটল। এই পর্য্যন্ত জিনিষটা স্বাভাবিক এবং সমাজের দিক থেকে এইটেই সম্ভব। কিন্তু তারপরে বিরাজ বৌ আবার যে তার সত্যিকারের মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, স্বামীর কোলে মাথা রেখে সে যে শেষটায় মরতে পারলে, এটা কখনোই আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির অনুকূলে হয়নি। এই দৃষ্টান্তের তালিকা যত ইচ্ছা বড় করা যায়।

অতি-প্রাকৃতিক অংশও যে শরৎবাবুর মধ্যে একেবারে নেই তা নয়। দেবদাস পার্ব্বতীকে বল্লে যে মরণের আগে ওদের মধ্যে সাক্ষাৎ হবে। বাস্তবিক হলও তাই। সাবিত্রী বলেছিল যে বিপদের সময় যে সতীশের সাম্নে এসে দাঁড়াবেই। বাস্তবিক সতীশ যতবার বিপদে পড়েছে অদ্ভুত উপায়ে সাবিত্রী ততবারই তার সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে শরৎবাবু দেখাতে চেয়েছেন যে ভালবাসার এমন শক্তি যে সময়ে সময়ে তা ভবিষ্যৎবাণী পর্য্যন্ত করতে পারে। কিন্তু ভালবাসার শক্তিকে এতটা বড় করে না দেখালেই সত্যের প্রতি বেশী শ্রদ্ধা দেখান হত। শরৎ-সাহিত্যের এগুলো গ্লানি এবং শরৎবাবুর কল্পনাবাদী প্রকৃতির দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। কিন্তু এক হিসাবে দেখতে গেলে এর স্বার্থকতা আছে। শরৎবাবুর নায়ক নায়িকাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এত উচ্চগ্রামে ওঠে যে তারা যদি তাদের মর্য্যাদা কিছু পরিমাণেও না পেত তাহলে গ্রন্থ-শেষে আমাদের মনে একটা বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্যব্যঞ্জক দুঃখের ভাব থাকৃত, রসানুভূতির পথে জন্মাত দুস্তর বাধা। মর্য্যাদা তারা পায় বলেই বই-এর শেষে আমরা অনুভব করি একটা দুঃখময় পরিতৃপ্তি যার আমদানি হয় এই ধারণার থেকে যে একদিন না একদিন পৃথিবী মহত্ত্বের মর্য্যাদা বুঝতে পারে, যদিও তা অতি দেরীতে। দেবদাস প্রভৃতি যে সমস্ত বইতে ভালবাসা তার সঠিক মর্য্যাদা পায়নি সেখানে এই অভাব পূর্ণ হয়েছে দু'একটা অপ্রাকৃতিক ব্যাপারে, যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এই অপ্রাকৃতিক অংশগুলোর মধ্যে এই ধারণা প্রচ্ছন্ন থাকে যে পৃথিবী ভালবাসার মূল্য বুঝতে না পারুক প্রকৃতি পারে; প্রকৃতি ভালবাসার বাণীকে সত্যময় করে তোলে।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ গোস্বামী

সার্থবাহ

আরবের মরুভূমিতে
সার্থবাহ বণিকের দল চলেছে,
সামরিক পণ্য বিক্রয় তাদের ব্যবসায় ;
উটের মত সহিষ্ণু বাণিজ্য
সূর্য্য ও বালুকার তাপে খুঁজছে
দেশহীন লোভের সিদ্ধি-পথ।

আরবের দুটি রাজ্যে বেধেছে যুদ্ধ ;
আভাস পাওয়া যাচ্ছে অন্তর্বিপ্লবের ;
দুই সীমান্তে বৈশ্যের অর্থময় অস্ত্রের ব্যাপ্তি ;
যুদ্ধে অরে মরুভূমিতে চলেছে
কালান্তিক সঙ্ঘর্ষ,
মহাকালের যেন বিপ্লবের দিকেই পক্ষপাত।

কালকে অতিক্রমের দুরাশায়
সাঙ্ঘাতিক দুঃসাহসের ঋজুতা
বণিকদের বালুকা-সঙ্গীতের পথ বেছে দিল ;
অসহ্য লোভের পঞ্জরাস্থিগুলি
ক্ষুধিত বালুকা নিঃশেষে ফেলল গ্রাস ক'রে
আর মরুভূমির নিশ্চিহ্ন প্রশান্তিতে মিলিয়ে গেল মহাকাল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

ভারতপথে*

(১)

চন্দ্রপুর সহরের একমাত্র বিশেষত্ব মারাবার গুহা, সেগুলিও আবার দশ ক্রোশ দূরে। সহরটি ঠিক গঙ্গার উপর বলা চলে না, গঙ্গা যেন পাশ কাটিয়ে গেছে, আর তারই পাড়ের উপরকার জঞ্জালরাশির সঙ্গে প্রায় একাকার হয়ে রয়েছে দুই মাইল লম্বা এই সহর। নদীর ধারে না আছে বাঁধানো ঘাট, কেন না গঙ্গা নাকি এখানে পূতসলিলা নয়, না আছে দালানপাট বা বেড়াবার জায়গা। সার সার দোকান-ঘর ও বাজারের আড়ালে প্রশস্ত নদীর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য সহর থেকে একেবারে চোখে পড়ে না। রাস্তাগুলো সব ছোট, মন্দিরগুলো নগণ্য, আর কতকগুলো বেশ ভালো বাড়ি থাকলেও সেগুলি হয় বাগানের আড়ালে, নয় এমনি সব নোঙরা গলির মধ্যে, যে নিতান্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া কারও যাবার প্রবৃত্তি হয় না। চন্দ্রপুর কোনো কালেই বড় বা সুন্দর সহর ছিল না। কিন্তু দু শতাব্দী আগে বাদশাহী আমলের হিন্দুস্থান থেকে সমুদ্রকূলে যাবার রাস্তা গিয়েছিল এই সহরের উপর দিয়ে, সৌখিন বাড়িগুলি সব সেই আমলের। এই সৌখিনতা কোনো কালেই বেশি লোকের মধ্যে ছড়ায়নি, কিন্তু যেটুকু ছিল তারও অবসান হয়েছে এক শতাব্দীর উপর। এখন সারা বাজার খুঁজলে একটি ছবি কোথাও মিলবে না, খোদাইর কাজও তথৈবচ। কাঠগুলি পর্য্যন্ত মনে হয় যেন মাটি আর লোকগুলি সব যেন চলন্ত মাটির ঢিবি। এমনি একঘেয়ে কদর্য্য যা কিছু চোখে পড়ে, যে মনে হয় গঙ্গার স্রোত এসে সব কিছু ধুয়ে একেবারে মাটিতে দেবে মিশিয়ে। দুটো একটা বাড়ি পড়ে ধ্বসে, দু'একটা লোক মরে ডুবে, আর তাদের শব থাকে পচতে, কিন্তু সহরটির আকৃতির বিশেষ কিছু বদল হয় না, কোথাও বা একটু কমে, কোথাও বা একটু বাড়ে, কিন্তু খুব নীচু স্তরের জীবের মতন—যার আয়ু কিছুতেই ফুরায় না—একেবারে মাটি আঁকড়ে সহরটি পড়ে থাকে।

নদীর থেকে দূরে সহরের চেহারার কিছু বদল মালুম হয়। চোখে পড়ে

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই এই সংখ্যা হইতে নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ পরিচয়ে সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

ডিম্বাকৃতি একটি ময়দান আর লম্বা গোছের ও শাদা চূণকাম-করা একটি হাঁসপাতাল। রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে উঁচু ডাঙ্গা, তারই উপর সব সাহেব-সুবাদের বাড়ি। নদীর সমান্তরাল রেলের লাইন, ও পারের জমী গেছে তলিয়ে, আবার হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠেছে। এই খাড়া জমীর উপর চন্দ্রপুরের সিভিল ষ্টেশন, অর্থাৎ অফিস, আদালত ও সম্ভ্রান্ত বসতবাড়ির সমাবেশ। এখান থেকে দেখলে চন্দ্রপুরকে দেখায় একেবারে অন্যরকম। এ যেন এক বাগিচা-ঘেরা সহর, কিম্বা সহরই নয়, যেন একটি বন আর মাঝে মাঝে কুঁড়ে ঘর, কিম্বা নদীর ধারের এক প্রমোদ কানন—যা বলো। তাল, নিম, আম ও পিপুল গাছের আওতায় বাজারটি আর চোখে পড়ে না, উল্‌টো দিক থেকে দেখলে আবার বাজারের আড়ালেই গাছগুলি পড়ে ঢাকা। পুরোনো দীঘির জলে পুষ্ট হয়ে বাগানের মধ্য থেকে, কোথাও বা সামান্য একটা মন্দির বা জঙ্‌লা জমী ভেদ করে, উঠেছে এই সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, আলো আর বাতাসের খোঁজে। মানুষ আর মানুষের হাতে-গড়া জিনিষের চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান এরা। নিম্নভূমি ছাড়িয়ে উর্দ্ধে ডালপালা পত্রজালের ইসারা দিয়ে এরা রচনা করেছে পরস্পরের জন্য নিমন্ত্রণ-লিপি আর পাখীদের জন্য একটি সহর। বিশেষ করে বর্ষার পর এরা নীচে যা কিছু ঘটে সব দেয় ঢেকে। কিন্তু সব সময়েই—এমন কি যখন সব পাতা ঝরে পড়ে বা গরমে ঝল্‌সে ওঠে তখনও—উঁচু ডাঙ্গার উপর যে সাহেবদের বাস তাদের চোখে এই গাছগুলির ভিতর দিয়ে সহরটিকে এমনই সুন্দর মনে হয় যে নিতান্ত কাছে গিয়ে না দেখা পর্য্যন্ত তাদের ভুল ভাঙে না।

চন্দ্রপুরের সিভিল ষ্টেশন সম্বন্ধে ভালো মন্দ মনে কোনো ভাবই হয় না। প্ল্যান মোটামুটি ভালোই বলতে হবে। ঠিক মাথার উপর লাল ইঁটের ক্লাব-বাড়ি। কিছু পিছনে একটি মুদির দোকান ও গোরস্থান। রাস্তাগুলি যেন নক্‌সার ছক্‌, ধারে ধারে সব বাংলো। এমন কিছু নেই যা চোখে লাগে, আর সুন্দর দেখবার মধ্যে দূরের দৃশ্য। চন্দ্রপুর সহরের সঙ্গে এই জায়গাটির মিল আদবে নাই বললেও চলে—এক মাথার উপর আকাশ ছাড়া।

মাঝে মাঝে আকাশেরও রূপ যায় বদলে, কিন্তু নদী ও বনের মতন তা অত চোখে পড়ে না। কখনো কখনো মেঘের বিচিত্র নক্‌সা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে; কিন্তু সাধারণত এ যেন এক নানা-রঙ-মেলানো গম্বুজ, তার মধ্যে নীল রঙ হোলো প্রধান। দিনের বেলায়, যেখানে মাটির উপর আকাশ নুয়ে পড়েছে সেখানে,

আকাশের নীল ফ্যাকাশে হয়ে ক্রমে মাটির মতনই শাদা হয়ে যায়। সূর্য্যাস্তের পর চক্রবালের মেখলায় নতুন রঙের ছোঁওয়া লাগে—প্রথমে কমলালেবু, তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে অত্যন্ত স্নিগ্ধ বেগুনি রঙে তা যায় মিশিয়ে। কিন্তু ভিতরকার নীল থাকেই—একেবারে রাত্রি পর্য্যন্ত। তখন এই বিপুল গম্বুজ থেকে ঝাড়ের আলোর মতন ঝোলে অগণিত তারা। এই আলোগুলি থেকে ঐ গম্বুজের ছাদের দূরত্ব এই গম্বুজেরও মাথার উপরে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে যে-দূরত্ব, তার তুলনায় যৎসামান্য। আকাশের নীল যেখানে ফুরিয়ে গেছে তারও উর্দ্ধে বর্ণের অতীত রাজ্যের সেই অসীম দূরত্ব।

সব কিছু নির্ভর করে আকাশের উপর। শুধু আবহাওয়া ও ঋতু নয়—পৃথিবী কোন সময়ে সুন্দর দেখাবে তাও। মাঝে মাঝে শুধু ফুলের ফসল—এই সামান্য উচ্ছ্বাস ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু আকাশের যখন মর্জ্জি হয় তখন চন্দ্রপুরের বাজারের উপর ঝরে পড়ে শ্রী, আর দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে যায় তার প্রসাদ। এত বিপুল, এত বলিষ্ঠ, তাই আকাশের এই ক্ষমতা। প্রতিদিন সূর্য্যের তেজ থেকে আকাশ পায় শক্তি আর দিগন্তপ্রসারী পৃথিবী থেকে পায় তার বিপুলতা। কোথাও এতটুকু পাহাড়ের রেখা পৃথিবীর এই প্রসারকে খর্ব্ব করেনি। যোজনের পর যোজন শুধু সমতলভূমি, হয়তো কোথাও সামান্য একটু উঠেছে, তারপর আবার সমতল। শুধু দক্ষিণে, যেখানে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে কতকগুলি বদ্ধ মুষ্টি ও হাতের আঙুল, সেখানে পৃথিবীর অসীম বিস্তার হয়েছে ক্ষুণ্ণ। এইগুলি হোলো মারাবার পাহাড়—যেখানে আছে আশ্চর্য্য সব গুহা।

(২)

সাইকেল থেকে নেমে চাকরের হাতে সেটি দেবার তর আর সইল না, সুতরাং সেটি ধড়াস করে পড়ল মাটিতে আর সেই সাইকেলের আরোহী লাফিয়ে উঠল বারান্দায়। বয়সে সে যুবক। মুখেচোখে তার উত্তেজনা ফুটে বেরোচ্ছিল। চেঁচিয়ে সে বল্‌ল, 'হামিদুল্লা, হামিদুল্লা, আমার কি দেরি হ'য়ে গেছে?'

'থাক্। দেরি আর তোমার কোন্ সময়ে না হয়!'

'আরে, বলো না। সত্যি দেরি হয়েছে? মামুদ আলি বুঝি সব খেয়ে ফেলেছে। তাহলে না হয় আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখি। মামুদ আলি, সেলাম আলে কম্, খবর কি?'

'খবর আর কি ডাক্তার আজিজ সাহেব, আমি তো মর-মর।'

'বেচারি! খাবার আগেই।'

'আর হামিদুল্লার তো আগেই হয়ে গেছে, তুমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে।'

হামিদুল্লা সায় দিয়ে বল্‌ল, 'একেবারে! আমরা যে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি সে হোলো আর এক রাজ্য থেকে—এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক ভালো।'

'বলি তোমাদের ঐ রাজ্যে হুঁকা টুকো কিছু মেলে?'

'আজিজ, মেলা বক্‌বক্‌ কোরো না আমরা এমন বিষয় কথা বল্‌ছিলাম সত্যি যাতে মন খারাপ হয়ে যায়।'

হুঁকোয় ঠেসে তামাক দেওয়া হয়েছিল—এই বাড়িতে যা দস্তুর—ফলে তার গুড়গুড়িটা শোনাচ্ছিল যেন ঘোঁৎঘোঁৎ। আজিজ একটু তোয়াজ করতে হুঁকোয় যেন প্রাণ এল, আর তার বুকের ভিতর থেকে নাক পর্য্যন্ত বাজারের ভিতর দিয়ে আস্‌বার সময় যে ঘুঁটের ধোঁওয়া গিয়েছিল ভরে, দমকা তামাক ঢুকে দিল তা ঠেলে বের করে। আজিজের মনে হোলো পরম উপাদেয়! নিছক ইন্দ্রিয়-সুখ হলেও তার এই আরামের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর কিছু ছিল না। তার দেহমন হয়েছিল এরই আবেশে আচ্ছন্ন। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেন সে শুনছিল তার দুই বন্ধুর আলোচনা। বিষয়—কোনো সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব কিনা। বিষয়টি তার কাছে কিন্তু খুব মন খারাপ হবার মতন ঠেকল না। মামুদ আলির মত হোলো এই রকম বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। হামিদুল্লা বল্‌ল, সম্ভব, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এত রকম ফ্যাকড়া দেখাল যে শেষ পর্য্যন্ত তাদের আর মতদ্বৈত কিছু থাক্‌ল না। সামনে চাঁদ উঠেছে, বাড়ির ভিতর চাকরেরা খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত, কোথাও কোনো ল্যাঠা নাই। এই সময়ে এই চওড়া বারান্দায় এমনি ভাবে পড়ে থাকা সত্যি পরম উপাদেয়।

"আচ্ছা, আমার আজ সকালের অভিজ্ঞতার কথাই ধরোনা কেন।"

হামিদুল্লা জবাব দিল, "শুধু বিলেতেই তা সম্ভব।" বহুদিন আগে, যখন বিলেত যাবার হুজুগ তেমন ছিল না, হামিদুল্লা বিলেত গিয়েছিল ও কেম্‌ব্রিজে যথেষ্ট আদরযত্ন পেয়েছিল।

"এখানে তা অসম্ভব। সেই নাক-লাল ছোকরা আদালতে আবার আমাকে অপমানিত করেছে। আমি তাকে দোষ দিই না। তার কানে মন্ত্র পড়া হয়েছে

যে আমাকে অপমানিত করা তার কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই তো সেদিন পর্য্যন্ত সে অমন চমৎকার ছিল, কিন্তু এখন সে আসল দলের হাতে পড়েছে।"

"তা ঠিক। এদেশে ওদের আর কোনো উপায় নেই—আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলি। যতই ওরা ভদ্রতা করবে ঠিক করে আসুক না কেন, এখানে এসেই শোনে ওসব চলবে না। এই দেখ না—লেস্‌লি, ব্লেকিষ্টোন, তারপর এবার তোমার ঐ নাক-লাল ছোকরা। এর পর বোধহয় ফিলডিং-এর পালা। টার্টন যখন প্রথম এল—সে আর এক জেলায়—বেশ মনে আছে আমার। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, টার্টনের সঙ্গে গাড়িতে আমি বেড়িয়েছি—সেই টার্টন! এক সময়ে আমার সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। ওর ষ্ট্যাম্প কালেক্‌শন্ পর্য্যন্ত আমাকে দেখিয়েছে।"

"এখন বোধহয় ওর ধারণা তুমি সুবিধে পেলেই তা চুরি করো। টার্টন! কিন্তু ঐ নাক-লাল ছোকরা টার্টনকেও হার মানাবে।"

"না, তা ঠিক মনে হয় না। হরেদরে ওরা সবাই সমান দাঁড়ায়, তার মধ্যে ভালো মন্দ নাই। টার্টনই হোক, বার্টনই হোক—একটা অক্ষরের তফাৎ—সবারই দৌড় দু'বছর। আর মেম সাহেব হলে—ঠিক ছটি মাস। সব ঠিক এক ছাঁচে ঢালা কি বলো?"

মামুদ আলির মন এই তিক্ত আলোচনায় বেশ মজে উঠেছিল, প্রত্যেকটি কথায়ে সে যেমন পাচ্ছিল আমোদ, তেমনি পাচ্ছিল ব্যথা। সে বল্‌ল, 'না, আমি তা বলি না। আমি অন্তত দেখি আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব গভীর রকমের পার্থক্য আছে। ঐ লাল-নেকো করে মিন্‌মিন্, টার্টন-এর কথাবার্ত্তা বেশ স্পষ্টই, টার্টন-গিন্নি ঘুষ নেন আর লাল-নেকোর গিন্নি অবশ্য তা নেন না ও নিতে পারেন না, কেন না আপাতত তাঁর গিন্নি জোটেনি।"

"ঘুষ!"

"জানো না, কি এক খাল টাল হবার সময় ওরা যখন সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়াতে বদলি হয়েছিল, তখন এক রাজা তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাতে জল বয়ে যায় সেই ব্যবস্থার জন্যে ওকে একেবারে আস্ত সোনার এক সেলাইর কল দিয়েছিলেন।"

"জল কি বইছে?"

'না। এইখানেই তো টার্টন গিন্নির কারচুপি। আমরা কালা আদমিরা

ঘুষ নিলে, কাজ হাঁসিল ঠিকমত করি, ফলে ধরাও পড়ি। সাহেবরা ঘুষ নেন, কিন্তু কাজ কিছু করেন না। সাধে কি আমি ওদের তারিফ করি।"

"তারিফ আমরা সবাই করি। আজিজ, হুঁকোটা দাও দেখি।"

"আহা, এখনই কি—সবে বেশ ধরে উঠেছে।"

"তুমি ভারি স্বার্থপর।" এই বলেই হামিদুল্লা হঠাৎ হাঁক দিয়ে চাকরদের বল্‌ল খাবার দিতে। চাঁকরেরা চেঁচিয়ে জবাব দিল, খাবার তৈরি—অর্থাৎ ঠিক না হলেও ঐ সময়েই যে খাবার ঠিক তৈরি থাকবে এই ছিল তাদের অভিপ্রায়—এবং এই সাধু অভিপ্রায় যে সবাই বুঝল তার প্রমাণ, যে যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। হামিদুল্লা আবার কথা সুরু করল কিন্তু তার সুর অন্য রকম, তার মধ্যে আবেগের ভাগ বেশ স্পষ্ট।

"এই ধরোনা—হিউ ব্যানিষ্টার বলে সেই যুবকটির কথা। ওর মা বাবা—রেভারেণ্ড আর মিসেস্ ব্যানিষ্টার—আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিলেতে কি স্নেহ যত্ন যে ওঁদের কাছে আমি পেয়েছি তা' আমি বলতে বা ভুলতে পারি না। একেবারে নিজের মা বাবার মতন। ছুটিতে ওঁদের রেক্‌টারি ছিল আমার নিজের বাড়ির মতন। স্বচ্ছন্দে ছেলেপিলের ভার আমার হাতে দিতেন ছেড়ে—তখন হিউ ছিল এইটুকু, তাকে নিয়ে কত বেড়িয়েছি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ফিউনারেল দেখাতে ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম আর দুহাতে তুলে ধরেছিলাম সেই লোকের ভিড়ের উপর।"

মামুদ আলি আস্তে আস্তে বল্‌ল, "মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া ছিলেন অন্য রকম।"

"শুনছি এখন নাকি এই ছোকরা কানপুরে চামড়ার ব্যবসায় ঢুকেছে। তাকে দেখবার জন্যে যে কি রকম ইচ্ছে হয়—আর রেল-ভাড়া দিয়ে তাকে আনতে যাতে এই বাড়ি তার নিজের বাড়ির মতন হয়। বৃথা ইচ্ছা। সাহেবদের দল বহু আগেই তাকে নিশ্চয় দখল করে বসেছে। সে হয়তো ভাববে, আমার একটা মৎলব আছে। আমার অত দিনের বন্ধুদের ছেলের কাছ থেকে তা' আমি একেবারে সহ্য করতে পারব না। আচ্ছা, উকিল সাহেব, বল তো, এদেশে সব কিছুই কোথায় যেন বিগড়ে গেছে!"

আজিজ বলে উঠল, "সাহেবদের কথা ভেবে লাভ? তাদের সঙ্গে হয় বন্ধুত্ব হতেই হবে, নয় হবেই না—তার কি মানে? ওদের কথা টথা বাদ দিয়ে

বেশ নিজেরা স্ফূর্ত্তি করলেই তো হোলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও মিসেস্ ব্যানিষ্টার এই দুটি ছিলেন ওদের মধ্যে আলাদা—আর তাঁরা তো মারাই গেছেন।"

"না, না, আমি তা স্বীকার করি না, আমি আরও ওরকম দেখেছি।"

মামুদ আলি অপ্রত্যাশিত ভাবে এই কথার সায় দিয়ে বল্‌ল, "আমিও। সব মেয়েরা কখনই এক রকম নয়।"

হঠাৎ সবারই মনে যেন একটা পরিবর্ত্তন এল। স্নেহের, সৌজন্যের ছোটো-খাটো সব ঘটনা ওদের মনে পড়তে লাগল। "কি রকম স্বাভাবিক ভাবে সেই মহিলাটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।" "আর ধূলোয় যখন আমার গলা খুস্ খুস্ করছিল, তখন এক মহিলা আমাকে লবেঞ্চুষ দিয়েছিলেন।" এর থেকেও বড় বড় দৃষ্টান্ত হামিদুল্লার পড়ছিল মনে—নারীদের দেবীত্বের সব নিদর্শন। কিন্তু তার বন্ধু শুধু জানত এদেশী সাহেব মহলকে, তাই অনেক চেষ্টা করে তাকে ছোটোখাটো সব ঘটনা স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে বের করতে হচ্ছিল। সুতরাং এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই যে সে অবশেষে আবার পুরোনো কথায় ফিরে এল ঃ "এসব দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত সুতরাং অগ্রাহ্য। বেশির ভাগ মেয়েই হচ্ছে টার্টন-গিন্নির ছাঁচের এবং এই ছাঁচ যে কি রকম, তা, আজিজ সাহেব, ভালো রকমই জানো বোধ হয়।" আজিজ মোটেই ভালো রকম জানত না, কিন্তু, তবু বলল, 'নিশ্চয়।' তার নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার থেকে সে খুব ব্যাপক মত গড়ে তুলেছিল—পরাধীন জাতির লোকদের পক্ষে এই রকম না করা কঠিন। দু'চারটে দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আর সব মেয়েরাই হোলো উদ্ধত, আর টাকার বশ—এই হোলো তার মত। কথা-বার্ত্তার রস গিয়েছিল উবে, কোনো রকমে একঘেয়ে একটানা সুরে গড়িয়ে গড়িয়ে তা' চলতে লাগল।

চাকর এসে খবর দিল খাবার তৈরি। কেউ কান দিল না। বড় দুইজন তাদের সনাতন পলিটিক্‌স্-এর আলোচনায় গিয়ে ঠেকেছিল। আজিজ গুটি গুটি হাজির হোলো বাগানে। চাঁপা গাছ থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছিল। আজিজের মনে পড়ছিল ফারশি কবিতার সব টুকরো। ওদিকে চাকরেরা খাবারের জন্য তাগিদ দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু আজিজ যখন বাড়ির মধ্যে ফিরল ততক্ষণে মামুদ আলি আবার হয়েছিল উধাও তার সহিশকে কি বলবার জন্যে। "আরে এস না, এই একটু আমার গিন্নির সঙ্গে আলাপ করো", বলে হামিদুল্লা তাকে নিয়ে গেল অন্তপুরে ;

প্রায় বিশ মিনিট সেইখানেই তাদের কাটল। হামিদুল্লা বেগম হতেন আজিজের দূর সম্পর্কের পিসি ও চন্দ্রপুরে তার একমাত্র মেয়ে আত্মীয়। তাঁদের বাড়িতে সম্প্রতি কি একটা ক্রিয়াকাণ্ড যথেষ্ঠ ঘটা করে হয় নি এই নিয়ে তিনি আজিজকে লম্বা এক বক্তিমে শোনালেন। এড়িয়ে আসা মুস্কিল, কেননা যতক্ষণ পুরুষদের খাওয়া না হবে তিনি খেতে বসবেন না, তাই, পাছে ওরা ভাবে যে ওঁর খুব খাওয়ার তাড়া, তিনি কথা আর শেষ করতেই চান না। সেই ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপারটি যে মোটেই ঠিকমত হয়নি, তা ভালো করে আজিজকে সমঝানোর পর তাঁর অন্যান্য পারিবারিক প্রসঙ্গ মনে পড়ল ও তিনি আজিজকে জিজ্ঞাসা করলেন তার বিয়ে কবে।

খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে কিন্তু একটু বিরক্ত হয়ে আজিজ জবাব দিল, "একবার তো হয়েছে, আর কেন ?"

হামিদুল্লা সায় দিয়ে বলল, "কেন আর ওকে জ্বালাও, ওর যা কর্ত্তব্য ও করেছে। পরিবার প্রতিপালন যথাবিধিই করছে—দু দুটি ছেলে আর তাদের এক বোন।"

"আমার স্ত্রী মারা যাবার আগে তার মা'র কাছে ছিল, ছেলেপিলেরাও এখন তাঁর কাছে। বেশ সুখেই তারা আছে, যখন ইচ্ছে আমি গিয়ে দেখি। একেবারে নেহাৎ বাচ্চা সব, পিসি।"

"জানো, ওর মাইনের টাকা ও পুরোটাই ওদের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে থাকে এক কেরাণীর মতন, আর কাউকে তা বলে না। এর বাড়া ওকে আর কি করতে বলো ?"

হামিদুল্লা বেগমের আসল কথাটা ছিল একটু অন্যরকম। ভদ্রতা করে বাজে দু'চারটে কথা বলে তিনি তা পাড়লেন। "যদি ছেলেরা সব বিয়ে করতে না চায় তাহলে আমাদের মেয়েগুলোর দশা কি হবে ? নীচু ঘরে বিয়ে করবে শেষকালে", এই না বলে হামিদুল্লা বেগম ফেঁদে বসলেন তাঁর পুরোনো কাহিনী—বাদশা বংশের এক মেয়ে কিছুতেই নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে বিয়ে করা চলে যাদের তাদের মধ্যে বর খুঁজে পেলেন না, অগত্যা এই ত্রিশ বছর বয়স হোলো তবু তিনি রয়েছেন অনূঢ়া আর আমরণ তাই থাকবেন, কেননা এখন আর কে তাঁকে বিয়ে করবে ? এই শোচনীয় কাহিনী শুনতে শুনতে শ্রোতা পুরুষদ্বয়ের এই স্থির বিশ্বাস হোলো যে সমগ্র সমাজের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। স্বয়ং ভগবান যে সুখের ব্যবস্থা

করেছেন তার থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হবে—এর চাইতে ছেলেরা নয় বহু বিবাহই করুক। বিবাহ, সন্তানপালন, গৃহস্থালির কর্তৃত্ব—এছাড়া মেয়েদের জন্ম কি জন্যে? আর যে পুরুষ এই সব থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে ভগবানের কাছে তার জবাবদিহি হবে কি? "হয়তো····· পরে দেখা যাবে"—এই বলে আজিজ বিদায় নিল। এই রকম অনুরোধের এই ছিল তার একমাত্র জবাব।

হামিদুল্লা বলল, 'যা ভালো বুঝবে তা চটপট করে ফেলবে। আজ না কাল করে করেই তো দেশটা গেল।' কিন্তু এদিকে আজিজের মুখ ভার দেখে সে ভাবল বুঝিবা তার স্ত্রীর কথা আজিজের মনে লেগেছে, তাই সে দু'চারটি মিষ্টি কথায় আজিজকে ভোলাবার চেষ্টা করল।

এদিকে মামুদ আলি পাঁচ মিনিটে ফিরছি বলে তাঁর গাড়ি চড়ে প্রস্থান করেছিলেন আর বিশেষ করে জানিয়ে গিছলেন যে যেন ওঁর জন্যে কেউ বসে না থাকে। অগত্যা ওঁকে ফেলেই সবাই খেতে বসল, অর্থাৎ ওরা দুজন আর মহম্মদ লতিফ নামে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। হামিদুল্লার দাক্ষিণ্যে তার দিন কাটত। বাড়িতে তার পদ ছিল চাকরবাকরের ওপর, অথচ বাড়ির লোকের সমান সমান নয়। কেউ তার সঙ্গে কথা না বললে সে নিজে থেকে কথা বলত না আর কথা যেহেতু কেউই বলছিল না, সেও নির্বিবাদে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে ঢেঁকুর তুলে খাবারের মালমশলার তারিফ করছিল। বেশ নিরীহ গোছের সদানন্দ লোক, বিবেকের বালাই থেকে মুক্ত, সারা জীবন এতটুকু কাজ সে করেনি। কোনো না কোনো আত্মীয়ের বাড়ি যতদিন আছে ততদিন আশ্রয় তার জুটবেই, আর এই বিপুল পরিবারের সকলেই দেউলে হয়ে গৃহহীন হবে এই সম্ভাবনাও ছিল কম। শ'কয়েক মাইল দূরে তার স্ত্রীও ঠিক এই ভাবেই জীবন কাটাত; রেলের ভাড়া অনেক, তাই দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হোতো না। কিছুক্ষণ পরে তাকে আর চাকরদের নিয়ে আজিজ খানিকটা রঙ্গ করল। তারপর সে সুরু করল অনর্গল ফারসি, উর্দ্দু ও অল্পস্বল্প আরবি কবিতা আওড়াতে। মশগুল হয়ে সবাই শুনছিল কেননা কবিতা বলতে তারা বুঝত একটা বারোয়ারি ব্যাপার, একা একা পড়ার জিনিষ নয়। আজিজের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর, আর ঐ অল্প বয়সে সে পড়েও ছিল বিস্তর। তার প্রিয় কবিতার বিষয় ছিল ইস্‌লামের অধঃপতন ও প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব। শুধু কথার পর কথা, কিন্তু ক্রমাগত তা শুনেও ওদের

কারও এতটুকু বিরক্তি হোতো না, বিনা বিচারে ওরা শুনে যেত রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন। হাফিজ, হালি বা ইকবাল—ঐ রকম কোনো একটি বড় কবির নাম থাকলেই হোলো—ভালো কবিতার পক্ষে ওর বাড়া প্রমাণের অপেক্ষা তারা রাখত না। বাইরে নির্বিকার চাঁদের আলোয় সমগ্র ভারতবর্ষ—বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ—সহস্র কণ্ঠের গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের কাছে তখনকার মতন এই বিচিত্র দেশ মনে হচ্ছিল এক ও অখণ্ড ও তাদের একান্ত আপন। বিগত গৌরবের জন্য বিলাপ শুনতে শুনতে তারা যেন সেই গৌরব আবার ফিরে পাচ্ছিল, আর যৌবন-চঞ্চল কবির এই উক্তিতে তাদের মনের মরা গাঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যৌবনের বান। হঠাৎ রসভঙ্গ হল। লাল উর্দি পরা একটি লোক, ওখানকার সিভিল সার্জ্জনের চাপরাশি, ঘরে ঢুকে আজিজের হাতে দিল একটা চিঠি।

"ক্যালেণ্ডার বুড়ো দেখা করতে বলেছে—তার বাংলোয়"—আজিজ ব'সে বসেই কথাগুলো বললে। "দরকারটা কি জানাতে পারত, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও।"

"নিশ্চয় কোনো একটা কেস্।"

"মনে তো হয় না—বোধ হয় কিছুই না। কেমন করে ও জেনে ফেলেছে এই সময়ে আমরা খাই, বাস—ওর প্রতাপ দেখানো চাই তো, সুতরাং বারবার ঠিক ঐ সময়েই ও তলব করবে।"

"তা তো ও করেই থাকে, তবে সত্যি একটা জরুরি কেসও হতে পারে, কে জানে? পান খেয়ে মুখটা একটু ধুয়ে ফেল্লে হয় না?" হামিদুল্লা বুঝেসুঝেই বলল, যাতে সাহেবের হুকুম তামিল আজিজের পক্ষে যতটা সম্ভব মানানসই হয়।

"এর জন্যে যদি দাঁত মাজতে হয়, না হয় নাই খেলাম। আমি হলাম এই দেশের লোক আর পান খাওয়া হোলো এই দেশের রীতি, সিভিল সার্জ্জনকে তা বরদাস্ত করতেই হবে। মহম্মদ লতিফ, ভাই আমার বাইসাইকেলটা দাও তো।"

মহম্মদ লতিফ অর্থাৎ সেই গরীব আত্মীয়টি উঠে পড়লেন। জড়জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন প্রায় নেই এই ভাবে সাইকেলের বসবার জায়গাটা সামান্য একটু হাত দিয়ে তিনি রইলেন ধরে। সাইকেলটি এগিয়ে দিল আসলে একজন চাকর। আজিজ মুখ হাত ধুয়ে মুছে, সবুজ টুপিটা মাথায় দিয়ে এক লাফে সাইকেলে উঠে সোঁসোঁ করে হামিদুল্লার কম্পাউণ্ড থেকে হল উধাও।

"আজিজ, আজিজ, ওহে তড়বড়ে ছোকরা!" আর আজিজ! সে ততক্ষণে প্রচণ্ড বেগে বাজারের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে। তার না ছিল বাতি, না ঘণ্টা, এমন কি থামবার ব্রেক্ পর্য্যন্ত না। কিন্তু যে-দেশে সাইকেল চড়া মানে কোনো রকমে একটির পর একটি লোকের গা বাঁচিয়ে চলা,—এক একটি করে মানুষের মুখ কাছে এগিয়ে আসে, মনে হয় এই লাগল ধাক্কা, অমনি যায় তা মিলিয়ে—এহেন দেশে আবার ওসব ব্রেকফ্রেকের কি দরকার? আর তাছাড়া তখন সহর প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। একটু পরে টায়ার থেকে হাওয়া বেরিয়ে যেতে আজিজ লাফ দিয়ে নেমে টঙ্গার জন্যে হাঁকডাক সুরু করল।

টঙ্গা তো প্রথমে মেলেই না, তাছাড়া বাহনটিকে কোনো বন্ধুর বাড়িতে জমা করে আসতে হবে তো। আরো খানিকটা দেরি হল দাঁত মাজার জন্যে। যা হোক, অবশেষে আজিজ সাহেব সিভিল-লাইন্স্-মুখে গড়গড়িয়ে রওনা হলেন। গাড়ি বেশ দ্রুতই যাচ্ছে মালুম হচ্ছিল। কিন্তু সিভিল লাইন্স্-এ পৌঁছে ওর মন গেল হঠাৎ দমে—কি রকম শুষ্ক মরুভূমির মতন এই সব সাজানো ঘর বাড়িগুলো। রাস্তাগুলো লাঠির মত সোজা, মোড়গুলো একেবারে যেন মেপে বসানো, আর তাদের নাম হয়েছে যত সব বিজয়ী সেনাপতিদের নামে—যে-বেড়া জাল দিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ছেঁকে ধরেছে একেবারে যেন তারই প্রতীক সহরের এই অঞ্চলটি। আজিজের মনে হল সেও এই জালে আটকা পড়েছে। মেজর ক্যালেণ্ডার-এর হাতায় ঢুকে ওর প্রবল প্রবৃত্তি হচ্ছিল গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি পর্য্যন্ত হেঁটে যায়। তার কারণ যে ওর মন একেবারে 'জো হুকুম' ছাঁচের তা মোটেই নয়। আসলে ওর হচ্ছিল ভয়, ওর সূক্ষ্ম চেতনায় ও তা তীব্রভাবে অনুভব করছিল, যে গাড়িতে গেলে হয়তো অপদস্থ হতে হবে। তবু কিন্তু ও জোর করে রইল বসে। এই রকম একটা ঘটনা গত বৎসর ঘটেও ছিল বটে। এদেশী এক ভদ্রলোক কোনো এক বড় সরকারি কর্ম্মচারীর বাড়ি গাড়ি চড়ে যেতে চাকরেরা তাঁকে খেদিয়ে দিয়ে বলেছিল দস্তুর মাফিক আসতে। শত শত কর্ম্মচারীর বাড়ি হাজার হাজার লোক গিয়েছে, তার মধ্যে এই রকম ঘটনা ঘটেছে ঐ একটি। কিন্তু এর খ্যাতি রটিয়েছিল বহুদূর। আবার ওরকম কিছু না ঘটে। তাই শেষ পর্য্যন্ত মনের সঙ্গে একটা রফা করে আজিজ গাড়ি থামাল যেখানে বারান্দা পেরিয়ে আলো এসে পড়ছিল তার ঠিক আগে।

ডাক্তার সাহেব বাড়ি ছিলেন না।

"কিন্তু সাহেব আমাকে কিছু বলতে বলেননি?" চাকরটা বিশেষ গা না করে জবাব দিল "না।" শুনে তো আজিজ একেবারে হতাশ। এই চাকরটাকে বক্‌শিস্ দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, আর এখন তা শোধরাবার উপায় নেই, কেননা দরজার কাছে আরো লোক ছিল। ওর ধারণা হোলো সাহেব নিশ্চয় কিছু বলতে বলে গিয়েছিল, লোকটা কেবল ওকে জব্দ করার জন্যে তা চেপে রাখছে। ওরা তর্কাতর্কি করছে এমন সময়ে ভিতরের লোকেরা বেরিয়ে এলেন—তুটি মহিলা। আজিজ টুপি তুলে নমস্কার করল। প্রথমটি ছিলেন রাতের খানা খাবার সাজে। আজিজের দিকে তাকিয়ে যেই দেখলেন ভারতবাসী অমনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন—সংস্কার যাবে কোথায়? তারপর বললেন, "মিসেস্ লেসলি, টঙ্গাই বটে!"

দ্বিতীয়টি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের নাকি?" ইতিমধ্যে আজিজকে দেখে তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রথমটি জবাব দিলেন, "আরে তর্কে কাজ কি, ভগবান যা জুটিয়েছেন, তা লুফে নাও।" বাস্, তুইজনে চড়ে বসলেন অমনি টঙ্গায়।

"এই টঙ্গা-ওয়ালা; ক্লাব, ক্লাব চল। বোকাটা যায় না কেন।"

আজিজ তাড়াতাড়ি বল, "যাও, ভাড়া কাল পাবে।" তারপর গাড়ি ছুটতে সে খুব সৌজন্য করে ডেকে বলল, "আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।" কে কার কথা শোনে, তাঁরা ততক্ষণ নিজেদের কথায় মশগুল্।

যাক্, শেষ পর্য্যন্ত যা ঘটবার তাই ঘটল—একেবারে মামুদ আলির কথা মাফিক্। ও টুপি তুলে নমস্কার করল, কেউ ফিরেও দেখল না, তার উপর গাড়িটা গেল নিয়ে—কপালের লিখন অপদস্থ হওয়া তার আর নড়চড় নেই। তবু মন্দের ভালো, ক্যালেণ্ডার আর লেস্‌লি বিবি তুজনেই গতরে ভারী, টঙ্গা একেবারে দেবে যাবে—এই ভেবেও একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। এর ওপর ওরা যদি হত সুন্দরী তাহলে বেচারি মুষড়ে যেত। চাকরটার হাতে তুটো টাকা গুঁজে দিয়ে ও আবার জিজ্ঞাসা করল খবর টবর কিছু আছে কি না। সেই এক জবাব, তবে এবার তার সুর খুব নরম। আধঘণ্টা হল মেজর ক্যালেণ্ডার বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

"কিছু বলে যাননি।"

কিছু অবশ্য বলেছিলেন, কিন্তু খুব তা সুশ্রাব্য নয়। চাকরটা ভদ্রতার

খাতিরে তা আর আজিজকে বল্‌ল না। বক্‌শিসের পরিমাণ কখনো হয় অতিরিক্ত কখনো অতি সামান্য—এমন ওজন দরে বকশিস বোধ হয় কেউ কখনো দেয়নি যাতে একেবারে ছাঁকা সত্যি কথা বের করা যায়।

"তাহলে একটা চিঠি লিখে যাব।"

চাকরটা ওকে ভিতরে গিয়ে লিখতে ডাকল। আজিজ মানী লোক, ভিতরে যেতে রাজী হল না, সুতরাং বারান্দাতেই কাগজ কলম এল। ও লিখতে সুরু করল ঃ

"মহাশয়, আপনার জরুরি তলব পেয়ে আমি আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-বোধে তৎক্ষণাৎ ছুটে এসেছি।"

এই পর্য্যন্ত লিখে সে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে বলল, "সাহেবকে বোলো আমি এসেছিলাম, তাহলেই হবে। এই আমার কার্ড রইল। একটা টঙ্গা ডেকে দাও তো।"

"হুজুর, টঙ্গা তো সব ক্লাবে।"

"তাহলে রেলের ষ্টেশনে টঙ্গার জন্যে টেলিফোন করে দাও।"

লোকটা অমনি টেলিফোন করতে যাচ্ছে দেখে ও আবার বলল, "থাক। দরকার নাই, আমি হেঁটেই যাই", এই বলে দেয়াশলাই চেয়ে নিয়ে ও সিগারেট ধরাল।

এই যে সমীহ—একেবারে নিছক পয়সা দিয়ে কেনা, তবু ওর লাগছিল ভাল। যা হোক, যতদিন হাতে টাকা আছে ততদিন তো টিঁকবে।

কিন্তু এই ফিরিঙ্গি মহলের ধূলো পায়ের থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে ও হয়েছিল অস্থির। একবার এই জাল কেটে বেরোতে পারলে হয়, তারপর এমন জায়গায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে, যেখানকার চালচলন ধাতে সয়। কোনো দিন হাঁটে না, কিন্তু আজ আজিজ হাঁটতে সুরু করল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ভিক্তর জাক্‌মোঁ

(১৮০১-১৮৩২)

বিগত শতকের প্রথম ভাগে একজন ফরাসী পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসেন, তাঁর নাম ভিক্তর জাক্‌মোঁ (Victor Jacquemont)। জাক্‌মোঁর নাম অনেকের নিকটই অপরিচিত; তার কারণ তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, আর তখনকার ভারতীয় ইউরোপীয় সমাজে এ জাতীয় লোকের বিশেষ আদর ছিল না। জাক্‌মোঁ ১৮২৯ সালের ৫ই মে কলিকাতায় পৌঁছেন এবং এদেশে নানা স্থানে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শেষ করে ফিরবার পথে ১৮৩২ সালের ৭ই ডিসেম্বর বোম্বেতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর।

পারিস সহরে Jardin des Plantes নামক এক 'চিড়িয়াখানা' আছে। তার এক প্রান্তে প্রাণীতত্ত্ব আলোচনার জন্য যে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানের এক প্রবেশ দ্বারের নিকট এখনো জাক্‌মোঁর স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে—

"Victor Jacquemont, voyageur du Museum d'Histoire Naturelle, ne a Paris le 8 Aout 1801, mort a Bombay le 7 Decembre 1832…"

জাক্‌মোঁ ১৮০১ সালে পারিসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা Venceslas Jacquemont ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্য ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসেও তাঁর নাম অজ্ঞাত নয়। তিনি প্রথমে জিরোন্দিস্ত (Girondist) দলভুক্ত ছিলেন। পরে তিনি নেপোলিয়নের অধীনেও নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরাগভাজন হয়ে কিছুকাল তাঁকে কারারুদ্ধও থাকতে হয়েছিল। এই কারণে ভিক্তর অল্পবয়স হতেই নেপোলিয়নকে বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্তেন্দাল (Stendhal) ছিলেন ভিক্তর জাক্‌মোঁর বিশেষ বন্ধু। নেপোলিয়নের সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যে সব চিঠি বিনিময় হয়েছিল তা থেকেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ছাত্রাবস্থাতেই ভিক্তরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই তিনি সহপাঠীদের নিয়ে Societe d'histoire Naturelle de Paris নামক সমিতি স্থাপন করেন এবং সে সমিতি এখনো বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করে ভিক্তর প্রথমে আমেরিকায় যান। সেখানে অল্পকাল অতিবাহিত কববার পর ১৮২৭ সালে ফ্রান্স থেকে বৃত্তি পেয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষে থাকবার সময় তিনি যে দিনপঞ্জী রাখেন এবং বন্ধুবান্ধবগণকে যে সব চিঠিপত্র লেখেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তা' থেকে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে নানা খবর পাওয়া যায়।

ভিক্তর প্রথমেই কলিকাতা আসেন। তিনি লণ্ডন হতে যে সব চিঠিপত্র আনেন তাতে তিনি লর্ড ও লেডি বেণ্টিঙ্ক, হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর চার্লস গ্রে, ও অন্যান্য বিচারপতি, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, চার্লস মেটকাফ্ প্রভৃতির সহিত অচিরেই পরিচিত হয়ে পড়েন।

ভিক্তর কলিকাতায় প্রায় ৬ মাস ছিলেন, কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বোটানিকাল গার্ডেন্সে (Botanical Gardens) তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা। এই সময়ে তিনি যে দিনপঞ্জী রেখেছিলেন তা থেকে কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয়ে যে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে তা' বলাই বাহুল্য।

তৎকালীন ভারতীয় ইংরাজসমাজ একটু অস্বাভাবিক ছিল। ভিক্তর বুঝেছিলেন যে কলিকাতার আবহাওয়ায় দেশীয় লোকদের মত না থাক্‌লে কেউ বাঁচতে পারে না; এবং তিনি নিজেও প্রায় সেই ভাবে চলতেন। তিনি এক স্থানে বলছেন—"কিন্তু আমার পরিচিত লোকেরা আমার কথায় কান দেয় না। তারা দিনে তিনবার খাবে, এবং স্পেন ও পোর্ত্তুগালের সব চাইতে কড়া মদের সঙ্গেও কিছুতে জল মেশাবে না। তার পর সন্ধ্যায় যখন হাওয়া একটু স্নিগ্ধ হয় তখন এরা সকলেই ঘোড়ার চড়ে automaton এর মত একঘণ্টা ছুটোছুটি করে। পরে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে বাড়ী ফিরে রাতটা হাল্‌কা করবার জন্য প্রায় দুঘণ্টা খাওয়া চালায়। ইংরাজদের manliness দেখাবার এই চেষ্টার মধ্যে একটা বড় রকম আহাম্মকী আছে। আর তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সারাদিন যে বিরাট আয়োজন চলে সেটাও

হাস্যকর” (Il y a un tres grand fond de betise dans cette exhibition de *manliness* que les Anglais se croient obliges de faire. Elle contraste bien ridiculement avec la multitude encombrante de rechrches somptueuses necessaires a leur confort).

এ রকম ঠাট্টা আরও অনেক আছে। একবার তিনি লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে গীর্জায় উপাসনায় যান। এই উপাসনার বর্ণনায় তিনি বলেছেন—“গীর্জার মধ্যে পুরোহিত ও তার সঙ্গীদের এবং গ্যালারিতে উপস্থিত লোকদের হাওয়া দেবার জন্য ছাদ থেকে মারাত্মক রকম পাখার সারি ঝুলছে।. প্রায় চল্লিশ জন পাল্কী বেয়ারা সাদা পোষাক পরে ও পাগড়ী মাথায় দিয়ে পাখাগুলি টানছে কিন্তু একটুও শব্দ হচ্ছে না। মোটের উপর ব্যাপারটা জমকালো কিন্তু উপসনার উপযোগী নয়। বিরাট সাদা রঙের ডানাগুলো একবার পুরোহিতের মুখ ঢেকে ফেলছে একবার তাঁর সঙ্গীর মুখ ঢেকে ফেলছে আর পুণ্যার্জ্জনের চেষ্টাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে” (Ces grandes ailes blanches, qui ont l'air de se jouer dans l'air et dont les balancements periodiques manquent et decouvrent tour a tour l'officiant a son pupitre, le predicateur dans sa chaire doivent impatienter vivement la piete qui cherche a s'enfoncer dans la priere).

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত আলাপ হয় তাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই আলোচনা হতে বোঝা যায় যে ভিক্তরের এ সম্বন্ধে বিশেষ দূরদৃষ্টি ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে জাক্‌মোঁ তাঁকে বলেন “এই বিপুল দেশের অধিবাসীদের কি প্রভূত উপকারই না আপনারা করতে পারেন”।

এর উত্তরে বেন্টিঙ্ক বলেন—“সে উপকার করতে আমরা অসমর্থ। আমাদের সামরিক শক্তি আছে। কিন্তু তা দিয়ে কোন জাতির মানসিক পরিবর্ত্তন আনা যায় না।···ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসনের যে সব সুবিধা গ্রহণ করেছে তা নঙর্থক। তাদের এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছি। এ শক্তি রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু তাদের উন্নত করায় আমাদের কোন

লাভ নাই।” (Nous leur avons apporte de la securite pour leur personne et leurs proprietes. La force pour leur garantir la paisible jouissance de ces biens nous suffit, mais pour les ameliorer elle ne nous sert de rien).

জাকমেঁা মনে করেছিলেন যে লর্ড বেন্টিঙ্কের মত উদারচেতা লোক মনে মনে ভাতরবর্ষে কোন বড় রকমের বিদ্রোহ অপছন্দ করেন না। ইউরোপীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রচলন হলে যে সে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধে জাক্‌মেঁার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। (Elle se fera par l'education europeenne donnee aux natifs des bas age).

এর কিছুদিন পরেই জাকমেঁা তাঁর পিতাকে চিঠি লেখেন, তাতেও একই কথা বলেছেন—“বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান কোন দিনই হবে না। শতদ্রু কিংবা সিন্ধুনদের তীরে যে বহিঃশত্রুর সমাবেশ হতে পারে ইংরাজের তার চাইতে সামরিক শক্তি অনেক বেশী। কিন্তু ইংরাজের এই সামরিক শক্তির পেছনে রয়েছে নৈতিক শক্তি, আর সে শক্তি বর্ত্তমানে প্রবল। খাম-খেয়ালীতে সে শক্তি কক্ষচ্যুত হতে পারে। এবং তা হলে সমস্তই বিনষ্ট হবে। তাকে বিনষ্ট করতে পারে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শক্তির নূতন উদ্বোধন। সে উদ্বোধন দুদিনেও ঘট্‌তে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়না যে তা একশো বৎসরের পূর্ব্বে ঘট্‌বে। (Mais leur force materielle n'a d'autre base qu'une force morale aujourd'hui tres puissante, mais qu'une caprice peut ebranler. Alors tout croule a la fois ! Quel evenement produira ce choc ? Le reveil de l'esprit religieux, sans doute ; cela pourrait etre demain comme cela n'arrivera peut etre pas avant un siecle).

কলিকাতার কাজ শেষ করে ভিক্তর উত্তর ভারত যাত্রা করেন। তাঁর সংকল্প ছিল হিমালয়ের বনজঙ্গলে নানা গাছগাছড়ার অনুসন্ধান করা। কলিকাতা হতে সিমলা পর্য্যন্ত যেতে তিনি যে পথ ধরেছিলেন সে পথের উল্লেখও তাঁর দিনপঞ্জীতে আছে। পথে যে সমস্ত স্থানে তিনি কিছুকাল ধরে অবস্থান করেছিলেন সে সকল স্থানের নাম—হুগলি, বর্দ্ধমান, দিগনগর, রঘুনন্দপুর (?), হাজারিবাগ,

সাসারাম, বেনারস, রেওয়া, লোহারগাঁ, পান্না, অজয়গড় (?), কালিঞ্জর, হামীরপুর, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, সিমলা ও কানাওয়ার। বেনারসে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রিন্সেপ্‌সের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের দিকে জাক্‌মোঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, সেইজন্য তাঁর দিনপঞ্জীতে তাজমহল ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের অন্য কোন নিদর্শনের উল্লেখ নাই অথচ তিনি পথে অনেক প্রাচীন মন্দিরই দেখতে পেয়েছিলেন।

কানাওয়ার হতে হিমালয়ের অন্তঃপাতী অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য যান। কান্নম নামক স্থানে এক তিব্বতী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় তিব্বতী পণ্ডিত কোরোসের (Csoma de Koros সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কোরোস তখন সেখানে তিব্বতী লামাদের সঙ্গে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য অনুশীলন করছিলেন। কোরোস পরে কলিকাতায় আসেন এবং ইংরেজীতে তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের খসড়া প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম তিব্বতী ভাষার অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করেন। জাক্‌মোঁ হিমালয়ের অন্তঃপাতী যে সকল স্থানে ভ্রমণ করেন তার উল্লেখ তাঁর দিনপঞ্জীতেই রয়েছে—চিনি, কোতি, রোন্নাং, হাঙ্গারোং, গুতোং বিকুর, লারি ইত্যাদি। এই সকল স্থানে তিনি ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌-তত্ত্বের অনুশীলনের জন্য বহু উপাদান সংগ্রহ করে সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সিমলা হতে জাক্‌মোঁ এবার নূতন পথে লাহোরের দিকে যাত্রা করলেন। সিমলা ছেড়ে পথে তিনি দু'দিন শিরমুরের রাজার অতিথি ছিলেন। শিরমুরের রাজার বয়স মাত্র ২২ বৎসর, দেশীয় পোষাকে তাঁকে সুন্দর মানিয়েছিল। সত্যকার রাজোচিত স্বভাব, সহৃদয় এবং সদালাপী। এই সব কারণেই জাক্‌মোঁ তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

এর পর নানা স্থান ঘুরে জাকমোঁ অবশেষে লুধিয়ানায় এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে লুধিয়ানায় আফগানিস্তান হতে বিতাড়িত আমীর শা' সুজা কোম্পানীর বেতনভোগী হয়ে অবস্থান করছিলেন। শা সুজাকে দেখে জাকমোঁ যে কতটা মুগ্ধ হয়ে পড়েন তা তাঁর বর্ণনা হতেই বোঝা যাবে। "এই বিতাড়িত সম্রাটের চাইতে আর বেশী রাজকীয় হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। শা' সুজার চরিত্রে এতটুকুও দম্ভ বা আড়ষ্টতা নাই, ব্যবহারেও কোন কৃত্রিমতা নাই। তাঁর পোষাক খুব জম-

কালো না হলেও সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত। মাথার পাগড়ী কাশ্মীরী শালের, আর সে শালের রঙ ও শিল্প নিখুত। গায়ের রঙ স্ফটিকের মত ধবধবে সাদা।" শা সুজাকে দেখবার পর তিনি দেশে যে চিঠি লেখেন তা প্রকাশিত হয়েছে। "এ লোক যদি কোন দিন পারিসে যায় তাহলে ফরাসীরা একে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে আর এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যে নেশানেল গার্ড ডাকলেও লোক হঠানো যাবে না।" এর কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে সিংহাসন-চ্যুত মোগল সম্রাট শা' মোহম্মদকে দেখেও জাক্‌মেঁা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

লুধিয়ানা হতে জাকমেঁা লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রণজিৎসিংএর সঙ্গে দেখা করা। রণজিৎসিংএর দু'জন ফরাসী সেনাপতি ছিল। তাঁদের নাম আলার্ (Allard) ও ভেন্তুরা (Ventura)। তাঁরাই জাক্‌মেঁার সন্ধান পেয়ে তাঁকে লাহোরে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। রণজিৎসিংএর সম্বন্ধে জাক্‌মেঁা একটি বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সে পরিচয় বারান্তরে দেওয়া যাবে।

জাকমেঁা সহৃদয় পর্য্যটক ছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষে যা কিছু দেখে ছিলেন তা' ঠিক বিদেশীয় চোখে দেখেন নাই, তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্যই এক সময়ে কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে বাঙ্গালী মেয়েদের পূজাও তাঁর চোখে ভাল লেগেছিল। তিনি বলেছেন—"গঙ্গার স্রোতে মেয়েরা কলার পাতে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। মেয়েদের চেহারা পুরানো গ্রীক মূর্ত্তির কথা খানিকটা মনে করিয়ে দেয়। যতক্ষণ না ফুল স্রোতের মধ্য অদৃশ্য হচ্ছে ততক্ষণ তারা তার দিকে চেয়ে আছে। হয় ত তাদের এই পূজার পেছনে আছে কুসংস্কার এবং ভাসমান ফুলের সঙ্গে আছে আশা ও নিরাশার ইতিহাস জড়িত। কিন্তু কোনো পূজা কি বেশী সুন্দর হতে পারে?"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

দীপান্বিতা

দুদিনের জন্যে এসেছিলেম। বহুদূরের পথ,
এবার বিদায় নিলেম অনেক দিনের মেয়াদে।
কাছে এসে চিবুক তুলে ধরলেম
বিদায় চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাবো,
হাসিমুখ আচম্বিতে সরিয়ে নিলে।
নতুন বর্ষার স্রোত আর বাধা পেল না।
ক্লান্তবর্ষণ শ্রাবণের আকাশে তখন
আলোতে বৃষ্টিতে ঝিকিমিকি।

বছর প্রায় ঘুরে এল। বৈশাখের রক্তঝরা দিন
যতদূর দৃষ্টি চলে, ঝল্‌সে যাওয়া প্রান্তর।
যেন পঙ্গপালের দল মাটির শেষ শ্যামলতাটুকু
শুষে নিয়ে দুর্ভিক্ষভূমি করে চলে গেছে দূরান্তরে।
তৃষাতুর মহিষগুলো শুকিয়ে যাওয়া নদীর গর্ভে
মুখ ঢুকিয়ে পড়ে আছে। গভীর তলে জলের গন্ধ
হয়তো পেয়েছে। অগ্নিবর্ষী আকাশ দাক্ষিণ্যে মুক্ত হস্ত।
মাঝে মাঝে পত্রবিহীন পলাশ ও অশোক,
আপন রক্তিম অজস্রতায় উষর বৈশাখের
পটভূমিকা সৃজন করেছে।

পাহাড়ের ধারে
অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় আমার ছোট বাংলো।
পাহাড় কেটে সেখানে চলেছে খনির কাজ।

জান্‌লা দিয়ে দেখি, শাবল দিয়ে কেটে তুল্‌ছে লোহা,
পুরুষেরা ঝুড়ি করে কুলীমেয়ের মাথায় দেয় চাপিয়ে।
আর দেখি, সাওতাল মেয়ের খোঁপায় অশোক-মঞ্জরী,
লালমাটি শালমহুয়ার দেশ।
রোমান্টিক উন্মাদনায় দিন কেটে চলেছে,
অবসর সময়ে একাকী বনে বনে ঘুরে আসি।
পাহাড়ের মাথায় দেখি রঙীন সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত।

গভীর রাতে শালফুলের তরলমদির গন্ধে
ঘুম ভেঙ্গে যায়। হাল্‌কা জ্যোৎস্নায় ঢাকা প্রান্তর ;
ছায়াচ্ছন্ন নির্জ্জনতায় বনভূমি প্রথম রাতের ঘুমের মত তন্দ্রামগ্ন,
আর একঘেয়ে পাহাড়ে নদীর কলকল শব্দ।
চেয়ে দেখি, দূরে বহুদূরে দিগন্তের ধূসর পাহাড়ে
আগুন লেগেছে। দীপান্বিতার উৎসব আজ সেখানে।
বহুদিনই দেখেছি, আজ আবার নতুন করে দেখলুম।
মালার মতো জড়িয়ে রেখেছে বুকের পরে
দিনের পর দিন অতন্দ্র আগুনের মহোৎসব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সোম-লতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

বিনোদিনীর মন ভালো নেই। কি যেন তার হয়েছে, কোনো কাজেই মন বসছে না। সমস্ত মন সারাক্ষণ কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না। যা পাচ্ছে তা হারিয়ে ফেলছে, আবার খুঁজছে। কি যেন একটা বড় কথা তার মনে এসেছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। আঁকু পাঁকু করছে। ছ'মাস হল, সে গৃহত্যাগ করেছে, কিন্তু এত বড় শূন্যতা আর কখনও অনুভব করেনি।

স্বামীর ভালোবাসায় সন্দেহ করার পথ তার নেই। কিন্তু কী তাকে সে দিয়েছে? ভালোবাসা? কে জানে! বিনোদিনী ভাবতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ভালোবাসার রূপ সে কল্পনা করতে পারলে না। কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। সর্ব্বনাশ! স্বামীকেও কি তবে সে ভালোবাসতে পারেনি! তাকেও কি সে ঠকিয়ে এসেছে? শুধু তাকে দিয়েছিল গুটি দুই সন্তান, এবং গৃহনির্ম্মাণের একটুখানি অবসর? কিন্তু তাও বা রইল কই? পিতার কাছ থেকে সন্তানকে সে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঘর দিয়ে এসেছে টুকরো টুকরো করে ভেঙে।

বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। হাতের কাজ ফেলে বুক চেপে সে দাওয়ায় এসে বসল।

ওর রক্তহীন, বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ওর মায়ের ভয় হল আবার ফিট হবে না কি?

জিজ্ঞাসা করলে, হাতের কাজ ফেলে অমন গিয়ে বসলি যে? শরীর খারাপ করছে না কি?

কারও কথার জবাব দিতে বিনোদিনীর বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। সংক্ষিপ্ত ভাবে বললে, হুঁ।

—তবে আর উঠিস না। ওইখানে একটা বিছানা করে দিচ্ছি শুয়ে থাক।

কিন্তু বিনোদিনী আর বিছানার প্রয়োজন বোধ করলে না। মেঝের উপরই আপাদমস্তক কাপড় ঢেকে চুপ করে শুয়ে রইল। মা শিয়রে বসে কপালের উত্তাপ

পরীক্ষা করলে। জ্বর নয়। ফিটও নয়, বিনোদিনী নিঃশব্দে শুয়ে রয়েছে। তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জন্য তিরস্কার করতে করতে মা অবশেষে উঠে গেল।

শীত মন্দ পড়েনি। দাওয়ায় রোদও এসেছে প্রচুর। নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে বিনোদিনীর বেশ লাগছিল। অলসভাবে শুয়েই রইল।

নয়নতারাও বকতে লাগল। গত রাত্রে স্বামীর সঙ্গে একটা রূপার পৈঁছা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার তুমুল কলহ হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ নিদ্রার পরেও সে ঝাঁঝ এখনও যায়নি। বিনোদিনীর অসুস্থতার সমস্ত অপরাধ সে অনুপস্থিত নিতাইপদর উপর চাপালে :

—হবে না? মানুষের শরীর তো বটে! ভায়ের জন্যে খেটে খেটেই গেলেন! ভাই কিন্তু ঠিক আছে!

বিনোদিনীর কিন্তু এ সব কিচকিচি ভালো লাগছিল না। সে একটু নিরিবিলি চায়। নিজের সম্বন্ধে তার কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে,—নারীজীবন সম্বন্ধেই। এত বড় অভিশপ্ত জীবন আর হয় না। সেই অভিশাপ সে নিজেও বহন করে, অন্যের জীবনেও ছড়িয়ে দেয়।

নয়নতারা তখনও বকছিল :

—নিশ্চয় ম্যালোয়ারি। ঘরে ঘরেই ওই রোগ হচ্ছে কি না। আমরাই বাকি ছিলাম, এবার তাও হল। ডাক্তার ডাকা মিছে, দুটো কুনিয়ানের বড়ি খেলেই বিকেল বেলায় জ্বর ছেড়ে যাবে। তারপরে ভাত-ডাল যা খুশী তাই খাও।

এসব কিন্তু বিনোদিনীর কানে আর ঢুকছিল না। তার মনে পড়ছিল সর্ব্বহারা হারাণের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। মনে পড়ছিল, কুণ্ঠিত গৌরহরির বেদনার্ত্ত, কাতর মুখ।

ম্লান হেসে গৌরহরি সেদিন বলেছিল, আমার ওই রকমই অদৃষ্ট কি না। পাই কিন্তু ধরে রাখতে পারি না।

বেচারা গৌরহরি! পেয়ে হারাণো না পাওয়ার চেয়ে দুঃসহ। সেই দুঃসহ দুঃখ-দহনের চাপ ওর সমস্ত মুখে-চোখে, কথায়-বার্ত্তায় পরিস্ফুট। ওর অদৃষ্টে কেবলই শক্ত মেয়ে পড়ে।

এই পরিহাস বিনোদিনী নিজেই একদিন করেছিল। আজ আর কিন্তু হাসতে পারলে না।

শক্ত মেয়ে! হ্যাঁ, সে নিজে খুবই শক্ত মেয়ে। কিন্তু তাতে কি হ'ল? কি পেলে? শুধু যে অপরকেই সে দুঃখ দিয়েছে তা তো নয়; নিজেও সে কম দুঃখ পায়নি। তাই যদি হয়, তাহলে এ শক্তির মানে কি? কোথায় এর স্বার্থকতা? কী লাভ?

বিনোদিনীর নিঃশ্বাস যেন টেনে ধরল। চুপ করে অসাড় হয়ে সে পড়ে থাকবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ তার মনে হল, গৌরহরিকে সে আবার নতুন করে ভালোবেসে ফেলেনি তো?

মনে হতেই তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার মতো হল।

…সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ না?…সে না সন্তানের জননী?…

বিনোদিনী আর সইতে পারলে না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

দুপুর বেলা একটু জ্বরের মতোই হল।

একদিনের জ্বরে, বিশেষ স্ত্রীলোকের জ্বরে ডাক্তার ডাকার প্রথা বাংলার পল্লীগ্রামে বোধ করি কোথাও নেই। অন্তত এখানে নেই। ডাক্তার একজন আছেন বটে, কিন্তু পাশ করা নয়। কোথায় একজন ডাক্তারের কাছে কিছুকাল কম্পাউণ্ডারী করে এখানে এসে বসেছেন। সে বহুকাল আগের কথা। এই দীর্ঘকাল চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ভদ্রলোক পশারও জমিয়েছেন মন্দ নয়। পশার না জমারই বা কারণ কি? রোগী ভালো হলে সে যশ নিশ্চয়ই চিকিৎসকের প্রাপ্য আর ভালো না হলে দোষ অদৃষ্টের,—এ সুশিক্ষা এ দেশের আছে। বিশেষ এই ডাক্তারটির অর্থ-লোভ অত্যন্ত কম। ফি ব'লে কোনো ব্যাপারই নেই। রোগী সেরে গেলে দু'টাকা, এক টাকা, আট আনা, চার আনা, এমন কি ক্ষেতের বেগুন-মুলোটা—যে যা দেয় খুসী মনেই তিনি তা গ্রহণ করেন। এই দুর্গত দেশের পক্ষে সে একটা কম সুবিধা নয়।

বিকেলের দিকে জ্বরটা বাড়তে আরম্ভ করল। রাত্রে এত বাড়ল যে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। ভোর বেলায় জ্বর অনেক কম পড়ল এবং বেলা আটটা-ন'টার মধ্যে সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল।

নয়নতারা সগর্বে বললে, আমি তখনই বলেছিলাম, ও ম্যালোয়ারী ছাড়া কিছু নয়। দুটো কুনিয়ানের পিল দাও, সাত দিনের মধ্যে আর জ্বর আসবে না।

তাই দেওয়া হল। ডাকঘর থেকে কুইনিনের পিল এনে খাইয়ে সবাই অষ্টম দিনের প্রতীক্ষায় রইল।

মেনী কাল সকাল থেকে সেই যে মায়ের কাছে এসে বসেছে, খাবার সময় ছাড়া আর ওঠে নি। মায়ের অবস্থা দেখে মুখখানি তার এতটুকু হয়ে গেছে।

বিনোদিনী শুয়ে শুয়েই সস্নেহে তার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলোল। বললে, এখানে চুপ করে বসে আছিস কেন? খেলতে যা।

মেনী কিছুই বললে না। ফ্যাল ফ্যাল করে নিঃশব্দে মায়ের দিকে চেয়ে রইল।

—রোগীর কাছে বসে থাকে না। খেলতে যাও।

মেনীর চোখ ফেটে জল আসছিল। কিন্তু কাঁদলে না। সে যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। ওঠবারও লক্ষণ দেখালে না।

বিনোদিনী ওর ললাটের উপর ঝুলে-পড়া চুলগুলি ঠিক করে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, হাবল কোথায় রে।

—জানি না।

নিতাইপদর বালকপুত্র বাইরে দাওয়ায় বসে কতকগুলো খালি দেশলায়ের বাক্স নিয়ে রেলগাড়ী তৈরী করছিল। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে বললে, আমি জানি। ডেকে আনব?

বিনোদিনী হেসে তার গাল টিপে দিলে। বললে থাক।

—কাছেই আছে, পিসি।

—কোথায়?

—পালের পুকুরে। লোপা দিয়ে মাছ ধরছে। ডাকব?

—থাক।

হতাশ হয়ে কেষ্ট পুনরায় গিয়ে কুটীর-শিল্পে মনোনিবেশ করলে।

মেনী বললে, দাদা কাল থেকে একটি বারও তোমার কাছে বসেনি মা।

বিনোদিনী হাসলে। বললে, কোথায় ছিল?

—কে জানে?

—তুমি সমস্তক্ষণ বসেছিলে?

সস্মিত বিনয়ে মেনী মায়ের বুকে মুখ লুকাল।

বাস্তবিকই অসুখের সময় হাবলকে সে একটি বারও দেখেছে বলে মনে করতে পারলে না। ও ওইরকমই। কেবল উড়ে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু ওকে একবার দেখবার জন্যে বিনোদিনী মনে মনে ছট ফট করছিল।

দেখা হল জল খাবার বেলায়। তখন বিনোদিনীর জ্বর ছেড়ে গেছে। ঘরের মধ্যে আর সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছিল না। আস্তে আস্তে দাওয়ায় এসে বসল। দেখে, ভাঁড়ার ঘর থেকে আঁচলে করে মুড়ি নিয়ে নামছে। ওর চোখে চোখ পড়তেই হাবল লজ্জিত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

অসুখ একদিনের সত্যি, কিন্তু বিনোদিনী অসম্ভব রকম দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। চোখের ইসারায় হাবলকে সে কাছে ডাকলে। কিন্তু সে যেন তা দেখতেই পেলে না, এমন ভাবে হন হন করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বিনোদিনী আপন মনেই হাসলে।

রোগীর সম্বন্ধে হাবলের অসম্ভব রকম ভয়। অত্যন্ত প্রিয়জনের প্রেতাত্মার সম্বন্ধে মানুষের যে ভয় থাকে, সেই রকম। এ ভয় তার হয়েছিল হারাণের অসুখের সময়। ঘরে আর কেউ ছিল না। বাপের বিছানার অদূরে ব'সে হাবল আপন মনে খেলা করছিল। বিকারের ঘোরে হারাণের মুখ দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে উঠল এবং অদৃশ্য কার উদ্দেশে এমনভাবে সভয়ে চীৎকার করতে লাগল যে, হাবল ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। রোগীর সম্বন্ধে সেই থেকে তার ভয়।

সেই কথা মনে ক'রে বিনোদিনী হাসলে।

হঠাৎ কি ভেবে সে ঘরে এল। চুপি চুপি টিনের পেটারীটা খুললে। পুরিয়ায় মোড়া ছোট বাবাজির দেওয়া অব্যর্থ ঔষধ যথাস্থানেই রয়েছে। একটা নতুন মাদুলীও আছে। কি একটা প্রয়োজনে হাবলের জন্যেই হোক, আর হারাণের জন্যেই হোক, কিছুকাল আগে একটা তামার মাদুলী তৈয়ারী করা হয়েছিল। মাদুলীটা তখন আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু বিনোদিনী সঞ্চয়ী মেয়ে,—কোন জিনিসই ফেলে না। দেখলে পেটারীর মধ্যে সেটাও রয়েছে। কিন্তু ঔষধটা মাদুলীতে পুরতে গিয়ে তার মনে হ'ল, অমাবস্যার রাত্রে পূর্ব্বমুখে একটা ডুব না দিয়ে তো ধারণ করা যাবে না। অমাবস্যার তো এখনও দেরী আছে।

বিনোদিনী ঔষধটা পূর্ব্বস্থানে রেখে, বাক্স বন্ধ ক'রে আবার দাওয়ায় এসে বসল।

এই ক'দিন নিতাইপদ খুব ব্যস্ত। তার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুৎ নেই। কখন বাড়ী আসছে, আর কখন যাচ্ছে, তার ঠিকানা নেই।

এবারে বৃষ্টিটা হয়েছে প্রয়োজনাতিরিক্ত। ধান পেকে গেছে বটে, কিন্তু জমি এখনও শুকোয়নি ব'লে ধান কাটার অসুবিধা হচ্ছে। অথচ মানুষের অভাব অত্যন্ত বেশী। ধানের ক্ষতি হচ্ছে দেখেও নিতান্ত কাছের কাচি জমির ধান ঘরের খোরাকের জন্যে কাটতেই হচ্ছে। নিতাইপদকেও তাই করতে হয়েছে। সে অবশ্য ক'দিনের মামলা! ছোট জমি,—নিজেই ধান কেটেছে, নিজেই মাথায় ক'রে নিয়ে এসে পিটিয়েছে। যা ধান পেয়েছে, তাতে এ মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা মামলা এসে নিতাইপদর ঘাড়ের উপর প'ড়েছে। মামলাটা অবশ্য আকস্মিক নয়। নিতাইপদর পরামর্শেই এ নিয়ে কিছুকাল থেকে তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু মামলাটা হয়েছে সম্প্রতি।

এই গ্রামের হরেন্দ্র মণ্ডলের কিছু টাকা দেনা ছিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুখুয্যেদের ঘরে। দেনাটা তার পৈতৃক, এবং মূলে পঁচিশ টাকার। পিতার মৃত্যুর পর হরেন্দ্র এবং নরেন্দ্র দুই ভাই যখন পৃথক হ'ল তখন এই ঋণ সুদে আসলে আড়াইশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্রর ঝঞ্ঝাট কম, সে তার অংশের টাকাটা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে দিলে। হরেন্দ্রর পক্ষে তা সম্ভব হ'ল না। সে নিজের অংশের দেনাটার জন্যে একটা পৃথক হ্যাণ্ডনোট কেটে দিলে। এই বাবদ নানা দফায় সে মহাজনকে প্রায় শতখানেক টাকা দিয়েছেও। তথাপি দেখতে দেখতে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় তিন শো টাকা।

এত টাকা দেবার কোন শক্তিই তার নেই। অথচ মহাজন নালিশ করবে ব'লে ক্রমাগত শাসাতে লাগল। হরেন্দ্র কেঁদে এসে পড়ল নিতাইপদর কাছে। মামলা সম্বন্ধে নিতাইপদর মাথা কুশাগ্রশাণিত। এই ব্যাপারে সে সাক্ষাৎভাবেই নামতে পারত, কিন্তু বিশেষ কারণে তা সম্ভব নয়। সে নরেন্দ্রকে ডাকিয়ে বললে, হরেন্দ্রর সমস্ত জমি, মায় পুকুর বাগান তাকে কিনতে হবে।

নরেন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে, আমি কিনব কি হে। আমার টাকা কোথায়?

—টাকা দিতে হবে না।

এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাবে নরেন্দ্র হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু নিতাইপদ

ভিতরের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই বুঝল। রাজিও হ'ল। অত্যন্ত গোপনে, নিতাইপদর কয়েকজন একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকের সাহায্যে দলিল রেজেষ্টারী হ'ল। মহাজন জানতে পারলে না, ওই জমির ওপর ডিক্রিজারী করলে এবং একদা রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই বহু লোকজন পাঠিয়ে কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে গেল। হরেন্দ্র এবং নরেন্দ্র বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অত জনবলের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেনি।

মামলা তাই নিয়েই। এর জন্য নিতাইপদ শুধু নিজের মুল্যবান মাথা খাটিয়েই পরিত্রাণ পাচ্ছে না, সদর পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। এই রকম সময়ে তার মেজাজ সব সময় এমন সপ্তমে চ'ড়ে থাকে যে, কেউ কাছে যেতে সাহস করে না।

কিন্তু মা আর থাকতে পারলে না। বিনোদিনীর প্রত্যহ জ্বর ছেড়ে জ্বর আসছে। ক্রমেই সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। বিনা চিকিৎসায় আর তাকে ফেলে রাখা যায় না।

বললে, বিনোদিনীর তো জ্বর আসছে।

চোখ পাকিয়ে নিতাইপদ বললে, তা আমি কি করব? শহর থেকে বড় ডাক্তোর আনব?

শান্ত কণ্ঠে মা বললে, বড় ডাক্তোর কেন, আমাদের গাঁয়ের ডাক্তোরকে তো একবার ডাকতে হয়।

—টাকা লাগবে না?

—তা লাগবে বই কি। বিনা টাকায় কি আর চিকিচ্ছে হয়?

—তবে?

ছেলের রক্তচক্ষু দেখে মা চুপ ক'রে রইল।

নিতাইপদ নিশ্চিন্তভাবে বললে, ধান-পান উঠুক, তারপর দেখা যাবে।

এবার মায়ের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হ'ল। বললে, হ্যাঁরে, কবে তোর ধান উঠবে, সেই ভরসায় এতদিন মেয়েটাকে বিনা-চিকিচ্ছায় ফেলে রাখব?

কিন্তু বিনা চিকিৎসাতেই, একমাত্র ডাকঘরের কুইনিন পিলের সাহায্যে বিনোদিনী অল্পদিনেই সেরে উঠল। তাকে আর ধান ওঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে

হ'ল না। বিধবা না হ'লেও এ সংসারে তার স্থান বিধবা ভগিনীর মতো। এ নিয়ে অভিযোগ করা বৃথা।

অল্প দিনেই সে সেরে উঠল। একটু একটু ক'রে বলও পেলে। ক'দিন পরে স্নানও করলে এবং দুটি একটি ক'রে সংসারের টুকিটাকি কাজেও হাত দিতে লাগল। এমনি ক'রে পূর্ণিমা গিয়ে অমাবস্যা এল।

মা এসে বললে, আজ রাত্রে ভাতটা আর খাসনে বিনোদিনী, দু'খানা রুটি কিম্বা দু'টো মুড়িই খাস।

—কেন ?

—আজ অমাবস্যা কি না। সাবধানে থাকাই ভালো।

অমাবস্যার কথাটা বিনোদিনীর নতুন ক'রে মনে হল। ক'দিনই বা সে ভুগেছে ? পূর্ণিমার ক'দিন আগে থেকে ক'দিন পর পর্য্যন্ত। তারপরে অমাবস্যা এসেছে।

টিনের বাক্সে তার তৈরীই আছে তামার মাদুলী, ছোট বাবাজির অব্যর্থ ঔষধ আর হাতে বাঁধবার সুতো। অমাবস্যার রাত্রিও বহু দিন পরে অবশেষে আজ এল।

কিন্তু এই শীতের রাত্রি···খিড়কির ডোবার কনকনে ঠাণ্ডা, দূষিত জল···আর সদ্য ম্যালেরিয়া মুক্ত বিনোদিনীকে এখনও রোগী বললেই হয়!

তা হোক। বহুদিন পরে এসেছে অমাবস্যা। আবার আসতে এক মাস দেরী। ততদিন সে অপেক্ষা করতে পারবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে সে তৈরী হতে লাগল। পূর্ব্বমুখে একটিমাত্র ডুব দিয়ে বাঁ হাতে মাদুলীটি ধারণ করতে হবে। এই সামান্য কথা মনে রাখা একটুও কঠিন নয়।

একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে সমস্ত দিন সে কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে রইল। কিছুতেই নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না। মেনীকে বুকে চেপে ধরে কত আদর করলে। সেই আকস্মিক, অহেতুক এবং মাত্রাতিরিক্ত আদর অতটুকু মেয়ের কাছেও অস্বাভাবিক ঠেকল।

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সলজ্জভাবে মেনী বললে, মা যেন কি!

—বাড়ী যাবি মেনী ?

কাদের বাড়ী ?

—তোদের নিজেদের বাড়ী ?

—আমাদের বাড়ী আছে মা ?

—আছে বই কি ! কেমন সুন্দর বাড়ী !

মেনী গম্ভীর ভাবে বললে, হুঁ। কেমন গরু আছে, বলদ আছে, আমাদের বাবা আছে, নয় মা ?

—আছেই তো। যাবি ?

মেনী এবারে ঘনিষ্ঠভাবে মায়ের কাছে সরে এল। চুপি চুপি বললে, বাবাকে দেখতে বড় মন হয় মা।

মেয়ের গোপন ব্যাকুলতার পরিচয়ে বিনোদিনীর চোখ ছল ছল করে উঠল। বললে, এবার যাব রে।

—কবে ?

—শীগগিরই যাব। এই শোন্। কাউকে এক্ষুনি বলিস না যেন।

—কেন মা ? কি হয় ?

—বলতে নেই। তাহ'লে যাওয়া ফস্‌কে যায়।

মেনী তাই বুঝে গেল। এবং বিনোদিনীর দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল, অচিরেই সে আবার শ্বশুর বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। এখন কেবল আজ রাত্রে পূর্ব্বমুখে একটা ডুব দিয়ে অব্যর্থ মাহুলী ধারণ করতে পারলেই হয়।

শীতের ছোট বেলা, কিন্তু তাই যেন অনেক গড়িমসি করে শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ হল। ধীরে ধীরে এল সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রি। অনেক দুরন্তপনা করে ছেলে মেয়ে দুটিও ঘুমুল। কিন্তু নিতাইপদ কিছুতে ফেরে না। নয়নতারা তার অপেক্ষায় আলো জ্বেলে বসে আছে। অনেক রাত্রে মামলা সংক্রান্ত জরুরী পরামর্শ সেরে নিতাইপদও ফিরল। আহারাদি এবং নয়নতারার সঙ্গে কলহ সেরে অবশেষে সে শুতেও গেল। আরও অনেকক্ষণ পরে চারিদিক নিশুতি হল। কিন্তু তখন আর রাত্রি বেশী নেই।

বিনোদিনী উঠল। মাহুলীটি হাতে নিয়ে সন্তর্পণে দ্বার খুলে বার হ'ল। রাত্রি বেশী নেই, কিন্তু অন্ধকার আছে।

বাইরে কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। রুগ্ন বিনোদিনীর হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। আর এঁদো ডোবার জলের তো কথাই নেই। কোমর পর্য্যন্ত ডুবুতেই বিনোদিনীর নিম্নাঙ্গ যেন পাথর হয়ে গেল। বিনোদিনী কাঁপতে কাঁপতে

কাপড়খানা কাচতে লাগল, যেন কোথাও বাসি না থাকে। কিন্তু ডুব দিয়ে যখন উঠল তখন আর তার হাঁটবার শক্তি নেই। মাদুলীটা নিয়ে কোনো রকমে উপরে উঠেই সে চমকে উঠল।

—কে রে ?

—বিনোদিনী ? এখন চান করছ ? আমি বেরুচ্ছিলাম প্রভাতী গাইতে। তোমার কাপড় কাচার শব্দ শুনে ভাবলাম, কে বুঝি চুরি করে মাছ ধরছে। চুপি চুপি আসছিলাম তাকে ধরতে।

কিন্তু বিনোদিনীর সমস্ত শরীর হাওয়ায়-ওড়া বাঁশপাতার মতো থর থর করে কাঁপছিল। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছিল। কম্পিত হাত থেকে টুপ্ করে মাদুলীটা গেল জলে পড়ে।

—কি যেন পড়ল জলে।

কিন্তু কে সাড়া দেবে ? ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিনোদিনীর শরীর অসাড় হয়ে আসছিল। অন্ধকারে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল একখানা গামছা ছাড়া তার পরিধানে দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড নেই। কিন্তু সে তখন টলছিল। গৌরহরি তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলে। বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা হাত, তাতে রক্তের উষ্ণতা মাত্র নেই।

অকস্মাৎ হয়তো গৌরহরির মনে দুর্ব্বলতা এল, নয়তো বিনোদিনীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি বিনোদিনীর অর্দ্ধনগ্ন দেহ বুকের মধ্যে নিয়ে গায়ের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে বেশী লজ্জা তার না করলেও চলে।

বিনোদিনীর সংজ্ঞা তখনও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু সে বাধা দিলে না। গৌরহরির দেহের উষ্ণতায় সে আরাম বোধ করছিল। তার কাঁধে মাথা রেখে সে ছেলে-বেলার মতো তাকে অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ দিলে।

রাত্রি তখন আর বেশী নেই, কিন্তু অন্ধকার আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

হের্মান্ য়াকোবি

ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার চর্চ্চায় যে সমস্ত জার্ম্মান পণ্ডিত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে Hermann Jacobi-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। Jacobi-র অল্পদিন পূর্ব্বেই Gruenwedel ও Winternitz-এর মৃত্যু হয়। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহাদের দানও অশেষ; কিন্তু Gruenwedel-এর মৃত্যুর সংবাদ পর্য্যন্ত এদেশে এখনও প্রচারিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, এবং Winternitz সম্বন্ধেও দুই-চার লাইন যাহা আমাদের সংবাদ-সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও আমাদের গৌরবান্বিত হইবার কিছু নাই। Jacobir প্রতিও এইরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কিন্তু আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে, কারণ ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তিনি এত দিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তাহার পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলেও বহু সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন।

ইহার আরও একটি কারণ এই যে Jacobir রচনাবলির প্রায় সমস্তই বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল তাহা তাঁহার কয়েকটি শিষ্যের নাম (ও ধাম) হইতেই বুঝা যাইবে:—Stcherbatski (Leningrad), Charpentier (Uppsala), Breloer (Berlin), Guerinot (Paris), ইত্যাদি। এক Guerinot ভিন্ন অপর তিনজন Jacobi-শিষ্যই স্ব স্ব দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বা আছেন। এবং ইহাঁদের অধ্যেয় বিষয় যথাক্রমে বৌদ্ধদর্শন (Stecherbatski), বৈদিক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব (Charpentier), ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র (Breloer), এবং জৈন দর্শন ও সাহিত্য (Guerinot)। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে Jacobi সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দাবলির উপর একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রচার করেন, এবং ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে তিনি এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই,—বোধ হয় এই জন্যই, যে তাঁহার মতে এখনও এ জন্য

করিবার অনেক বাকি। কিন্তু Jacobi-র অসমাপ্ত গ্রন্থ আর যে কেহ যথোচিত রূপে সমাপ্ত করিতে পারিবে তাহার বিশেষ আশা নাই; সুতরাং তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই যদি প্রকাশিত হয় তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই গ্রন্থে তিনি ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে লিখিত যত গ্রন্থ আছে—যথা রামায়ণ, মহাভারত! —সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়াছেন। ইহা যে কি বিরাট কাজ তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই ছন্দের theory লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন,—যাহা পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র এবং আর দুই একটি গ্রন্থ হইতেই সুলভে শিক্ষা করা যায়। কিন্তু ছন্দাবলির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইলে theory ছাড়িয়া তথ্যকে আশ্রয় করিতে হইবে। Wackernagel ঠিক এই পন্থায় সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিতেছেন,—গত ৪২ বৎসরে তাঁহার ব্যাকরণের, তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। Wackernagel-এর প্রিয়সুহৃৎ Jacobi কিন্তু তাঁহার magnum opus-এর কিছুই প্রকাশিত করিয়া যান নাই,—তাঁহার দুই একটি গ্রন্থে বা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আদৌ তৃপ্তি হয় না।

বৈদিক সাহিত্যের কাল সম্বন্ধে Jacobi-র মতের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্ত্তমান আকারে ঋগ্বেদ যে খৃষ্ট জন্মের আনুমানিক সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল এ কথা তিনিও অস্বীকার করিয়া যান নাই; কিন্তু গৃহ্যসূত্রে জ্যোতিষ বিষয়ক কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে বৈদিক সভ্যতার কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০০। কিন্তু Jacobi-র এই চেষ্টা সফল হয় নাই; কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী Thibaut, এবং বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় Oldenberg,—উভয়েই Jacobi-র যুক্তির অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদ করেন। Jacobi তাঁহার এই মত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে এ সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই তাহা নিশ্চিত। যাহাই হউক, Jacobi অল্প দিনের মধ্যেই প্রমাণ করিয়া দেন যে বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই Jacobi তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Compositum und Nebensatz" প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষায় এবং অপরাপর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কিরূপে সমাসের উদ্ভব হইয়াছে তাহা তিনি

অতি প্রাঞ্জল ভাবে এই গ্রন্থে দেখাইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থই এখনও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং তাঁহার মতই এখনও সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে তিনিই প্রথম দেখাইয়া যান যে যদ্‌বৃত্ত বাক্য (dependent clause) হইতেই সমাসের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল বাক্য সাধারণতঃ যদ্ শব্দ দ্বারাই প্রধান বাক্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ; কিন্তু ঋগ্বেদে কয়েক স্থলে দেখা যায় যে এইরূপ বাক্যের আদিতে যদ্-শব্দের ব্যবহার নাই। ঋগ্বেদের কবি বলিবেন "বরাহঃ ত্বেষং রূপং"—যাহার অর্থ অবশ্যই "বরাহঃ, যস্য রূপং ত্বেষং"। Jacobi সুন্দর রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন যে "বরাহঃ ত্বেষং রূপং" ক্রমশঃ হইয়া পড়িয়াছে "ত্বেষরূপঃ বরাহঃ"। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেও দেখা যায়। দ্বন্দ্বসমাসের উদ্ভবও Jacobi অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"Compositum und Nebensatz" প্রকাশিত হইবার পরেই Jacobi-র খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারও ৪ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৩) Jacobi-র যে দুইখানি গ্রন্থ বাহির হয় তাহাদের জন্যই তিনি আজ ভারতে এত সুপরিচিত। এই দুই গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের উপর লিখিত। রামায়ণ ও মহাভারত কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের আপেক্ষিক কালই বা কি, এবং ভারতীয় সাহিত্যের উপর ইহাদের প্রভাবই বা কিরূপ—এই সকল কথা এই গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত হয়। মহাভারত ক্রমশঃ কিরূপে বিপুলাকার হইয়া উঠিল তাহাও তিনি অন্তরঙ্গ প্রমাণ সহযোগে দেখাইয়া গিয়াছেন। Jacobi-র পূর্ব্বে এই দুই মহাকাব্য সম্বন্ধে Albrecht Weber-এর মতই প্রচলিত ছিল। তিনি বলিতেন মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ একটি অর্ব্বাচীন গ্রন্থ,পালিপিটকান্তর্গত 'দসরথজাতক' রামায়ণের আদিরূপ, এমন কি Homer-এর Iliad-এর প্রভাবও ইহার উপর সুস্পষ্ট। Weber-এর মত বিশাল পণ্ডিতের মত যে সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইতে লাগিল তাহা বলাই বাহুল্য। Jacobi কিন্তু তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ে Weber-এর যুক্তিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইলেন যে তাঁহার কথা আদৌ সত্য নহে। তিনি দেখাইলেন যে মহাভারতের কথাংশ প্রাচীনতর হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান আকারে মহাভারত নিশ্চই রামায়ণের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতার (খৃঃ পূঃ ৫০০) ছন্দের সহিত রামায়ণের ছন্দের তুলনা করিয়া তিনি দেখাইলেন যে উভয় গ্রন্থের রচনাকাল পরস্পরের নিকটবর্ত্তী না হইয়া পারে না।

মহাভারতের ছন্দ কিন্তু মিশ্র ও অশুদ্ধ,—খুব সম্ভব মহাভারত গদ্য হইতে পরে পদ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে,—এবং "যুধিষ্ঠির উবাচ", "সঞ্জয় উবাচ" প্রভৃতি যে সকল অতিচ্ছন্দ শব্দ এখনও মহাভারতে দেখা যায় সেগুলি প্রাচীন গদ্যেরই ভগ্নাবশেষ। রামায়ণ সম্বন্ধে তিনি দেখাইলেন "দসরথজাতক" বাল্মীকির মহাকাব্যেরই একটি বিকৃতরূপ, এবং Homer-এর প্রভাবও তিনি এই বলিয়া অস্বীকার করিলেন যে তাহা হইলে রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে সাগরপার হইবার জন্য সেতুবন্ধন করিতে হইত না, Agamemnon-এর অধিনায়কত্বে গ্রীক্‌দের মতই বানরগণ জাহাজে করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিত। —রামায়ণ মহাভারতের উপর Dahlmann, Holtzmann ও Hopkins আরও বিস্তীর্ণতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি এখনও বহু বিষয়ে Jacobi-র Das Ramayana আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

জৈন সাহিত্য ও দর্শনে Jacobi-র দান অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধেও তিনি ব্যাপক কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই, তবে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে Hastings-এর Encyclopaedia of Religion and Ethicsএ জৈন ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ আছে তাহার সমস্তই প্রায় Jacobi-র রচিত। Jacobi-শিষ্য Schubring এখন তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে (Die Lehre der Jainas) গুরুর অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। যাহাই হউক, Sacred Books of the East, Vol. XXII এ Jacobi জৈন কল্পসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে জৈন সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু কাজ হইতেছে তাহা সমস্তই Jacobi-র প্রদর্শিত পন্থায় পরিচালিত। তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে এ বিষয়েও চর্চ্চা আরম্ভ করেন সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত Albrecht Weber। Buehler এ দেশ হইতে প্রায় ৫০০ প্রাকৃত পুঁথি Berlin-এ প্রেরণ করেন; সেইগুলি লইয়াই Weber এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন।

বৌদ্ধ-সাহিত্যের ভাষা যেমন পালি, জৈন-সাহিত্যের ভাষা সেইরূপ প্রাকৃত। জৈন-সাহিত্যের আলোচনা সম্পর্কে Jacobi সেই জন্য প্রাকৃত ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়েও তিনি একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—Ausgewaehlte Erzaehlungen in Maharastri (1886)।

প্রাকৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে এইটি বোধহয় এখনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যদিও ব্যাপকত্বে Pischel-এর Grammatik der Prâkrit Sprachen (1905) এ বিষয়ের মূল গ্রন্থ। প্রাকৃতের স্বর (accent) লইয়া Pischel-এর সহিত Jacobi-র বহুদিন ধরিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল। Pischel-এর মতে প্রাকৃতের স্বর ছিল বৈদিক স্বরের অনুরূপ, যাহার মধ্যে কণ্ঠের তীব্রতা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতাই ছিল অধিক। আজ-কাল এ সম্বন্ধে Jacobi-র মতই সাধারণ্যে গৃহীত হইয়া থাকে, Pischel-এর মত নহে। Jacobiর মতে প্রাকৃত ভাষাগুলির স্বর ছিল প্রধানতঃ তীব্র। Geiger দেখাইয়াছেন যে পালিরও স্বর ছিল প্রাকৃতের অনুরূপ—প্রধানতঃ তীব্র।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইলে দেশে বিদেশে খুব একটা সাড়া পড়িয়া যায়। একদল বলিতে থাকেন এই গ্রন্থ বাস্তবিকই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের রচিত,—এই দলের নেতা Jacobi, J. J. Meyer, Jayaswal প্রভৃতি। অপর দলের মতে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে; এই মতের পৃষ্ঠপোষক Berriedale Keith, Julius Jolly, Winternitz প্রভৃতি। আমি নিজে "Chronology of the Smritis" শীর্ষক প্রবন্ধে (Indian Historical Quart., 1928) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতির সহিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না, যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরি-লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে এখনও অধিকাংশ পণ্ডিত Jacobi-র মতই সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের বাহিরে Jollyর মতই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। কৌটিল্য সম্বন্ধে Jacobi-র প্রবন্ধগুলি Sitzungsberichte der preussischen Akademieতে বাহির হইয়াছিল। কৌটিল্য সম্বন্ধে যাঁহারাই কিছু আলোচনা করেন তাঁহাদের এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন লইয়াও Jacobi সারাজীবন আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধেও তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। তবে বিবিধ পত্রিকায় এতৎ সম্পর্কে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। Jacobiই প্রথম দেখাইয়া যান যে গৌতম বুদ্ধ ভারতে একটা নূতন "ধর্ম্ম" প্রচার করিয়া যান নাই; বৌদ্ধমত আপনা হইতেই সাংখ্য ও যোগদর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং বৌদ্ধ-গণ ছিল আসলে হিন্দুধর্ম্মেরই একটা sect মাত্র। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধেও Jacobi-র

কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রহিয়াছে ; তবে এ সম্বন্ধে এখন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাঁহার শিষ্য Stcherbatski-র Buddhist Logic.'

Jacobi-র সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় আশা করি ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে, যদিও তাঁহার কীর্ত্তিগৌরব পরিমাণ করা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নহে। জার্ম্মানীর বিখ্যাত Indologist-এর দল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহার একটি প্রধান কারণ অবশ্য এই যে সে দেশে এখন বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা বন্দুক ও কামান চর্চ্চা ও Jew-baiting-এরই চলন হইয়াছে বেশী। Goering যে দেশে চারু শিল্পের তত্ত্বাবধায়ক, Goebbels যে দেশের শিক্ষামন্ত্রী, Kerrl যে দেশের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা, সে দেশ হইতে সরস্বতী লজ্জায় না হইলেও প্রাণ-ভয়েই যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে ? এই জার্ম্মানীকেও শ্রদ্ধা করিবার যদি কোন কারণ ভারতবাসীর থাকে তবে তাহা এই যে এই দেশেই Hermann Jacobi-র মত অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে আজীবন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার আলোচনা করিয়া ভারতবাসীকে ভারত সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পুস্তকপরিচয়

The Ten Principal Upanisads—Put into English by Shree Purohit Swami and W. B. Yeats. (Faber & Faber)

যে গ্রন্থের সহিত কৃতী কবি ইয়েট্‌স্‌-এর নাম সংযোজিত, সে গ্রন্থ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষতঃ আমার মত উপনিষদ্‌ যাহার 'ব্যসন'। সেইজন্য আমি এ গ্রন্থ সযত্নে পাঠ করিয়াছি—কিন্তু যতটা আশা করিয়াছিলাম ততটা পাই নাই।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে প্রকাশক এইরূপ লিখিয়াছেন—

'The translations hitherto available are out of date and are written in a style which fails to convey, the magnificience of the poetry of the original'।

এ সম্পর্কে ইয়েটস্‌-এর নিজের ভূমিকায় এই কথার প্রতিধ্বনি আছে—

"Could latinised words, hyphenated words, could polyglot phrases, sedentary distortions of unnatural English, —could muddles, muddied by 'Lo ! verily' and 'Forsooth,' represent what grass farmers sang thousands of years ago, what their descendants sing to day ? ('Grass farmers' কাহারা, ঠিক বুঝা গেল না)।

অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে, সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সুকো (যিনি হিন্দু কৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন) কয়েকখানি উপনিষদের পার্শীতে তরজমা করাইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এক ক্যাথলিক পাদরী (Andrew Drupont) ঐ পার্শী গ্রন্থের লাটিনে অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদের অনুবাদ জার্ম্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের (Schopenhaur) হস্তগত হয়। তিনি উহার খোসা ভেদ করিয়া সার শস্যের আস্বাদন করিয়া মোহিত হইয়া ঘোষণা করেন—জগতের সাহিত্যে উপনিষদের সমতুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। ইহার পর হইতে য়ুরোপে উপনিষদের আলোচনা আরম্ভ হয়। আমার স্মরণ আছে প্রথম যৌবনে ডাক্তার E. Roer-কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার পর

Sacred Books of the East সিরিজে ম্যাকস্ মুলার উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সে অনেক দিনের কথা। আরও পরে আমার বন্ধু ভি, সি, শেষাচারী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা-প্রমুখ কয়েকজনের সাহায্যে মাদ্রাজ হইতে শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ সহ দশোপনিষদের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত করেন। ইহারও পরে অধ্যাপক Paul Deussen এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—এবং ৬০ খানি উপনিষদের জার্ম্মান অনুবাদ সহ তাঁহার বিশ্রুত Philosophy of the Upanisads গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই সকল আলোচনার ফলে সাধারণ পাঠকের উপনিষদের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার পথ কতকটা সুগম হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল অনুবাদের উল্লেখ করিলাম তাহাদের ভাষা ও ভঙ্গি অনেকস্থলে stilted অর্থাৎ আড়ষ্ট ধারণের হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক উপনিষদের রসাস্বাদে প্রায়শঃ বঞ্চিত ছিলেন। এই কথা স্মরণ রাখিলে ইয়েট্‌স্-এর পূর্ব্বোদ্ধৃত আক্ষেপ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না। তবে একটি অনুবাদের কথা আমি জানি; বোধ হয় ইয়েট্‌স্ তাহার সহিত পরিচিত নন—সে অনুবাদ Mead ও J. C. Chattopadhay-কৃত। উহা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের থিওসফিক্যাল সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে উহার নব সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ অনুবাদ একেবারেই stilted নহে। উহা ইয়েট্‌সের গোচর হইলে ভাল হইত।

সে যাহা হউক, ইয়েটস্ বলিতেছেন: যখন বিলাতে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল "I proposed that we should go to India and make a translation that would read as though the original had been written in common Eglish."

এই সহযোগিতার ফলে দশোপনিষদের এই ইংরাজী অনুবাদ। এ সম্পর্কে প্রকাশকের বক্তব্য এই—

Shree Purohit Swami is an Indian scholar well known in England, trained in the ancient tradition of Sanskrit Scholarship. He has had throughout the collaboration of Mr. Yeats, who explains in his introduction the principles on which they have tried to render in contemporary English speech, the beauty and simplicity of the Sanskrit.

পুরোহিত স্বামী সংস্কৃতাভিজ্ঞ বটেন কিন্তু ইয়েটস্ একেবারেই সংস্কৃত জানেন না। ইয়েটস্ লিখিতেছেন—

Sree Purohit Swami has asked me to introduce what is twice as much his as mine—for he knows Sanskrit and English, I but English."

পুরোহিত স্বামী পণ্ডিত বটেন, কিন্তু উপনিষদে যে বেশ নিষ্ণাত তাহা আমার বোধ হইল না। ইয়েটস্‌এর ত' কথাই নাই—মূলগ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত তিনি আদৌ সে ভাষা জানেন না। তথাপি ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারের ফলে—বিশেষতঃ তিনি কবি ও ভাবুক বলিয়া, এই অনুবাদ অনেক স্থলে বেশ চমৎকার হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইয়েট্‌স্ ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

Yet I am satisfied ; I have escaped the polyglot, hyphenated, latinised, muddied muddle of distortion that froze belief.'

ইয়েট্‌স্-এর অনুবাদের ভঙ্গি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহার অনুবাদের প্রচেষ্টা এই—'as though the original had been written in Common English'। উপনিষদের অনুবাদে কিন্তু Common English সকল স্থলে পর্য্যাপ্ত নয়। কারণ, উপনিষদ্ শুধু mysticism ও philosophy নয়, অনেক স্থলে ইহা উচ্চাঙ্গের কবিতা—high poetry—(ইয়েট্‌স্-এর ভাষায়) কেবল 'vast sentiments and generalisations, the oldest philosophical composition of the world' নহে কিন্তু 'most beautiful as literature'। অতএব উপনিষদের প্রাণময় ভাবময় উদাত্ত উদার বাণীকে ভাষান্তরিত করিতে হইলে Common English কোনমতেই পর্য্যাপ্ত নয়। একটা উদাহরণ দিই :— উপনিষদের একটি প্রখ্যাত মন্ত্র এই—

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

ইহার অনুবাদ এই—

জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্
তমসের পরে যিনি—চির জ্যোতিষ্মান্
তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যুপার
অয়নের তরে অন্য গতি নাহি আর!

ইহার কি Common English-এ অনুবাদ হইতে পারে?

যিনি উপনিষদের যথার্থ অনুবাদ করিবেন—তাঁহাকে একাধারে কবি ও ধ্যানী (poet and mystic) হইতে হইবে—পণ্ডিত না হইলেও চলিবে (পাণ্ডিত্যং নির্বিব্দ্য) কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমার মনে হয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ যদি কোনদিন অবসর করিয়া উপনিষদের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন,—তবেই এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির অনুবাদে আমরা যে জীবন্ত প্রাণবন্ত ইংরাজীর পরিচয় পাইয়াছি—সেই ভাষাই উপনিষদের ইংরাজী তর্জ্জমার প্রকৃষ্ট ভাষা। অতএব কবিবরের নিকট আমার এই প্রার্থনা পেশ করিয়া রাখিলাম।

উপনিষদ্ প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা—

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তস্মৈ তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।

ইয়েট্স্-এর ভূমিকা পড়িয়া মনে হইল তিনি এ বিষয় দত্তদৃষ্টি নন্। রহস্যবাদ (Mysticism) এবং সাইকোএনালিষ্ট কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত ব্যাপকতর সম্বিৎ (larger subliminal self)—উপনিষদে এই সকল বিষয়ের ইঙ্গিতই তাঁহার অধিক মনঃপূত।

সেইজন্যই বোধহয় তিনি অনুবাদের মধ্যে কৌষীতকী ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ধরেন নাই। এই দুই উপনিষদে ব্রহ্মণ্যদেব সম্পর্কে অনেকানেক সুন্দর গম্ভীর বাণী আছে। ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই দুই গ্রন্থের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ইউরোপীয়রা যাহাদিগকে মুখ্য বা major উপনিষদ্ বলেন—এ দুই উপনিষদ্ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

পুরোহিত স্বামীর পাণ্ডিত্য এবং ইয়েট্সের কবিত্ব সত্ত্বেও এই অনুবাদে অনেকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা অভিজ্ঞ পাঠককে পীড়া দেয়। কয়েকটি ভ্রমের এখানে উল্লেখ করিব—যদিস্যাৎ প্রকাশকদিগের গোচরে আসে তাঁহারা দ্বিতীয় সংস্করণে সাবধান হইতে পারিবেন।

ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্র এই—'ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই...whatever is fleeting in this world, cover it up with the Lord। কিন্তু অনুবাদকদ্বয়ের অনুবাদ—'whatever

lives is full of the Lord'। ঐ উপনিষদের আর একটি মন্ত্র---ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ। ইহার কি অনুবাদ Do not waste light, gather light? বায়ুরনিলমমৃতম্—ইহার অর্থ এই—Let the individual life merge in the Immortal Life। অনুবাদকদ্বয়ের অনুবাদ এই ;—Life ! merge into the all prevalent. কঠ উপনিষদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র এই :—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

অনুবাদকদ্বয় ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

He has made mere preachers and soldiers His food, death His condiment ; how can a common man find Him ?

এই অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে ?

মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ না কি At the feet of Master Mandooka! মাণ্ডুক্য ব্রহ্মের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রার পরিচয়ে বলিয়াছেন—অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যম্, অব্যপদেশ্যম্ ইত্যাদি। ইহার কি অনুবাদ—' He cannot be seen, grasped, bargained with ?

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাই। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আছে—'ন বা অরে পত্যুঃকামায় পতিঃপ্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।' এ মন্ত্রে আত্মা কে ? আত্মা আমাদের ভূতাত্মা—না পরমাত্মা ? অনুবাদকদ্বয়ের অনুবাদ এই,—

Of a certainty, the wife does not love her husbaand for himself but loves him for *herself* only. The hushand does not love his wife for herself, but loves her for *himself* only.

এ অনুবাদে মূলার্থের মূলচ্ছেদ করা হইয়াছে।

সমস্ত জাগতিক ব্যাপার ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation—এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাচ্ছব্দাচ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। ইহার অনুবাদ কি—

'As the sounds of a lute that cannot be understood unless we understand the lute and the player'.

বৃহদারণ্যকের আর একটি বিখ্যাত মন্ত্র এই—'এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।' কবির ইহার ঠিক মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন—'সৎ গুর নুর তামাম'—কিন্তু 'So this great endless deathless Being dissolved in Knowledge' কি ইহার প্রকৃত অনুবাদ? মুক্তির একাকার অবস্থা বুঝাইতে উপনিষদ্ নদী-সমুদ্রের উপমা দিয়াছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

যাজ্ঞবল্ক্য এক কথায় বলিয়াছেন—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি। এখানে সংজ্ঞা অর্থে 'নাম' নয়—সংজ্ঞান। অনুবাদে কিন্তু name শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—'Disappears—when they disappear leaving no *name* behind?'

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ সকলের সুপরিচিত। সেখানে তিনি যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সমস্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া 'Inner Ruler Immortal' (অন্তর্যামী) রূপে সমস্ত যমন করিতেছেন—তাঁহার কথা বলিয়াছেন,—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ পৃথিবীম্ অন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ইহার অনুবাদকদ্বয়-কৃত অনুবাদ এই—

He who lives *on* earth, apart from earth, controlling earth from within—is your own self, the immortal, the controller.

উপনিষদে আকাশ ব্রহ্মের একটি সুপরিচিত প্রতীক—আকাশো হবৈ নাম রূপয়োঃ নির্ব্বহিতা। এ আকাশ ভূতাকাশ নহে—'sky' ত নহেই—আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ (ব্রহ্মসূত্র)। অথচ এ গ্রন্থে আকাশের অনুবাদ করা হইয়াছে 'Sky', কোথায়ও বা 'Air'।

উপনিষদে অক্ষর ব্রহ্মের একটি সুপরিচিত নাম। অক্ষর তিনি—যিনি অজর অমর, অব্যয় অক্ষয়—যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্। এই অক্ষরের কথা যাজ্ঞবল্ক্য তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে অতি মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করিয়াছেন—তদক্ষরম্ গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলম, অনণু ইত্যাদি। ইহার অনুবাদ কি 'the saints call it the root'? আরও কয়েকটি ভুল আমার চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ের বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন।

উপনিষদের যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল। উপনিষদেই ভারতীয় চিন্তা তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। উপনিষদ্ জীবের স্বস্তি ও শান্তির অজস্র উৎস। যদি ইয়েটসের নামের সহিত সম্পর্কিত এই গ্রন্থের দ্বারা ঔপনিষদী প্রজ্ঞার পাশ্চাত্যে ভূয়ঃ প্রচার হয় তবে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

চামেলি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। দিলীপকুমারের একটি কবিতা ও নাটোর-মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায়ের মুখবন্ধ সম্বলিত।

গানগুলি মিষ্টি,কথা সুরচিত, মাত্র এইটুকু জানলে শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে এবং যে কোন গানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তার রসের পরিবেশনে। কিন্তু সমালোচক বলে একজাতীয় জীব আছে তারা এতটুকুতে তুষ্টিলাভ করেনা। তারা বিশ্লেষণ দ্বারা সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ঠিক করে আর মিলিয়ে দেখে যে কোথায় চ্যুতি ঘটেছে আর কতখানি মানানসই হয়েছে। মানদণ্ড নিয়তই বদলায়, তবে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হয় বলে সাময়িক ভাবে পরিমাপের প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থির থাকে। এটা যদি সমালোচকশ্রেণীরই রোগবিশেষ হত, তা হলে বিশ্লেষণের কোন বিশিষ্ট মুল্য থাকত না। বুদ্ধিজীবীর খোরাক জোগান ছাড়া সমালোচনার অন্যতম সার্থকতা রয়েছে প্রতিভার পরিচালনে। কোন বড় প্রতিভা বিশ্লেষণ ছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। য়ুরোপীয় এক অভিনেতার গল্প শুনেছিলাম। অভিনেতা ছিলেন মফস্বলের লোক, স্বভাবজাত প্রতিভার জোরে সহরের এক বড় নাট্যশালায় অভিনয় করে সকলকে চমকিত করে তোলেন। কিছুকাল সকলের মুখে অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা। কিন্তু তাঁর অভিনয়ে যতটা অভিনবত্ব ছিল, তত বৈচিত্র্য ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যে সাধারণে তাঁর অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু অভিনেতা বিশ্লেষক ছিলেন না বলে পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগিল এবং ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল। ভারতবর্ষে যাঁরা এখন গায়ক বাদকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁরা এক একটি পাকা

সমালোচক, যদিও তাঁদের অনেকেই ইংরাজি বলতে পারেন না। এমন কি খেলাধুলোর মত বিষয়েও একথা খাটে। সুবিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় টিলডেন—অনেকের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—যে বইগুলি লিখেছেন তাতে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রণালীতে আশ্চর্য্য হতে হয়। অবশ্য যেমন প্রতিভার অভাবে শুধু বিশ্লেষণের সাহায্যে ভাল খেলা যায় না, তেমনি সমালোচনার সঙ্গে সৌন্দর্য্যজ্ঞান না থাকলে শিল্পীর সৃষ্টি দাঁড়ায় শুধু ব্যাকরণের কচকচি এবং তার বিভীষিকা কম নয় (সঙ্গে অভ্যাস যে চাই এটা স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নিতে হবে)। পরিশেষে বলা উচিত যে ভারতীয় সঙ্গীত বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়ে পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয়েছে এবং এই বিশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা রয়েছে।

হিমাংশুকুমার সুররসিক, এই জন্য তিনি হিন্দি গানের হুবহু নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেননি। বাংলা গানের প্রকৃতির সঙ্গে যা খাপ খায় তেমনি সুর, অলঙ্কার, গীতোপযোগী ছন্দ তিনি বাংলা কথার সঙ্গে মিলিয়েছেন, তাই আজ শিল্পী কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণের কণ্ঠে গীত হয়ে সাধারণ্যে এগুলি প্রীতি ও খ্যাতি লাভ করেছে। কেউ কেউ বলবেন—তাই যদি হয়, হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর নাম গানগুলির মাথায় সাজানর কি প্রয়োজন ছিল? কথাটা খুব অসঙ্গত নয় এবং হয়ত এই কারণেই আধুনিক রবীন্দ্র সঙ্গীতে রাগের পরিচয় দেওয়া হয় না। হিমাংশুকুমারের গানে আর এক আপত্তি উঠতে পারে যে গানগুলিতে বিলিতী মেলডির অপর্য্যাপ্ত মিশেল রয়েছে। বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্র লাল বিলিতী চালের বহুল আমদানি করেন। আধুনিক বাংলা গানে ও হিন্দি ঠুংরীতে অর্দ্ধান্তর স্বর (semitonic intervals) বেশী ব্যবহার হওয়ায় বিদেশী ছাপ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে পড়ছে (বিলিতী মেলডি কেন ভারতীয় মেলডি থেকে পৃথক তার সামান্য আলোচনা আমার 'Problems of Hindustani Music'এ রয়েছে)। কিন্তু এই সংমিশ্রণে এখনও এত বিজাতীয় গন্ধ রয়েছে যে ভারতীয় সঙ্গীতে এর প্রভাব নিঃশব্দে স্বীকৃত হওয়ার অবস্থা এখনও আসেনি। এসব যুক্তি সত্ত্বেও মনে হয় রাগে নাম দেওয়াতে অনেক সুবিধে হয় কারণ রাগের উল্লেখমাত্রে মোটামুটি গানের গতির যে একটা ছক মনে অঙ্কিত হয়, তাতে প্রথম পরিচয় সহজ হয়। বিদেশী ঢং এসে পড়লেও রাগের উল্লেখে অসুবিধে হয় না কারণ বিদেশী সুরগুলির ভারতীয় পদ্ধতির মত শ্রেণী বিভাগ নেই আর বাংলা

গানে ভারতীয় কিছু ছাপ থাকেই। ভবিষ্যতের কথা বলা শক্ত, বর্ত্তমানের সীমানায় দাঁড়িয়ে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভাল। রাগগুলির অধিকাংশ মিশ্র বলে উল্লিখিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন প্রয়োজন হয়নি। যে কয়েকটি রাগে মিশ্র নামোল্লেখ নেই, সেইগুলিতে সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী রাগের শুদ্ধতার চেয়ে মিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যাকরণ বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও এ গানগুলি যে কোনরকমে হিন্দুস্থানী গানে রূপান্তরিত হতে পারত না 'পরিচয়ে' সেকথা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু বাংলা গান যে ক্লাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হতে পারল না এতে আমার কোন দুঃখ হয় না। আধুনিক বাংলা গানে এবং সমধর্ম্মী হিন্দি গানে যে পরিণতির আভাস রয়েছে মনে হয় তার ধারা বর্ত্তমান রাগসঙ্গীত থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক হয়ে যাবে।

রাগরাগিণীর নাম ব্যবহার সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবার আছে। বিলিতী সুরের অনুকরণে রচিত প্রথম গানটিতে 'শিবরঞ্জনী' বলে এক রাগের উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় রাগ-তালিকায় 'শিবরঞ্জনী'র অস্তিত্ব 'মেঘরঞ্জনী'র চেয়েও অস্পষ্টতর ধূম্রলোকে। বস্তুতঃ 'মনোরঞ্জনী', 'হৃদয়রঞ্জনী', 'লোকরঞ্জনী' ইত্যাদি প্রায় অশ্রুতপূর্ব্ব নামের অবতারণা করে কোন লাভ নেই কারণ প্রায় সমস্ত অপ্রচলিত রাগের প্রকৃতি অনির্দ্দিষ্ট, এমন কি একই রাগে গান যা পাওয়া যায় সেগুলি বহুস্থলে পরস্পর থেকে অত্যন্ত বিভিন্ন। রচয়িতা যদি মিশ্র 'কাফি' লিখতেন সাধারণের সহজেই বোধগম্য হত। যে গানটির ভেঁরো-ভৈরবী বলে পরিচয় দিয়েছেন, সেটির সমতুল্য 'শিবরঞ্জনী' থেকে অপেক্ষাকৃত প্রচলিত 'শিব ভৈরব' বলে একটি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় এই গীতমালিকায় ভেঁরো-ভৈরবী বলে পরিচয় দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ হইয়াছে। 'নতুন ফাগুন' গানটিকে মিশ্র 'রাগশ্রী' না বলে মিশ্র 'খাম্বাজ রাগশ্রী' বলাই ভাল মনে হয় কারণ গানের মুখ খাম্বাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং গায়কেরা বেশীর ভাগ খাম্বাজের ধরণেই এই গানটির বিস্তার করেন। 'ভুলোনা ভুলোনা সরলা কিশোরী' পদযুক্ত একটি পুরোনো বাংলা খাম্বাজ টপ্পার মুখবন্ধনীও উল্লিখিত গানের অনুরূপ।

তারপর গানে ছন্দের কথা আসে, এ বিষয়ে বলবার বিশেষ কিছু নেই। তালগুলির পাশে এক জায়গায় ছাড়া বিলম্বিত, মধ্য বা দ্রুত লয়ের উল্লেখ নেই। অবশ্য এক মাত্রায় স্বর সন্নিবেশ থেকে লয়ের অনুমান করা কঠিন নয় যেমন প্রথম

ও দ্বিতীয় গানে দাদরা ও ত্রিতালে একমাত্রায় কোন কোন স্থলে চারটি স্বর এসে পড়ায় এগুলিকে মধ্যলয়ের গান বলতে পারা যায়, তবু উল্লেখ থাকলে ভাল হত। 'আলোক-আঁধারে' গানে রচয়িতা ইংরিজি ৯/৮ ছন্দের অনুকরণ করে ত্রৈমাত্রিক ছন্দের উল্লেখ করেছেন। দেশীয় পদ্ধতিতে একে দুইটি তাল ও একটি ফাঁকে রূপান্তরিত করা কঠিন হত না। তবে আমার মনে হয় লোকে যদি সোম ফাঁকের শাসন না মেনে শুধু একটা ছন্দ রেখে গাইতে চায় সাধারণ গানে সে সুবিধে থাকা উচিত। তবলা-বাদকের অসুবিধে হবে সন্দেহ নেই কারণ তবলার ঠেকাও পরণ তালের সুচিহ্নিত আবর্ত্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এরকম গায়কের সঙ্গে যে সঙ্গত করা যায় এরকম কথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক আবেদ হোসেনের কাছে শুনেছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বর্ত্তমানে চতুর্মাত্রিক তালের কোন গান রচনা করতে হলে ষোলমাত্রা বা আট মাত্রার আবর্ত্তন রক্ষা করে চলতে হবে, শুধু চার মাত্রার ছন্দ রাখলে চলবে না এবং এইজন্যে ষোলমাত্রার গান কোথাও এসে বার, আট বা চার মাত্রায় শেষ করাও যায় না। হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতে অবশ্য এখনও পরিবর্ত্তনের কোন বিশেষ তাগিদ আসেনি, কারণ তালের নিজের মধ্যেই প্রবণতা আছে দলবদ্ধ হবার। উল্লিখিত বিদেশী ৯/৮ তালেও এই জমাট বাঁধার আভাস আছে ৯'র উল্লেখে, কিন্তু সেখানে ৩/২, ৩/৪ বা ৩/৮ তালে যূথভ্রষ্ট ত্রৈমাত্রিক ছন্দরক্ষারও অবকাশ আছে। ভরতীয় সাধারণ গানে এ স্বাধীনতা থাকলে বিদেশীর সাহচর্য্য সহজ হবে।

গানগুলির কথা রচনা করেছেন অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, বিনয় মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রমোহন সাহা, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও মমতা মিত্র। রবীন্দ্রনাথের গীত-রচনার পর প্রায় সমস্ত আধুনিক রচয়িতাই তাঁর ভাষার অনুকরণ করে চলেছেন। বস্তুতঃ তাঁর প্রতিভা এত অভ্রভেদী ভাবে সাম্‌নে রয়েছে যে তাকে অতিক্রম করে নতুন রচনার ধারা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। তরুণ সাহিত্যিকরা বিদ্রোহ জ্ঞাপন করেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেননি। তবে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যেই নবধারার ইঙ্গিত থাকবে, ভবিষ্যতের কোন বড় প্রতিভা এগুলি কুড়িয়ে বাড়িয়ে সংহতি দিয়ে নতুন রীতির সৃষ্টি করবেন।

পরিশেষে এই সুমিষ্ট গীতমালিকা সমালোচনার উপসংহারে বলতে ইচ্ছে করে যে গ্রন্থের 'চামেলি' নামকরণ সার্থক হয়েছে কারণ পনরটি গানের প্রত্যেকটি চামেলির গন্ধে ও অনুরণনে ভরপুর।

হেমেন্দ্রলাল রায়

The Mind in Chains—edited by Cecil Day Lewis (Frederick Muller Ltd.)-5s.

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার লেখকসমাজে গত আট বৎসরে একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, তার সুস্পষ্ট প্রভাব সাময়িক সাহিত্যে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে দেখা যায়। ১৯২৯ সালে যে-বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট আরম্ভ হয়েছিল তার ফলে ধনিক সভ্যতার ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়ে উঠল। সেই দুর্দ্দিনেও সোভিয়েট রাশিয়া অনেকখানি অবিচলিত থাকার ফলেই বোধহয় সাম্যবাদ ও ডায়ালেক্‌টিক্‌-দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের কৌতূহল বেড়ে উঠেছে। ১৯৩৩-এর হিটলারী বিপ্লবের পর ফাশিষ্ট ও সাম্যবাদী এই দুই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রতিক চিন্তাকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে উদ্যত হ'ল। তারপর ১৯৩৬-এ এল স্পেনের অন্তর্বিরোধ। আজকের দিনের সকল আলোচনা এরই প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

ইংল্যাণ্ডে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক তর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে সংস্কৃতি ও সাহিত্যালোচনায় ক্ষেত্রেও যে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বামপন্থী চিন্তাধারা প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আলোচ্য পুস্তকটি তার অন্যতম নিদর্শন। এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছেন কবি সিসিল ডে লুইস; প্রবীণ সাম্যবাদী জ্যাকসন্‌, কৃতি বৈজ্ঞানিক বার্ণাল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক কল্‌ডার-মার্শাল্‌, নবীন কবি ম্যাজ, সম্পাদক রিক্‌ওয়ার্ড প্রভৃতি সুপরিচিত লেখকদের প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। বামমার্গের নানা গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে এই গ্রন্থকারেরা বারটি বিভিন্ন অধ্যায়ে মূল সূত্র নির্ণয়ের যে-প্রচেষ্টা করেছেন সে সন্ধান পলিটিক্সের ক্ষেত্রে আজকের দিনে সম্মিলিত জনশক্তি গড়ে তুলবারই অনুরূপ কার্য্য।

এজাতীয় লেখা সফল হ'তে পারে দুই ভাবে। প্রবন্ধগুলিতে বর্ত্তমান অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হয়েছে বলে' আমার মনে হয় না, ব্যাখ্যা হয়ত মাঝে মাঝে যুক্তির আশ্রয় নেয় নি, বিশেষ বক্তব্য অনেক সময় কষ্ট-কল্পনায় পরিণত হয়েছে। থিওরির প্রয়োগে অক্ষমতা কি ভুল কিম্বা অযথা বিস্তার থাকলেই কিন্তু লেখা ব্যর্থ হয় না। অধ্যাপক হল্‌ডেন্‌ এ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতেও মাঝে মাঝে ভুল হয় তেমনি মার্ক্সের

মূলবিশ্বাসের প্রয়োগ ক্ষেত্র-বিশেষে ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্যে নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মূলবিশ্বাসেই তার যাথার্থ্য নির্ভর করছে। সুতরাং বইখানির বিচার এর উপরেই হওয়া উচিত এবং এদিক থেকে দেখলে অন্ততঃ প্রথম ও শেষের প্রবন্ধ কয়েকটি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এক সূত্র যুক্ত বলে' অবশ্য উপহাস করা যায় যে এই লেখকদের মনই আসলে শৃঙ্খলিত কিন্তু তখনই প্রশ্ন ওঠে যে তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা বস্তুতই স্বাধীন কিনা। সে তর্কের মীমাংসা সুদূরপরাহত—তাই তার মধ্যে প্রবেশ না করে' এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যের এখানে কিছু পরিচয় দেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃতির তরফ থেকে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজকাল এই অভিযোগ আনা যায় যে সামাজিক গঠন ও আর্থিক ব্যবস্থার ফলে সর্ব্বত্রই একটা ব্যর্থতার ভাব ফুটে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন নিজের কাজে গৌরব অনুভব কিম্বা তার ফলে জগতের মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে। শিক্ষা, সাহিত্যচর্চ্চা, এমন কি বিজ্ঞান আলোচনার মধ্যেও গ্লানি ও অবসাদের ভাব আজ নিতান্ত বিরল নয়। জার্ম্মানি ও ইটালী প্রভৃতি দেশের লব্ধকীর্ত্তি সংস্কৃতি আজ বিপন্ন, অন্য অনেক দেশেও তার প্রভাব এখন স্তিমিতপ্রায়। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের যে হিসাব নিকাশ ধনিক সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে--- জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পও তার থেকে অব্যাহতি পায় না বলে'ই অনেকের মতে তাদের এ-দুরবস্থা। আর্থিক জগতের মত এক্ষেত্রেও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার রয়েছে। তা'ছাড়া শ্রেণী-বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠাতে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার অনুভূতি জ্ঞানী বা শিল্পস্রষ্টার সূক্ষ্ম মনকে পীড়িত করতে বাধ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর একদিক থেকে। জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে ধনিককর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল শিক্ষকদের সে বিষয় নিরুত্তর থাকতে হয়, তাই শিক্ষাও হয়ে পড়ে প্রাণহীন। সেই প্রশ্নকে চাপা দেবার জন্য হয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে' প্রচলিত সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে অসরল মনে সমর্থন কিম্বা সমস্যাকে একেবারে এড়িয়ে শিক্ষার তুচ্ছতর কোন অঙ্গ বা উদ্দেশ্যের উপর মনোনিবেশ ভিন্ন গতি থাকে না। আধুনিক সংস্কৃতি-সঙ্কটের আর এক চিহ্ন দেখা যায় ক্রমোন্নতি বা উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনার

প্রতি গভীর অবজ্ঞার মধ্যে। সংশয়ের ভিতর তাই সজীব ও সবল চিন্তা এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বামপন্থী মতবাদের বিশ্বাস এই যে এ অবস্থার মূল কারণ ধনতন্ত্রের অধঃপতন, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক দৌর্ব্বল্য বা অক্ষমতা নয়।

কথা উঠতে পারে যে ধনতন্ত্রের যুগেও অনেক সময় সংস্কৃতির উৎকর্ষ দেখা গেছে, আজকের নৈরাশ্যের জন্য ধনিকপ্রভুত্বকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত? ইংল্যাণ্ডে বণিক রাজত্বের প্রারম্ভে এলিজাবেথীয় সাহিত্য, যন্ত্রযুগের সঙ্গে সঙ্গে রোমাণ্টিক্ কবিতা কি দেখা দেয় নি? রেনেসাঁস্ ও রেফর্মেশনের সময় কিম্বা উদার বিচারশীল গণতন্ত্রের আমলে মানুষের চিন্তাশক্তি ত' অনেক অসাধ্য সাধন করেছিল, অথচ তখন ত' ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা অবাধে চল্‌ছিল। নূতন থিওরিতে এর উত্তর এই যে ইতিহাসে একটা সময় ধনিক-অভ্যুদয়ই ছিল নবীন উদীয়মান শক্তি, শৃঙ্খল তারাই ছিন্ন করে' সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে, ধনতন্ত্রই তখন ছিল বিপ্লবী ও প্রগতিপন্থী। কিন্তু তারপর স্থবিরতা এসেছে, ধনিকশ্রেণীর আর সেই পূর্ব্বতন সতেজ সাহস ও স্বাধীন চিন্তা নেই, ঠিক যেমন আর্থিক জগতে ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশঃ বিকল হয়ে পড়েছে। এখন বার্দ্ধক্যের যুগে ধনতন্ত্র সংস্কৃতির উন্নতি ও এমন কি মুক্তির পথে বাধা-স্বরূপ, সে বাধা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার নেই। সমাজের মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা গড়ে উঠ্‌ছে বলে' বামপন্থীদের বিশ্বাস, কালচারকে এখন তার আশ্রয় খুঁজতে হবে, নয়ত তার তিলে তিলে ক্ষয় ও অধঃপতন অনিবার্য্য। ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার শৃঙ্খল, ঠিক যেমন এক সময় ফিউডাল্ সমাজব্যবস্থা ও ক্যাথলিক্ ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল চিন্তার কঠোর বন্ধন। এই বিশ্বাসই হ'ল ইতিহাসে ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গী—মার্ক্সের এই সূত্রই আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণবস্তু।

সংস্কৃতি শুধু আর্থিক ব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রতিফলন অবশ্য নয়, তাহলে তার সম্বন্ধে ভাববার কোন প্রয়োজনই থাকত না। তার একটা পৃথক সত্তা ও সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাকে তাল রেখে চল্‌তে হবে আর্থিক পরিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে। না চল্‌বার স্বাধীনতা হয়ত তার আছে, কিন্তু তাহলে পরিণামে কাল্‌চারেরই হবে ক্ষতি, তাতে সাময়িক ভাবে তিমির যুগ ফিরে আসাই সম্ভব। বামপন্থার বক্তব্য এই যে যাঁরা সংস্কৃতির পুরোধা তাঁদের কর্ত্তব্য ডায়ালেক্‌টিকের মর্ম্মগ্রহণ করে' ভবিষ্যৎকে বরণ করা, অন্ধভাবে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকলে আসলে কাল্‌চারেরই

সর্ব্বনাশ—আর সমস্যাকে অস্বীকার করা হ'ল তারই নামান্তর। এ প্রস্তাবে অনেকেই আপত্তি করবেন – কিন্তু সে বিবাদ আসলে ডায়ালেক্‌টিক্‌কে অস্বীকারেরই সামিল। এইখানে সমাজের গতি সম্বন্ধে মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংকীর্ণতর সংস্কৃতি-সঙ্কটের যোগ।

সমাজের মধ্যে যখন তার সাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ প্রবলতর হয়ে ওঠে তখন পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের যুগ আসন্ন ভাবা উচিত। সংস্কৃতির প্রচলিত রূপেরও তখন সমস্যা উপস্থিত হয়। বিচার ও নীতির দোহাই দিয়ে তখন নূতন চিন্তাস্রোতকে আটকাবার চেষ্টা স্বাভাবিক। তাতেও বিশেষ ফল না পেলে পুরাতন-পন্থীরা কাল্‌চারকে বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত হ'তে পারে। এর উদাহরণ ফাশিষ্ট্‌ দেশে আজ বিরল নয়। জার্ম্মান্‌ সংস্কৃতির বর্ত্তমান দুর্দ্দিন অনেক লেখককে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার জন্যই পুরাতন আদর্শকে অকস্মাৎ ত্যাগ করতে হচ্ছে, এ ব্যাখ্যা কি ভেবে দেখবার নয়? ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ধনিক প্রভুত্বের ভবিষ্যৎ এখনও অত অন্ধকার নয় বলেই হয়ত সেখানে সংস্কৃতির উদার রূপ টিঁকে আছে···কিন্তু সেখানেও বিপদ এগিয়ে আস্‌ছে। ফর্ষ্টার ইংল্যাণ্ডে সে বিপদকে ফেবিও-ফাশিস্‌ম আখ্যা দিয়েছেন, তার গতি মন্থর হলে'ও সে কাল্‌চারের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে যে উদার আদর্শে আমরা অভ্যস্ত তার সঙ্গে সোশ্যালিজমের কোন চিরন্তন প্রকৃতিগত বিরোধ নেই, তাই স্পেণ্ডার প্রমুখ নবীন লেখকেরা সাম্যবাদকেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গত যুগের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন।

সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে বামপন্থীরা এমন কথা বলেন্‌ না যে, সাম্যবাদী লেখক বই লিখ্‌লেই সে বই ভাল হবে কিম্বা সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। এককালে সাহিত্যের বিচার ছিল অনেকটা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কতকগুলি চিরন্তনী সত্যকে উদ্ভাসিত করার সাফল্যই ছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। রিচার্ডস্‌ প্রমুখ সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে সৌন্দর্য্য,আনন্দ, মঙ্গল প্রভৃতি ধারণার সর্ব্বসম্মত রূপ পাওয়া কঠিন। তাঁরা আবার বোধহয় ভাবেন যে সাহিত্য ব্যক্তি-বিশেষের মনের সূক্ষ্ম আবেগ প্রকাশের বাহন মাত্র। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক শূন্যে বিচরণ করতে পারে না এবং মানুষ একক নয়। তাই প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সাহিত্যের মূলাধার, তার প্রকাশরূপ যতই বিচিত্র, নৈর্ব্যক্তিক ও কল্পনা-প্রবণ হোক না কেন। এ গ্রন্থের অন্যতম লেখক আপ্‌ওয়ার্ডের মতে

তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে বাস্তব হতে হবে। বাস্তব অর্থে অবশ্য বহির্জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফোটোগ্রাফি বোঝায় না—সে বিবরণ অনেক সময় প্রকৃত রূপ ধরতেই পারে না। তাই সাহিত্যে অন্তর্দৃষ্টির এত আদর। মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগের মধ্যেও পরিবর্ত্তন ও গতি আছে, সেখানেও ডায়ালেক্‌টিকের প্রবেশ রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই ছন্দকে রূপ দেওয়াই প্রকৃত বাস্তবসাহিত্য সৃষ্টি।

প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে যে-অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে সাহিত্যের মূল বস্তু তাই;—সে অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্ত্তনই সাহিত্যিক প্রগতির নিয়ন্ত্রণের হেতু। কিন্তু বিষয়বস্তু ছাড়াও সাহিত্যে আর একটা দিক আছে—প্রকাশভঙ্গী। তার অভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাহিত্যের পর্য্যায়ে উঠতে পারে না। ষ্টাইলের এই নৈপুণ্যকে হয়ত বিষয়ের dialectical opposite বলা যায় যদিও এ কথা আপ্‌ওয়ার্ড বলেন নি। এই দুইটির পরস্পর সংমিশ্রণে যে সিন্‌থেসিস্ উৎপন্ন হয় তাকেই সাহিত্যিক সাফল্য আখ্যা দেওয়া চলে এবং তার ভিতর আমরা নূতন এক qualityর পরিচয় পাই। এ প্রসঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান কথা এই যে বর্ত্তমান সঙ্কটে সাহিত্যসৃষ্টি অনেকখানি নির্ভর করছে লেখকদের উদীয়মান চিন্তাধারার সঙ্গে যোগের উপর। পরিবর্ত্তনের ক্রমবর্দ্ধমান ধারাই আজকের দিনে বাস্তব বিশ্বালোচনের মূল কথা—সে অন্তর্দৃষ্টির অভাব থাকলে লেখকের পক্ষে futilityর অবসাদই এখন বেশী সম্ভব। তার উপর নিশ্চয় প্রকাশনৈপুণ্য থাকা দরকার কিন্তু প্রথমটির অভাবে সাহিত্যসৃষ্টির আন্তরিক আবেগই ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে; তখন বস্তুর অভাবে কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগও কমে আসবে। এ ছাড়াও অবশ্য কালচারের উপর ফাশিষ্ট্ আক্রোশের সমূহ বিপদ রয়েছে।

সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের লেখাকে আমরা নূতন ভাবে দেখতে শিখি। যে-লেখাকে এই ভাবে ভবিষ্যৎ যুগ নূতন করে' দেখতে পারে তাকেই মহৎ লেখা বলা যায়। সে জাতীয় লেখকের মধ্যে ষ্টাইলের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রসার ও অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চয়ই থাকে। বড় লেখক যদি স্থিতিশীল যুগের বদলে পরিবর্ত্তন ও সঙ্কটের সময় জন্মান, তবে উদীয়মান ভাবধারার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ স্বপ্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মিল্‌টন্ বা বানিয়ানের জীবন এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডিত করে না। তাঁদের সময় রাষ্ট্রনীতির জগতে পিওরিটান্ পরাজয় ঘটে থাকলেও রেষ্টরেশনের সাময়িক

উত্তেজনার পর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে মধ্যশ্রেণীর উপযোগী পিওরিটান্ প্রভাব কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নি, তাকে তখন পতনোন্মুখ ভাবা কঠিন।

যে-শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ক্ষয়ের মুখে, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত কাল্চারও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে বাধ্য। আর এ কথা বলাও শক্ত যে সামাজিক বিপ্লবের যুগে সাহিত্যিক বা শিল্পী বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে' মানসকুঞ্জবনে সর্ব্বদা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবেন। ইংল্যাণ্ডের নূতন সাহিত্যিকেরা তাই অনেকই বর্ত্তমান সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন। সকলে পলিটিক্সে নামবেন এমন কথা অবশ্য নেই কিন্তু রাষ্ট্রিক সমস্যাকে অস্বীকার করা ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সকলে বড় লেখক হয়ে উঠবেন এমন কথা বলা চলে না কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ও আশার রেখা দেখা দিয়েছে। উইষ্টান্ অডেন্ লিখ্ছেন—

> "Seekers after happiness, all who follow
> The convolutions of your simple wish,
> It is later than you think—"

এই অনুভূতি আলোচ্য গ্রন্থটিকে অনুপ্রাণিত করছে। আর সেই জন্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভেবেই এই লেখকেরা সম্মিলিত জনশক্তিকে ফাশিস্ম্-এর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার আদর্শকেই মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধিজীবীরা নিজের প্রচেষ্টায় এ উদ্দেশ্য সফল করবেন এমন দুরাশা এ লেখকদের নেই। তাঁরা স্বীকার করেন যে ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর, তাঁদের উচিত সে শ্রেণীর সহায়তা করা। তাই শ্রমিকদের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রক্ষক রূপে বন্দনা করা হয়। কালচারের অস্তিত্ব ও প্রসার ক্রমশঃই শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থের অঙ্গ হয়ে পড়বে বলে' এঁদের বিশ্বাস। গত শতকের উদার আদর্শ-বাদীদের পতন সুরু হ'ল সেই মুহূর্ত্তে যখন তাঁরা বুঝতে চাইলেন না যে, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা শ্রেণীশূন্য সমাজ গঠন। ডায়ালেক্টিক্কে তাঁরা উপেক্ষা করলেন এভলিউশনের নামে—অথচ ডায়ালেক্টিক্ আসলে এভলিউশনেরই ব্যাপক প্রয়োগ ও রূপনির্দ্দেশ মাত্র। শ্রমিক অধিনায়কত্ব উদার মতবাদীর কাছে অসহ্য অথচ ধনিক কর্ত্তৃত্ব মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি নেই আর বাধা অপসারণের জন্যই শ্রমিকশাসনের উদ্ভব। সোশ্যালিজমের ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয় বলে' তাঁরা ভয় পান কিন্তু বর্ত্তমানকে ভুলে দূর অনাগতের সম্বন্ধে ব্যাকুল হওয়া তাঁদেরই উপযুক্ত। অতীতের

কাল্‌চার শ্রমিকেরা সমূলে উৎপাটিত করবে এ আশঙ্কাও কি অমূলক নয়? সম্পূর্ণ নূতন শ্রমিক-সংস্কৃতি গঠনের চেষ্টাকে লেনিন্‌ নিন্দা করেছিলেন—সে উদ্যম বাস্তবকে অবহেলা করে' বোহেমীয় আদর্শবাদের ইউটোপিয়ায় পরিণত হ'তে বাধ্য। উদার মতবাদে আজ সমস্যা এড়াবার শেষ যুক্তি—রাশিয়ার অভিজ্ঞতা। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদিও মেনে নেওয়া যায় যে সেখানে বহু অনাচার হয়েছে, তবু প্রশ্ন থাকে যে বিভীষিকার তাণ্ডবলীলা কিম্বা থার্মিডরের আদর্শচ্যুতি কি ফরাসীবিপ্লবকে চিরদিনের জন্য ব্যর্থ ও পঙ্গু করতে পেরেছিল?

শ্রীসুশোভন সরকার

ক্রন্দসী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, (ভারতী-ভবন)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি ঐতিহাসিক, সুতরাং নৈতিক, ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই সর্ব্বগ্রাসী ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোই হল আজকের দিনের প্রধান সমস্যা। বর্ত্তমান পৃথিবীতে তাই সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈতিক ভিত্তি আর নেই। সুধীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবি; কিন্তু আজকের বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার কথা এবং কারণ তাঁর অজ্ঞাত নয়। তবু জ্ঞানের চেয়ে মোহ বড়, এবং আভিজাত্যটা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রক্তে মেশানো। সেজন্য বারে বারে তাঁর মন পুরাতন স্বাতন্ত্র্যের অসম্ভব আদর্শের দিকে ছোটে, এবং ব্যর্থতায় ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। এরই ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা। দুটি পৃথিবীর মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান, তার একটি মৃত, আর একটি জন্মাবার ক্ষমতাহীন। মৃত পৃথিবীর বিষয় আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নবজন্মের সম্ভাবনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মানসিক যন্ত্রণা শেষ পর্য্যন্ত ফাঁপা বলে ঠেকলে অবিচার হবে না। তিনি এসে পড়েছেন বিনষ্টপ্রায় বণিক-বিশ্বের প্রান্তে, উত্তরকালে তাঁর বিন্দু-মাত্র বিশ্বাস নেই, পূর্ব্বকালের স্মৃতি তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। প্রাক্তন, জাতিস্মর ইত্যাদি কথা এবং পৌরাণিক কল্পনার প্রাদুর্ভাব তাঁর কাব্যে সেজন্যই হয়ত বেশী। রাণীকে মৃত জানলেও বাঁদীতে তাঁর কোন আসক্তি নেই। ব্যক্তিগত ভাবে সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমি আস্থাহীন, তবু ফীড্রাসের উদ্ধৃতিকে শ্রদ্ধা করতে

পারি, কারণ এটা ত সহজে কল্পনা করা যেতে পারে যে 'অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য্যে'র আদর্শ আর তার বাস্তব সম্ভাবনার মাঝখানে আছে অনাগত সমাজ-বিপ্লবের ব্যবধান। ততদিন অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য্য আনাটা নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার ; আধুনিক আভি-জাত্যের এই ধ্রুপদী অভীপ্সার প্রতি প্রবল অনুরাগ আনাটা ততদিন শক্ত, কারণ বহুদিন থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত এই আদর্শ আত্মকেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার খোলস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্রন্দসী' পড়ার সময় উপনিষদের বৃক্ষের পরিবর্ত্তে চোখের সামনে ভাসে শূন্যমুখী শিকড়, উৎপাটিত গাছের ছবি। 'What are the roots that clutch, what branches grow'—এই প্রশ্নের উত্তর 'ক্রন্দসী'তে মেলে না।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আকর্ষণের অনেক জিনিষ আছে আঙ্গিকের এবং মননের দিক দিয়ে। তাঁর কবিতার মেরুদণ্ড অত্যন্ত দৃঢ়, যেটা অধিকাংশ বাঙ্গালী কবিতে একান্ত বিরল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দের বলিষ্ঠ এবং বেগবান ঝঙ্কার 'ক্রন্দসী'র প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখায় কয়েকটি বর্জ্জনীয় উপাদান বর্ত্তমান, যেমন স্থানে স্থানে পুনরুক্তির এবং অতি-কঠিন শব্দের প্রাচুর্য্য। এখানে দুটি জিনিষ উল্লেখ করা উচিত। প্রথমতঃ ছন্দের গতিবেগে অধিকাংশ কঠিন শব্দই নিজেদের বোধগম্য করতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সঠিক শব্দ ব্যবহারের সতর্কতা 'ক্রন্দসী'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি পংক্তিতে বিস্ময়কর এবং বেগবান সংহতি আছে। দুএকটি পংক্তিতে তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা অন্যান্য কবিদের হয়ত একটি সম্পূর্ণ কবিতার খোরাক জোটাতে পারে। তবু তাঁর দীর্ঘ রচনার কয়েকটিতে পংক্তিগত সংহতি সত্ত্বেও অসংহতি দোষ বর্ত্তমান।

'ক্রন্দসী'র পটভূমিকা প্রধানতঃ ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের রসায়নিক প্রক্রিয়া তাকে বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত করেছে। এতদিন বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা রামায়ণ ও মহাভারতের মূল উপাখ্যান এবং বহুবিধ ঘটনা-বলীকে চলতি ভাষায় "গল্প" হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। বর্ত্তমান সমাজ এবং ইতিহাসের আলোয় যাঁরা উপরোক্ত ঘটনাবলীকে নবরূপ দিতে পেরেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তথাকথিত প্রেমের কবিতা 'ক্রন্দসী'তে একটিও নেই, এ ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য। 'ক্রন্দসী'র মূল ভাবের কথা প্রথমেই লিখেছি।

ধ্বংসপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশ্ব সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যর্থতাবোধ এনেছে, এবং এটিই 'ক্রন্দসী'র বিশিষ্ট বৈচিত্র্য। এর ফলেই তিনি লিখতে পেরেছেন :

মিশরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই যাদুঘরে
নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনারে পরিপাক করে ॥
(যাদুঘর)

এ জিষ্ণু-সেনার পাছে, জানি জানি, আজিকার মতো
ভ্রমিবে কবন্ধযূথ, অন্ধকার, ত্রস্ত বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার, শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কাল-শেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তি যন্ত্রণা,
ক্ষুব্ধ আত্মধিক্কারের ধূমাঙ্কিত, খিন্ন তুষানল।
(বর্ষপঞ্চক)

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো
সঙ্কুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এতকাল ধ'রে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ;
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে ;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জ্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম ॥ (সমাপ্তি)

'ক্রন্দসী'র শেষ কবিতা 'প্রার্থনা'র মতো ব্যঙ্গ রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। আশা করি সুধীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাবোধ ভবিষ্যতে বেদনাবোধ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। মহাভারতে-কথিত জরৎকারু পূর্ব্ব পুরুষদের দুর্দ্দশা দেখে তাদের দুঃখমোচন করেছিলেন ; তখন সেটার চেষ্টা না করে মূষিক-রূপী কাল দ্বারা ছিন্নপ্রায় শীর্ণ সূত্রের জন্য বিলাপ করতে সুরু করলে যে ছবিটা আমাদের মনে আসে তার সঙ্গে 'ক্রন্দসী'র অধিকাংশ কবিতা তুলনীয়।

সমর সেন

Phoenix—By D. H. Lawrence. (Heinemann)

লরেন্সের মৃত্যুর পর এই বৃহৎ রচনা-সঙ্কলন প্রকাশিত হল এডওয়ার্ড ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের সম্পাদনায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে Daily Herald-এ প্রকাশিত রচনা-গুচ্ছ বাদ পড়েছে। সেগুলি নিশ্চয়ই পরের বৃহত্তর সংস্করণে প্রকাশিত হবে। লরেন্সের লঘু-সাহিত্য-চর্চ্চা জাতীয় বহু রচনা এতে পাই। এর মধ্যে 'Flowery Tuscany' Criterion পত্রিকায় পূর্ব্বেই পড়েছি। আমেরিকায় প্রকাশিত আরও প্রবন্ধ এক সঙ্গে প্রকাশিত হল, যার খবর পূর্ব্বে আমরা পাইনি। এর জন্যে সম্পাদকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

লঘু-সাহিত্য-চর্চ্চা বা Journalism সাধারণতঃ উপভোগ্য না হলেও লরেন্সের সমস্ত সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভেতরে তাঁর প্রাণবান ও বলবান মনের সন্ধান পাই বলে তা উপভোগ্য। তাই লরেন্সের অধ্যাপক শেরম্যানের ওপর প্রখর আক্রমণও আনন্দদায়ক। লরেন্সের এই জাতীয় রচনার প্রধান গুণ—insouciance—লরেন্সের ভাষায়। অপেক্ষাকৃত গুরু-রচনার ভেতর ভ্রমণবৃত্তান্তই বেশী। এতে প্রাক্-সামরিক ইউরোপ ও মেক্সিকোর বহু মনোজ্ঞ চিত্র পাই। এ বিষয়ে তিনি বহু সাহিত্যিক ভ্রাম্যমাণদের পূজ্য। সম্পূর্ণ আত্ম-নিরুদ্ধ হয়েও মনের স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম রক্ষা করে চলা সম্ভব, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লরেন্স। এই বিশ্ব-মানবিক নিরীক্ষা, অদ্ভুত prophetic mass-diagnosis, দুর্লভ।

সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য রচনা পাই গলস্‌ওয়ার্দি ও হার্ডির সমালোচনায় এবং The Education of the People ও অসম্পূর্ণ নভেল The Flying Fish-এ। The Education of the People যুদ্ধের প্রাক্কালে লেখা এবং The Fantasia of the Unconscious-এর অগ্রজ। অসমাপ্ত Flying Fish-এর জন্যে দুঃখ হয়। তবু তার প্রস্তাবনার জন্যেও লরেন্সের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ নভেলটি সুসমাপ্ত হলে Rainbow বা Women in Love জাতীয় নভেল হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাহাজ-যাত্রী হয়ে দেখতে পাই বিরাট সমুদ্রের ওপর ডল্‌ফিন্‌দের জলকেলী আর উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। তার ভেতর মন যায় ডুবে। ঘুরে ফিরে একই পটের ওপর নানা বর্ণের চিত্রাঙ্কন চল্‌তে থাকে বিচিত্র ভঙ্গীতে। মন শ্রান্ত হয় না। এই টুডর-সুলভ লিখন-রীতি লরেন্সের নিজস্ব ও স্বোপার্জ্জিত। এই রীতি Phoenix-এর সব রচনাতেই দ্রষ্টব্য। মনের বিশেষ বিশেষ সুরে এক

একটা রচনা বাঁধা, কিন্তু একই স্বরসাধনা। এক দিক দিয়ে এটাই লরেন্সের সাহিত্য-সাধনার সীমা। Joyce বা Eliot-এর মন ও রসবস্তু বিচিত্রতর। এবং তাঁদের মিতব্যয়ী মন বহু নূতন রসবস্তুতে অন্তঃসত্ত্ব।

জন গলস্‌ওয়ার্দি'র ওপর প্রবন্ধটি উগ্র হলেও সুচিন্তিত। গলস্‌ওয়ার্দির ওপর লরেন্স দক্ষিণ-মুখ হতে পারেন নি বলে তাঁর ওপর অবিচার করেছেন ভাবা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এ প্রবন্ধে লরেন্স নিজের জীবনাদর্শের তরফ থেকে বহু কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যা দরকারী। এ বিষয়েও এটা উল্লেখযোগ্য। কারণ এই আদর্শের গুণে তিনি প্রায় একাকী। হার্ডির প্রবন্ধেও তা দ্রষ্টব্য। প্রথমেই সাহিত্য-সমালোচনার নিজস্ব সূত্র তিনি প্রণয়ন করেন—"Literary criticism can be no more than a reasoned account of the feeling produced upon the critic by the book he is criticizing. Criticism can never be a science : it is concerned with values that science ignores. All the critical twiddle-twaddle about style and form, all this pseudo scientific classifying...is mere impertinence and mostly dull jargon. রিচার্ডস্‌-পন্থীরা এর উত্তর হয়ত দিতে পারেন বিশ্বাস করি। কিন্তু শুধু উত্তর দিতে পারাটাই বিশেষ কিছু প্রমাণ করে না। কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা ত দূরের কথা। তার পর, সমালোচকদের কোন জাতীয় জীব হওয়া উচিত, এই সূত্রে লরেন্সের বক্তব্য—a man who is emotionally educated is rare as a phoenix. The more scholastically educated a man is generally, the more he is an emotional boor. A critic must be emotionally alive, intellectually capable and skilful in essential logic, and then morally very honest। 'skilful in essential logic' এবং "morally very honest" এর বিশদ টীকা প্রয়োজন। তা ছাড়া এ জাতীয় জীব লরেন্সের জীবিতাবস্থায় জন্মায় নি বোধ হয়, এক লরেন্স ছাড়া। তারপর 'human beings' সম্বন্ধে লরেন্সের বক্তব্য বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য।—The human individual is a queer animal, always changing. But the fatal change to-day is the collapse from the psychology of the free human individual into the

psychology of the social being,...while a man remains a man, a true human individual, there is at the core of him a certain innocence or naivete which defies all analysis. This doesn't mean that the human being is nothing but naive or innocent. But in his essential core he is naive, and money does not touch him—এ কথা এখন হয় ত অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নেই। বলা বাহুল্য এ মন নিয়ে লরেন্স একটা pantisocrasy গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারতেন কোল্‌রীজের মত। কিন্তু লরেন্সের অন্তর্দৃষ্টি ও দূর-দৃষ্টি কোলরীজের চেয়ে বেশী ছিল। তাই কোলরীজের দুর্ভাগ্য তাঁর জীবনে আসে নি। শুধু নিজেকে নিয়েই পালিয়ে ফিরেছেন দেশ দেশান্তরে। 'Study of Thomas Hardy'-তে তাঁর নিজের বহু তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন দশ অধ্যায়ে। মানুষের জীবনের পারস্পরিক যৌন সম্বন্ধ কি ভাবে তাদের জীবনকে বিশেষ রূপ দেয় ও নিয়ন্ত্রিত করে এটাই তাঁর বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং লরেন্সের এই নিরুক্তি আধুনিক মনোবিজ্ঞান-নিরপেক্ষ, যার বিভিন্ন লরেন্সীয় সংজ্ঞা বা মুদ্রা Phoenix, Rainbow, Solar Plexus।

এ সব তথ্য ছাড়াও হার্ডির অতি উৎকৃষ্ট সমালোচনা হিসাবেও এটা অবশ্য পাঠ্য। বিশেষতঃ 'Jude the Obscure'-এর সাহিত্যবিচারে লরেন্সের অভিমত অকাট্য বলেই মনে হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

নদী-পথে—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। ভারতী-ভবন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

'পর পর তিন বড়-দিনের ছুটিতে বাঙ্গালা ও আসামের নদীতে বেড়াবার সময় ষ্টিমার থেকে যে সব চিঠি লিখেছিলাম কিছু রদবদল করে সেগুলিকে ছাপান গেল'—লেখক ভূমিকায় এই নিবেদন করেছেন। ছাপান সার্থক হয়েছে। বাংলাদেশের যে অংশটি নদীপ্রধান তারই একটি ছবি লেখক আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। দুঃখ হয় যে ছবিটি মনোরম হলেও সম্পূর্ণ নয়। তার জন্য

লেখককে দোষ দেওয়া চলে কিনা জানি না, কেননা তিনি ভূপরিচয় লেখেননি, লিখেছেন শুধু ভ্রমণবৃত্তান্ত। কিন্তু এরই সঙ্গে যে সকল অঞ্চলে তিনি বেড়িয়েছেন তাদের আর একটু বিশদ বর্ণনা, দু'একটি নকসা ও মানচিত্র সমেত দিলে বইটির মূল্য আরো অনেক বেশি হোতো সন্দেহ নাই।

বইটি চল্‌তি ভাষায় লিখিত। লেখক এই ভাষার একজন বড় পাণ্ডা। চল্‌তি ভাষায় বাংলায় অনেক ভালো জিনিষ বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও বীরবল এই ভাষাকে যে মর্য্যাদা দিয়েছেন তা 'সাধু' ভাষার থেকে কম তো নয়ই, বরঞ্চ বেশি। কিন্তু সাধু ভাষায় বা চল্‌তি ভাষায় একটি অভাব বাংলা রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ছোটো খাটো টুকটাক্ জিনিষ, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা তুচ্ছ আকিঞ্চনের ব্যাপার, নিত্য চলা ফেরা করতে বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের নানা-সূত্রে যে পরিচয় ঘটে—এই সবের যথাযথ বর্ণনা। 'নদী-পথে' এই জাতীয় বর্ণনা বহু জায়গায় আছে। লেখক যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছেন শুধু চোখে যা দেখেছেন হুবহু তাই, মনের মালমশলা ও ভাষার কারিকুরি যোগ না করে, পাঠককে উপহার দিতে।

একটি কথা না বলে আর পারলাম না। লেখক 'কুয়াশা' না লিখে লেখেন 'কোয়াশা' কোন্‌টি হওয়া উচিত জানিনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখে 'কোয়াশা' বসানো—'আলোরে যে গ্রাস করে খায়, সেই কোয়াশা সর্ব্বনেশে' (নদী-পথে—১৮ পৃষ্ঠা)—অমার্জ্জনীয়।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্ব্বণ—স্বামী সদানন্দ প্রণীত, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বামী সদানন্দ গিরি একজন অক্লান্ত পর্য্যটক। হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর গভীর শ্রদ্ধার আকর্ষণে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার স্মৃতি বিজড়িত নানা স্থানে তিনি তীর্থ-যাত্রীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরেও যেখানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত কীর্ত্তি-চিহ্নের সহিতও পরিচিত হইবার আগ্রহে সুদূর শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও তিনি গিয়াছিলেন।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে লেখক শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার চিহ্নাবশেষের কিছু পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন। এই সকল স্থানে যে সমস্ত হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবদেবী পূজিত হইতেন বা এখনও হইতেছেন তাঁহাদের বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের ভিতর এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ বলিদ্বীপে হিন্দু-ধর্ম, আখ্যান ও কাহিনী এখনও কেমন সুস্পষ্ট তাহার বিশদ বিবরণ লেখক "আমোদ প্রমোদ" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে পূজা-পদ্ধতির বিবরণ লেখক দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সুশৃঙ্খল, সুসমঞ্জস এবং সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। চারিটি পরিশিষ্টের একটিতে এই সমস্ত পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং আর একটিতে বলিদ্বীপীয় মুদ্রাদির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

লেখক পাণ্ডিত্যের দাবী করেন নাই, এবং পণ্ডিত সমাজের জন্য পুস্তিকাখানি রচিত না হইলেও ইহাতে জটিল প্রশ্নেরও অবতারণা এবং আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম এখানে পূর্ব্বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা কতকাল আগে এখানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সকল স্থানে প্রচলিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি স্থান কোথায় এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা এখনও হয় নাই। এ সমস্ত বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং লেখকের সিদ্ধান্তগুলি হয় তো অনেকের নিকটই সমীচীন বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু সে তর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন, কারণ পুস্তকখানি সাধারণের জন্য লিখিত। লেখক নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল এমন মনোজ্ঞ ভাবে সাজাইয়াছেন যে সাধারণ পাঠকের পুস্তিকাখানি ভালই লাগিবে বলিয়া মনে হয়। বৃহত্তর ভারতের কথা সুধীসমাজের নিকট অপরিচিত না হইলেও সাধারণে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। এই জন্য বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তকের আবশ্যকতা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "প্রবাসীতে", এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় "বিচিত্রায়" এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং তৎপরে "ভারত ও ইন্দোচীন" এবং "ভারত ও মধ্য-এশিয়া" নামক দুই খানি গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকাখানি ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারের একটি অধ্যায় সাধারণ পাঠকের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিবে আশা করা যায়।

শ্রীসরসী সরস্বতী

নিবেদন

আগামী ১২ই অগ্রহায়ণ-এ
'পরিচয়' কার্য্যালয় ও ভারতী-ভবন
১১নং কলেজ স্কোয়ার-এ স্থানান্তরিত
হইবে। অতএব উক্ত তারিখ হইতে প্রবন্ধ,
চিঠি ইত্যাদি নূতন ঠিকানায় পাঠাইলে
বাধিত হইব।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড,
ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

পরিচয়

রতির তারতম্য

গতবারে আমরা বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ঐ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, ভক্তি কিরূপে বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 'সর্ব্বধর্ম্মান্' পরিত্যাগ করিয়া প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেমের মূলে মমতা—'মমতা প্রেমসঙ্গতা' অর্থাৎ আত্মীয় বুদ্ধি। এই মমতার পারিভাষিক নাম 'রতি'। আমরা জানিয়াছি, ঐ রতি পঞ্চবিধ—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর
বাৎসল্যরতি, মধুররতি পঞ্চবিভেদ
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ

—চরিতামৃত

'কৃষ্ণ-ভক্তি'—কেননা, বৈষ্ণব আগমে ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ

—ব্রহ্মসংহিতা

ঐ রতি পঞ্চকের গতবারে আমরা সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন আর একটু নিবিড় ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম শান্ত-ভক্তি। যিনি শান্তভক্ত, যেমন ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্র ও সনক-সনন্দ প্রভৃতি—তাঁহার স্বভাব—

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥

যিনি শান্তভক্ত তিনি,

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।

—ভাগবত, ৬।১৭।২৩

শান্তভক্তের চিত্তে যখন কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন,

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

তিনি তখন—

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

—ভাগবত, ১১।২।২৪

ইহার উপর দাস্য-ভক্তি। দাস্যভক্ত—যেমন, উদ্ধব, বিদুর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হনুমান্—খৃষ্টানের ভাষায় ইহারা Servitors of God (সেবক)। দাস্যভক্তির সম্বন্ধে দুর্ল্লভসারগ্রন্থকর্তা লোচনদাস বলিয়াছেন—

দাস্য-পীরিতি করে অধীন হইয়া।
নিরপেক্ষ হয় পদমধুগন্ধ পাঞা॥
ভয় ভক্তি করে কেহো ঈশ্বর বলিয়া।
অপরাধ ডরে নিরবধি কাঁপে হিয়া॥

এ সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এই ঃ—

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥

দাস্যভক্ত ভগবানের নিত্য কিঙ্কর। দাস্যভক্ত বলেন,

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমেকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥

'হে নাথ! কবে আমি ঐকান্তিক নিত্যদাস হইয়া সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করিয়া তোমার আদেশ অনুসারে আমরণ আত্মাকে আনন্দিত করিব।'

দাস্যভক্ত ভগবানের পাদপদ্মের দাসের দাসের দাস—

গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ।

দাস্যভক্ত দাক্ষিণাত্য-কৃত শ্লোকের ভাষায় বলেন—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

'হে নন্দনন্দন! বিষম ভবাব্ধিতে পতিত এই কিঙ্করকে কৃপায় তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলির সমান মনে করিও।'

আমি তোমার কিঙ্কর—তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস—তোমার উপভুক্ত স্রক্‌চন্দন নির্মাল্যে আমার লালসা—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

—ভাগবত, ১১।৬।৪১

ভগবান্‌কে হারাইবার ভয়ে তিনি উদ্ধব-বাক্যের প্রতিধ্বনি করেন—

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব!
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি॥

মীবারের রাণী মীরাবাঈ সমস্ত দাস্য-ভক্তের প্রতিভূ হইয়া ভগবানের নিকট দাসভক্তের চিরন্তন প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন—

মেনে চাকর রাখোজি!
চাকর রাখো চাকর রাখো চাকর রাখোজি!
মীরাকে প্রভু পহির গভীরা হৃদয় বহকি ধীরা
আধিরাতকে দরশন দাইহে!

সুফি ভক্তের সার কথা—'খোদার দস্তের দস্তানা হওয়া'—বৈষ্ণব আরও মধুর করিয়া বলেন,—

যাব আমরা ব্রজেন্দ্রপুর
শ্যামের পায়ের হব নূপুর
শ্যামের পায়ের নূপুর হ'য়ে রুণুঝুণু বা'জব।

দাস্যভক্তির উপর সখ্যভক্তি। সখ্যভক্তি সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্য বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান।*
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥

এ সম্বন্ধে দুর্ল্লভসারের উক্তি এই,—

সখ্যপীরিতি যে সেই হয়ে দ্বিবিধ।
একাকার সিদ্ধ আর ভিন্নাকারে সিদ্ধ॥
সেইত দ্বিবিধ সখ্য চতুর্ব্বিধ লেখা
সখা, সুহৃদয়, প্রিয়, আর মর্ম্মসখা॥

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভক্ত—ব্রজে শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন। ব্রজের বাহিরে অর্জ্জুনই সখ্য ভক্তির জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সত্য সখা, নিত্যসখা। তাঁহাতে নর-ঋষির আবেশ—অপর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ-ঋষির মানবী তনু।

অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্

এই নর ও নারায়ণ ঋষি—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জ্জুন-কেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ॥
—উদ্‌যোগপর্ব্ব, ৯৬।৪৬

* সেই জন্য ভাগবতে শুনিতে পাই—উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ

এই নর-ঋষি নারায়ণ-ঋষির সহিত হিমালয়স্থ বদরীতে বহু সহস্র বৎসর উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণ-সহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥

বনপর্ব্ব, ৪০।১

অতএব নর নারায়ণের নিত্য সহচর। তা'ই গীতায় অর্জ্জুনের মুখে শুনিতে পাই—

—সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।

কিন্তু সখ্য-ভক্তির সুপ্রচুর প্রকাশ বৃন্দাবনের গোষ্ঠ লীলায়—যেখানে—

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ

—ভাগবত, ১০।১২।১১

কত পুণ্যে ব্রজবালক নরদেহী ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকের অধিকারী হইয়া বলিতে পারিয়াছিল—

বড় সুমিষ্ট এ ফল খারে কৃষ্ণ আমি খেয়েছি
মধুর ব'লে আর না খেয়ে ধড়ায় বেঁধেছি॥
ফল খেয়ে ভাই নাচতে হবে
নাচবো আমরা রাখাল সবে
সবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে আয় দেখি নাচি॥

মনে আছে—কী সখ্যপ্রেমে গদগদ হইয়া তাহারা নির্ম্মল প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া বলিত—

হারে রারেরারে উঠরে কানাই
বেলা হল চল চল গোঠে যাই
আয় আয় কানু আয়রে

কবি গিরিশচন্দ্রের এই বিখ্যাত সঙ্গীতের মূল একটি প্রাচীন পদ—সেটি যেন আরও মধুর! তথায় গোপসখা ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এইরূপ :—

গোপবালকের উক্তি—

ভাই! স্বপনে কখন, মধুর বচন
'তুমি' বলি নাই মোরা রে।

ওরেরে হাঁরেরে বলিয়ে ডাকিরে
গোপশিশুর এই ধারারে ॥
(কত) মেরেছি ধরেছি কাঁধেতে চড়েছি
কুবোল বলেছি মোরারে।
হাঁরেরে রেরেরে বলি যে ডাকিরে—
গোপজাতের এই ধারারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি—

শুন শিশুগণ করি নিবেদন
স্বরূপ কহিয়ে তোদেরে।
'ওরেরে হাঁরেরে আয়রে কানাইরে'
বলিয়া ডাকিও মোরেরে ॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে লেপিলে
মোর নহে যত সুখ
'ওরেরে হাঁরেরে' বলিয়া ডাকিলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে বুক ॥

লোচনদাস বলেন, ব্রজধামে দ্বিবিধ সখ্য—এক শ্রীদাম সুদাম সখার সখ্য, আর এক ললিতা বিশাখা সখীর সখ্য।

সখ্য দ্বিবিধ সেই কহি বিবরিয়া
বয়স্য প্রসিদ্ধ আর গোপীগণ লৈয়া ॥
কেহ সখা কেহ সখী ভাবে লিখি এক।
ভাবের স্বভাব তুই দেখ পরতেক ॥
কাম সম্বন্ধে ভজে যত গোপীগণ।
দেহে বয়সেতে হয় ভাব উদ্দীপন ॥
সখাগণ ভজে কিবা সুবেশ বয়সে।
কামতত্ত্বে ভজে গোপী হাসপরিহাসে ॥
লীলালাবণ্য রূপ বিনোদ বিলাস।
হৃদয় নিবদ্ধ তায় বন্ধুভাব রস ॥—তুর্লভসার

রাধা ভিন্ন অন্য গোপীর এই সখীত্ব সিদ্ধি করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন-লীলার উপর এক চমৎকারী নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দেখি গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন, অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণ রমণ, তাঁহারা রমণী—এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দে শ্রীরাধা যাহার নায়িকা—সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ—'চুম্বতি কামপি, শ্লিষ্যতি, কামপি, কামপি রময়তি রামাম্' কিন্তু চরিতামৃত বলিলেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ কেলি হৈতে তা'তে কোটি সুখ পায়।

পুনশ্চ

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম।
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।

—চরিতামৃত, মধ্যলীলা

অর্থাৎ এ ভাবে সখীরা 'সঙ্গতা' নহেন 'সঙ্গময়িতা'—

রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী (বিদগ্ধমাধব)

একেই বলে 'Vicariously', পরস্মৈপদে—গোপীরা এখানে রাধিকার 'প্রিয় নর্মসখী'—প্রতিদ্বন্দ্বী (rivals) নহেন।

তাই 'চৈতন্য প্রভুর দাস-অনুদাস' নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন—

কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন।
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব করে হেরিব মুখচন্দ্র।
গাঁথিয়ে মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥

সেই জন্য চরিতামৃতকার বলেন—

সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি
সখীভাবে তাঁহারেই করে অনুগতি।

রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

এই সখীতত্ত্ব সম্পর্কে 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক কথা আছে—এখানে তাহার আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে নরোত্তম ঠাকুর 'ভক্তিতত্ত্ব-সারে' সখীগণের যে গণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব।

রাধিকার সখী যত,
তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন।
ললিতা বিশাখা তথা,
চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী স্বদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা,
এই অষ্ট সখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্মসখীগণ।
রাধিকার সহচরী,
প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার,
শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে
কস্তূরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেম সেবা করি কুতূহলী॥

সখ্য-ভক্তির উপর বাৎসল্য-ভক্তি—যেমন বসুদেব-দেবকীর, বিশেষতঃ নন্দ-যশোদার। বাৎসল্য-ভক্তি সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎ'সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান॥

সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত রসগুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে॥

সুরদাসের একটি গান শুনুন—

আরতি করতহি যশোমতী মাই।
মনমে আনন্দ হোকে বেশ বনাই॥
দীপক জ্যোতি অঙ্গে বিজরী খেলাই।
নন্দ মহারাণী ঠারে আঙিনামে
হাসত গায়ত মন সুখ পাই॥
ব্রজক বালক যত আয়ত যুথ যুথ
নাচত গায়ত করতালি দেই॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছেন—তখন ব্রজের কি ভাব ?

যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠল
সাহসে উঠই না পার
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল
বিছুরল নগর রাজার।

আর যশোদা বিরহে বিভোর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিয়া বলিতেছেন—

অঞ্চলের মণি এসরে নীলমণি
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে
আয়রে কোলে করি হেরি চাঁদ বয়ান।

সেই জন্য শুকদেব নন্দ-যশোদার সৌভাগ্যে বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন—

নন্দঃ কিম্ অকরোৎ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ॥—১০।৮।১৬
নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥—১০।৯।২০

ভগবতী উমার আগমনী-বিজয়ায়ও আমরা এই বাৎসল্য ভক্তির উচ্ছল প্রবাহে অভিষিক্ত হই।—দেখিতে পাই,—মায়াতীত মহামাহা মায়াবী মানুষের

মত স্নেহ ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া মাতাপিতাকে সংবৎসরান্তে দেখিবার জন্য ছল ছল নেত্রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন—

এসেছেন পিতা অচল আঁখি দুটী ছল ছল,
কেবল বল্‌ছেন চল চল, কি আজ্ঞা হয় পশুপতি !
সম্বৎসর হইল গত, মা আমার কাঁদিছেন কত,
আসিব হে ত্বরান্বিত করি আমি এই মিনতি।

আবার দেখি বিজয়া-দশমীর দিন জগন্মাতা পার্থিব মাতার বিচ্ছেদ-ভয়ে বিধুরা হইয়া সারনিশি জাগিয়া বিষণ্ণ ও মলিন বদনে রোদন করিলে গিরি-রাণী তাঁহার উদ্দেশ্যে কাতরে বলিতেছেন—

জাগাওনা হরজায়ায় জয়া ! তোমায় বিনয় করি
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী।
নিশি জেগে কাতর হয়ে আছেন উমা ঘুমাইয়ে,
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি॥

বাৎসল্যরসের ইহা বেশ মিষ্টমূর্ত্তি—কিন্তু মনে হয় নন্দ-যশোদার বাৎসল্য যেন আরও মধুময়। ইহার পর মধুর বা উজ্জ্বলা ভক্তি—তাহার কথা আগামীবারে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতপথে*

(৩)

আজিজ লোকটি ছিল আঁটসাঁট ছোটোখাটো, হাতপাগুলো যেন কোনো রকমে জোড়াতাড়া দেওয়া, কিন্তু, আসলে, ওর গায়ে শক্তি ছিল ভীষণ। তবু হাঁটলে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যেমন সবাই এদেশে হয়, কেবল নতুন যারা আসে তারা ছাড়া। মাটিতেই কি যেন একটা প্রতিকূল ভাব আছে, হাঁটতে গেলে কোথাও এমন নরম যে পা যায় একেবারে দেবে, কোথাও হঠাৎ এমনি শক্ত আর এবড়ো খেবড়ো যে পথের যত নুড়ি আর পাটকেল পায়ে বেঁধে। দু'একবার এরকম হ'তে হ'তেই দম বেরিয়ে যায়। তা'ছাড়া আজিজের পায়ে ছিল পাম্প-সু, যা শুধু এ দেশ কেন কোনো দেশেই পথ চলার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। সিভিল ষ্টেশনের প্রান্তে এসে জিরিয়ে নেবার জন্যে ও গিয়ে ঢুকল একটা মসজিদে।

এই মসজিদটি বরাবরই ওর বড় পছন্দসই ছিল। জায়গাটির যেমন শ্রী, তেমনি সুন্দর ব্যবস্থা। ভাঙা খিলান-করা দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকেই প্রশস্ত আঙিনা, সেখানে একটি চৌবাচ্চা, পরিষ্কার টাটকা জলে ভরা, সহরের কলের সঙ্গে যোগ থাকায় সব সময়ে তার জলে স্রোত বইছে। ভাঙা পাথরের টালি দিয়ে আঙিনাটি বাঁধানো। মসজিদের বাড়িটার প্রস্থ সচরাচর মসজিদের যা' হয় তার চাইতে বেশি, দেখতে অনেকটা বিলাতি গির্জের দু' পাশের দেওয়াল ভেঙে দিলে যেমন হয় সেই রকম। ও ব'সে ব'সে দেখতে পাচ্ছিল সামনের তিনটে খিলান, ভিতরে একটা বাতি টাঙানো, এই বাতির ও চাঁদের আলোয় সেখানকার অন্ধকার দূর হয়েছে। পূরোপূরি চাঁদের আলো পড়লে সামনেটা মনে হয় যেন মার্বেল

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আগন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে। অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পঃ সঃ

পাথরের, মাথার কাছে কালো হরফে খোদা আল্লার নিরানব্বই নাম সাদার উপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, যেমন এই সাদা ফুটে উঠেছে আকাশের গায়। বাইরে সাদা কালোর বিরোধ ও ভিতরে ছায়ায়-ছায়ায় দ্বন্দ—এই দ্বৈত রহস্য আজিজের মনকে করেছিল মুগ্ধ। ওর মনে হচ্ছিল এক বড় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতীক্ এই সমগ্র দৃশ্য—সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে ও করছিল চেষ্টা। মসজিদে ওর মন সায় পেত, তাই মসজিদে এসে ওর কল্পনা হয়েছিল উধাও। হিন্দু, ক্রিশ্চান, গ্রীক্—অন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের মন্দিরে ওর শুধু বিরক্তি ধরত, ওর সৌন্দর্য্যবোধকে স্পর্শ করে এমন শক্তি তাদের ছিল না। কিন্তু এ হ'ল ইসলাম, একেবারে ওর অন্তরঙ্গ রাজ্য, ধর্ম্মবিশ্বাসের বাড়া, 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনির বাড়া—সবার বাড়া···দেহমনের একান্ত আশ্রয় এই ইসলাম, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ওর সমগ্র জীবনবেদ, সূক্ষ্ম ও চিরন্তন এর প্রভাব।

আঙিনার বাঁ দিকের নীচু দেওয়ালের উপর আজিজ ব'সেছিল। সেখান থেকে ঢালু জমী নেমে গেছে সহরে, অর্থাৎ, দূরে যে গাছের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে তারই দিকে। চারদিক নিস্তব্ধ, তার মধ্যে ওর কানে ভেসে আসছিল নানা রকমের শব্দ। ডানদিকে ক্লাবে সাহেবদের সখের বাজনার দলের বাজনা জ'মে উঠেছিল। আর এক জায়গায় একদল হিন্দু ঢাক পিটোচ্ছিল—হিন্দু যে তার প্রমাণ তার একঘেয়ে আওয়াজ ওর মোটে বরদাস্ত হচ্ছিল না। আবার কতকগুলি লোক এক মড়াকে ঘিরে কান্না জুড়েছিল—সে জানত কার মড়া, কেননা বিকেলে সে তার মারা যাবার সার্টিফিকেট দিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া ছিল পেঁচার ডাক, পঞ্জাব মেল···আর ষ্টেশন-মাষ্টারের বাগানের ফুলের মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু রাত্রির এই বিচিত্র আকর্ষণ কাটিয়ে ওর মন বারবার ফিরে আসছিল ঐ মসজিদে—একমাত্র ঐ মসজিদই ওর কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, তাই একে ঘিরে ঘিরে ওর মন রচনা করছিল এমন সব অর্থ যা এই মসজিদ যারা গড়েছিল তাদের মাথাতেও কোনোদিন আসেনি। একদিন ও নিজে একটা মসজিদ গড়বে, এই মসজিদের চাইতে ছোটো, কিন্তু একেবারে নিখুঁৎ; সেখানে এসে পথিকেরা আজ ওরই মতন তৃপ্তি পাবে। সেই মসজিদের কাছে ছোট্ট একটা গম্বুজের তলায় হবে ওর সমাধি, আর তার উপরকার পাথরের বেদীতে এই ফারসি কবিতা খোদা থাকবে ঃ

জানি, আমি জানি, হায়,
　　এ ধরায়,
আমি রহিব না, তবু, গোলাপ-মঞ্জরী
　　বিকশিবে বর্ষ বর্ষ ধরি ;
　　সহস্র বসন্ত তার
　　দিয়ে যাবে পত্রপুষ্পভার।
শুধু যারা বুঝিয়াছে মনে,
　　সঙ্গোপনে,
আমার অন্তরতম বাণী,
　　জানি,
অন্তিম শয়নে যেথা রহিব শয়ান,
সেথা রেখে যাবে তারা হৃদয়ের বেদনার দান।

এই কবিতাটি ও দেখেছিল দাক্ষিণাত্যের কোন এক রাজার সমাধির উপর, আর দেখে' ওর মনে হয়েছিল এর মধ্যে রয়েছে গভীর তত্ত্বকথা ; করুণ রস হ'লেই ও মনে করত খুব গভীর। 'অন্তরতম বাণী !' আপন মনে ও এই কথাটি আবার বল্‌ল, আর ঠিক সেই সময়ে ওর মনে হ'ল মসজিদের একটা থাম যেন কাঁপছে, তারপর অন্ধকারে একটু ন'ড়ে থামটা যেন সরে গেল। ওর রক্তে ছিল ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, কিন্তু, তবু শক্ত হ'য়ে ও ব'সে রইল। আবার একটা থাম নড়ল—তারপর তৃতীয় একটা, আর তার পরেই এক মেম চাঁদের আলোয় বেরিয়ে পড়লেন। হঠাৎ বিজাতীয় রাগে "ম্যাডাম, ম্যাডাম" ব'লে আজিজ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

স্ত্রীলোকটি একটু যেন ভয় পেয়ে এঁ্যা এঁ্যা করতে লাগলেন।

"দেখুন, এটা মসজিদ্, এখানে আপনার যা'তা' কর্‌বার অধিকার মোটেই নাই ; আপনার উচিত ছিল জুতো খুলে আসা ; জানেন, এটা মুসলমানদের একটা পবিত্র জায়গা ?"

"আমি জুতো খুলেই ঢুকেছি।"

"খুলেছেন ?"

"হ্যাঁ, আমি গেটের কাছে জুতো রেখে এসেছি।"

"তা'হ'লে আমাকে মাপ করবেন।"

স্ত্রীলোকটির ত্রস্ত ভাব তবু ঘুচল না ; মাঝখানের চৌবাচ্চাটির ওপার দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

আজিজ চেঁচিয়ে বলল, "কিছু মনে করবেন না আমার কথায়।"

"তাহলে আমার কিছু ত্রুটি হয়নি, কেমন ? জুতো খুললে পরে তো আর আসতে আপত্তি নাই ?"

"নিশ্চয় না, তবে মেম সাহেবরা বেশির ভাগই আর অতটা মেহনৎ করেন না। বিশেষত যদি মনে করেন যে কেউ দেখছেনা।"

"তাতে কি হয়েছে, ঈশ্বর তো আছেন এখানে।"

"দেখুন।"

"আমায় এবার যেতে দিন।"

"আচ্ছা, আপনার কোনো উপকার আমার দ্বারা হ'তে পারে কি—এখন হোক, পরে হোক্ ?"

"না, না, সত্যি কোনো দরকার নেই, এবার আসি।"

"আপনার নাম বলবেন না ?"

স্ত্রীলোকটি এতক্ষণে দরজার অন্ধকারে গিয়ে পড়েছিলেন, সুতরাং আজিজ তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু, তিনি আজিজের মুখ দেখতে পেলেন, তাই একটু নরম সুরে তিনি জবাব দিলেন, "মিসেস্ মূর।"

"মিসেস্—।" একটু এগিয়েই আজিজ দেখল তিনি বৃদ্ধা। এক মুহূর্তে চূরমার হ'য়ে গেল এই মসজিদের চেয়েও বড় যে সৌধ ও এতক্ষণ মনে মনে গড়ে তুলেছিল। লাল মুখ, শাদা চুল, বয়স তাঁর হামিদুল্লা বেগমের বেশি বই কম নয়। আজিজ ভুল বুঝেছিল মহিলাটির গলার স্বর শুনে।

"মিসেস্ মূর, আমি আপনাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম, না ? আমি বন্ধুবান্ধব আর আমার জাতভায়েদের সকলকে আপনার কথা বলব। 'ঈশ্বর তো আছেন এখানে'—সত্যি, কি সুন্দর কথা আপনার। আপনি বোধ হয় নতুন এদেশে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু, আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?"

"আপনার কথা শুনে—যাক্, আপনাকে একটা গাড়ি ডেকে দেব ?"

"আমি ক্লাব থেকে এসেছি। ওরা একটা অভিনয় করছে, লণ্ডনে তা আমার দেখা। তা ছাড়া ভারি গরম।"

"নাটকটির নাম কি?"

"কাজিন কেট্।"

"দেখুন মিসেস্ মূর, রাত্রি বেলায় একলা একলা হেঁটে যাওয়া আপনার মোটেই ঠিক নয়। বদমায়েশ লোক সব এদিক ওদিক আছে, আর মারাবার পাহাড় থেকে চিতাবাঘ আসতে পারে, সাপও।"

মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠলেন, সাপের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন।

"এই ধরুন একরকম আছে, গায়ে চাকা চাকা দাগ। আপনি হয়ত গায়ে পা দেবেন, আর অমনি বসাবে ছোবল—বাস্, আপনাকে আর দেখতে হবে না।"

"কিন্তু আপনি তো একলা একলা ঘুরে বেড়ান।"

"আমার কথা ছেড়ে দিন, আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে।"

"বলেন কি—সাপের অভ্যাস।"

দুজনেই হেসে উঠলেন।

আজিজ বল্‌ল, "আমি ডাক্তার, সাপের সাহস কি আমাকে কামড়ায়।"

গেটের তলার পাশাপাশি ব'সে দুজনে জুতো প'রে নিলেন।

"দেখুন, এখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আচ্ছা, এরকম সময় এদেশে এলেন কেন, একেবারে শীতের শেষে?"

"ইচ্ছে ছিল আগেই আসি, কিন্তু বিশেষ বাধা পড়েছিল, কিছুতেই কাটাতে পারলাম না।"

"শিগ্‌গিরই এমন খারাপ দিন পড়বে—আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে পারে। আর এলেন যদি এই চন্দ্রপুরে কেন?"

"আমার ছেলের কাছে, সে এখানে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট।"

"অসম্ভব, তা হ'তে পারে না; এখানকার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট হচ্ছেন হিস্‌লপ সাহেব, আমি তাঁকে ভালো ক'রে জানি।"

মহিলাটি একটু হেসে বললেন, "তা হ'লেও সে আমার ছেলে বটে।"

"কিন্তু মিসেস্ মূর, কি ক'রে তা সম্ভব?"

"আমার দু'বার বিয়ে হয়েছে।"

"ও, বুঝলাম, আপনার প্রথম স্বামী মারা যান ?"

"দ্বিতীয় স্বামীও।"

"তাহলে আমাদের দুজনের দেখছি একই দশা। আচ্ছা, সিটি ম্যাজিষ্টেট আপনার একমাত্র সন্তান ?"

"না, ছোট দু'জন ইংল্যাণ্ডে আছে—র‍্যাল্‌ফ্ আর ষ্টেলা।"

"আর এখানে যিনি আছেন বুঝি ওদের সৎ ভাই ?"

"হ্যাঁ।"

"মিসেস্ মূর, এ কিন্তু ভারি মজা, আপনার মতন আমারও দুই ছেলে এক মেয়ে। কি রকম অদ্ভুত মিল বলুন তো ?"

"তাদের কি নাম ? নিশ্চয় রনি, র‍্যাল্‌ফ্ আর ষ্টেলা নয় ?"

আজিজ ভারি খুসি হ'য়ে বলল, "অবিশ্যি নয়। কি রকম মজার শুনতে! তাদের নাম একেবারে অন্য রকম, শুনলে আপনার আশ্চর্য্য লাগবে। এই শুনুন না, বলছি, একটির নাম আহমেদ, আর একটির নাম করিম, আর বড়টির নাম জামিলা। তিনটিই যথেষ্ট—কি বলেন ?"

"নিশ্চয়।"

খানিকক্ষণ কেউ আর কথা বললেন না। দুজনেই ভাবছিলেন যে-যার ছেলে মেয়ের কথা। একটু পরে মহিলাটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আজিজ জিজ্ঞাসা করল, "একদিন সকালে এসে মিণ্টো হস্‌পিট্যাল দেখবেন না ? চন্দ্রপুরে আর তো কিছু দেখাবার মতন পাচ্ছিনে।"

"আমি আগেই যে একদিন দেখে এসেছি, তা' না হ'লে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যেতাম।"

"বোধ হয় ডাক্তার সাহেব নিয়ে গিছলেন ?"

"হ্যাঁ, আর মিসেস্ ক্যালেণ্ডার।"

আজিজের গলার স্বর গেল বদলে। "সত্যি ? চমৎকার লোক মিসেস ক্যালেণ্ডার।"

"আরো ভালো ক'রে তাঁকে জানলে, বোধহয় তাই হবেন।"

"বলেন কি, আপনার তাঁকে ভালো লাগেনি ?"

"আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু দেখে খুব যে মুগ্ধ হবার মতন লোক তা তো মনে হয়না।"

আজিজ আর থাকতে পারল না। "এই দেখুন না, না ব'লে আমার টঙ্গা নিয়ে তিনি উধাও হয়েছেন; এই নাকি চমৎকার লোকের লক্ষণ! আর মেজর ক্যালেণ্ডার—রাতের পর রাত যেখানেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেতে বসি, অমনি তাঁর তলব আসে, আর আমি সব আমোদপ্রমোদ মাটি ক'রে তখনই ছুটি; তারপর গিয়ে দেখি না আছেন তিনি, না আছে ভালোমন্দ কোনো একটা খবর। বলুন দেখি, কেমন চমৎকার লোক? কিন্তু কি এসে যাচ্ছে তাতে? আমি নিরুপায় তিনি তা বেশ জানেন। আমি আছি শুধু হুকুম তামিল করতে, আমার আবার সময়ের দাম! আর আমরা কালা আদমি, আমাদের পক্ষে বারান্দাই যথেষ্ট, আবার বসতে বলে কে, বেশ তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আর মিসেস্ ক্যালেণ্ডার গাড়ি নিয়ে ভাগেন, আর এমন ভাব দেখান যেন চিনতেই পারেন না।"

মহিলাটি নীরবে শুনছিলেন।

যে জুলুম ওকে সহ্য করতে হয়েছে তারি কথা ভেবে আজিজ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, এর উপর একজন ব্যথার ব্যথী পেয়ে ওর উত্তেজনা পেয়েছিল সমধিক বৃদ্ধি; আর তাই ও একই কথা বলছিল বারবার, তাও আবার রঙ চড়িয়ে সঙ্গতির দিকে কোনো দৃষ্টি না রেখে। ওর শ্রোত্রী যে ওর কাছে নিজের দেশের মেয়েদের সমালোচনা করেছিলেন তাঁর সহানুভূতির এই তো যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আজিজ তার পরিচয় পেয়েছিল আরও আগে। যে-আগুনের ইন্ধন যোগাতে দৈহিক রূপও হার মেনে যায়, আজিজের মনে লেগেছিল তারই ছোঁয়া; তাই যদিও ওর মুখের কথা শোনাচ্ছিল নাকি কান্নার মতন, নিভৃত অন্তরে ও অনুভব করছিল সেই আগুনের দীপ্তি। তারপর হঠাৎ দপ্ ক'রে তা উঠল জ্ব'লে কথার পর কথায়।

"আপনি আমাকে ঠিক বুঝেছেন; পরের মনের কথা আপনি ধরতে পারেন। সবাই যদি আপনার মত হত!"

একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তিনি জবাব দিলেন, "আমার তো মনে হয়না আমি কাউকে ভালো বুঝতে পারি। এইটুকু শুধু বুঝি কাকে ভালো লাগে, কাকে লাগে না।"

"তাহ'লে তো আপনি এদেশের লোকেদেরই সামিল।"

আজিজ ওঁকে ক্লাব পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইল, উনিও আপত্তি করলেন না। ক্লাবের ফটকের কাছে এসে মহিলাটি বল্‌লেন,

"আমি ক্লাবের মেম্বার হ'লে বেশ হ'ত, তা'হলে আপনাকে ভিতরে ধ'রে নিয়ে যেতাম।"

"চন্দ্রপুর ক্লাবে কারও অতিথি হ'য়েও আমাদের যাওয়া নিষেধ"—সংক্ষেপে আজিজ শুধু এই কটি কথা বল্‌ল। ওর মন ছিল কানায় কানায় ভরা, তাই নিজের দুঃখের কথা ফেনিয়ে বলার প্রবৃত্তি আর ওর ছিলনা। মাথার উপর উঠেছিল চাঁদ, তারি অপরূপ আলোয় ঢালু পথ বেয়ে ফিরবার সময়ে ওর চোখে পড়ল আবার সেই অপরূপ মসজিদ, আর ওর মনে হ'ল এই দেশ একেবারে ওর নিজের, অন্য যে-কোনো লোকের চাইতে কম নিজের নয়; না হয়, থলথলে একদল হিন্দু ওর আগে ছিল দেশের মালিক, আর এখন হয়েছে আঁস্‌টেলে গুটিকয় ইংরেজ—কিন্তু কি আসে যায় তাতে ?

(৪)

মিসেস্ মূর যখন আবার ক্লাবে গিয়ে ঢুকলেন ততক্ষণে 'কাজিন্ কেট্' নাটকটির তৃতীয় অঙ্ক বেশ জ'মে উঠেছে। পাছে চাকর বাকর তাদের সাহেব মেমদের অভিনয় দেখে ফেলে তাই জানলাগুলো সব এঁটে বন্ধ করা হয়েছিল, ফলে ঘরটি হয়েছিল ভীষণ গরম। দুটি মাত্র ইলেকট্রিক পাখা ছিল, তার একটি কোনো রকমে ঘুরছিল জখম হাওয়া-পাখীর মতন, আর একটি গিয়েছিল বিগড়ে। মিসেস্ মূরের অভিনয় দেখার সখ ঘুচে গিয়েছিল, তাই তিনি বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আর অমনি তাঁর কানে এল—"আমি দেখতে চাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ।" ইনি হলেন এডেলা কেষ্টেড। রনি অর্থাৎ তাঁর পুত্রের কথামত মিসেস্ মূর ইংল্যাণ্ড থেকে এঁকে আমদানি করেছেন এবং সম্ভবত, নিশ্চয় কিনা বলা যায়না, রনিকেই তিনি করবেন মাল্যদান। একটু অদ্ভুত গোছের কিন্তু সাবধানী মেয়ে শ্রীমতী এডেলা বিবি, তেমনি সাবধানী হলেন

রনি আর তাঁর মা অর্থাৎ মিসেস্ মূর—আপাতত যিনি প্রবীণাদের দলভুক্ত। মেয়েটির সাধু অভিপ্রায় শুনে তিনি বললেন,

"বটে! আমিও তো সেই কথাই বলি, যদি কোনো রকমে সম্ভব হয়। মনে তো হয় যে আসছে মঙ্গলবারের মধ্যে টার্টনরা কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।"

"শেষ পর্য্যন্ত হবে, যা হ'য়ে থাকে, হাতীর পিঠে চড়া। এই দেখুন না, আজকের সন্ধ্যাটা কি ভাবে কাট্‌ল—'কাজিন কেট,' মরি, মরি, 'কাজিন্ কেট!' কিন্তু আপনি কোথায় স'রে পড়েছিলেন বলুন তো, গঙ্গার জলে চাঁদের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন?"

আগের দিন রাতে এরা গঙ্গার খুব দূরের এক ধারায় চাঁদের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। জলের মধ্যে ছায়াটির আয়তন গিয়েছিল বেড়ে, তাই সত্যিকারের চাঁদের চাইতে অনেক বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। দেখে দুজনেই হয়েছিলেন মুগ্ধ।

"আমি গিয়েছিলাম মসজিদে, কিন্তু চাঁদ পাইনি।"

"দিকটা একটু বদলে গিয়ে থাকবে—আরো পরে উঠবে।"

মিসেস্ মূর ক্লান্ত হয়েছিলেন, হাই তুলতে তুলতে জবাব দিলেন—"পরে, সবই পরে। আচ্ছা, দেখি, এদেশে কি চাঁদের উল্‌টো দিক আমরা দেখি? না তো!"

"আরে রসুন, এদেশটা অত খারাপ নয়।" স্নিগ্ধ গলায় কে যেন কথাগুলি বল্‌ল। "পৃথিবীর আর এক প্রান্ত হতে পারে, কিন্তু চাঁদ সেই একই।" লোকটি যে কে দুজনের একজনও ঠাহর করতে পারলেন না, আর তাঁর সঙ্গে এদের দেখাও আর ঘটেনি। পরিচিত বন্ধুর মতন ক'টি কথা ব'লে লাল ইটের খিলানের ভিতর দিয়ে তিনি একেবারে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'লেন।

এডেলা বল্‌ল, "পৃথিবীর আর এক প্রান্তও যে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা আমাদের তো এই দুঃখ"। মিসেস মূর সায় দিলেন; নতুন জায়গায় এসে সবই নীরস লাগ্‌ছিল তাঁর কাছে, তাই তাঁর স্ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁরা এসেছিলেন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে, মিশরের মরুভূমি পার হ'য়ে, বোম্বাইর বন্দরে—কি অদ্ভুত সুন্দর সে পথ! অবশেষে কিনা এই বাংলোর ঘেরাটোপ! কিন্তু তবু মিস্ কেষ্টেড-এর মতন অতটা মন-মরা তিনি হননি, কারণ বয়সে তিনি ছিলেন তার চাইতে চল্লিশ বৎসরের বড়, তাই এই জ্ঞান তাঁর হয়েছিল যে জীবনে যখন

যা খুসি তা কখনো মেলেনা ; মাঝে মাঝে অবশ্য আজব ব্যাপার ঘটে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ধ'রে না। তিনি আবার বললেন, আশা করা যায় আগামী মঙ্গলবার একটা কিছু মজার ব্যবস্থা হয়তো হবে।

আবার কে একজন মোলায়েম গলায় বলল, "মিসেস্ মূর, মিস্ কেষ্টেড, এক গেলাস হোক—না, দু গেলাস, কি বলেন ?"

এবার অবশ্য লোকটিকে তাঁরা চিনলেন—জিলার কালেক্টার সাহেব মিষ্টার টার্টন, এঁরই বাড়ি তাঁরা রাত্রে খানা খেয়েছিলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা হয়েছিল তাঁদেরই মতন, অভিনয়ের জায়গায় গরমে তিনি টিঁকতে পারেন নি। মেজর ক্যালেণ্ডারের উপর ছিল অভিনয় পরিদর্শনের ভার, কিন্তু অধস্তন কোনো এক 'নেটিভ' কর্ম্মচারী না কার গাফলতির জন্য তিনি এসে উঠতে পারেন নি, তাই তাঁর জায়গায় পরিদর্শন করছিলেন রনি, আর ভালোই নাকি করছিলেন। অতঃপর টার্টন শ্রীমান রনির অন্যান্য গুণের ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে ধীর স্থিরভাবে এমন সব কথা বল্‌লেন যা শুনলে সত্যি রনির অহঙ্কার হ'তে পারত। অবশ্য রনি যে খেলাধূলোয় ওস্তাদ ছিল, বা বিদেশী ভাষা খুব রপ্ত করেছিল কিম্বা আইন কানুন খুব ভালো জানত, তা' ঠিক বলা চলেনা, কিন্তু (বেশ বড় রকমের 'কিন্তু' বলতে হবে) মান বজায় রেখে চলতে সে পারত—এই হ'ল টার্টন্ সাহেবের বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

শুনে মিসেস মূর আশ্চর্য্য হলেন, কেননা ছেলেরা যে মান বজায় রেখে চলে একথা মায়েরা বড় একটা বিশ্বাস করেন না। একটু চিন্তিতও তিনি হ'লেন, কেননা মানী লোকেরা যে বেশ পছন্দসই হয়, এসম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি চেষ্টায় ছিলেন মিষ্টার টার্টনের সঙ্গে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করতে, কিন্তু খুব অমায়িকভাবে হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে টার্টন বলে গেলেন :—"মোদ্দা কথা কি জানেন? হিস্‌লপ্ হ'ল আসল সাহেব, ঠিক যে-রকমটি আমরা চাই, আমাদের সঙ্গে একেবারে ও মিশ খেয়ে যায়।" বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর ঝুঁকে খেলছিলেন আর একটি সিভিলিয়ান, তিনি টার্টনের কথায় সায় দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লেন, "যা ব'লেছেন।" বাস্, বিষয়টির চরম নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল, এবং টার্টন সাহেব প্রস্থান করলেন, কেননা আরও একাধিক কাজের তাগিদ ছিল।

অভিনয় সাঙ্গ হ'লে সখের বাজনার দল সাহেবদের জাতীয় সঙ্গীত সুরু করল। কথাবার্ত্তা গেল থেমে, মুখ হ'ল সব গম্ভীর। বিজেতা বাহিনী বিনীত দেশের বুকের উপর চেপে ব'সে আছে, তারই গর্ব্ব ফুটে বেরোচ্ছে এই গানে। শোনা মাত্র ক্লাবের প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষ সভ্যের মনে পড়ে গেল বিলেত তাঁর জন্মভূমি, ভারতবর্ষে তিনি পরদেশী, অমনি মন উঠল ক্ষণেকের জন্যে গদগদ হ'য়ে, সঙ্কল্প হ'ল দৃঢ়। সামান্য একটু সুর, নেই বললেও চলে, ভগবানের কাছে ক'দফা দাবী—তাই জোড়াতাড়া দিয়ে রচনা হয়েছে এমন এক প্রার্থনা যার চল্ বিলেতে একেবারেই নেই। তবু এই প্রার্থনার প্রভাবে সবাই করল উপলব্ধি, রাজা বা ভগবানের সান্নিধ্য নয়, কিন্তু এমন এক শক্তি একদিন যার বিরুদ্ধে এই ইংরেজরাই করেছিল অস্ত্রধারণ! তারপর বাঁধ ভাঙ্ল, সুরু হ'ল পরস্পরকে অনুরোধ উপরোধ—এই একটু তরল নেশার জন্য।

"এডেলা, এক গেলাস হবে না, মা, তুমি কি বলো ?"

দুজনেই 'না' বল্‌লেন। পানীয়ে তাঁদের আর রুচি ছিলনা। মনে যখন যা ভাব্‌ত মুখের কথায় তাই প্রকাশ করা ছিল এডেলার অভ্যাস ; আবার নতুন ক'রে সে জানাল, তার সাধ সত্যিকারের ভারতবর্ষ দেখা।

রনির স্ফুর্ত্তি আর ধরছিল না। এডেলার এই অনুরোধে সে বিশেষ কৌতুক পেল, তাই তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে আর একজন কে যাচ্ছিল তাকে ডেকে বল্‌ল, "ওহে, ফিলডিং, সত্যিকারের ভারতবর্ষ কি ক'রে দেখা যায় বাৎলাতে পারো ?"

"তাহলে এদেশের লোকদের দেখার চেষ্টা করো"—এই কথা ব'লেই ভদ্রলোক চম্পট দিলেন।

"উনি কে ?"

"উনি হ'লেন মাষ্টার মশায়—গভর্ণমেণ্ট কলেজের।"

মিসেস্ লেস্‌লি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লেন,

"যেন এদেশের লোকদের না দেখে উপায় আছে।"

মিস কেষ্টেড বললেন, "আমি তো দেখা পাইনি। এদেশে পা দেবার পর থেকে এক চাকর ছাড়া আর কোনো দেশী লোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিনি।"

"আপনার বরাৎ ভালো।"

"কিন্তু আমি যে চাই তাদের দেখ্‌তে।"

একদল মেয়ে মজা পেয়ে তাঁকে ঘিরে ফেল্‌ল। তাঁদের একজন বল্‌লেন, "ভারতবর্ষের লোকদের দেখতে চান? নতুন কথা শোনালেন বটে!" আর একটি—"নেটিভদের দেখবার সাধ? হায়রে, এ দুর্ম্মতি কেন?" খুব গম্ভীর চালে আর একজন বললেন, "বুঝিয়ে বলি শুনুন। ভাববেন না যেন নেটিভরা আমাদের কারও সঙ্গে দেখা হলে বেশি ক'রে সমীহ করে।"

"দেখা হবার পর অনেক স্থলেই তা' ঘটে।"

কে শোনে? মহিলাটি একেবারে নিরেট বোকার মতন কিন্তু খুব সহৃদয়ভাবে উপদেশ দিয়ে বল্‌লেন:

"আমার কথা হচ্ছে এই, বিয়ের আগে আমি ছিলাম নার্স, তাই নেটিভদের যথেষ্ট দেখেছি, বুঝেছেন? ভারতবাসী বল্‌তে সত্যি কি বোঝায় তা আমি ভালো ক'রেই জানি। আমি আবার চাকরি করতাম এক দেশীয় রাজ্যে—ইংরেজ মেয়েদের পক্ষে এর চাইতে বিপরীত জায়গা আর হ'তে পারে না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় একেবারে নিজের মতন থাকা—কারও সঙ্গে না মিশে।"

"রুগীদের সঙ্গেও না?"

ক্যালেণ্ডার গিন্নি ব'লে উঠলেন, "বলেন কি! নেটিভদের প্রতি চরম অনুগ্রহ তাদের নির্ব্বিবাদে মরতে দেওয়া!"

মিসেস্ মূর ভালো মানুষটির মতন কিন্তু একটু মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর যদি তারা স্বর্গে যায়?"

"যেখানে খুসি যাক্, আমার কাছে না এলেই হ'ল, একেবারে গা ঘিন্ ঘিন্ করে!"

ভূতপূর্ব্ব নার্সটি বললেন, "সত্যি বলতে কি, স্বর্গে যাওয়ার কথা যা বল্‌লেন তা আমি ভেবে দেখেছি, তাই আমি মিশনারি ফিশনারি মোটেই পছন্দ করি না। একটু আধটু উপদেশ যারা দেয় দিক, তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে ওদের খ্রীষ্টান করা কিছুতেই সহ্য হয় না। কেন বলি শুনুন।"

কিন্তু তাঁর কথা আরম্ভ হবার আগেই কালেক্‌টার সাহেব দিলেন বাধা।

"মিস্ কেষ্টেড্, আপনি যদি সত্যি আমাদের আর্য্যভাইদের দেখতে চান, সহজেই তার ব্যবস্থা হ'তে পারে। কে জানত যে ওদের মধ্যে আপনি এত মজা পান?" একটু ভেবে তিনি আবার বললেন, "ঠিক যে টাইপ চান আপনি

দেখতে পারেন। মনমত বেছে নেবেন। আমি জানি এই জমীদারদের আর যারা সরকারী কাজ করে। হিস্‌লপ ব্যারিষ্টার দলকে যোগাড় করতে পারে। আর যদি আপনার বিশেষ আগ্রহ থাকে এডুকেশন সম্বন্ধে, তাহলে ফিলডিং-এর ঘাড়ে চাপতে পারেন।"

মেয়েটি বল্‌ল, "খোদাই করা ছবির মতন একদল লোক আমার চোখের সামনে আনাগোনা করবে, দেখে দেখে আমার অরুচি হয়েছে; যদিও প্রথম জাহাজ থেকে নেমে এই সব দেখে একেবারে মোহিত হয়ে যেতাম। কিন্তু চোখের মোহ আর কতদিন থাকে বলুন?"

ভারি তো এসে যাচ্ছিল কালেকটার সাহেবের মিস্ কেষ্টেডের আসলে কি ভালো লাগে বা না লাগে, তবে মেয়েটি দু'চারদিন একটু স্ফূর্ত্তি ক'রে নেয়, এই ছিল ওঁর অভিপ্রায়। অবশেষে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা'হলে কি একটা 'ব্রিজ' পার্টির ব্যবস্থা করা যাবে? অবশ্য 'ব্রিজ' পার্টি বলতে তিনি তাস খেলার পার্টির কথা বলেন নি, তিনি বলছিলেন এমন এক পার্টির কথা যার সাধু উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝখানে 'ব্রিজ' অর্থাৎ সেতুবন্ধন করা। ব্রিজ-পার্টির এই ব্যাখ্যা তিনি স্বয়ং উদ্ভাবন করেছিলেন, বুঝিয়ে বলতে সবাই খুব আমোদ পেল।

"এদেশী যে-সব লোকদের সঙ্গে আপনাদের সামাজিক মেলামেশা আছে, বন্ধু-বান্ধবের মতন, আমি চাই শুধু তাদের।"

কালেক্‌টার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "তা' যদি বলেন তো সামাজিক মেলামেশা ওদের সঙ্গে আমাদের আদবেই নেই—ওদের গুণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবু নেই। দেখুন, রাত অনেক হ'ল, সাড়ে এগারটা বেজেছে, সুতরাং এর কারণ এখন আর বলা চলে না।"

বাড়ি ফিরতে ফিরতে গাড়িতে টার্টন-গিন্নি কর্ত্তাকে বল্‌লেন, "মিস কেষ্টেড, মরি, কি নাম!" এই নবাগতা তরুণীটিকে তাঁর বিশেষ পছন্দ হয়নি, কি রকম যেন বেঢপ আর খেয়ালী ব'লে মনে হয়েছিল। "দিব্যি ছেলে হিস্‌লপ্, আশা করি তার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে মেয়েটিকে আমদানি করা হয়নি, যদিও রকম দেখে তাই মনে হয়।" টার্টন সাহেব পারৎ পক্ষে কোনো ইংরেজ মেয়ের নিন্দা করতেন না, তাই গিন্নির মতে মনে মনে সায় দিলেও, মুখে তিনি বললেন, "আহা, বেচারি ভুলচুক একটু তো করবেই।" তিনি আরও বললেন, "ভারতবর্ষে

লোকদের মতামত কি রকম অদ্ভুত বিগড়ে যায়—বিশেষ ক'রে এই গরম কালে ; দেখনা, ফিলডিং-এর কি হ'য়েছে।" ফিলডিং-এর নাম শোনামাত্র টার্টন-গিন্নি চোখ বুঁজে বললেন যে ফিলডিং ঠিক 'পাক্কা চিজ' না, সুতরাং মিস কেষ্টেড-এর সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে বেশ হয়, কেননা সেও 'পাক্কা' না। অতঃপর তাঁরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন—প্রকাণ্ড নীচু একটা বাংলো, সিভিল ষ্টেশনের বাংলো-গুলোর মধ্যে সব চাইতে পুরোনো আর সব চাইতে থাকতে এতে অসুবিধা, আর তার হাতাটা যেন কড়াইর মতন গেছে দেবে। বাড়ি ফিরে দুজনে একটু বার্লির জল খেয়ে গিয়ে শুলেন। তাঁরা চ'লে আসায় ক্লাবের আড্ডা গিয়েছিল ভেঙে ; অন্য সব জায়গার মতন এখানেও আড্ডা হ'লেই তাতে একটু হাকিমি চালের ছোঁয়া থাকত। বড়লাটকে দেখলেই যারা দণ্ডবৎ করে আর ভাবে যে রাজাকে ঘিরে থাকে যে-দিব্য মহিমা দরকারমত পাত্রান্তরে তার আরোপ সম্ভব, তারা যে বড়লাটের যে-কোনো প্রতিনিধিকে অল্পবিস্তর ভক্তি করবে তা আর বিচিত্র কি ? চন্দ্রপুরে টার্টনরা বিরাজ করতেন ক্ষুদে দেবতার মতন ; অল্পকাল পরে বিলাতের কোনো সহরতলী এঁদের করবে গ্রাস, সেখানে, এই গৌরব হ'তে বহুদূরে এঁদের জীবনের হবে অবসান।

ওর নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতি কালেকটার সাহেবের সৌজন্যে খুসি হ'য়ে রনি বলছিল, "মহাপ্রভুর অসীম কৃপা বলতে হবে। জানো, ভদ্রলোক আগে কখনো 'ব্রিজ-পার্টি' দেননি, তা আবার ডিনার খাওয়ানোর পরেই। খুব ইচ্ছা করে আমি নিজেও কিছু একটা ব্যবস্থা করি, কিন্তু নেটিভগুলোর রকম সকম আর একটু ভালো ক'রে জানলে বুঝবে বড়সাহেবদের পক্ষেই ওসব করা সোজা। ওরা ওঁকে ঠিক চেনে, তাই জানে যে ওঁর চোখে ধুলো দেওয়া চলবে না। আমি তো বলতে প্রায় সবে এসেছি। বিশ বছর না থাকলে এ দেশের হালচাল কেউ যে বুঝেছে সে কথা ভাবাও চলে না।—এই যে, মা, তোমার ওভারকোট।—আচ্ছা শোনো, কি রকম সব ঝকমারি লোকে করে। এদেশে আসার অল্পদিন পরেই এক উকিলকে আমি সিগারেট খেতে দিয়েছিলাম—শুদ্ধ একটা সিগারেট। ওমা, সে কিনা সহরময় দালাল পাঠিয়ে ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তাই জানিয়েছে। তারা গিয়ে জনে জনে বলেছে, "মহম্মদ আলি উকিলের কাছে যেয়ো—সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে ব'সে তিনি আড্ডা দিচ্ছেন, জানো ?" সেই থেকে আদালতে

ওকে আমি যথাসম্ভব কড়া শাসনে রাখি। যথেষ্ট শিক্ষা আমার হয়েছে আর, আশা করি, তারও।”

“শিক্ষাটা কি এই হ’ল না যে উকিলদের সবাইকে ডেকে সিগারেট দেওয়া উচিত?”

“হবে, কিন্তু সময় তো অঢেল নেই, আর আমারও রুচি ব’লে একটা জিনিষ আছে। ক্লাবে ব’সে নিজের লোকেদের সঙ্গে সিগারেট খেতেই আমার লাগে ভালো।”

মিস্ কেষ্টেড ছাড়বার পাত্রী নয়। “কেন, উকিলদের ক্লাবে ডাকলেই হয়।”

“নিষেধ আছে।”

খুব মোলায়েমভাবে রনি কথা কইছিল, তার উপর ছিল ওর ধৈর্য্য। মিস কেষ্টেড যে কেন ওর কথা বুঝতে পারছিলেন না, ও কিন্তু তা বেশ বুঝছিল। ও বলতে চাচ্ছিল যে এক সময়ে ওর অবস্থাও ছিল ঠিক মিস কেষ্টেডের মতন, যদিও বেশি দিন সে ভাব টেঁকেনি। বারান্দায় বেরিয়ে চাঁদের দিকে মুখ ক’রে ও দিল এক হাঁক। ওর সইস দিল জবাব। তেমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ও হুকুম দিল, “গাড়ি লে আও।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

গানের সমালোচনা

গানকে একটি ভোগ্য পদার্থ বলিয়া মনে করিলে ভরসা করি কিছু দোষ হইবে না। এবং অন্যান্য যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের মত গান বস্তুটিও যে সমালোচনার যোগ্য ও অধীন, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—অর্থাৎ গানের সমালোচনা স্বাভাবিক কার্য্য।

প্রথমেই প্রশ্ন হয় গান বস্তুটি কি ? এই বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ বক্তব্য আছে। এবং তাহারই বিশদ আলোচনা—এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। সে জন্য মনে করি সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য প্রতিপাদন করিয়া পরে গান সম্বন্ধে বিশেষ কথাগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা গীতবাদ্যের ব্যাকরণ অনুশীলন করেন না এরূপ ব্যক্তি এক প্রকার সমালোচনা করেন—যাহার শেষ কথা, মোটের উপর ভাল লাগা বা না লাগা। এই প্রকার আলোচনাকে দোষ দেওয়া যায় না—অন্ততঃ ইহার মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অনুভূতির চরম সত্য পাওয়া যায় ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রকম ভাল লাগা বা না লাগার মধ্যে যেটুকু পক্ষপাতিত্ব পাওয়া যায় তাহাকে ব্যক্তিগত রুচিভেদ বলিয়াই মনে করা উচিত। ঐ প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং রুচি-বৈষম্য ক্রমে গানের সমালোচনাকে অতিক্রম করিয়া গায়কের সমালোচনায় পরিণত হয়। যাহার গান একাধিকবার ভাল লাগে বা লাগিয়াছে—যে-কোনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণেই হউক না কেন—তাহার সব গানই ভাল লাগে। এবং যাহার গান কয়েকবার ভাল লাগে নাই তাহার আর কোনও গান ভাল লাগে না। অন্যদিকে পক্ষপাতিত্ব বা রুচি-বিকার এতদূর চরম সীমায় না আসিলে, একটি গান ব্যক্তিগত ভাবে ভাল লাগিল কি লাগিল না, এই প্রকার মন্তব্যেরও উপকার আছে, যদিও গুরুত্ব নাই। কিন্তু যদি ঐ প্রকার সমালোচনা অথবা মন্তব্য বহু জনসাধারণের বাক্য ও আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ মন্তব্যের মধ্যে সত্য ত আছেই, এমন কি তাহার গুরুত্বকে অবহেলা করা যায় না। অর্থাৎ এই প্রকার সমালোচনার মত-ভেদের কোনও বিশেষ মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু একমত

হইলে ইহার বিশেষ মূল্য আছে। আমাদের দেশের একদল বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা এই শেষোক্ত একমত হওয়ারও কোনও মূল্য স্বীকার করেন না—অর্থাৎ জনসাধারণ, যাহারা রেখব-গান্ধার বুঝে না—তাহাদের আবার মতামত কি? তাহাদের কোনও মতই গ্রাহ্য নহে। আমি ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাহার কারণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ নিবেদন করি।

প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার সময় সমবেত ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ ভাবে গিরীন্দ্রশেখর বাবু আমাকে গীতার পদগুলিতে স্বরযোজনা করিয়া গান করিতে অনুরোধ করেন। তথায় উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র একজন সভ্য ছিলেন (আমাকে বাদ দিয়া) যিনি গান-বাজনার ব্যাকরণ ও রাগরাগিণী বিষয়ে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। তাহার নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন—যিনি চিত্রবিদ্যার জন্য আমাদের সকলের নিকট সুপরিচিত। সাধারণ সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে আমি এক একটি শ্লোক ইচ্ছামত স্বরযোজনা দ্বারা গান করিতে আরম্ভ করিব; কিন্তু যদি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ঐ শ্লোকটি শুনিতে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আমাকে অন্য প্রকার স্বরযোজনার সাহায্য লইতে হইবে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ শ্লোকটি সকলের ভাল লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বর-যোজনার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার পাইলাম, কিন্তু যতীন্দ্রবাবু ঐ প্রকার নির্দ্দেশে আপত্তি করিলেন—এই বলিয়া যে শ্রোতৃবর্গ যখন রাগরাগিণী তাল মান কিছুই বুঝেন না, তখন তাঁহাদের ভাল লাগা বা না লাগার কিছুমাত্র মূল্য নাই; অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহাই হউক সভাটি democratic হওয়ার জন্য যতীন্দ্রবাবুর আপত্তি গ্রাহ্য হইল না বিশেষ যখন আমার আপত্তি নাই। কার্য্যারম্ভ হইল। যতীন্দ্রবাবু আমাকে খাম্বাজ রাগিণীর ইঙ্গিত করিলেন। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তেওরার ছন্দে ধ্রুবপদের প্রণালী অবলম্বন করিয়া খাম্বাজ রাগিণীকে আহূত করা গেল। শ্রোতারা একমতে বলিলেন—ভাল লাগিল না (যতীন্দ্রবাবু স্বতন্ত্র)। ইহার পর—বাহার-রাগিণী সাহায্যে গান করা হইল। তাহাও ভাল লাগিল না। এইরূপে পরে পরে কেদারা, হাগ ও পঞ্চম রাগিনী সাহায্যে experiment

করিয়াও একই ফল হইল। এই অবস্থায় অবশ্য আমি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং নিজের অক্ষমতার জন্য লজ্জিতও বোধ করিতেছিলাম; মনে মনে যতীন্দ্রবাবুর মতেরই সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—হঠাৎ আর একটি রাগিণী মনে পড়িল। দেখা যাউক ইহা-দ্বারা শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি হয় কি না। সেই রাগিণী তিলক-কামোদ। যখন ইহার সাহায্যে ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি গান করিলাম তখন সকলের মধ্যেই একমত এবং সকলেরই খুব ভাল লাগিল এইরূপ মত শুনা গেল।

ইহার পরে আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া গীতার পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি পর্য্যায়-ক্রমে গাওয়া হইয়াছিল—বলা বাহুল্য একই রাগিণী দ্বারা নহে। রাগরাগিণী অনভিজ্ঞ শ্রোতাদিগের ভাল লাগা বা না লাগার ইঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীকে আশ্রয় করা হইতেছিল এবং বিশেষ হতাশ হইবার কোনও কারণ ঘটে নাই।

উক্ত শ্রোতাগণ যখন একমত হইয়া খাম্বাজ, কেদারা, বাহার পঞ্চম প্রভৃতি রাগিণীর সুর যোজনাকে ভাল বলিলেন না, সেই একমতের কি কোনও মূল্য নাই? পরে যখন একমত হইয়া তিলককামোদ স্বরযোজনাকে ভাল লাগিল বলিলেন—তাহারও কি কোনও মূল্য নাই? আমার বিশ্বাস, আছে—এবং সেই মূল্য এই যে ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি বলিতে আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, বোধ হয় খাম্বাজ, বাহার কি কেদারার সহিত তাহার সমন্বয় হয় না; এবং তিলককামোদের (ঐ বিশিষ্ট স্বরযোজনার) সহিত হয়ত তাহার কোনও গূঢ় সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য আছে;—না থাকিলে একসঙ্গে এতগুলি লোকের ভাল লাগে কিরূপে? এবং এই ভাল লাগা বোধের জন্য ব্যাকরণ, ষড়জ-ঋষভ শ্রুতি-জাতি ইত্যাদিরও জ্ঞান প্রয়োজন সেরূপ ধারণা হইবার কোন কারণও দেখা যায় না।

এই প্রকার সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ বন্ধুবর্গকে লইয়া আরও অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং একইরূপ ফল পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একমতে ভাল লাগার বা না লাগার যে যথেষ্ট কারণ আছে এবং ঐ মন্তব্যের যে বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার মত অভিমান আমার নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের সমালোচনা আমরা বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে পাই। এই প্রকার সমালোচনার সময়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি গানের কথা, স্বরবিন্যাস, ছন্দ এবং

এইগুলির সমাবেশ ও সামঞ্জস্য প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখেন এবং অন্যকে দেখাইতে পারেন ; গানের কি কি গুণ, কি কি দোষ তাহা বুঝেন ও বুঝাইতে পারেন, এবং এমন কি নিজের ভাল লাগা বা না লাগারও কারণ বলিতে পারেন। তিনি গায়কের সমালোচনা করেন না—on principle ; যেহেতু গায়কের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার চরিত্রকে সমালোচনা করিতে হয়। গায়কের সহিত শ্রোতার কোনও সম্বন্ধ নাই—তাহার গান উপভোগ করা ছাড়া। বিশেষজ্ঞ সমালোচক তুলনামূলক সমালোচনা করেন—কিন্তু তাহা গানের সহিত গানের তুলনা—গায়কের সহিত গায়কের তুলনা নহে। এই প্রকার বিশেষজ্ঞ সমালোচক হইতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতার চর্চা করিতে হয়। অন্ততঃ বুদ্ধি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এই দুইটি গুণ আমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারি। ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তি অভ্যাস করিয়াও তিনি প্রাণের সরলতা বা রসগ্রহণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন না —এই গানটি খেয়াল হইল না, এই গানটি ধ্রুবপদ হইল না, এই গানটি ঠুমরী হইল না বলিয়া সভাত্যাগ করেন না। তবে—ইঁহারা কয়েকটি বিষয়কে বিশেষ আপত্তিকর বলিয়া মনে করেন—তাহার মধ্যে প্রধান কথা এই যে গায়ক যদি বিজ্ঞপ্তি ও স্পর্দ্ধা করিয়া গান করে তাহা হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও স্পর্দ্ধার ঔচিত্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত। এবং এ বিষয়ে গায়কের পক্ষে তিলমাত্র ভুল হইলেই তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। খেয়াল গাইতেছি বলিয়া গায়ক যদি অল্পমাত্রায়ও ঠুমরীর কর্ত্তব (Technique) প্রদর্শন করেন—তাহা হইলেই ইঁহারা বিশেষ আপত্তি করেন। দাবি করিলেই দাবির সার্থকতা সম্বন্ধে সমালোচনা এমন কি নির্ম্মম সমালোচনা সহ্য করিতে হইবে ; দাবি না করিলে গানের রসোপভোগ ব্যতীত শ্রোতার দ্বিতীয় কার্য্য নাই ; ঠিক যেটুকু দাবি, সেইটুকুরই সমালোচনা হইতে পারে। ইঁহাদের মত লইলে গায়কের পক্ষে নিজের গান সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিজ্ঞপ্তি না করাই ভাল কারণ বিজ্ঞাপন দিলেই নানা প্রকার প্রশ্ন ও সমালোচনা উত্থাপিত হইয়া গান নষ্ট করিতে পারে। যেমন—কোনও গায়ক যদি বলেন—'আমি ডাগোর বাণী ধ্রুবপদ গান করিতেছি আপনারা শুনুন—তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে ডাগোর বাণী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ—অন্য বাণীও কি কি আছে এবং তাহাদের মধ্যে

পার্থক্য কি ? ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও প্রকারে গায়কের অজ্ঞতা প্রমাণিত হইলে তাহার বিজ্ঞাপনের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া একেবারে অন্দর মহলে পৌঁছিলে মাঠাকুরাণী স্নেহের স্বরে যে মিষ্টিমুখ করিতে বলেন এবং যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করেন তাহার রসগ্রহণ করাই চলে—সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বৈঠকখানায় ধনগর্ব্ব ও প্রশংসালালসা দিয়া মাখানো যে সরপুরিয়া পরিবেশন করিবার সময় বলা হয় যে সরপুরিয়া কৃষ্ণনগরের কান্তিকুরীর তৈয়ারী তখন মোসাহেববৃন্দ যাহাই করুন না—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া ফেলেন যে "কান্তিকুরী ত বেঁচে নেই···। এবং সরপুরিয়াও কৃষ্ণনগরের নয়—রাণাঘাট ষ্টেশনের ফেরিওয়ালাদের।" বাস্তবিক আমরা গানবাজনা সম্বন্ধে অনেক কিছু বিজ্ঞপ্তি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলি এবং ফেলিয়াছি যাহা বিশেষজ্ঞদের মতে ধাপ্পা।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—এই প্রকার সমালোচনার চাপে গায়ককেও সমালোচনাবৃত্তিতে পটু হইতে হয়। নচেৎ সমালোচকের কার্য্যে গায়ক বিহ্বল ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। আর না হয় মিশ্রিত রাগ-রাগিণীর গান গাওয়াই সুবিধা, এবং বেশী কিছু দাবি করিতে নাই। কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছে—অর্থাৎ যেটা বেশী সুবিধা তাহাই হইতেছে। আধুনিক গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, থিয়েটারী গান প্রভৃতি গানের আবির্ভাব আর কিছুই নহে—দাবি করিয়া গান করায় বিপদ আছে এবং সমালোচকগণ গায়ককে অপ্রস্তুত করিতে পারেন—এই দুইটি অবস্থার প্রতিক্রিয়া মাত্র। এমন কি সারী-গান করাতেও বিপদ আছে ; "কোথাকার সারী-গান মশায় ?" বলিয়া প্রশ্ন করিলে বেচারা গায়ককে অপ্রস্তুত হইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সমালোচনারই উপকারিতা আছে। অবিশেষজ্ঞ জনসাধারণকে তুষ্ট করিতে হইলে—দুইটি ব্রহ্মাস্ত্র—সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও স্পষ্ট উচ্চারণ—ইহাদিগকে শাণিত রাখিতেই হইবে। বিশেষজ্ঞ সমালোচককে সন্তুষ্ট করিতে হইলে—কিছু না হউক, মুখবন্ধ করিতে হইলে—বিনয় নামক গায়কদের প্রসিদ্ধ মানসিক গুণটির চর্চা করিতে হইবে এবং স্বরধ্যান, রাগরাগিণীর জ্ঞান, গানের আল্‌ফাজ, লেহাজ, ঘরবানা, বাণী প্রভৃতি বিষয়ে বোলচাল দুরস্ত রাখিতে হইবে। সুতরাং গানবাজনার উন্নতিকল্পে সমালোচনা যে কতখানি দায়ী—তাহা বেশ বুঝা যায়।

দাবি না করিলে বা বিজ্ঞাপন না দিলে, বিশেষজ্ঞের মুখবন্ধ হয় ও তাঁহাদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়। বোধ হয় এই প্রকার বেকার সমস্যার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই সমালোচকগণ আধুনিক গান বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের উপর বিরূপ। এবং ইহাও মনে রাখা উচিত যে—বিজ্ঞাপন না দিয়া গান করিলে বিশেষজ্ঞের মুখবন্ধ থাকিলেও অবিশেষজ্ঞ জনসাধারণের ভাল লাগা বা না লাগার সমালোচনা হইতে নিস্তার নাই। নিস্তার লাভের জন্য আধুনিক গানের গায়কগণ নানা প্রকারে জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ফলও হইতেছে। মাইফেলে ভাল না লাগিলে রেডিওতে, তম্বুরার সহিত ভাল না লাগিলে pianoতে বা mandolineএর সঙ্গে, একক ভাল না লাগিলে chorus, বা duet, না হয় নাচের সঙ্গে—ফল কথা, জনসাধারণের মন যখন যেদিকে যায়,—তখনই সে দিগদর্শনীর ইঙ্গিতে গানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সরল ভাষায় সেকালে শ্রোতাদিগের ছিল গরজ; গায়ক ছিল নবাবতুল্য লোক। এবং আধুনিক যুগে—জনসাধারণই নবাবের মত খেয়ালী এবং গরজ হইয়াছে গায়কের।

আর একশ্রেণীর সমালোচনা পাওয়া যায় এবং সমালোচক পাওয়া যায়—যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে প্রথমশ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু আচার ব্যবহারে ও বাক্যে ইঁহারা বিশেষজ্ঞের এতই অনুকরণ করিতে পারেন যে গ্রাম্যব্যক্তির পক্ষে (যাহাকে পাড়াগেঁয়ে বলে) ইঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাদের প্রকৃত ও উপযুক্ত কার্য্য দালালি করা অথবা Gramophone Record-এর ব্যবসায় করা; তাহা না করিয়া ইঁহারা সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল; কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়াই কিছু বলিতে হইল। আরও এই যে—গানবাজনার জগতে ব্যক্তিগত ও তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা যত কিছু অনর্থ হইয়াছে ও হইতেছে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে এই শ্রেণীর সমালোচকের সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তিপূজা এবং আত্মপ্রবঞ্চনা রূপে কতকগুলি মনঃকল্পিত উক্তি বা সমালোচনা পাওয়া যায়। ইহাদের সম্মুখে গান করা যে কোনও গায়কের পক্ষে দুঃসাহসিকতার কার্য্য। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময়ে আমাদের বৈঠকে এইরূপ একটি সমালোচক আসিয়াছিলেন।

আমরা সকলেই গ্রাম্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি আমাদিগকে কিছুক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের "খেয়াল" প্রভৃতি শিক্ষার ইতিহাস, খেয়ালের ঘরবানার (সম্প্রদায়) উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচয় প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে আব্দুল করিম ওঁকারনাথ অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের গায়ক—অমুক অপেক্ষা অমুক নিম্নশ্রেণীর গায়ক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সময়ে—আমার মনে হইল যে সমালোচক মহাশয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেরূপ তীক্ষ্ণ ইহার কান সেরূপ তৈয়ারী কিনা একবার পরীক্ষা করিলে মন্দ হইবে না। এই ভাবিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—মহাশয় আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—একটু আধটু গান করি। যাই হোক—আমি পুরিয়া রাগিণীর একটা তান করিতেছি—আপনি দেখুন ঠিক হয় কি না। তিনি অবশ্য আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। পুরিয়ারাগিণী অবলম্বন করিয়া একটি তান করিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে পুরিয়ারাগিণীর বর্জ্জনীয় যে সুর অর্থাৎ পঞ্চমকে লাগাইয়া তানটি করিলাম। একাদিক্রমে তিন চারবার শুনাইয়া তাঁহার উপদেশের প্রতীক্ষা করা গেল। তিনি বলিলেন যে উক্ত তানটি ঠিক হইয়াছে। তাঁহাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিলাম যে উহা নির্দোষ। তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে—কলিকাতা অঞ্চলে আজকাল পুবিয়াতে পঞ্চম লাগান fashion হইয়াছে কিনা। অন্ততঃ আমাদের সময়ে ঐ প্রকার ছিল না। তিনি একটু আশ্চর্য্যই হইলেন। তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে উক্ত তানটিতে পঞ্চম লাগান হইয়াছে। ইহার পর তিনি কিছুক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, এবং আমরা হাঁফ ছাড়িয়া অন্য কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। এই প্রকার সমালোচকগণ সম্পূর্ণভাবে পরের মুখে ঝাল খাইয়া ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা আমাদিগকে পরিবেশন করেন।

এই প্রকারের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ—বলা বাহুল্য আমরা সমালোচনারই রূপে পাইয়া আসিতেছি—এবং অধিকাংশ স্থলে, আমরা অজ্ঞ বলিয়া ইহাকেই প্রকৃত সমালোচনা এবং যথার্থ উপদেশ বলিয়া মনে করি। এই প্রকার জ্ঞান-লাভের ফলে, আমাদের মনে নানারূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক—ইহা আমার ব্যক্তিগত। ভয় হয়—আমায় ন্যায় আরও ভুক্তভোগী আছেন। বহুদিন হইতে আমরা এই তৃতীয়শ্রেণীর সমালোচকদিগের নিকট

শুনিয়া আসিতেছি যে উচ্চাঙ্গের গান—যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল—শুনিবার সকলে অধিকারী নহে—সকলে উহা বুঝিতে পারিবে না বা রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহার অব্যবহিত পরেই রাস্তাঘাটে মাত্র একটি Harmonium সংযোগে বা বেহালা সংযোগে পশ্চিমা ভিখারী বালকবালিকাদের অথবা আমাদের সেকেলে ভ্রাম্যমাণ আগমনী গায়কদিগের গান শুনিয়া যখনই মুগ্ধ হই তখনই বুঝিয়া লই যে—এত সুলভে মনোরঞ্জক গান কখনই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নহে এবং হইতে পারেনা—যেহেতু আমরা মুগ্ধ হইতেছি। আমরা মুগ্ধ না হইলে বরং উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। যাহা হউক—ইহা একটা নির্দ্দিষ্ট ভেদজ্ঞান। তাহার পর—যখন "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে"…এবং "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তে" প্রভৃতি শ্লোক পড়ি—তখনও মনে ভরসা থাকে যে আমাদের দেশের অবতারকল্প ও ভক্ত মহাপুরুষবৃন্দ যে সকল গান করিতেছেন তাহা যতই জনমন-মোহনকর হউক—তাহা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত হইতে পারে না। কারণ—উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতরস গ্রহণে জনসাধারণের ক্ষমতা নাই। এ পর্য্যন্ত মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন শুনি যে বৈজুবাওরা, হরিদাসস্বামী প্রভৃতি সঙ্গীতের অবতারকল্প মহাপুরুষদের গান শুনিয়া—মনুষ্য ত কথাই নহে—মৃগাদি পশু এমন কি প্রস্তরাদি জড়বস্তুও দ্রবীভূত হইত—তখন মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদয় হয়। ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গীত কি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ছিল না? ইহার উত্তরে—এই সমালোচকগণ অবিচলিতভাবে বলেন যে—হরিদাস স্বামী, বৈজুবাওরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গান করিতেন। ইঁহাদের দুই প্রকার বিরুদ্ধ উক্তির কথা উঠিলেই দেখা যায় যে ইঁহারা স্থানত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিব তাঁহারাই যদি অন্তর্ধান করেন—তাহা হইলে আর সমস্যার পূরণ হয় কি করিয়া? কেবল মনে হয় যে, যদি একবার হরিদাস স্বামীজী বা বৈজুবাওরার ধ্রুবপদ শুনিতে পাইতাম (যাহা হইবার নহে) তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যে উঁহাদের গানের সহিত ইদানীন্তন ধ্রুবপদ প্রভৃতি গানের সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে কি না এবং আমরা জনসাধারণ—যদিও সমালোচকদের ন্যায় চক্ষুকর্ণাদিবিশিষ্ট জীব—তথাপি ঐ পশুপক্ষী এবং প্রস্তরাদির শ্রেণীভুক্ত—না কি—একেবারেই সৃষ্টিছাড়া?

আমাদের দেশে গীতবাদ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যে শব্দ অর্থ ও ভাবের

বিসংবাদ দেখা যায়—যে সকল অপ্রামাণিক তথ্য ও ঐতিহাসিকতার উদ্ভব দেখা যায়—এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অদ্ভুত প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি হয়—তাহা সর্ব্বতোভাবে ঐ তৃতীয় প্রকারের সমালোচকদিগের সমালোচনাদ্বারা স্থায়ীভাবে অমীমাংসিত থাকিয়া গিয়াছে। আমাকেও ঐ প্রকার সমালোচনা-জাত জ্ঞান ও ভাবদ্বারা বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। শেষে ইহাই ঠিক করিয়া-ছিলাম যে—হয় বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিব না হয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া নিজের বুদ্ধিতে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কথিত তিন প্রকারের সমালোচনার মধ্যে মাত্র বিশেষজ্ঞের সমালোচনা দ্বারা গান বস্তুটির সন্ধান পাই। অন্য দুই প্রকারের সমালোচনা দ্বারা গান সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না; হয় ব্যক্তিগত ভাললাগা বা না লাগার মনস্তত্ব—না হয় কতকগুলি অযথার্থ ও কষ্টকল্পিত মন্তব্য পাওয়া যায়।

যে বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া এত রকমের সমালোচনা হইতে পারে—সেই বস্তুটি কি—তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়া উচিত। কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশ বর্ষব্যাপী ঐ বস্তুটিকে উপভোগ করিবার মধ্যে—নানা প্রকারের মতভেদ আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং হইতেছে। এই মতভেদ কেন হয়—এবিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও জল্পনা কল্পনার পরে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে কতকগুলি মূল বিষয়ে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্পষ্ট ধারণার (যাহাকে definite concept বলিতে পারা যায়) অভাব এবং পরিভাষা ও সংজ্ঞা (যাহাকে Terminology বলিতে পারা যায়) তাহার অনাচার ও যথেচ্ছাচার—এই তিনটি দোষের উৎপত্তি হইয়া সমালোচনা ব্যাপারকে দূষিত করিয়াছে ও করিতেছে। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। বলা বাহুল্য আধুনিক সংবাদ ও মাসিক সাহিত্যে এবং সঙ্গীত সাহিত্যে এই প্রকার শত শত উদাহরণ পাওয়া যাইবে। সমালোচনার মধ্যে "সুর" কথাটির একাধিক অর্থে ব্যবহার হইতে দেখিতে পাই। কোনও বাক্যের মধ্যে "সুর" কথাটি ষড়জ, ঋষভাদি সপ্তসুরের যে কোনও একটিকে বুঝাইবে; সেই বাক্যেরই সন্নিকটে আর একটি বাক্যে "রবীন্দ্রনাথের সুর…" "রবীন্দ্রনাথ যে সুর দিয়াছেন…" বলিতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গানটিকে যে স্বরবিন্যাসদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমষ্টিকে বুঝাইবে; অন্যস্থলে সুর অর্থে রাগরাগিণী বা উভয়কেই বুঝাইবে (যদিও রাগরাগিণী কি

তাহা বুঝা যায় না !) ; কিছু পরেই "D sharp-এর সুরে গান করিলে"— বলিতে—'D sparp-কে ষড়জ করিয়া গান করিলে' বুঝাইবে ; এবং পরে দেখা যায় "চড়া সুর" "খাদের সুর" "কোমল সুর"—যাহার নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। এই প্রকার অস্পষ্ট শব্দার্থদ্বারা বৈঠকখানার (বিশেষতঃ সমঝদারের বৈঠকখানা) গল্প বেশ চলিতে পারে ; কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে জনসাধারণের পক্ষে—বিশেষ কোনও স্পষ্ট অর্থের উদ্ধার বা ধারণা হয় না। এই প্রকার শব্দের ইন্দ্রজাল ও অর্থের ছায়াবাজী হইতে থাকিলে অজ্ঞ জনসাধারণের উপর একটা সম্মোহ সৃষ্টি হয় স্বীকার করি ; কিন্তু ভাবের আদান প্রদান অসম্ভব হয়। বক্তা বা লেখক মনে করেন আমার কথা কেহ বুঝিল না, শ্রোতা ও পাঠক মনে করেন আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না। সমালোচনা পড়িতেছি কি mystic কবিতা পড়িতেছি সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে !

এইরূপ অজস্র সংস্কৃত ও প্রচলিত শব্দের অর্থের অপব্যবহাররূপ স্বকৃত বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিয়াই যে সমালোচকগণ ক্ষান্ত আছেন তাহা নহে। ইহার উপর সপ্তসমুদ্র ও ত্রয়োদশ নদীর পারের দেশ হইতে নূতন নূতন বিদেশী কথা আমদানী করা হইতেছে এবং সমালোচনার হিং টিং ছট-এর অভিধান পূর্ণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি—Classical নামক কথাটি—গল্পের উটের মত প্রথমে সামান্য আশ্রয় ভিক্ষা করিতে করিতে এখন বাড়ীর মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ! ইহাকে এখন তাড়াইবার উপায় নাই। এই শব্দটি যেরূপ যথেচ্ছাচারের দাবী করিতেছে, সেজন্য ইহার দাবী কতখানি এবং যাঁহারা ইহার বাহক হইয়াছেন তাঁহারাই বা কি বলেন তাহা এই সময়ে দেখা উচিত। সম্পূর্ণভাবে বা বিশদভাবে ইহার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু গানের সমালোচনা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ইহার দাবী পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

Classic কথাটি ইউরোপীয় সমালোচকদিগের একটি অর্থসমন্বিত শব্দ। গ্রীক্ রসশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ইউরোপীয় সমালোচকগণ যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই যে Classic বলিতে একটি বিশেষরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ধারা বুঝাইবে যাহার পরিকল্পনা সরল, রচনা (form) সরল এবং বিষয় নির্বিশেষে রচনাপ্রণালী একই নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী এবং ছন্দ বিশিষ্ট হইবে এবং অলঙ্কার বর্জনীয়। বিষয় ভিন্নরূপ হইলেও রচনা ও ছন্দ একটি বিশেষ শ্রেণীতেই

আবদ্ধ থাকিবে। এই Classic-এর বিরুদ্ধে যে জগদ্বিখ্যাত প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল যাহা Romanticism নামে ইউরোপীয় সমালোচকদিগের নিকট পরিচিত—তাহারই মূল কথা এই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বিষয়ে কোনও নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না—বিষয়ানুযায়ী রচনার প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইবে এবং অলঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। Classic-এর নিয়মানুবর্ত্তিতা যেরূপ গোঁড়ামীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল Romanticism-এর স্বাধীনতাও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইবার ইতিহাস আছে।

কথিত ভাবধারার অনুশীলন করিলে আমাদের দেশের গানের মধ্যে একমাত্র ধ্রুবপদ গানের রচনাই (এমনকি হোরী বা ঝাঁপতালের গানও নহে) সঙ্গীত জগতে Classicism-এর দাবী করিতে পারে—কারণ Classic-এর নিয়মানুবর্ত্তিতা ইহার মধ্যে আছে; রচনার সরলতা, প্রকাশে ও গতিতে গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কারের প্রতি ঔদাসীন্যও একমাত্র ধ্রুবপদ গানেই পাওয়া যায়। শৃঙ্গার রসের ধ্রুবপদ গানও (যাহার পরিমাণ শতকরা ৩০টি আন্দাজ হইবে) চৌতালে হইবে, বীররসের ধ্রুবপদ গানও সেই চৌতালে হইবে এবং পারমার্থিক রসের গানও চৌতালে হইবে। এই প্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতা ধ্রুবপদ-ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার গানে নাই। এইজন্য ঝাঁপতাল, হোরী, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, কাজরী, চৈতী, সাধন, গজল, দাদরা, প্রভৃতি গানকে মস্তিষ্কের সুস্থ অবস্থায় Classical গান বলা উচিত হয় না। কিন্তু—দুঃখের বিষয় এই যে সমালোচকগণ (এবং গায়কগণও) আধুনিক বাংলা সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের গান, ও নাট্যসঙ্গীতকে একটি বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করিবার ব্যপদেশে—খেয়াল ঠুমরি—পরন্তু যাহা কিছু হিন্দুস্থানী গানকে Classical শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। অতঃপর আমরা মাসিক সাহিত্য, সংবাদ-পত্র এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মধ্যে Classical গানের বিজ্ঞপ্তির বাহুল্য দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে খেয়াল টপ্পা, ঠুমরি ও গজল গানকে Romanticism দ্বারা অনুপ্রাণিত বলাই উচিত। Classic শব্দটি ব্যবহার করিব অথচ উহার অন্তর্নিহিত বিশেষ অর্থ ও ভাবকে অবহেলা বা বর্জন করিব—ইহা পূর্ব্বে কথিত তৃতীয় প্রকারের সমালোচক দ্বারা সম্ভব—বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণ একথা বলেন না—জনসাধারণ ব্যক্তির এসকল কথা ভাবিবার অবকাশই নাই।

এই প্রকার, emotion, sentiment, mood প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ইচ্ছানুযায়ী ভাব ও রসকে বুঝাইতেছে ; কখনও বা emotion বলিতে sentiment-কেও বুঝাইতেছে। কখন যে কি বুঝাইবে এবং কখন কি বুঝান উচিত তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—সংবাদ পত্রে ও মাসিক সাহিত্যের প্রতিবাদমূলক আলোচনাগুলি।

প্রচলিত ভাষায়—রাগ, রাগিণী, শ্রুতি, ধ্রুবপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরি, বাণী প্রভৃতি বহুসংখ্যক শব্দ শুনিয়া আসিতেছি—যাহার প্রকৃত অর্থ পাওয়া কঠিন অর্থাৎ বহু অর্থে ব্যবহার হইতেছে। সমালোচকগণ এবিষয়ে একমত নহেন এবং একই সমালোচকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন মতও দেখা যায়। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বুঝেন কিন্তু পরীক্ষা বুঝেন না বা বুঝাইতে পারেন না। একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে "গ্রাম মানে কি ?" তিনি বলিলেন—"যেখানে স্বরগুলি বাস করে তাহার নাম গ্রাম।" "যেমন ?" "যেমন ষড়জ্ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম, মধ্যম গ্রাম" "তাহা হইলে—ঋষভগ্রাম ধৈবতগ্রাম, কোমল নিষাদ-গ্রাম হইবে না কেন ?" ইহার তৃপ্তিজনক উত্তর আর পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদিগের একটা গুণ আছে—তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যার গণ্ডীর বাহিরে যান না। কিন্তু সাধারণ সমালোচকগণ—প্রত্যেকে স্ব স্ব মনঃকল্পিত অর্থ ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। ফলে যদিও ফৌজদারী মামলা হয় না কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও যাহা ভীষণ ও অনিশ্চিত—দেওয়ানী মামলা—তাহা যুগের পর যুগ চলিতে থাকে। এই দেওয়ানী মামলার বর্ত্তমান অবস্থায়—শ্রুতি, গ্রাম, Classic, ঠাট প্রভৃতি লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে।

এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে "গান" নামক শব্দটিও উপরিকথিত যথেচ্ছাচার দোষে বহুদিন হইতে দূষিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

ডাষ্টবিন্

কয়েকটি কুকুরের কর্কশ চীৎকারে সুরপতির ঘুম ভেঙে গেল। জানালার কাছে এসে সুরপতি চেয়ে দেখে নীচে রাস্তার ধারে ডাষ্টবিনের পাশে উচ্ছিষ্ট পাতা নিয়ে একপাল কুকুর কাড়াকাড়ি করছে। পাশের বাড়ীর উৎসব-কোলাহল প্রায় নীরব হয়ে এসেছে। ডাষ্টবিনের একটু দূরে জগা পাগলা কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে আপন মনে খাচ্ছে আর কুকুরগুলোর সঙ্গে অনর্গল কি আবোল-তাবোল বকছে। বকুনির বিরাম নেই।

"কালো! কালো! আয়, আয়—"

একটি কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে তার কাছে এসে নাকী সুরে কান্না সুরু করলে। "চুপ্ কর্, চুপ্ কর্! কি হয়েছে"—গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে, "বুড়ো হয়েছিস্, কবে মরে যাবি—"

নাকী কান্না থামলো।

আর একটি কুকুর বিকটভাবে ডাকতে লাগলো বিনা কারণেই।

"চোপ্‌রাও পাজী—চোপ—"

জগা পাগলা কুকুরটিকে লক্ষ্য ক'রে একটি মাটির গ্লাস ছুড়ে মারলে। সুরপতি উপর দিকে চেয়ে দেখলো আকাশে তুলার স্তূপের মত সাদা সাদা খণ্ডমেঘ তীরবেগে দৃষ্টিসীমা পার হ'য়ে যাচ্ছে। সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো, তারার ভিড়।

বিশ্বাসঘাতক!

সুরপতির গা ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে। সুব্রতার চিঠির কয়েকটি লাইন মনে পড়ে যায়ঃ

"তুমি তো জানো আমার জীবনে দুঃখের শেষ নেই। কেন তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে, কেন?"

সুরপতি একবার চাইল আকাশের দিকে, একবার চাইল নীচে ডাষ্টবিনের পাশে কুকুরগুলোর দিকে। জগা পাগলা তখনও খাচ্ছে। মনে পড়ে,—

"মনে কর মাটির প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছো, তার জন্যে আবার দুঃখ কি।"

সুরপতির ঘরখানির এক কোণে একটি লম্বা টেবিলের উপর কতকগুলি শিশিতে নানারকম এ্যাসিড্, কয়েকটি কাচের জার্, বার্ণার, এবং আরও অনেক-গুলি পরীক্ষা করবার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে। ঘরখানি ছোটখাটো একটি ল্যাবোরেটরী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। দিনের বেলা সে এক্সপেরিমেণ্ট নিয়েই থাকে, ঘরের ভিতর দুম্ দাম্ শব্দ, গ্যাস্ ও এ্যাসিডের ঝাঁঝাল গন্ধ। সুব্রতার গা ঘিন্ ঘিন্ করে, অস্বস্তি বোধ হয়। ঘরের আর একপাশে একটি পুরাতন বুক্কেসে খানকতক বই—দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুই আছে। সুরপতি হয় পড়ে, না হয় শিশি বোতল নিয়ে পরীক্ষা করে। কি যে করে আর কি যে হয় কাকেও জানায় না। জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না।

জানলার ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদের কিরণ এসে ঘর আলোকিত ক'রে দেয়। সুব্রতার ভাল লাগে না, বলে—

"ঐ ছেঁড়া বইখানার মধ্যে কি রস পাও বলো তো?"

কুণ্ডলী পাকিয়ে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে সুরপতি সুব্রতার দিকে ফিরে হাসে। বলে,—

"বোসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"রক্ষে কর, আমার বুঝে দরকার নেই। তোমার থিসিস্, এ্যান্টিথিসিস্ নিয়ে তুমি থাকো—"

সুব্রতা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুরপতি সেদিকে চেয়ে একটু হেসে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করে।

ছোট ছোট স্মৃতির তরঙ্গ ধাক্কা দেয় মনে। মনে পড়ে চিঠির আরও কয়েকটি লাইন,—

"রমেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চল্লাম পশ্চিমের পথে। বাকি জীবন এঁর সঙ্গেই কাটিয়ে দেবো।" মনে পড়ে,—

"তোমার কাছে আমার মূল্য কতটুকু? ঝড়ে-উড়ে-আসা ছেঁড়া কাগজের টুকরো আমি—"

দিগন্ত রেখায় একটি তারা ধীরে ধীরে পাণ্ডুর হ'য়ে যাচ্ছে।

রামপ্রসাদী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে জগা পাগলা। অমন সে প্রত্যহই যায়। ভিক্ষার ঝুলিটি ঝুলছে কাঁধে, হাতে একখানি ভাঙা বেহালা, তারগুলি বাঁধা বেসুরে।

একদল মাড়োয়ারী গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছে ভৈরবের স্তোত্র পাঠ করতে করতে। প্রত্যুষের স্তব্ধতায় মিলিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠে শরীর শিউরে ওঠে।

দূর থেকে ধানকলের ভোঁ ভেসে আসে কানে। একতার নিষ্ঠুর আহ্বান।

কতকগুলি কাক বিশ্রীভাবে কলরব ক'রে ওঠে।

মূল সুরটি ধ'রে পাশের বাড়ীতে সানাই ওঠে বেজে। ভৈরবী রাগিণী। বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুর ফুলে ফুলে ফেনিয়ে ওঠে। ছোট ছোট সুরতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গতরাত্রির বাসর গেল ভেঙে।

একখণ্ড মেঘের আড়াল দিয়ে ভোরের সূর্য্যকিরণ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে ষ্টীমারের সার্চ্চলাইটের মত।

মিউনিসিপালিটির ময়লাফেলা গাড়ীতে স্তূপীকৃত হ'ল ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা। শীর্ণ, হাড়সার ঘোড়াটি পথের উপর খুর ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বেরিয়ে গেল। সুরপতি চেয়ে রইল সেদিকে।

* * *

অপরিসীম নিঃসঙ্গতা। যন্ত্রের একটানা ঘর্ঘড়ানির মত স্ফূর্ত্তিহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবনের দিনগুলি কেটে যায়।

বড় পিতলের দাঁড়ে বসে কাকাতুয়াটি কথা কয় অস্পষ্ট, আধ আধ। সুরপতি তার উত্তর দেয় মিষ্টি মিষ্টি। সুরপতির বর্ত্তমান জীবনের একমাত্র সাথী এই কাকাতুয়াটি। পাখীটিকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়, স্নান করায়, তার

সঙ্গে নানারকম কথা বলে। অর্থহীন কথা। কাকাতুয়ার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'য়ে ঝুঁটি নেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—

"কিয়া—কিয়া—কা—কা—উ—ক—ক—কিয়া—"

সুরপতি খুব জোরে দাঁড়টি দুলিয়ে দিয়ে হতাশ হ'য়ে চেয়ারের হাতল ধ'রে বসে পড়ে। একটি চুরুট ধরায়। চুরুটের ধোঁয়ায় আব্‌ছা ভেসে ওঠে চোখের সামনে অসংখ্য অসংলগ্ন চিন্তার মিছিল। কত দিনের, জীবনের কত তুচ্ছ দিনের টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি সুরপতির চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যায় ছায়াছবির মত। কাকাতুয়াটি সুরপতির দিকে চেয়ে ঝুঁটি নাড়তে থাকে। সুরপতিও চেয়ে থাকে তার দিকে। তপোবনের মত স্নিগ্ধ নির্লিপ্ত দৃষ্টি। যেন প্রাচীন যুগের কত রহস্যময় ইতিহাস ধ্যানমগ্ন যোগীর মত তার ভিতর স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

নক্ষত্রের মত ছোট্ট একটি মেয়ে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে। সাজি হাতে ফুল তুলছে বাগানে। পূজার ফুল। ন'বছরের সুব্রতা। সুরপতিকে পিছনে দেখে ছুটে গিয়ে লুকালো রজনীগন্ধার পাতার আড়ালে।

রাজবন্দী সুরপতি মুক্তি পেয়েছে চার বছর পর। জেলখানার গেটের সামনে ছোট্ট একটু জনতা। জনতার ভিতর থেকে একটি কিশোরী বালিকা বেরিয়ে এসে তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলে যুঁইফুলের মালা।

সুব্রতার সেই যূথিকাশুভ্র মূর্ত্তি এখন ধূসর স্বপ্নের মত।

বিস্মৃতি যখন মানুষের কাম্য হয়, তখন স্মৃতি তাকে জড়িয়ে ধরে সাপের মত। কাকাতুয়াটিকে নামিয়ে সুরপতি তাকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়, কথা বলে। বলে, "বল—ক্রতো স্মর কৃতং স্মর—"

"ক—কিয়াশ্—টাকিয়া কা—"

কাকাতুয়ার কথা অস্পষ্ট তবু ভাল লাগে।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটে, তারপর সুরপতি বিছানার উপর ক্লান্ত শরীর দেয় এলিয়ে। ধীরে ধীরে চোখের পাতাদুটি বুজে আসে।

সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলক্, মেঘ-গর্জ্জন। সুরপতির মন আজ অন্তর্মুখী। কাকাতুয়ার ডাক আজ আর ভাল লাগে না, তবু কাকাতুয়া ডাকছে, তার কণ্ঠস্বরে আজ তীক্ষ্ণতা।

নিশুতি রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করে দ্বিপ্রহরের শ্মশানের মত।

মুখ থেকে সদ্যনিঃসৃত চুরুটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে সুরপতি দেখছিলো তার ক্রমবিলীয়মান রূপ।

সবুজ রঙের শাড়ী পরে পা টিপে টিপে এসে কে যেন তার চেয়ারের পিছন থেকে বল্‌লে—

"ওগো ঘুমোও—ঘুমোও আর রাত জেগো না—ঘুমও কি তোমায় বশ করতে পারলে না—"

"না—না—না—"

সুরপতি চেয়ার ছেড়ে ধড়ফড় ক'রে উঠে পড়ে। কাকাতুয়ার ঝুঁটি ধ'রে খুব জোরে জোরে নাড়া দেয়, চুরুট টানে আর ঘন ঘন পায়চারি করে। তারপর চুপ ক'রে চোখ বুজে চেয়ারে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

কাকাতুয়াটি ঘন ঘন চীৎকার করতে থাকে।

সুরপতি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দাঁড় থেকে কাকাতুয়াটিকে মেজের উপর নামায়। শৃঙ্খলমুক্ত কাকাতুয়া আনন্দে ককিয়ে ওঠে। ডেস্ক থেকে একখানি ছুরি বার ক'রে সুরপতি কাকাতুয়ার কণ্ঠনালী চিরে ছেড়ে দেয়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোয়। মেজের উপর ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে এক কোণে গিয়ে কাকাতুয়াটি দু'বার সমস্ত শরীর ঝাকুনি দিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে যায়।

নিশুতি রাতে মৃত কাকাতুয়াটিকে সুরপতি ফেলে দিয়ে আসে ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনার মধ্যে। পরদিন ভোরে মিউনিসিপালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী ডাষ্টবিন্ উজাড় ক'রে আবর্জ্জনার সঙ্গে কাকাতুয়াটিকে নিয়ে চলে যায়।

* * * *

ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভোরের অস্পষ্ট আলো, আজও ঠিক তেমনি ভাবে গাড়ীতে ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা ভর্ত্তি ক'রে শীর্ণ ঘোড়াটি খুর ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বেরিয়ে গেল। সুরপতির প্রিয় 'পার্ল' রইল

পড়ে। মুখ বিকৃত ক'রে নিষ্পলক চোখছুটি মেলে সে পড়ে রয়েছে ডাষ্টবিনের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে একটি ধাঙড় ঠেলা গাড়ীতে ক'রে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। সুরপতি একদৃষ্টে চেয়ে র'ইল সেদিকে।

"পার্ল !"

পার্ল ছুটে এসে চেয়ারের হাতলের উপর ঠ্যাঙ্ ছুটি তুলে দিয়ে দাঁড়ায়, ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকে। সুরপতি তাকে প্যাট্ ক'রতে ক'রতে বলে, "ফ্রি উইল্ বুঝিস্ পার্ল ?"

পার্ল গোঁ গোঁ করে।

কাকাতুয়াটিকে হত্যা করার পর ভীষণ নির্জ্জনতার মাঝখানে সুরপতির বহুদিন কেটে গেছে। তখন দিবারাত্রি সে দর্শনের মধ্যে ডুবে থাকতো। একদিন বেড়িয়ে ঘরে ফিরতে সে দেখে বহুদূর থেকে একটি কুকুর তার পিছন পিছন আসছে দৌড়ে। অনেকবার সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু সে তার পিছু ছাড়েনি। ঘরে ফিরে দেখে কুকুরটিও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।

সেদিনের মত সে তাকে বাইরের বারান্দায় আশ্রয় দিয়েছিল, ভেবেছিল ভোর হ'লে বোধহয় সে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। কিছু সে খায় নি। সুরপতিকে দেখে পরদিন ভোরে করুণভাবে চেয়ে র'ইল তার দিকে। সেদিন থেকে সে হ'ল সুরপতির সাথী, নাম রইল তার 'পার্ল'। কিন্তু আগুনের বুকে খড়ের আয়ু কতক্ষণ !

পার্লকে সঙ্গে নিয়ে সুরপতি প্রায়ই বেড়াতে যেতো। সেদিন পার্ল পথে ভীষণ বিরক্ত ক'রেছে। ছুটে গিয়ে অন্য কুকুরের সঙ্গে করেছে ঝগড়া, কারো পিছন পিছন গেছে ছুটে—সারা পথ ঘাস আর কাঁকর শুঁকে শুঁকে দৌড়ে বেড়িয়েছে। সুরপতি তাকে শাসন করতে গিয়ে যৎপরোনাস্তি হয়রান হয়েছে। ঘরে ঢুকে দৌড়ে এক লাফে টেবিলের উপর উঠে পার্ল ভাঙলো একটি কাচের

জার। একখানি বই কামড়ে ধ'রে মেজের উপর খেলা ক'রতে লাগলো। বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলি উড়ে উড়ে যায় আর পার্ল লাফ দিয়ে ধরে।

পার্ল এর গলায় শিকল পরিয়ে সুরপতি ভীষণ চাবুক মার্তে থাকে। শঙ্কর মাছের চাবুক গায়ে কেটে কেটে বসে যায়। পার্ল বিকটভাবে গোঁঙায়, তাতেও হয় না। অসহ্য বিরক্তিতে সুরপতি বগ্‌লস্‌টি চেপে ধ'রে আঁটতে থাকে। ধীরে ধীরে পার্ল-এর জড়িত গোঙানি ক্ষীণ হ'য়ে আসে। ঠ্যাঙ্‌ দু'টি সটান ক'রে পার্ল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

* * * *

অন্ধকারের পটভূমিকায় অশরীরী স্মৃতির মূকাভিনয়।

ঘরের ভিতর পা দিলেই সুরপতি শুনতে পায় রমেশ ও সুব্রতার খিল্‌ খিল্‌ অট্টহাসি, কাকাতুয়ার ডানা ঝাপটানি, মুমূর্ষু পার্ল-এর গোঙানি। সুব্রতার একটি কথা শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে ঃ

"তোমার মত স্বামী সত্যিই দেবতা, পূজার যোগ্য—আমাদের ঘর করতে হ'লে দরকার মানুষ—"

এখন সুরপতির জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সহরের এক কোণে একটি নির্জ্জন রেস্তোরাঁয় গ্লাসের পর গ্লাস মদ উজাড় ক'রে টলতে টলতে ঘরে ফিরে সুরপতি শুয়ে পড়ে। জীবনের অতীত দিনগুলি দেয়ালের গায়ে, সিলিঙের উপর প্রেতনৃত্য করে।

নির্জ্জন অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে স্মৃতির সর্পিল পথের উপর দিয়ে বহুদূর সে চলে যায়—ফিরে আসার কথা স্মরণ থাকে না। ঘরের ঠিকানা বুঝি গরমিল হ'য়ে যায়।

দিনরাত বুকের হাড়পাঁজর কে যেন রোলার দিয়ে পিষছে। পৃথিবীর সে শ্যামলতা আর নেই, সেই সবুজ রঙের পৃথিবী, সেই প্রশ্নাতুর দৃষ্টি আর নেই পৃথিবীর চোখে, এখন সেখানে ঘন কালিমার প্রলেপ, নিষ্প্রভ ঘোলাটে তার দৃষ্টি।

হায় রে পৃথিবী!

চিরপ্রবহমাণা পৃথিবী। বিরামহীন গতিতে চলেছে, বিসর্পিল চক্রগতিতে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে, বিবর্ত্তন আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে, মিথ্যে, সব

মিথ্যে। স্নরপতির মনে হয় সব অর্থহীন। কোথায় সেই দ্বন্দ্ব, সেই বিরোধ, সেই সমন্বয়। শুধু সহজ সাবলীল একঘেয়েমি। যেন কোনো কারখানার কলের ভোঁ অনাদি কাল ধ'রে অহরহ বাজছে।

স্নরপতির অট্টহাসিতে কাচের শিশিবোতলগুলি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্লো।

গাছের তামাটে পাতায়, চিলে কোঠার ছাদে, দূরে লৌহকারখানার ধূমায়িত চিমনির মাথায় ভোরের সোনালি সূর্য্যকিরণ ঘোলাটে দেখায়। কোনো সুদূর পল্লীতে, নবজাত দোদুল্যমান ধানশীষের মাথার উপর হয়তো আলপনা আঁকছে এই সোনালি সূর্য্যকিরণ। তাতে তার কি ?

স্নরপতি ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দার উপর রেলিঙে কনুই ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। সামনে রায় বাহাদুরের বাড়ী। দোতালার বারান্দায় আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে তিনি একখানি খবরের কাগজ পড়ছেন। সমস্ত বাড়ীটি লাল নীল আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। তেতালার ছাদে রঙিন্ সামিয়ানা টাঙানো, নীচে ব্যাগপাইপপার্টির বাদকেরা সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। রায়বাহাদুরের স্ত্রী সোনালি কারু কাজ করা একখানি ভায়লেট্ রঙের শাড়ী প'রে ছ'মাসের শিশুটিকে কোলে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে কি বললেন। রায়বাহাদুর মহাশয় স্ত্রীর দিকে ফিরে হেসে হাতদুটি বাড়িয়ে দিলেন। মায়ের গলা জড়িয়ে শিশু কেঁদে উঠলো। বহু সাধ্যসাধনার পর বুড়োবয়সে একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, আজ তার অন্নপ্রাসন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে মহাসমারোহে।

স্নরপতি রাস্তার ধারের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ব্যস্তবাগীশ জনতার স্রোত। ট্র্যাফিকের শব্দ।

পাশের বাড়ীর চাকর এক ঝুড়ি আবর্জ্জনা ফেলে গেল ডাষ্টবিনে।

কোন বিস্ফোরণ নেই, কোন উল্লম্ফন নেই, পথ বন্ধুর নয়, বেশ মসৃণ। অপরিবর্ত্তনশীল জগৎ।

সেদিন ঘরে ফিরতে স্নরপতির অনেক রাত হয়েছিল।

গভীর রাত্রি। পথ জনমানবহীন। দু'একখানি ট্যাক্সি ও রিক্সা মাঝে মাঝে চলাচল করছে। ফুটপাতের উপর মজুরের দল চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ঘুমুচ্ছে।

সুরপতি ঘুরতে ঘুরতে বাসার কাছে সরু গলিটার ভিতর ঢুকলো। মিট্ মিট্ ক'রে গ্যাসগুলি জ্বলছে। কার বাড়ীর বাগান থেকে হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। অদূরে একটি বীভৎস মূর্ত্তি দেখে সুরপতি হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো।

ডাষ্টবিন্ থেকে হাত পঁচিশ দূরে নর্দ্দমার ধারে একটি মেয়েমানুষ উলঙ্গ হ'য়ে শুয়ে রয়েছে। চুলগুলি কাদামাটি-মাখা। পরণের শতছিন্ন ময়লা কাপড়খানি নর্দ্দমার ধারে লুটোচ্ছে। একটি লোমহীন নেড়ী কুকুর তার রুক্ষ চুলের গোছা শুঁকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুরপতি কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর চুপ ক'রে ফিরে গেল নিজের ঘরে। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয় আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে সেই বীভৎস নগ্ন নারীমূর্ত্তি। কি কুৎসিত এই নগ্নতা!

হয়তো কোনো সুদূর প্রবাসে দ্বিতল বাড়ীর এক অন্ধকার কক্ষে এখনও রমেশ ও সুব্রতা জেগে আছে—হয়তো—

সুরপতির হাত পা মাথা ঝিন্ ঝিন্ ক'রে ওঠে। বিছানায় শুয়ে সারারাত্রি ছটফট্ ক'রে কেটে যায়। ঘুম আসে না।

ভোরের আলো টেবিলের উপর এসে পড়েছে। সুরপতি উঠে অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ডাষ্টবিনের পাশে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। হু হু ক'রে লোক জড় হ'চ্ছে কোত্থেকে, প্রভাতের জনবিরল পথটি মুহূর্ত্তে সরগরম হ'য়ে উঠ্‌লো। জনতার ভিতর তিনচারটি পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূরে মিউনিসিপালিটির ময়লাফেলা গাড়ীর সেই শীর্ণ পাঁজরা-বার-করা ঘোড়াটি ধুঁক্‌ছে আর খুর ঠুক্‌ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুরপতি নীচে নেমে এসে দেখলো ডাষ্টবিনের মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো ছোট্ট একটি রক্তমাংসের পুতুল। যেন এক চাঁই জমাট-বাধা তাজা রক্ত। জবাফুলের মত লাল টুকটুক করছে। চোখদুটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত, সরুসরু

হাতপাগুলি লিক্ লিক্ ক'রেছে কাঠির মত। ভিড়ের ভিতর থেকে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করছেন।

সুরপতি সারাদিন অনুসন্ধান ক'রেও গত রাত্রির সেই মেয়েমানুষটির কোনো খোঁজ পায়নি সেদিন।

* *
*

এরপর প্রায় ছ'মাস সুরপতি ঐ ঘরটিতে ছিল। মাঝে মাঝে সে দেখতো সেই মেয়েমানুষটিকে। কোমরে ছেঁড়া একফালি কাপড় জড়ানো, চুলগুলি আলুথালু উড়ছে। ডাষ্টবিনের কাছে এসে সে মুঠো মুঠো ছাই তুলে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতো আর চীৎকার ক'রে বলতো—

"ধরে নিয়ে আয়—খুন্ করবো—খুন্ করবো—খুন্ ক'রে ফেলবো—" এর সঙ্গে আরও অশ্রাব্য অনেক কিছু কুকথা।

কিন্তু এই সময়ের ভিতর সে জগা পাগলাকে কোনোদিন কোথাও দেখতে পায় নি। জগা পাগলা কোথায় অন্তর্ধান করেছে। কেউ তার কোনো খোঁজখবর রাখে না।

শ্রীবিনয় ঘোষ

শ্যামা

আমার বিশ্বাস, আধুনিক যুগে যদিও কবির অভাব নেই, তবু কবিতাপাঠকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। সেইজন্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ একেবারে অসার্থক নয়, কেবল কালাতিক্রান্ত। কারণ এখানে আমি যে-কাব্যসংগ্রহের গুণগানে উদ্যত, সেই প্রণয়সংক্রান্ত কবিতাবলী বেশ কিছুদিন আগে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তার বিষয়ে ইদানীন্তন সুধিসমাজের ঔৎসুক্য যতটা মৌখিক, ততটা চাক্ষুষ নয়; এবং সঞ্চয়নখানির প্রণেতা অনামিক ও অজ্ঞাতকুলশীল হলেও, রচনাগুলির উৎকর্ষ, আমার মতে, এতই নিঃসন্দেহ যে সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের নিরাগ্রহ সর্ব্বতোভাবে শোচনীয়।

কিন্তু পুস্তকখানি নামেই সঙ্কলন, আসলে তার মধ্যে কোনো আনুপূর্ব্বিকতা নেই; কোনোমতেই বলা যায় না যে সকল কবিতা একটিমাত্র রমণীকে উৎসর্গিত। এবং যদি বা একাধিক কবিতা একই নারীর উদ্দেশে লেখা হয়ে থাকে, তবু সেগুলির রচনাকাল নিশ্চয়ই বিভিন্ন। তাতে প্রেমানুভূতির নানা রূপের সঙ্গে বিষম বিদ্বেষের প্রকারভেদ ফুটে উঠেছে; এবং কবির প্রিয়া বা প্রেয়সী-পরম্পরার মতিগতিও সেখানে এক নয়, বিচিত্র ও বিবিধ।

তবে শুধু বৈচিত্র্যের খাতিরেই আমি আজ এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি। এতদিন পরে এ-বিষয়ে বাক্যব্যয়ের বিশেষ কারণ এই যে উক্ত কবিতাবলী নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের লেখা বটে, কিন্তু কোনো ইংরেজ স্ত্রীলোক সেগুলোর উপলক্ষ্য নয়। সম্প্রতি বইখানা আবার পড়তে পড়তে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কবির প্রিয়তমারা ভারতবর্ষীয়া। কবিতার পর কবিতায় প্রেমিক রূপসী নায়িকার শ্যামসমারোহের গুণ গেয়েছেন:

> ...my mistress' brows are raven black,
> Her eyes so suited... ...
> ...every tongue says beauty should look so.

অতএব এতে সন্দেহ নেই যে কবির বাঞ্ছিতা প্রায় নিকষকালো ছিলো এবং তার কৃষ্ণকান্তিই কবিকে অনিবার্য্য আকর্ষণে টানতো। সুন্দর আর শ্বেতবর্ণের মধ্যে

যে-শব্দগত সংযোগ এ-দেশের একাধিক ভাষায় পরিস্ফুট, আমাদের লেখক সেই সাধারণ কুসংস্কার এবং, অন্তত আমার মতে, ভ্রান্ত গৌরীপ্রীতির পৃষ্ঠপোষক নন। তাঁর অকপট প্রেয়সী যেহেতু আধুনিকাদের মতো পাউডারপ্রলেপে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেনি, তাই তার অঙ্গরাগ থেকে বেগুনী রঙের হাস্যকর আভাও হয়তো ফুটে বেরুতো না :

Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.

আমার অনুমান, কাব্যোল্লিখিত ভারতবাসিনীদের মধ্যে অন্তত একজন ছিলো বাঙালী। কারণ নারীদেহের একটি বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সদাসর্ব্বদা আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করতো ; প্রেয়সীর চোখের বর্ণনায় কখনো তাঁর ক্লান্তি আসেনি। নিবিড় কালো চোখের সে-রকম রোমাঞ্চকর জৌলস শুধু বাংলা দেশেই সম্ভব ; এবং সে-সম্মোহনে স্বয়ং বাঙালী কবিদের মনও বারম্বার মজেছে। অবশ্য আমি রবীন্দ্রনাথের সেই মেয়েটির কথাই ভাবছি, যে একদিন ময়নাপাড়ার মাঠে কালো হরিণচোখ আকাশে তুলে আসন্ন বর্ষার মেঘসমাগম দেখেছিলো ; কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক এখনই আরো হাজারটা দৃষ্টান্ত ভেবে নেবেন।

সে যাই হোক, আমাদের কবি উদ্ধৃতাংশে বলেছেন :

...my mistress' brows are raven black,
Her *eyes* so suited......,

অন্য একটা কবিতার সুরুতেই তিনি লিখেছেন :

Thine *eyes* I love......,

অন্যত্র দেখতে পাই তিনি

Commanded by the motion of her *eyes*,

এবং উপান্ত কবিতাতে মদন নিজে তাঁর সংক্রামক উদ্দীপনার আগুন কবিপ্রিয়ার চোখের আলোয় জ্বালিয়ে নিয়ে যান। অতএব আমাদের কবি স্বভাবতই চোখের জন্যে পাগল। এমনকি উপমিতির প্রসাদে নিজের চোখ সম্বন্ধেও তাঁর উদ্বেগের

অন্ত নেই। এবং চোখের প্রবঞ্চনায় বারম্বার প্রতারিত হয়েও তিনি শেষ পর্য্যন্ত সেই চোখেরই অন্ধ স্তাবক ঃ

O ! how can Love's eyes be true
That is so vex'd with watching and with tears ?

উপরন্তু প্রত্যাখ্যানের ফলে তাঁর প্রেম যখন বিদ্বেষে বদলায়, তখন তিনি যদিও কবিতার আরম্ভেই লিখে বসেন ঃ

My mistress' eyes are nothing like the sun,

তবু চাহনির আজ্ঞালঙ্ঘন তাঁর সামর্থ্যে কুলায় না, বরং ফ্রয়েডী দুরুক্তির আড়াল থেকে আপনার হাস্যকর দাসত্বই ফুটে বেরোয় ঃ

If hairs be wires, black wires grow on her head.

এখানে পদটির অনিশ্চয়তা দ্রষ্টব্য ঃ আসলে নরম চুল একাধারে আধি-ব্যাধির লক্ষণ এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতীক। তাঁর অভিসার নিশ্চয়ই সমতল পথে চলতো না।

আমার বিশ্বাস, ফীড্রাসে প্লেটো ঐশী উন্মাদনার যত রকম প্রকারভেদ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলোর সর্ব্বসাধারণ লক্ষণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা ; এবং ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে ওই জাতীয় উত্তুঙ্গ মনোভাবের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর সমভাবের বিরোধ বাধে ব'লেই উক্ত ব্যাধি অতখানি অসহ্য লাগে। তাহলেও মানুষের সকল দুর্মূল্য অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই পতন-অভ্যুদয়ের ডায়ালেক্‌টিক অন্তর্নিহিত থাকে ; এবং আজ পর্য্যন্ত কোনো প্রেমার্ত্ত ব্যক্তিই এই উভবল দ্বৈতবোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। যারা শুধু কবি নয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেমিক, তাদের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ উন্মাদনা যেহেতু একত্র বর্ত্তমান, তাই সাংঘাতিক অন্তর্বিরোধেও তারা অদ্বিতীয় ; এবং পার্থিবাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজাতিরিক্ত ভাবা তাদেরও সাধ্য নয়। আলোচ্য সঙ্কলনে এই মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্বসমাসই একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতার অবলম্বন। নিম্নলিখিত পংক্তি-কটায় আমাদের কবি শুধু অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাতই নয়, এমনকি হয়তো প্রাণাধিকার সাক্ষাৎকারেও প্রতিষিদ্ধ ; তবু তার উপরে চোখ পড়তেই প্রেমিক উত্তেজনায় মৃতপ্রায় ঃ কোনো এক জনবহুল স্থানে উভয়ের অপ্রত্যাশিত সন্নিকর্ষ

ঘটায় নায়িকা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কারো দিকে তাকাতে কবি বলছেন—

ah ! my love well knows
Her pretty looks have been my enemies,
And therefore from my face she turns my foes,
That they elsewhere might dart their injuries :
Yet do not so ; but since I am near slain,
Kill me outright with looks and rid my pain.

পরবর্ত্তী কবিতা আরো বেশী কৌতূহলপ্রদ ঃ এটিও সম্ভবত একই স্ত্রীলোকের উদ্দেশে লেখা, এবং সে-নারীর উপেক্ষা এখনো অবিকৃত ঃ বোধহয় কবি কিছু দিন আগে তাকে চিঠি বা কবিতা পাঠিয়ে আজও কোনো জবাব পাননি—

Be wise as thou art cruel ; do not press
My tongue-tied patience with too much disdain ;
Lest sorrow lend me words and words express
The manner of my pity-wanting pain.
If I might teach thee wit, better it were,
Though not to love, yet, love, to tell me so ;
As testy sick men, when their deaths be near,
No news but health from their physicians know ;
For if I should despair, I might grow mad,
And in my madness might speak ill of thee :
Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be.
That I may not be so, nor thou belied,
Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.

সহজ ভাষায় এর অর্থ এই যে কবি তাকে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে অভীষ্টসিদ্ধির আয়োজনে অগ্রসর ; এবং যেখানে তাঁর বাস সে-স্থান যে রটনার পক্ষে অতিশয় উর্ব্বর, তাও তাঁর অজ্ঞাত নয় ঃ

Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be.

নায়িকা যদি জবাব না দেয়, এবং তার উত্তরে যদি অন্তত প্রেমের ভান না থাকে, তবে কবি তার বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচারে নামবেন। এবং সে-কুৎসা কি? তিনি লোকসমাজে শুধু এইটুকুই বলবেন যে মেয়েটি নিতান্ত নির্ব্বোধ—

Be *wise* as thou art cruel......

এবং

If I might teach thee *wit*......

এই কবিতাটির রচনাকালে তিনি নির্ঘাত ভেবেছিলেন যে সে বস্তুতই অত্যন্ত নির্ব্বোধ; এবং তার দীর্ঘায়িত নীরবতায় ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে উঠে তিনি লোকসমক্ষেও সে-সত্যঘোষণার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যাতে সারা সমাজ তাঁর প্ররোচনায় মেয়েটির বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ অভীপ্সা আর নীচতার দোটানায় তিনি শত্রুদলে যোগ দিতেই বদ্ধপরিকর।

কিন্তু তাঁর নিরাশার কবিতাগুলিও বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এ-দেশের কৃষকরমণীরাই এ-চিত্রকল্পের নির্ভর—

Lo! as a careful housewife runs to catch
One of her feathered creatures broke away,
Sets down her babe and makes all swift dispatch
In pursuit of the thing she would have stay,
Whilst her neglected child holds her in chase,
Cries to catch her whose busy care is bent
To follow that which flies before her face,
Not prizing her poor infant's discontent;
So runn'st thou after that which flies from thee,
Whilst I thy babe chase thee afar behind;
But if thou catch thy hope, turn back to me,
And play the mother's part, kiss me, be kind;...

প্রেয়সীর সঙ্গে তাঁর নিজের সম্বন্ধ আর মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ, এই দুই সম্বন্ধের তুলনা পূর্ব্বোক্ত কবিতার "pity-wanting pain"-এর অভিব্যক্তি; এবং যাঁরা এখনো ঈডিপাস গ্রন্থিতে আস্থা রাখেন, তাঁরা উল্লিখিত পংক্তিগুলোয় সে-মনোব্যাধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাবেন। এ-প্রসঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের নাম নেওয়া যদি মার্জ্জনীয় হয়, তবে অন্যান্য মনোবিদেরা বুঝবেন যে এখানে আমাদের কবিও শেক্‌স্‌পীয়রের মতোই গর্ভগৃহকে সমাধিমন্দিরে পরিণত করছেন—making his tomb the womb wherein he grew। যাঁরা মনোবিজ্ঞানী নন, তাঁদের কাছে এ-কবিতার সমাজতাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে এই যে সমাজব্যবস্থায় মাতৃ-প্রাধান্য সত্যই দুর্ম্মর; এবং আমার মতো মামুলী মানুষের কাছে কবির সুপ্রকট দৈন্যগ্রন্থি এই সাধারণ সত্যেরই সাক্ষ্য যে পুরুষ-মাত্রেই স্ত্রীজাতির অঞ্চলাশ্রয়ী।

কবিতাটির যে-ব্যাখ্যাই করা যাক না কেন, এতে সন্দেহ নেই যে কালীপূজার মূলেও অনুরূপ প্রত্যয়ই ক্রিয়াশীল; সেই মসীবরণা বিশ্বজননীর প্রতীকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের স্বতোবিরোধী সমন্বয় আরো সুপ্রকট; এবং আলোচ্য কবিতাসমূহের একটাকে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, কালীস্তোত্র বলেই বোধ হয়। আমাদের কবি যে বাংলা দেশকে জানতেন তার অকাট্য প্রমাণ এই কবিতাটি, এবং সেইজন্যে এটিকে আমি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি:

Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;
For well thou know'st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love groan:
To say they err, I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.
And, to be sure, that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another's neck, do witness bear
Thy black is fairest in my judgement's place.

In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slandar, as I think, proceeds.

এ-কবিতাটি যে কালীর বন্দনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় এই অংশটুকু ঃ

A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another's neck, do witness bear
Thy black is fairest.........

অন্বয়ের খাতিরে পংক্তি-কটার এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধহয় সমীচীন ঃ—"কেবল তোমার মুখের ধ্যান কর্‌লেও আমার হৃদয় সহস্র দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিদীর্ণ হয় ; এবং সে-দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলোর মধ্যে তিলার্দ্ধ ব্যবধান থাকে না, একটা আসে আগেরটার গলায় ভর দিয়ে।" এ-ব্যাখ্যা সকলেই নিশ্চয় নির্ব্বিবাদে মেনে নেবে। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবচ্ছবি—দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা! তবু এখানে শব্দবিন্যাস দ্রষ্টব্য ; এবং যুক্তিশৃঙ্খলার কথা বাদ দিলে, "one on another's neck—" পদটার স্থান 'groans'-এর পরে নয়, 'face'-এর অব্যবহিত পরে। এখন আমরা যদি ভাবতে পারি যে এখানে কবির মানসপটে কালীপ্রতিমা ফুটে উঠেছিলো, তবেই তাঁর চিন্তাধারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় ; কারণ কালীর যে-মূর্ত্তি আবালবৃদ্ধবনিতার উপাস্য, তাতে তিনি নরমুণ্ডমালিনী, এবং এই কপালমালায় মাথাগুলো বাস্তবিকই গলাগলি ক'রে আছে। সুতরাং কাব্য-রচনার একটা অতিসাধারণ ঘটনার নিদর্শন এই পংক্তি-কটায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ যে-চিত্রকল্প মুখ্যত চক্ষুসম্পর্কিত, তার অঙ্গবিশেষ মূল অর্থ হারিয়ে, নিকটবর্ত্তী বাক্যে নিহিতোপমার পদে প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনধিকারচর্চ্চা করছে। কাব্যরচনার সাম্প্রতিক বিশ্লেষণমাত্রেই দেখিয়েছে যে এই জাতীয় রূপান্তর সকল কবিতাতেই সুলভ। এবং এখানে যখন ছন্দের প্রয়োজনে শব্দবিন্যাস এই রকম ন্যায়াতিরিক্ত অর্থের অনুকূল, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসের গলা দেখেও আশ্চর্য্য হওয়া অনুচিত।

ফলত আমরা মানতে বাধ্য যে কবির মনে কালীমূর্ত্তি মুদ্রিত ছিল। কিন্তু দেবী আর মানবীর মধ্যে তিনি স্পষ্টত বিশেষ পার্থক্য করেননি ; অসংখ্য ভারতীয় লেখকদের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও একজন অপরের বাদ সাধেনি, একই পাত্রে উভয়ের সাযুজ্য ঘটেছিলো। তবে উদ্ধৃত কবিতার শেষের দু লাইন থেকে

বোঝা যায় যে কালীপূজার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বটুকুর অনেকখানিই তাঁকে এড়িয়ে গেছে, সে-সর্ব্বনাশীর মধ্যে সৃষ্টির আকৃতি তিনি বড় একটা দেখতে পাননি, সাধারণত তার খামকা খেয়ালই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "Black in thy deeds"; এবং সে-উক্তির মধ্যে হয়তো বিদেশ সম্বন্ধে আগন্তুকের প্রথম ভুল-চুকগুলোই টিঁকে আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইচ্ছাকৃত অবিদ্যাই তাঁর সাময়িক অবস্থাকে বেশী মানায় ভেবে তিনি এই কবিতায় পূর্ণ জ্ঞানের দিকে এগোতে চাননি। কারণ শুনেছি যে কালবিনাশিনী মহাকালীর সংহারমূর্ত্তি মায়াজালমাত্র, প্রকৃত ভক্ত সে-বাধা মানেনা; বিশ্বজননীর নির্দ্দেশে সে শেষ পর্য্যন্ত মোক্ষের জ্যোতির্ময় শান্তিতেই পৌঁছায়। নিম্নোক্ত পদরচনার সময় আমাদের কবিও এ-কথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন ঃ

> So runn'st thou after that which flies from thee
> Whilst I thy babe chase thee afar behind.

আশা করি উদ্ধারের সাহায্যে আমি দেখাতে পেরেছি যে এই কবিতাগুলির অন্তর্দৃষ্টি বিশ্ববিস্তৃত, আবেগ প্রভূত শক্তিশালী, শব্দনির্ব্বাচন ও পদন্বয়ের প্রতিভা অসাধারণ এবং বিষয়বস্তু কবির অতিগভীর ও বহুবিচিত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়তো এই শ্যামাঙ্গিনী কে, সে-সমস্যারও সমাধান করেছি। সে-রমণী কোনো একজন স্ত্রীলোক নয়, অনেক বাঙালী মেয়ের সমন্বয়ে তার উদ্ভব। তাদের মধ্যে কেউ সুন্দরী, কেউ কুরূপা; কেউ দয়াবতী, কেউ মর্ম্মান্তিক; কিন্তু তারা সকলেই মহাকালীর অংশভাক, যার মধ্যে সেই পরস্পরবিরোধী কৃষ্ণার দল সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য পায়।

কিন্তু আমার পাঠকেরা নিশ্চয়ই কবিপরিচিতির জন্যে উৎসুখ হয়েছেন। অনেক বছর ধরে অবিবেকী কাব্যবিবেচকেরা বিশ্বাস করতেন যে এই কবিতা-সমষ্টির রচয়িতা শেক্‌স্‌পীয়র, কারণ কবিতাগুলিকে একত্রে সংগ্রথিত ক'রে টমাস থর্প্ নামক কোনো এক কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি এই অনামিক কাব্যসঙ্কলনখানি 'পরবর্ত্তী সনেটসমূহের একমাত্র জনক'—'The Onlie Begetter of these Insuing Sonnets Mr. W. H'-কে উৎসর্গ করেন। এখনো শেক্‌স্‌পীয়রের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত কবিতাগুলো ১২৭ থেকে ১৫৪ নম্বরের সনেট ব'লেই স্থান পায়; কিন্তু আজ আর নামকরা এমন কোনো পণ্ডিত নেই যিনি নিঃসন্দেহে

সবগুলোকে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা হিসাবে দেখেন। এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ অত্যাধুনিক শেক্‌স্‌পীয়র সমিতিগুলোও এখনো এ-অনুমানের কোনো প্রমাণ পাননি যে শেক্‌স্‌পীয়র ইংলণ্ডের বাইরে খুব বেশী বেড়িয়েছিলেন অথবা ৯৮ নম্বরের সনেটটি ব্রাউনিং-এর Home Thoughts from Abroad কবিতার পূর্ব্বাভাস। এ-ধারণার স্বপক্ষেও কোনো সাক্ষ্য নেই যে শেক্‌স্‌পীয়র যদি এ-দেশে এসেই থাকেন, তবে ভারতের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে যতদিন এখানে থাকা দরকার, তিনি ততদিন প্রবাসে কাটিয়েছিলেন। সুতরাং অগ্রগামী গবেষণার আশাপথ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে Times Literary Supplement যে-দেশকে কবিতার লীলাভূমি বলেছে সে-দেশের সম্মোহে অভিভূত একজন অনামা ইংরেজের সম্বেগ, প্রজ্ঞা, আত্মনিগ্রহ ও তিক্ততার সার্ব্বজনীন অভিব্যক্তিই রসিকের পিপাসানিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

[এই প্রবন্ধের প্রকরণ জন্‌সন্‌, কোল্‌রিজ্‌, সুইন্‌বর্ন্‌, রির্চার্ড্‌স্‌, গ্রেভ্‌স্‌ ও এম্‌সন্‌ ইত্যাদি একাধিক মনীষীর দ্বারা উদ্ভাবিত, এর বক্তব্যের একমাত্র জনক, the onlie begetter, আমি।]

হমফ্রে হাউস্‌*

---

* ইংরেজিতে প্রদত্ত রেডিও বক্তৃতার ভাবানুবাদ

রূপান্তরিতা

এখনো মেটেনি আশা ? হে আমার তৃষ্ণার গণিকা,
মুক্তদ্বার আকাঙ্ক্ষার বাতায়নবর্ত্তিনী সুন্দরী,
অন্ধকার নগরীর সৌধশিরবাসিনী হে শিখা !
আর কতকাল, বলো, তমস্বিনী তোমার শর্ব্বরী
প্রহর গণিবে বসি' চন্দ্রহারা তন্দ্রাহীনতায় ?
পথভ্রান্ত মানসের পতঙ্গ-পান্থের দল আসি'
ইন্ধনের মত জ্বলে প্রোজ্জ্বলন্ত জ্বালার লিপ্সায়
লেলিহান আকর্ষণে আসঙ্গের আসব-পিয়াসী
তীব্রতম অতৃপ্তির আলিঙ্গন-বহ্নির বিহ্বল—
সম্বিত-বিলাসে তব। ছিন্নপাখা পাখীর পালকে
সাজায়ে রেখেছ ওই কুণ্ডলিত কবরীকুন্তল ;
চটুল কটাক্ষ ভরা নয়নের দৃষ্টির আলোকে
বন্দী বিদ্যুতের দীপ্তি ; মালিকার মঞ্জরীর দল
রচিয়াছে, রক্তবর্ণ বিকাশের বন্ধনশৃঙ্খল।

তাই আজি তব কণ্ঠে মোর সুর বিক্ষুব্ধ বিলোল
তরঙ্গের হিন্দোলায় বহি যায় উদ্বেল বাহিনী,—
অঙ্গে অঙ্গে আবর্ত্তিয়া সংঘাতের উচ্ছলিতরোল
বাজায় কুটিল রঙ্গে কামিনীর কলঙ্ককাহিনী ;
বসন্তের পুষ্পতরী সে আবর্ত্তসুরায় শিহরে,
উগ্রগন্ধপবনের স্পর্শ লাগে স্বপনের পালে ;
কমলের ফুল্লবনে মদমত্ত মাতঙ্গী বিহরে ;
পুঞ্জিত জলদরাশি আবরিয়া আকাশের ভালে
বিরঞ্জিত করি তোলে প্রকাশের প্রকট ভঙ্গিতে
প্রসাধন-বিন্যাসিত রঙ্গিণীর যৌবনসম্ভার,

অঞ্চলের বায়ু তার তরুণের শিরার শোণিতে
'মুহূর্ত্তে ঝলকি' তুলি' কামনার ফণার বিস্তার,
উৎক্ষিপ্ত গরল ঢালি কম্পমান স্পন্দনের স্রোতে
ঊষার অরুণ-মন্ত্র গ্রাস করে তার মর্ম্ম হ'তে।

হে স্বৈরিণী ! আজি তব বিলাসের শেষের রজনী।…
তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়ে পরিশ্রান্ত আরক্তিম আঁখি ;
শান্ত হয় হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উত্তাল ধমনি ;
স্খলিত হইয়া পড়ে সম্বিতের ইন্দ্রধনু-রাখী—
মোহিনীর মাধুর্য্যের সপ্তবর্ণ বিভাস মিলায় ;
কণ্ঠ হ'তে ছিন্ন হয় ষড়দল উৎপল মালিকা ;
তৈলহীন পঞ্চশিখা একে একে বৈভব হারায়
নগরীর বাতায়নে—নিভে যায় স্তিমিত বর্ত্তিকা
আকাশের পানে চাহি ; কুন্দকান্তি অনাবৃত করি'
অঞ্চলের যবনিকা কক্ষতলে ধূলায় লুণ্ঠিত
অচঞ্চল তটিনীর প্রায় ; ভুজঙ্গিনী কুন্তলকবরী
কুণ্ডলীর বন্ধ ছিঁড়ি আপনারে করে এলায়িত
পালঙ্কের শয্যাপরে। সুধাংশুর শুভ্র আলিঙ্গন
গভীর নিশীথে আনে রমণীর অন্তিম রমণ।

গণিকার গ্রন্থি টুটি' প্রস্ফুটিল তরুণী কুমারী,
জনকের ধ্যানলব্ধা, জননীর স্বপ্নসমুত্থিতা,
মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্বরা মোর কণ্ঠে পরাইল তারি
বরণের পুষ্পমাল্য ; পথে পথে চলিল নন্দিতা
জাগ্রত সুপ্তির দেশে দেখাইয়া নব নব দিশা ;
তারি দীপ্ত বর্ত্তিকায় স্পন্দহীন নীল ধ্রুবতারা ;
পূর্ণিমায় পরিপ্লুত তার স্নিগ্ধ বাসরের নিশা ;

সৌরবতী বাসনার উৎস হ'তে উচ্ছলিয়া ধারা
সুধায় সিঞ্চিয়া দিয়া মোর মুগ্ধ প্রাণের তৃষ্ণারে
দ্বিগুণ তৃষিত করি প্রণয়ের পুণ্য প্রেরণায়
প্রগতির গান গাহি নিয়ে চলে মুক্ত অভিসারে
বিচ্ছুরিত কাঞ্চনের শিখরের অলোক-পন্থায়,—
যেথায় হিরণ্যমূর্ত্তি-যুগলের অচিন্ত্য লীলার
অলকানন্দার ছন্দ মর্মে মোর মিলায় ঝঙ্কার।

নিশিকান্ত

দুই বোন

পরস্পর এতদিন ছিলে প্রতিক্ষণে
ঘিরি এক নিরর্থক দীর্ঘ নীরবতা,
চলিষ্ণু পৃথ্বীর পিঠে বাঁধা নিয়ন্ত্রণে
বয়স গিয়েছে বেড়ে হয়নি অন্যথা।
সহসা দুজনে কোনো বয়ঃসন্ধিকালে
রচিলে যে পূর্ব্বরাগ হেরি এ বল্লভে ;
প্রেমের সে ইতিহাস মৌন অন্তরালে
বিচ্ছেদের কূটনীতি লিখেছে নীরবে।
যদিও এ দ্বৈত রাজ্যে, ভবিষ্যতে যার
পরিণাম দুরাশার ব্যর্থ রোমন্থনে,
ক্ষণিক আনন্দে সেও স্বীকৃতির দ্বার
উন্মুক্ত রেখেছে সদা সব আমন্ত্রণে।
আমার বিরহে দেখি ঈর্ষ্যার শিখর
অতিক্রমি মিলিয়াছ দুহুঁ পরস্পর।

শ্রীচঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

সোমলতা

(৭)

এক একটা ঘটনা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে যে, তার আঘাত একেবারে সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে গিয়ে পৌঁছয়। বিনোদিনীর তাই হ'ল। টলতে টলতে গিয়ে কোনোমতে সে নিজের ঘরে পৌঁছল। কোনোমতে একখানা শুক্‌নো কাপড় প'রে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে প'ড়ল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বুঝতে পারলে না, সেটা সকাল কি বিকাল। ঘরে একঘর লোক জ'মে গেছে। তার মধ্যে স্বয়ং ডাক্তারবাবুও আছেন। সে চোখ মেলে চাইতেই এক সঙ্গে বহু লোক তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগল। তাদের কণ্ঠে কী ব্যাকুলতা!

বিনোদিনী অবাক হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু আশ্বস্ত ভাবে বললেন, আর ভয় নেই। জ্ঞান হয়েছে। তোমরা সব এইবার যাও দিকি মা সকল। রোগীর ঘরে ভিড় ক'র না। ওকে একটু নিরিবিলি থাকতে দাও।

ঘরের ভিড় আস্তে আস্তে অল্প একটু হালকা হ'ল।

ডাক্তার হাবলকে বললেন, ওরে এই ছোঁড়া, একটা শিশি নিয়ে আয় দেখি আমার সঙ্গে। এখুনি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে।

হাবল ডাক্তারের সঙ্গে গেল।

বিনোদিনীর মা তখন বিনোদিনীর মুখের উপর ঝুঁকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে। চোখ জলে ছলছল।

বিনোদিনী বিরক্ত হ'ল। বললে, সকাল বেলায় কাঁদতে বসলি কেন?

তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ। কথা বলতে গিয়ে সে প্রথম উপলব্ধি করলে, সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলে, আমার হয়েছিল কি?

নয়নতারা জিভে একটা টাকান দিয়ে বললে, কি হয়েছিলই বটে। আজ

তিন দিন জ্বরে একেবারে বেহুঁস। বলে, কি হয়েছিল !

ব'লে সহাস্যে উপস্থিত সকলের দিকে চাইলে। সে হাসি যেন লোষ্ট্র খণ্ডের মতো মৌন মধুচক্রের উপর পড়ল। সকলে এক সঙ্গে কলরব ক'রে উঠল।

বিনোদিনী বিস্মিত হ'ল। তিন দিন ! কিন্তু অত দিন কি ক'রে হবে ! সে চোখ বন্ধ ক'রে ভাববার চেষ্টা করলে। অন্ধকার রাত্রি···কনকনে ঠাণ্ডা ডোবার কালো জল···গৌরহরির উষ্ণ স্পর্শ···একে একে সবই মনে পড়তে লাগল। কিন্তু সে কি কালকে নয় ? তিন দিন আগে ?

বিনোদিনী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, হাবল কি গরু নিয়ে গিয়েছে ?

নয়নতারা আবার হেসে উঠল।

—গরু নিয়ে যাবে কি গো ? এখন যে বিকেল বেলা !

—ও।

বিনোদিনী আবার চোখ বন্ধ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল।

বিনোদিনীর মা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলে, হাবলকে ডাকব।

সে ঘাড় নেড়ে জানালে দরকার নেই।

নয়নতারা ধীরে ধীরে বললে, সে গিয়েছে ওষুধ আনতে ডাক্তারখানায়। এখুনি আসবে।

দুর্ব্বল মস্তিষ্কে বিনোদিনী সমস্ত কথা ভাববার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কেমন যেন গুলিয়ে যায়। সে রাত্রের ঘটনার ছবিগুলি অত্যন্ত দ্রুত একটা আর একটার উপরে এসে পড়ে। ভালো ক'রে তাকে বুঝতে দেয় না। পরস্পর-বিরোধী নানা অনুভূতি তাকে তোলপাড় ক'রে তোলে। স্থির হয়ে ভাবতে দেয় না।

উঠানের গাঁদা গাছগুলি এইবারে শুকিয়ে আসছে। কিন্তু অন্তিম মুহূর্ত্তেও তাদের ফুল ফোটাবার চেষ্টা যায়নি। দু'একটি গাছে শুকনো গাঁদা ফুল বিনোদিনীর চোখে পড়ল। জানালার বাইরে হেমন্ত-শেষের অপরাহ্ণ ধূলায় ধূসর। অপরিচ্ছন্ন আকাশে বিদায়বেলায় বিষণ্ণতা। বিনোদিনী আবার-ক্লান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে। ধীরে ধীরে তার চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু বালিশে গড়িয়ে পড়ল।

মা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে।
জিজ্ঞাসা করলে, কষ্ট হচ্ছে বিনোদনী ?
বিনোদিনী সাড়া দিলে না।

এই দুর্ভাগিনী মেয়েকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। নিতাইপদ ধান কাটা ও তোলা নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, বোনের অত বড় অসুখ একবার চোখে দেখারও ফুরসুৎ পায়নি। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে গাড়ী ক'রে কেবল ধানই আনছে, আর পালা বাঁধছে। তার পরে চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা আছে। গ্রামের এ পক্ষের মামলা-মোকদ্দমার যত বোঝা সবই তো একা তারই ঘাড়ে কি না। সেজন্যে মাঝে মাঝে সদরে যাওয়া আসাও আছে।

কতক অভিমানে, কতক ভয়ে মা তাকে বিনোদিনীর অসুখ সম্বন্ধে একটা কথাও বলেনি। ডাক্তার বারে বারে এসেছে গেছে, নিতাইপদর চোখে হয়তো তা পড়েছে, হয়তো পড়েনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথাও সে বলেনি। বলার বিপদও আছে। যত সামান্যই হোক, চিকিৎসার একটা ব্যয় আছে। অথচ হাতে তার একটি পয়সাও নেই। মধ্যে একদিন সদর থেকে গোটা কয়েক কমলা লেবু এনেই সে কর্ত্তব্য শেষ ক'রেছে। এই সব ভেবেচিন্তেই বিনোদিনীর অসুখ সম্বন্ধে সে বড় একটা গা করে না।

অসুখটা কিন্তু তার কঠিনই হয়েছিল। একে সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে। তার উপর শেষ রাত্রে ওই ডোবার দূষিত ঠাণ্ডা জলে স্নান। চুলও শুকোবার অবসর পায়নি। পনেরো দিন পরে যেদিন সে বিছানায় উঠে বসল, সবাই বললে হ্যাঁ পরমায়ু বটে। বিনোদিনী একেবারে যমের দুয়ার থেকে ফিরল।

সেই কথাটাই বিনোদিনী ভাবে। বহু ভাগ্যে যমের দুয়ার পর্য্যন্ত যদি পৌঁছেছিল, সেখান থেকে কেন ফিরল ? ফেরার এমন কী প্রয়োজন ছিল ? দুঃখের ভরা কি তার আজও পূর্ণ হয়নি ? এখনও বাকি আছে ? ভাবতে গিয়ে সে আর দিশা পায় না।

তার চেয়ে গৌরহরির কথা ভাবা ভালো। তার উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টি, স্নেহভারাতুর কবোষ্ণ স্পর্শ এবং বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন যেন বিনোদিনীর মর্ম্মে গিয়ে

দাগ কাটে। অকারণে বারে বারে মনে পড়ে। আর তার সমস্ত মন উঠানের গাঁদা গাছগুলির মতো ফুল ফোটাবার তুর্ব্বার প্রয়াসে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

গৌরহরির প্রভাতী গান শোনবার জন্যে প্রত্যহ সে খুব ভোরে জাগবার চেষ্টা করে। কিন্তু যত ভোরেই জাগুক, কোনোদিনই গান শুনতে পায় না। গৌরহরি কখন গান গেয়ে যায়? সে আশা করে, গৌরহরি তার জানালার নীচে দিয়ে গাইতে গাইতে যাবে, 'রাই জাগ, রাই জাগ'।

প্রভাতী গানের এই একটা কলি বিনোদিনীর জন্যে যেন অমৃত বহন ক'রে আনে। 'রাই জাগ, রাই জাগ'। সুপ্তোত্থিত সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে এ শুধুই একটা গান। কিন্তু তার কাছে তো তা নয়। বিশেষ ক'রে তারই ঘুম ভাঙাবার জন্যে যে গৌরহরির এই গানটি গাওয়া।

কিন্তু এত চেষ্টা ক'রেও একটি দিনও বিনোদিনী প্রভাতী শুনতে পেলে না।

অবশেষে একদিন হাবলকে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ রে, প্রভাতী শুনতে পাস না?

হাবল ঘুড়ীর সূতো মাঞ্জা করবার জন্যে একটা ভাঙা শিশি অন্বেষণ করছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—তুই শুনতে পাবি কি ক'রে? যা তোর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম!

বিনোদিনী নয়নতারাকেও জিজ্ঞাসা করলে।

নয়নতারা বললে, কি জানি ভাই, শুনতে তো পাই না। আর বোধ হয় গায় না।

সে আবার কি? তবে কি তারও আবার অসুখ করল না কি? তার ঘর এখনও শেষ হয়নি। কোথায় আছে, কে দেখছে, কে জানে! বিনোদিনী মনে তার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কিন্তু নয়নতারাকে আর কোনো কথা বলতে লজ্জা হচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলে হাবলকে।

—হাঁ রে, গৌরহরি কোথায় জানিস?

—আমি কি জানব?

—গাঁয়ে তাকে দেখিস নি?

—না।

বিনোদিনী আর কি করবে ভেবে পেলে না। তার নিজের শরীর এমন

নয় যে, একটা খবর নিয়ে আসে। তার কি যে হ'ল, কোথায় আছে, জানবার জন্যে ভিতরে ভিতরে সে অস্থির হয়ে উঠল।

বিকেলে শিবদাসের স্ত্রী এল তাকে দেখতে।

বললে, সময় পাই না ভাই। ধান-টান উঠছে। রোজই ভাবি, তোমাকে একবার দেখে আসি। তা সেই ঝঞ্ঝাটে আর সময়ই ক'রে উঠতে পারি না। কেমন আছ ?

বিনোদিনী উত্তরে শুধু একটু হেসে তাকে বসতে বললে।

—আর বসব না ভাই এখুনি উঠতে হবে। আমার কি আর বসার সময় আছে ?

ব'লে কিন্তু শিবদাসের স্ত্রী বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে পা ছড়িয়ে বসল।

বিনোদিনী বললে, আর ভালো লাগছে না ভাই। দিন রাত্তির শুয়ে আর ব'সে সময় যেন কাটে না।

—তা আর নয় !

শিবদাসের ছোট ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে বিনোদিনী বললে, ছোট মেয়ে হ'লে বলতাম, আমাকে কোলে ক'রে বেড়িয়ে এস। তারও যো নেই।

শিবদাসের স্ত্রী উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে বললে, যা বলেছ ভাই। অসুখ হ'লে তাই মনে হয় বটে।

এমনি বাজে কথা চলে। বিনোদিনীর কিন্তু মন পড়ে রয়েছে গৌরহরির সংবাদ নেওয়ার দিকে। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচে কথাটা আর তুলতে পারছে না। গৌরহরির সম্বন্ধে এমন সঙ্কোচ সে এর আগে আর কখনও অনুভব করেনি।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ীর সব ভালো তো ?

—হাঁ ভাই। তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে অসুখ বিসুখ কিছু নেই।

যাক। তাহ'লে গৌরহরি অসুস্থ নয়।

পরম ঔদাসিন্যের সঙ্গে বিনোদিনী বললে, গৌরহরিদা'র ঘর কতদূর উঠল ?

—আর ঘর ! মানুষেরই পাত্তা নেই।

—কি হ'ল ?

—ভগমান জানেন কি হ'ল। আজ ষোলো-সতেরো দিন হ'ল, সেই যে প্রভাতী গাইতে বেরিয়ে গেল, আর না খবর, না সংবাদ।

—কোথায় গেল ?

—তা সেই জানে, আর তার মন জানে। তা কি আর কাউকে ব'লে গিয়েছে ?

বিনোদিনী ভাবতে লাগল, ষোলো সতেরো দিন আগে ? তা'হলে কি···

শিবদাসের স্ত্রী বললে, যাই বল ভাই, অমন ভোলা মানুষ জীবনে দেখিনি।

অন্যমনস্কভাবে বিনোদিনী বললে, হুঁ।

কিন্তু গৌরহরি এমন অকস্মাৎ কেন চলে গেল ? কোথায় গেল ? তার স্বভাবেই যে স্থিতি নেই, কোনো একটা জায়গাতেই সে যে দীর্ঘ দিন থাকতে পারে না, বিনোদিনী তা জানে। কিন্তু তার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান যে শুধু স্বভাবধর্ম্মে এ কথা মানতে বিনোদিনীর মন সরল না।

সত্য বটে গৌরহরি বিরক্ত বাউল। এমন কি এবিষয়ে তার সঙ্গে রসময়ের কিম্বা অন্য কোনো বাউলেরও তুলনা চলে না। তারা বিষয়াসক্ত না হ'লেও গৃহী। একটা গৃহ আছে, গৃহের সঙ্গে বেঁধে রাখবার জন্যে বৈষ্ণবীও আছে। গৌরহরি তাদেরও উপরে গেছে, তার একটা গৃহ পর্য্যন্ত নেই,—বৈষ্ণবী তো দূরের কথা। গ্রামের পর গ্রামে সে যায়, মানুষের পর মানুষের সঙ্গে মেশে, কিন্তু কোথাও কোনো বন্ধন নেই।

কিন্তু তাই কি সত্য কথা ? সত্যই কি তার কোথাও কোনো বন্ধন নেই ? মনে তার স্নেহ নেই ? মায়া নেই, মমতা নেই, কিছু নেই ? তার সম্বন্ধে বাইরের লোকে যে যা ভাবে ভাবুক, বিনোদিনী কি ক'রে তা ভাবতে পারে ?

সে শুধু ভাবতে লাগল, তবে সে কেন গেল ? কেন গেল ?

এমনি যখন তার মনের অবস্থা তখন একদিন অকস্মাৎ বহির্দ্বারে যুগ্ম-কণ্ঠের গান শুনে সে চমকে উঠল। ললিতা আর রসময় না ? সে তাড়াতাড়ি হাবলকে বললে, ওরে, ডাক ওদের ডাক।

হাবলের ডাকে একা ললিতা ভিতরে এল।

বিনোদিনী হাসতে হাসতে বললে, আয়, আয়। সে কোথায়? রসময়?

ললিতা হাসতে হাসতে বললে, কি জানি?

—কি জানি কি লো? এখুনি তো একসঙ্গে গান গাইছিলি।

ললিতা সে কথার আর উত্তর না দিয়ে বললে, কেমন আছিস বল।

—এই তো দেখছিস।

বিনোদিনী মুগ্ধনেত্রে ললিতার দিকে চেয়ে রইল। সে এখনও ঠিক তেমনি আছে, কচি লতার মতো সতেজ এবং প্রাণবন্ত।

ললিতা বললে, হঠাৎ খবর পেলাম তোর খুব অসুখ। কি করি? এখানে কি আর আমার মুখ দেখাবার উপায় আছে? তবু লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এলাম।

ললিতা হাসলে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, কার কাছে খবর পেলি?

ললিতা ঠোঁট টিপে হেসে বললে, পেলাম।

—কার কাছে শুনি?

ললিতাও কিছুতে বলবে না, বিনোদিনীও ছাড়বে না। অবশেষে ললিতা বিনোদিনীর গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, দাদার কাছ থেকে?

কথাটা শোনা মাত্র বিনোদিনীর কানের ডগা পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। গৌরহরি কি ললিতাদের আখড়া পর্য্যন্ত গিয়েছিল না কি? তার তো অগম্য স্থান নেই!

বিনোদিনীর মা অপরিচিতার সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে কাছে এল। তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ললিতার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ মেয়েটিকে তো চিনতে পারলাম না!

বিনোদিনী বললে, ললিতা।

ললিতার লজ্জা করছিল। নিশুতি রাত্রে যেদিন সে গৃহত্যাগ করে চ'লে যায়, তার পরে আর কখনও এ-গ্রামে আসেনি। আসার মুখও ছিল না। এল এই প্রথম।

মুখে হাসি টেনে বললে, আমাকে চিনতে পারছ না কাকীমা?

কাকীমা অন্ধকার মুখে নিরুত্তরে চলে গেল, কলঙ্কিনী ললিতাকে দেখে সে খুশী হয়নি। নয়নতারাও ভদ্রতা রক্ষার জন্যে একটুক্ষণ তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দুটো কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে নিজের কাজে চ'লে গেল। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে নিজের জন্মস্থান থেকে ললিতা যে অভ্যর্থনা পেলে, তা এই রকম।

গৌরহরির ঔদাসিন্যে তাদের পৈতৃক ভিটাটি গেছে। আর যে সব প্রতিবেশিনীর গৃহে একদা সে আত্মীয়ারও অধিক সমাদর পেত, তারা এখন তাকে দেখে অন্ধকার মুখে চ'লে যায়। সে কলঙ্কিনী। কারণ, সে স্বামীত্যাগ ক'রে তার ছেলেবেলার প্রণয়ীর সঙ্গে মালা বদল ক'রেছে। কোনো গৃহস্থ-গৃহে তার পক্ষে মর্য্যাদা পাওয়া অসম্ভব।

রসময় একা একা বাইরে ব'সে কি করছে কে জানে। কিন্তু ললিতা লজ্জায়, সঙ্কোচে এবং অস্বস্তিতে পীড়িত হয়ে উঠল।

এই অস্বস্তি বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়াল না। এককালে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ললিতার প্রতি তারও চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু তার আখড়ায় কিছু কাল বাস ক'রে সে ভাব দূর হয়েছে। এই সদাহাস্যময়ী তরুণী তার কাছে আজ বিস্ময় এবং ঈর্ষার বস্তু।

অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিনোদিনী তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

বললে, বল্ কি খবর ?

—খবর আবার কি ?

—তোর দাদা কোথায় ?

—দাদাই জানে।

বিনোদিনী তাকে একটা চিমটি কেটে সকোপে বললে, তবে যে বললি তারই কাছ থেকে আমার অসুখের খবর পেলি ?

—পেলামই তো।

ললিতা চোখ নাচিয়ে হাসতে লাগল।

বিনোদিনীর লজ্জার বাঁধ ভেঙে গেল। পোড়ার মুখী ললিতার কাছে তার আবার লজ্জা করবার আছেই বা কি !

সে ব্যগ্রভাবে ললিতার একখানা হাত ধ'রে বললে, আর জ্বালাস নে ললিতা, যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। জানিস তো, এখানে মনের কথা বলবার কত অসুবিধে।

ললিতা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'ল।

বললে, এলি কেন আমার আখড়া থেকে ? সেখানে পিঁপড়েয় কামড়াচ্ছিল, নয় ?

ভ্রূভঙ্গি ক'রে বিনোদিনী বললে, তাহলে কি আর এখানে তোর দাদার আখড়া উঠত ?

ললিতা হেসে উঠল। বললে, তা সত্যি। দাদার মুখে শুনেছি। যাওয়ার সময় দেখে যাব। বাপ-পিতেমো'র ভিটে, দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

—তা আর নয়।

—কেমন হচ্ছে রে ? ঠিক আমাদের সেই পুরোনো আখড়ার মতো ?

—হ্যাঁ। সেই জায়গাতেই।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে ললিতা বললে, যাওয়ার সময় দেখে যাব।

একটু পরে বললে, একদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ দাদা এসে উপস্থিত। রূপ দেখে তো ভয়ে মরি ভাই ! মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে, গায়ে খড়ি উঠছে, মাথার রুখু চুল হাওয়ায় উড়ছে,—যেন কতকাল খায়নি।

বললাম, হঠাৎ কোত্থেকে এলে দাদা ?

বললে, এলাম ঘুরতে ঘুরতে।

ব'লে ধপ ক'রে দাওয়ায় ব'সে পড়ল।

জিগ্যেস করলাম, তোমার চেহারা অমন কেন ? অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?

হেসে বললে, না ! অসুখ করবে কেন ? বোধ হয় ক'দিন চানটান হয়নি তাই।

আমি তাড়াতাড়ি পা ধোবার জল দিলাম। একটু গুড়জল দিলাম। দাদা তেল মেখে নেয়ে এল, দুটি ভাতে-ভাত নামিয়ে খেতে দিলাম। তার পরে শুনলাম, তোর নাকি খুব অসুখ।

কি যেন একটু ভেবে বিনোদিনী বললে, কিন্তু তোর দাদা তো তখন এখানে ছিল না।

—হয়তো কারও কাছে শুনেছে।

—তা হবে।

ললিতা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে গাল টিপে দিয়ে বললে, শুধু তোর অসুখের খবরটা দেবার জন্যেই দাদা না-খেয়ে না-দেয়ে অত দূরে আমার ওখানে গিয়েছিল। বুঝতে পারছিস ?

আনন্দে বিনোদিনীর সমস্ত দেহ অবশ হয়ে আসছিল। চোখ ছলছল ক'রে উঠল। উদ্গত অশ্রুগোপনের জন্য সে মুখ নামিয়ে বললে, চুপ কর।

বললে, দাঁড়া। রসময়কে জল খেতে দেওয়া হ'ল কি না খবর নিয়ে আসি। তুইও চান ক'রে এসে দুটো রান্না চড়া।

—পাগল ! আমরা চলেছি নতুনডাঙার মেলায়। যাওয়ার পথে ভাবলাম, তোকে একবার দেখে যাই।

বিনোদিনী হেসে বললে, বেশ ক'রেছিস। তা নতুনডাঙার মেলাও তো এখানে নয়। খাওয়া-দাওয়া না ক'রে গেলে পৌঁছুবি কখন তার খেয়াল আছে ?

—তা হোক ভাই। বুঝতেই তো পারছিস, এখানে থাকবার কি আমার মুখ আছে ? শুধু তোর জন্যেই লজ্জার মাথা খেয়ে এলাম। বাপপিতেমো'র দেশ, আসতেও ইচ্ছে হয়, থাকতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ওই যে বললাম।

ব'লে ম্লান ভাবে হাসলে।

বিনোদিনী চোখ রাঙিয়ে বললে, চুপ। আমার কাছে আর কুটুম্বিতে করতে হবে না।

ললিতা সকাতরে বললে, কুটুম্বিতে নয় ভাই। দাদার আখড়া হোক, তখন এক মাস থেকে নেচে-গেয়ে হাসিয়ে-হেসে তোদের খুব ক'রে জ্বালাতন ক'রে যাব।

—সত্যিই থাকবি না ?

—না ভাই।

বিনোদিনী বুঝলে, এই অত্যন্ত অভিমানিনী এবং মর্য্যাদাশালিনী ভিখারিণী মেয়ের আঘাত লেগেছে কোথায়। সে আর জেদ করলে না।

শুধু কুণ্ঠিতভাবে বললে, তুটি জল খেয়েও যাবি না।

ললিতা কি যেন ভাবলে। বললে, আঁচলে তুটি মুড়ি দে। রাস্তায় খেতে খেতে, আর তোর জয়গান করতে করতে যাব।

বিনোদিনী হেসে বললে, খুব হয়েছে!

সে ওদের আঁচলে এক রাশ ক'রে মুড়ি ঢেলে দিলে। আর গোটাকয়েক নারিকেল-খণ্ড। ওরা হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

রসময় হাসতে হাসতে বললে, এবারে আর তোমাকে গান শোনান হ'ল না বিনোদিদি। পারি তো ফেরবার পথে শুনিয়ে যাব। বেশ ?

—বেশ।—ওদের বিদায় দিতে বিনোদিনীর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অন্ধকার আর কবিতা

ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি
কলেজ ছুটীর পর কবিতা লিখ্‌ছি
খাতার সাদা পাতায়
প্রদোষের ছাইরঙা অন্ধকারে

জানালার গা-ঘেঁসে চূণ স্বুরকি আর ইঁটের দেয়াল
দেয়ালের ওপর ভাঙাচোরা বেগ্‌নে-হল্‌দে-কালো কাঁচ
তীক্ষ্ণ ধারাল চক্‌চকে
চোখা চোখা মসৃণ
হিংস্র

কবিতা লিখ্‌ছি
শীতের সন্ধ্যায় এ্যাশফল্‌ট্‌ ঢালা পথের পাশে
ভাড়াটে বাড়ীর নিচতলার সাঁৎসেঁতে অন্ধকারে
বোবার মত নিঃশব্দে
আনওয়াড়ে বালিশে বুক ঠেসে
কতরাত্রির দুঃস্বপ্ন-মলিন বিছানায়

ড্রেনের ক্লেদের দুর্গন্ধে
কবিতার লাইন সঙ্কুচিত হয়ে যায়
নাকে কাপড় গুঁজে বাসন মাজে
আধ্‌বয়েসী ঝিটা
এঁঠো বাসন
কলতলায়
আরো পড়ে আছে কত ডিমের খোসা পেঁজের ছাল
আর পাখীর রঙীন পালক
মেঘের মত বহুবর্ণ

আর অন্ধকারের মত নরম
রাত্রির মত ঠাণ্ডা
আর চুমুর মত মোলায়েম

দম্ আট্‌কে আস্‌ছে এই কুটিল নিরালা অন্ধকারে
খালি পেটে কবিতা লেখা চলে না
হায় অন্ধকার জড়িয়ে যাচ্ছে আমার পেনের পায়ে পায়ে
সর্ব্বাঙ্গে ঘনিয়ে এলো নিঝুম আলস্য
আর স্তিমিত হোলো গতি
বুজে আসে চোখ
অন্ধকারে বেহালার শব্দ ভাসছে
অন্ধকারের জোয়ারে সোনালী একগাছা খড়
সরু আর লিক্‌লিকে
বেহালার সুকরুণ শব্দ আসে জানালা দিয়ে
দেয়াল ডিঙিয়ে
আর্ত্তনাদ করে ওঠে আমার মৃত্যু-শীতল মেঝের কর্কশ সোহাগে

কাঁপে সুর—বেহালার সুকরুণ সুর
আমার ঘরের অন্ধকারের শিরায় শিরায়
আমার কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে
অসহায় ছন্দের আহ্বানে

বাইরে অন্ধকারে গ্যাসের আলো জ্বলে
ফিরিয়ালা হাঁকে কুল্‌ফি বরফ
আর বস্তির অবিচ্ছিন্ন সার

আর অন্ধকার ঘরে আমি কবিতা লিখ্‌ছি

সুকৃৎ মৈত্র

ভিক্তর জাক্‌মোঁ ও মহারাজা রণজিৎসিংহ।

জাকমোঁ তাঁর চিঠিপত্রে মহারাজা রণজিৎসিংহ সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন ঐতিহাসিকের নিকট তার মূল্য আছে কারণ রণজিৎসিহের চরিত্রের কতকগুলি অজ্ঞাত কোণে সেগুলি আলোকপাত করে। তা ছাড়া জাকমোঁর অন্যান্য লেখার মত সে বর্ণনা সরস। তৎকালীন ইউরোপীয় চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটায়ও তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। মহারাজা রণজিৎসিংহের সঙ্গে জাকমোঁর তিন চারবার সাক্ষাৎ হয় এবং নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনাও চলে। এই সব আলোচনা জাকমোঁ লিপিবদ্ধ করেছেন।

জাকমোঁ লাহোরে নিমন্ত্রণ পান তাঁর কয়েকজন দেশবাসীর জন্য। সে সময়ে রণজিৎসিংহের তিনজন ফরাসী সেনাপতি ছিল, আলার (Allard) ভেন্তুরা (Ventura) এবং কুর (Court) এদের মধ্যে আলার ছিলেন প্রধান এবং তাঁদের হাতেই রণজিৎসিংহের সৈন্য ফরাসীরীতিতে শিক্ষিত হয় এবং নানা যুদ্ধে বিজয়ী হয়। আলার ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে সাঁ-ত্রোপেজ (Saint Tropez) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে জোসেফ্ বোনাপার্টের অধীনে ইটালী ও স্পেনে যুদ্ধ করেছিলেন। এল্‌বা হতে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইম্পিরিয়াল গার্ডে ক্যাপ্টেন হিসাবেও কিছুকাল কাজ করেন। নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের পর তাঁর দেশে থাকা অসম্ভব হয় বলে তিনি দেশত্যাগ করে। ঈজিপ্ট, তুর্কিস্তান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ হয়ে অবশেষে পারস্যে আসেন। পারস্যে একবৎসর চাকরী করবার পর ইস্পাহানে তাঁর সঙ্গে ভেন্তুরার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে পারস্য ছেড়ে আফগানিস্তানে যান এবং সে দেশে কিছুকাল অবস্থানের পর ১৮২২ সালে পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। রণজিৎ সিংহ প্রথমে তাঁদের ইংরাজ কিংবা রুশীয় গুপ্তচর মনে করেন, কিন্তু নানা ভাবে পরীক্ষা করবার পর যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁদের বিশ্বাস করা যেতে পারে তখন তাঁদের সাহায্যে শিখ সৈন্যের পুনর্গঠন করলেন। ফরাসী সেনাপতিরা কেউই বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি এবং সেই কারণে বরাবরই রণজিৎসিংহের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আলার ১৮৩৫ সালে

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ; ভেন্তুরা রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পরও ৬।৭ বৎসর শিখসৈন্য বিভাগে সেনাপতি হিসাবে চাকরী করেছিলেন।

আলার ও ভেন্তুরা জাকমোঁর সংবাদ পেয়ে তাঁকে লাহোরে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। রণজিৎ সিংহকে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন যে জাকমোঁ একটা মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সক্রেটিস্ প্লেটো বা আরিষ্টটলের চাইতে কম নয়। রণজিৎ সিংহ তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছিলেন তা বলা যায় না ; তবে তাঁকে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সাক্ষাতের পর যথেষ্ট সম্মানও দেখিয়েছিলেন।

১৮৩১ সালের ১১ মার্চ তারিখে জাকমোঁ লাহোর পৌঁছিলেন। আলার ও ভেন্তুরা লাহোর হতে দু তিন মাইল এগিয়ে এসে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরদিন রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা। আলার রাজার চালচলন জান্‌তেন, তাই জাকমোঁকে নানাভাবে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন। তাঁরা জাকমোঁকে রাজার সাম্‌নে এমন ভাব দেখাতে বললেন যে তিনি সমস্ত বিষয়ই জানেন, কোন বিষয়েই যেন অজ্ঞতা স্বীকার না করেন ! তিনি যে বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তিতে কোন রাজার চাইতে কম নয় তা যেন রণজিৎ সিংহ বুঝতে পারেন। এ পরামর্শ জাকমোঁ শেষ পর্য্যন্ত শোনেন নি।

সাক্ষাৎ হবার পর জাকমোঁ মহারাজ রণজিৎ সিংহের একটি সঠিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলছেন মহারাজা ক্ষুদ্রকায় ও রোগা ; কিন্তু তাঁর চেহারা মোটের উপর সুন্দর, একটি চোখ না থাকলেও এবং মুখে বসন্তের দাগ সত্ত্বেও চেহারা কুৎসিৎ হয় নি। যে চোখটি আছে তা বেশ বড়। নাক উঁচু ও সরু, মুখের গঠন সুন্দর, সরু ও ছোট গোঁপ অনবরত তাঁর আঙ্গুলের ভিতর ঘুরছে, পাতলা সাদা ধবধবে লম্বা দাড়ী বুক পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। রাজার দেহের গতি হতেই বোঝা যায় তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং তাঁর চিন্তার গতি দ্রুত। তাঁর সাজসজ্জায় বিশেষ আড়ম্বর নাই। সাদা কাশ্মীরী কাপড়ের পোষাক, খালি পা, গলায় বড় বড় মুক্তার মালা। তলোয়ারের হাতল হীরক-খচিত।

জাকমোঁ আলারের পরামর্শ মত প্রাচ্যরীতিতে রণজিৎসিংহকে নজর দিলেন। মহারাজা তাঁকে আপ্যায়িত করলে জাকমোঁ হিন্দুস্থানীতে বললেন "আমি মহারাজের সুখ্যাতি শুনেছি। ইউরোপের বোনাপার্টকে স্বচক্ষে দেখেছি ;

এখন এশিয়ামহাদেশের বোনাপার্টকে দেখতে এসেছি।" একথাও জাকমোঁকে আলার শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

রণজিৎ সিংহ আলার ও ভেন্তুরার নিকট নেপোলিয়নের বীরত্বের কথা অনেক শুনেছিলেন এবং সেই কারণে নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি জাকমোঁর স্তুতিবাক্য শুনে বিশেষ খুসী হয়েছিলেন। রণজিৎ ও জাকমোঁর মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হয় তা জাকমোঁর দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রণজিতের অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং সে সব প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে রণজিতের রাজনৈতিক দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। এই কথাবার্ত্তার যথাযথ অনুবাদ হতে তা আর স্পষ্ট হবে—

"আপনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন?"

"নিশ্চয়ই"—

"ইংলণ্ডের কত সৈন্য আছে?"

"একলক্ষ; বেশীর ভাগ সৈন্য ইংলণ্ডের বাইরে ইংরাজের অধীনস্থ অন্যান্য দেশে; যেমন ভারতবর্ষে ২০ হাজার।"

"তারা কি ভাল যুদ্ধ করতে পারে?"

"বেশ ভাল যুদ্ধ করে।"

"ফরাসীদের মত?"

"প্রায় ফরাসীদের মত। নেপোলিয়নই ইংরাজদের এ বিদ্যা শিখিয়েছেন।"

"কোম্পানীর ভারতীয় সিপাইরা কি যুদ্ধে ভাল?"

"তারা ভাল বলেই শুনেছি।"

"ইউরোপীয় সৈন্যদের মত ভাল?"

"তা ঠিক নয় তবে ইউরোপীয় সেনানায়কদের অধীনে তারা মন্দ যুদ্ধ করে না। তারপর আমি যতদিন ভারতবর্ষে আছি তার মধ্যে ত যুদ্ধই হয় নাই।"

"কেন ভরতপুরের যুদ্ধ?"

"ভরতপুরের যুদ্ধ আমি এদেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বে হয়েছে। তা ছাড়া ভরতপুরের দুর্গ নামমাত্র দুর্গ। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সাম্‌নে তা দাঁড়াতে পারে না।"

"ভরতপুর নামমাত্র দুর্গ!"

"ঠিক তাই, ভারতবর্ষে এমন কোন দুর্গ নাই যা ইউরোপে দুর্গ-আখ্যা পেতে পারে। ভারতবর্ষের যুদ্ধ ছেলেখেলা মাত্র। বোনাপার্টের প্রত্যেক যুদ্ধে দৈনিক ৪০০০০, লোক নিহত হয়েছে।"

কথা-প্রসঙ্গে রণজিৎ জাকমোঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আচ্ছা, আমি এখন কোন্ দেশ জয় করতে পারি ?"

"আপনার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে ইংরাজ ও রুশ রাজ্যের বাইরে এশিয়াখণ্ডে যে কোন দেশ জয় করতে পারেন।"

"কিন্তু প্রথমে কোন্ দেশের ওপর হাত দেব !"

"কেন তিব্বত ?"

"আপনি তিব্বত গিয়েছিলেন ?"

"আপনি যদি শুধু একদল গুর্খা সৈন্য পাঠিয়ে দেন তাহ'লেই সে দেশ অধিকার করা যাবে। কিন্তু সে দেশ এত দরিদ্র যে হাজার লোকের খাবার পাওয়া যাবে না।"

"তা হ'লে সে দেশ নিয়ে কি হবে। এমন দেশ দরকার যেখানে যথেষ্ট ধনধান্য আছে। আচ্ছা সিন্ধুদেশ জয় করলে কি হয় ? তাহ'লে ইংরাজরা কি বল্‌বে ?"

"সে সম্বন্ধে মহারাজই ভাল জানেন। কারণ ইংরাজদের সঙ্গে সিন্ধুদেশের যে সন্ধি হয়েছে তাতে ইংরাজরা সে দেশ রক্ষার ভার নিয়েছে। সুতরাং আপনি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করলে ইংরাজদের সঙ্গেও আপনার যুদ্ধ বাধ্‌বে।"

"কিছুদিন হতে রুশদের কথা অনেক শুন্‌ছি।"

"তারা পারস্যদেশে অনেক স্থান জয় করেছে।"

"ভারতে ইংরাজরা তাদের সম্বন্ধে কি ভাবে ?"

"তারা বোধ হয় কিছুই ভাবে না।"

"কিন্তু রুশসৈন্য যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাহলে তারা কি করবে !"

জাকমোঁ একথার সঠিক উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন যে "রুশদের প্রথমে আপনার রাজ্য অতিক্রম করতে হবে, আর আপনি ইংরাজদের বন্ধু, আপনার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়েই আপনি রুশদের গতি রোধ করতে পারবেন।" কিন্তু জাকমোঁ তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার অনেক খবর রাখতেন, তাই তিনি

তাঁর দিনপঞ্জীতে বলছেন যে রুশসৈন্য যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাহ'লে ইংরাজরা রণজিৎ সিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সোজাসুজি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে এবং ইংরাজ রাজ্যের সীমানা শতদ্রু হতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাবে" (Ils feraient beaucoup d'excuses a Votre Majeste pour la necessite ou ils se trouveraient d'envahir vos etas et de porter leur frontiere du Sutledge a l' Indus.)। কিন্তু জাক্‌মোঁ সে কথা না বললেও রণজিৎ সিংহ তা বুঝ্‌তেন, তাই জাক্‌মোঁ যখন তাঁকে বললেন যে তিনি ইংরাজদের বন্ধু তখন রণজিৎ সিংহ অবজ্ঞার সুরে বললেন "হুঁ, ইংরাজ ও আমি একাত্মা।"

এর পর দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত বাদশা' ও আফগানিস্তানের বিতাড়িত আমীর শা' সুজার সম্বন্ধেও রণজিৎ নানা প্রশ্ন করেন। এ প্রশ্ন করবার কারণ রণজিৎ শুনেছিলেন যে জাক্‌মোঁ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

রণজিৎ জাকমোঁকে জিজ্ঞাসা করলেন সিংহাসনচ্যুত নবাবদের সঙ্গে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁরাই বা তাঁকে কিভাবে আপ্যায়িত করেছিলেন। জাকমোঁ উত্তরে বললেন যে নবাবদের সম্মান দেখাবার জন্য তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। ইউরোপে এ সব রাজাদের শুধু ওপর ওপর সম্মান দেখান হয় এবং তাদের দুরবস্থার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এ সব সিংহাসনচ্যুত রাজাদের সঙ্গে ইংরাজের ব্যবহার হাস্যকর। তারা এই রাজাদের মাসিক বৃত্তি দেয় এবং উপরন্তু নবাবোচিত সম্মানও দেখায় যদিও সে সম্মানের কোন মূল্য নাই।

জাকমোঁ যাবার পর রণজিৎসিংহ আলার ও ভেন্তুরাকে বলেন যে জাকমোঁ জাতিতে ফরাসী না হয়ে পারেন না কারণ ফরাসী ছাড়া আর কোন জাতি কথা বলবার সময় দেহের ভঙ্গী অতবার বদলায় না। এর পর রণজিতের সঙ্গে জাকমোঁর আর একবার দেখা হয়েছিল। তখন জাকমোঁ কাশ্মীর হতে ফিরছিলেন এবং রণজিৎ লর্ড বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করবার জন্য শতদ্রু অভিমুখে যাচ্ছিলেন। জাকমোঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওয়েড নামক একজন ইংরাজ ছিলেন। রণজিৎ জাকমোঁকে অন্ততঃ বিশবার আলিঙ্গন ও করমর্দ্দন করলেন কিন্তু ক্যাপ্টেন ওয়েডের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। জাকমোঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে

পুস্তক পরিচয়

Empire of the Nabobs—by Lester Hutchinson.
(Allen & Unwin)

গত কয় শতকে যে পরিমাণে সময়, অর্থ এবং শক্তি ঐতিহাসিক গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছে তা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। ততোধিক আশ্চর্য্য যে এতটা গবেষণা সত্ত্বেও ইতিহাস আজকে প্রধানতঃ সাহিত্যের শাখাবিশেষ বলে সাধারণের কাছে গণ্য। এতটা প্রয়াস কেবলমাত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনার যাথার্থ্য ও সত্যতা নির্দ্ধারণ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্র যেমন সর্ব্বদাই সচেতন থাকে সে একটা নির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করছে, বিশুদ্ধ শিল্পেরও যেমন উপলভ্য উদ্দেশ থাকে, ঐতিহাসিক গবেষণার ছাত্রের তেমন বিশেষ লক্ষ্য একটা থাকে না। ইতিহাসের যে কি সার্থকতা তাও সে জানে না। এর ফলে আজ ইতিহাসের একটা কোন সর্ব্ব-সম্মত সংজ্ঞা নেই। অদ্যাবধি কেবল দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের একটা সার্থকতা বোঝাতে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্য্যকারণ-পারম্পর্য্য বজায় রেখে ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছেন। অন্যেরা সকলে সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনার অনুবৃত্তি দিয়ে ভেবেছেন তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন। Ecclesiastical এবং মার্ক্সপন্থী ঐতিহাসিকেরা উক্ত দুই শ্রেণীর লেখক। আজকের প্রজ্ঞাবাদী এবং বৈজ্ঞানিক যুগে সেরকম ধর্ম্মপ্রাণতার কোন সার্থকতা নেই। হেগেলীয় ইতিহাস-শাস্ত্র—যার পদ্ধতি অবলম্বন করে বস্তুবাদী ইতিহাসশাস্ত্র উৎপন্ন হয়েছে—আধুনিক জগতে বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে পারে না, কারণ ভাববাদী হেগেলীয় ব্যাখ্যা বস্তুতঃ উক্ত ধর্ম্মধ্বজ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী, তার পিছনে ভূয়োদর্শনের সমর্থন নেই। মার্ক্সপন্থীরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত একটি বিশেষ রূপ দিতে পেরেছেন এবং তাঁদের মতবাদেরই ভবিষ্যৎ আছে। Hutchinson-এর Empire of the Nabobs বইখানির প্রধান মূল্য হল এইখানেই। তিনি ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিবৃত্ত লিখেছেন বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মুখপাত্র হিসাবে। Pokrovsky-র রুষ ইতিহাস ছাড়া মার্ক্সীয়

পদ্ধতিতে লেখা কোন দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস এযাবৎ লেখা হয় নি। ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে Marx-এর এক আধটা সাময়িক প্রবন্ধ ছাড়া আর কোন মার্ক্সীয় সাহিত্য এতদিন ছিল না।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক থেকে ইয়োরোপের আত্মপ্রসারণের ইতিহাস সুরু। সেই যুগে ইয়োরোপের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিরাট বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছিল। সেই যুগ থেকে ইয়োরোপের ইতিহাস দাঁড়াল বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর এবং ধনিকতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী। ধনিকতন্ত্রের নির্ম্মম আঘাতে পুরাতন feudal সমাজব্যবস্থা অনিবার্য্য মৃত্যুর মুখে পতিত হল। এই বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের খরচে জাহাজ পাঠিয়ে দেশবিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সুরু করল দেশের গভর্ণমেণ্টের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে। কোম্পানী গঠনের এবং ব্যবসা করার একচেটিয়া অধিকার দানের আকারে আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হত। East India Company এইভাবেই গঠিত হয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সুরু করে। ভারতবর্ষের অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্যে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করা এদের জীবনের স্বপ্ন ছিল। ভারতবর্ষে East India Companyর প্রতিষ্ঠা অন্য সব বুর্জ্জোয়াদের লোভ এবং ঈর্ষার কারণ হ'ল। বুর্জ্জোয়াদের এই দুই দলের সঙ্ঘর্ষের কথা সপ্তদশ শতক থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতায় বড় বড় হরফে লেখা আছে।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের এই সময় বড় দুর্দ্দিন। এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সামন্ত রাজারা নিজের নিজের গোছ-ব্যবস্থা করে নিতে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় সকলের অলক্ষ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সও নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা করে নিলে। বাণিজ্যের মানদণ্ড নিয়ে যারা ঢুকেছিল তারা রাজদণ্ডের জন্য কাড়াকাড়ি করে ভবিষ্যতে নিজেদের দস্যুতার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে নিলে। এই গোলমালের অন্ধকার যখন অপসারিত হল তখন দেখা গেল যে ইংরাজই সকলের থেকে ভাল গোছ-ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কোম্পানী দেশের রাজা হল বটে কিন্তু প্রজাপালন হল তাদের কাছে গৌণ ব্যাপার। কোম্পানীর কর্ত্তাদের এবং ভৃত্যদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতে অর্থসঞ্চয় করে দেশে ফিরে নবাবিয়ানা করা। যে প্রথায় অর্থ সঞ্চয় চলত তাতে না ছিল সভ্যতার ছদ্মবেশ, না ছিল পাপপুণ্যের বালাই।

নিজেদের দেশের লোকের কাছে এরা অবজ্ঞাভরা "ন্যাবোব" আখ্যা পেলে। এতে কিন্তু অন্যদের অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্য থেকে ঈর্ষ্যাই ছিল বস্তুতঃ বেশি। Hutchinson একটি কথা যা আগে কেউ বলেননি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে যে-ইংরাজ বুর্জ্জোয়ারা ঘরে রইল এবং যারা 'ন্যাবোব' হল তাদের মধ্যে ঝগড়া ন্যায় নিয়েও নয় নীতি নিয়েও নয়। সজ্ঘর্ষটা বস্তুতঃ বাধল সফলকাম এবং ব্যর্থকাম প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে। ভারতবর্ষকে নিয়ে বুর্জ্জোয়া এবং ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সজ্ঘর্ষ সেই থেকেই চল্ল। একধারে কোম্পানীর নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা, অন্যধারে ভারত সাম্রাজ্য কোম্পানীর হাত থেকে নিয়ে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আনার জন্য বঞ্চিতদের চেষ্টা। অর্থের জোরে কিছুদিন কোম্পানী নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখলে বটে কিন্তু শেষ অবধি তাদের ধীরে ধীরে অনেক কিছুই ছাড়তে হল। শেষে সিপাহি বিদ্রোহের গোলমালে কোম্পানী চিরকালের মত রাজত্ব হারাল। হস্তান্তরে এসে ভারতবর্ষে সতীদাহ বন্ধ, ঠগ ও পিণ্ডারিদের উচ্ছেদ এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হল বটে কিন্তু দেশের উপকার কতটা হল এবং প্রজারঞ্জন কতটা হল তা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইংরাজ বণিকেরা ভারতের ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলে। Industrial Revolution ইংলণ্ডকে "workshop of the world"-এ পরিণত করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিটাই একেবারে বদলে দিলে। যে-স্থলে ন্যাবোবরা ভারতীয় শিল্পোৎপাদিত মাল ইয়োরোপে বিক্রী করে নবাবিয়ানা করত সেই স্থলে ইংরাজ ধনিকতন্ত্রীরা ভারতবর্ষকেই ইংলণ্ডের যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের বিপণিক্ষেত্র করে তুল্লে। শুধু তাই নয়, ইংলণ্ডের বিরাট শিল্প-যন্ত্রের খাদ্যের বরাদ্দ হল ভারতবর্ষ থেকে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কাঁচা মালের চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। ভারতের feudal অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনিবার্য্য মৃত্যুর মুখে পতিত হল। Hutchinson-এর কথায় "It hardly needs to be emphasised that the English Nabobs, traders, and manufacturers were not conscious revolutionaries : they were in India solely because of their lust for plunder and profit ; but they were nevertheless the unconscious instru-

ments of history in effecting a social and economic revolution which had been long overdue." (p 126)। ভারত নিজস্ব শিল্প হারিয়ে ব্রিটিশ industrial capitalism ও পরে monopoly capitalism-এর লীলাভূমি হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ মূলধন প্রচুর পরিমাণে ভারতে invested হতে লাগল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ capital-এর রপ্তানী সেই থেকে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে আছে। এই টাকার স্থদ হিসাবে বৎসরে কোটি কোটি টাকা ভারত থেকে ইংলণ্ডে চালান হয়। Pitt-এর India Bill-(১৭৭৮ খৃঃ)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল যে "the wealth of India was in future to be used not only to enrich the Nabobs but also to balance the National Budget, তা এই ভাবে সফল হল। এধারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার স্বধর্ম্মপালন করে ভারতের প্রগতির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়ে ভারতের আধুনিক nation হয়ে গড়ে ওঠার পথ একধারে যেমন খুলে গেল, তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যধারে সেই পথকেই তুর্গম করে তুল্লে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্ম হল এই স্বতোবিরোধী অবস্থা থেকে। "Imperialism ceased to be progressive and became reactionary ; but India could not be turned back ; she had begun the long and bitter struggle against imperialism, which had forfeited every historical right to be in India." (p 182)। দেশের আর্থিক অবস্থা যতই সঙ্কীর্ণ হতে লাগল জাতীয় আন্দোলনও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। কংগ্রেস প্রথমে সমাজ-সংস্কারী প্রতিষ্ঠান ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে ধীরে ধীরে দেশের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে উঠল। গোড়ার আন্দোলন প্রধানতঃ বুর্জ্জোয়া ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বুর্জ্জোয়া আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল,—বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাস "আনন্দ মঠ" থেকে "বন্দে মাতরম" মন্ত্র গ্রহণ করেছিল। ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থা আসার ফলে যে-শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ সুরু হয়েছিল সেটা সর্ব্বদা অর্থনৈতিক তুর্দ্দশার ইন্ধন পেয়ে ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। ভদ্রলোক শ্রেণী যখন এর সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করলে তখন তাদের প্রয়াস হল কি ভাবে এই জন-আন্দোলনকে

বানচাল করা যায়। ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে সুরু করে ১৯৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত অনেকটা এই উদ্দেশেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যেকবারেই "ভদ্রলোকেরা" দেশের মজুর ও কৃষাণদের প্রতারিত করতে কৃতকার্য্য হয়েছিল। যতবারই জনসাধারণ অধৈর্য্য হয়ে নেতাদের পরিচালনা অগ্রাহ্য করে নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করার উপক্রম করলে প্রত্যেকবারই কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাদের শাস্তি দেবার সুযোগ দিলে। বুর্জ্জোয়ারা একধারে এইভাবে ইংরাজের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘর্ষ চালাচ্ছে এবং অন্যধারে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের জন্য জনতার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ চালাচ্ছে, যাতে জনতা না তাদের নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে তাদেরই বিরুদ্ধে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ চালাতে পারে। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে যখন জনতা কংগ্রেসের হাতের বাইরে চলে যাবার উপক্রম করলে তখন গান্ধিজি তাঁর "Himalayan blunder" স্বীকার করে সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দিলেন। Michael O'Dwyer রক্তের স্রোতে বিদ্রোহী জনতার উপর নৃশংস প্রতিশোধ নিলেন। ১৯২০ সালের আন্দোলন চৌরীচোরার ব্যাপার উপলক্ষ করে প্রত্যাহৃত হল। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের পরিণতি হল Gandhi-Irwin Pact। ১৯৩২ সালে গান্ধিজি "Under the cover of the sentimental hysteria raised by his fast... . had cleverly sidetracked a dangerous mass movement into the harmless channel of religious reform"। ভারতীয় রাষ্ট্র আন্দোলনের এইরকমে রূপ হল দু'টি। একধারে জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসনকামী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘর্ষ। অন্যধারে আভ্যন্তরিক শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ। মহাত্মা গান্ধির অধিনায়কত্বে ভদ্রলোক-শ্রেণী চেষ্টা করছে তাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র-আন্দোলন পরিচালিত হয় এমন ভাবে যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অটুট থাকে। তেমনি আবার কৃষাণ এবং মজুরদের জন-আন্দোলন ক্রমশই সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুর্জ্জোয়া-বিরোধী শ্রেণীসঙ্কটে পরিণত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পরিণতি হল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায়। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের এই হল মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ। এই কাঠামোর উপর Hutchinson তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে ১৯৩৫ সালের

India Act পর্য্যন্ত ইতিহাস এই বইটির বিষয়বস্তু। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুটি দিক দেখিয়েছেন এবং তাদের যোগসূত্র কোথায় তাও নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের শেষ অধ্যায় সুরু হয়েছে। তার কিন্তু আগেকার ভিত্তি বদলে গেছে। আজকে "No longer are the masses of the people the passive instrument of economic interests hostile to their own ; no longer are they easily led astray by political abstraction divorced from their misery" (p 259)। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সজ্ঘর্ষ আজকে জমিদার এবং মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষাণদের, মিলওয়ালাদের বিরুদ্ধে মজুরদের শ্রেণীসজ্ঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতিটা কাম্য কিনা তা মতসাপেক্ষ। গ্রন্থকারের এত আশান্বিত হওয়ার মত অবস্থা আজ সত্যই এসেছে কি না সেটাও বিচার্য্য।

বইটির দু'টি সমালোচ্য বিষয় চোখে পড়ে। বইখানিকে প্রথমত পক্ষপাত-দুষ্ট বলা যায়, দ্বিতীয়ত একটু একপেশে বলে মনে হয়। Hutchinson মুখবন্ধেই বলেছেন যে ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে লেখা চলে না যেহেতু ইতিহাস ঘটনার ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। Hutchinson নিজে মার্ক্সপন্থী হওয়াতে তাঁর পক্ষপাতিত্বটা মার্ক্সবাদ-বিরোধী সকলেরই কাছে অবিচার এবং অন্যায়ের দিকে বলে বোধ হবে। যাঁরা ঐতিহাসিকের কাছে নির্জ্জলা নিরপেক্ষতা আশা করেন তাঁরা ইতিহাসের চরিত্রটাই বুঝতে ভুল করেন। নিরপেক্ষ বিচার কেবল কথারই কথা। প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তার জন্য সমস্ত লেখাতেই পক্ষপাতিত্ব থাকতে বাধ্য। তবে পক্ষপাতিত্বের মাত্রাটি ঠিক কিম্বা বেশি হতে পারে। Hutchinson-এর পক্ষপাতিত্বটি যদিও অনিবার্য্য এবং তজ্জন্য ন্যায্য তাঁর একচোখামি ভাব দুইটির কোনোটাই নয়। ইতিহাস নিরপেক্ষ হতে পারে না বটে কিন্তু ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক হওয়া উচিত। গ্রন্থকার যথার্থ পরিমাণে বহিরাশ্রয়ী হতে পারেননি বলে ঠিক পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিকও হতে পারেন নি। যদিও ইতিহাস এখনও পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কোঠায় উঠতে না পারার জন্য ইতিহাসকারের পক্ষে যথাযথ ভাবে বহিরাশ্রয়ী এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠা সহজ নয় তবুও দৃষ্টি-পদ্ধতি যাদের বস্তুবাদী ও ডায়ালেটিকাল তাদের বিশেষ করে যতটা বহিরাশ্রয়ী হওয়া

উচিত Hutchinson ততটা হতে পারেন নি। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ব্যক্তির স্থান নিতান্ত গণ্ডিবদ্ধ বটে কিন্তু সেই সীমারই মধ্যে ব্যক্তির একটা ঐতিহাসিক সার্থকতা আছে। গান্ধিজি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরক্ষার কার্য্যে ব্রতী সে কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর হাতের অস্ত্র হওয়া ছাড়াও গান্ধিজির ব্যক্তিগত প্রভাব যে আরও ব্যাপক সে কথা অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক ভ্রম। গান্ধিজিকে প্রতারক এবং হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় গ্রন্থকারের একদেশ-দর্শিতা ও মতসর্ব্বস্বতাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধির ব্যবহারে হাস্যাস্পদ ব্যাপার অনেকটাই আছে কিন্তু তেমনি আবার একটা উন্নততর দিকও আছে, যেটা নির্দ্ধার্য্য নিরাসক্ত ভাবে, আজকের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় গান্ধিজির ব্যক্তিগত অবদান থেকে। Hutchinson-এর বইখানির মূল্য অধিক বলেই এই ত্রুটিগুলিতে আফশোষ হয় বেশি। অন্যান্য ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমরা একমত কখনও হতে পারিনি। কিন্তু Hutchinson-এর রাজনৈতিক মত যাহাই হোক তাঁর ব্যাখ্যার আবেদন আমাদের কাছে ঢের বেশি। তিনি শেষে যা বলেছেন রাজনৈতিক মতভেদ নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলেরই আশা এবং ভরসা তাই, "the progressive forces in India as elsewhere will not rest until they have carried world civilisation forward from the dangerous anarchy created by capitalist decay to a new world social order in which each will give according to his ability and each will receive according to his needs"।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

সমুদ্রতীর—বুদ্ধদেব বসু (কবিতা-ভবন)

আমি চঞ্চল হে—বুদ্ধদেব বসু (ডি, এম, লাইব্রেরি)

এতদিন আমরা বুদ্ধদেবকে কবি, গল্পলেখক ও প্রবন্ধকার হিসেবেই জানতুম। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনীও যে তিনি অতি ভাল করে লিখতে পারেন তার পরিচয় এই দু'খানা বইতে পেলাম। এই দু'খানা বইতে লেখক যে সব জায়গায় বেড়িয়েছেন,

সে সব জায়গা প্রায় প্রত্যেকের কাছে অতি পরিচিত, তবু বর্ণনার গুণে জায়গাগুলি নতুন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। বলাই বাহুল্য যে বুদ্ধদেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী এর জন্য দায়ী। দু'খানা বইয়ের মধ্যে তথ্যও তত্ত্বের দ্বারা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি ; অতি সরস সাহিত্যের আমেজে সর্ব্বত্র ভরপুর। একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, বুদ্ধদেবের বদলে যদি সুনীতিবাবু পুরী ও ভুবনেশ্বর বেড়াতেন তাহলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হয়ত আমাদের কাছে যথেষ্ট শিক্ষণীয় হত, কিন্তু সাহিত্যের মেজাজ বোধ হয় মিলত না। অপর পক্ষে সুনীতি বাবুর বদলে যদি বুদ্ধদেব বোরোবুদুর বেড়াতে যেতেন তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হত তা সহজেই অনুমেয়। মাসিকপত্রের দেশভ্রমণের গল্প-লেখকদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের তাই এত পার্থক্য। "সমুদ্রতীর" পড়ে ছেলেবেলাকার সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ"র কথা মনে পড়ে গেল। শুধু "সমুদ্রতীর" কিছুটা আধুনিক এবং স্বপ্নালসবৃত্তি প্রায় শূন্য, এই যা প্রভেদ। সব পাঠকেরই এই দু'খানা বই পড়ে ইচ্ছে হবে সমুদ্রতীরের দেশগুলিতে পুনর্বার নতুন চোখে বেড়িয়ে আসতে। কোনো ভ্রমণ কাহিনীর লেখকের পক্ষে এতবড় সার্থকতা আর বোধ হয় নেই। দেশ পর্য্যটন-কালে লেখকের চিত্তে প্রকৃতির দ্বারোদ্ঘাটন কোথাও বাধা পড়েনি। এবং সেখানে বাহির জগতের অবাধ সঞ্চরণ দেখে বিস্মিত হতে হয়। গল্প, কবিতা অথবা উপন্যাসের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ঢাকা পড়েছিল ; এবার তার উন্মোচনের সুযোগ অন্তত কিছুটা পরিমাণে মিলল—তির্য্যকরূপে, দেশভ্রমণের মধ্যস্থতায়। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে কারুর হয়ত নাও মিলতে পারে তবু ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যেটুকু পরিচয় এই পুস্তকগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তাকে শ্রদ্ধা না করে কেউ পারবেন না। প্রাণের এত প্রাচুর্য্য সহজে চোখে পড়েনা। রবীন্দ্রনাথের পর এ ধরণের সুন্দর বই বোধ হয় খুব কমই আছে।

'আমি চঞ্চল হে' অনেকটা চম্পূ ধরণের লেখা। তার ধাবমান সতেজ গদ্যভাষারই মধ্যে নিশ্চল স্নিগ্ধ জলাশয়ের মত মাঝে মাঝে গদ্যকবিতার আবির্ভাব হয়েছে। ফলে পাঠকের মন বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেও শ্রান্ত বোধ করে না। তা'ছাড়া বুদ্ধদেব গল্পলেখক, সেইজন্য যা দু'একটি ঘটনা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে, তাকেই তিনি সরস বৈচিত্র্যে পূর্ণ করেছেন। কাজেই পাঠককে কোথাও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করতে হয় না। সমুদ্রের বর্ণনা দুটি বইয়ের বহুস্থানে

রয়েছে, তার একটি এখানে উদ্ধৃত করছি, ওয়ালটায়ারে লেখক যে সমুদ্র দেখেছেন তারই বর্ণনা ঃ

"দূরের সমুদ্র পরিষ্কার নীল, ঝকঝকে সাদা ফেনা ছিটানো। এখানকার সমুদ্রের দেখছি সব সময়ই একটা অস্থির দুর্দান্ত ভাব। ক্ষেপেই আছে। এর সঙ্গে পুরীর সমুদ্রের তুলনা হয় না, গোপালপুরের তো নয়ই। এ-সমুদ্র দাঁত-দেখানো, ভয়-দেখানো ; এ নয় বতিচেলির শঙ্খ-চিক্কণ সমুদ্র, নয় জলকন্যাদের প্রবাল-প্রাসাদের স্বচ্ছ-নীলাভ ছাদ-শুভ্র গম্বুজের পর গম্বুজ-তোলা ; এ সমুদ্র নয় স্বপ্নের, নয় শান্তির, নয় ক্লান্ত চোখের উপর অফুরন্ত স্নেহের। বরং একে মনে হয় নিষ্ঠুর, মনে হয় ক্ষুধিত ও আহত, তিমির তপ্তরক্তের তাড়া-খাওয়া, হাঙরের ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে-যাওয়া, মনে হয় একটা উতরোল অন্ধ আতঙ্ক, যাতে ঝড় ওঠে, যাতে জাহাজ ডোবে, যাতে হাজার মানুষের জীবন বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। এখানকার সমুদ্র শুধু জীবন্ত নয়, জান্তব ; এই জলরাশির তলে যে-তীব্র জীবস্রোত অন্ধ হত্যার প্রেরণায় উৎসারিত, এর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তারই যেন দুরন্ত দস্যুতা।"

এ বর্ণনাটি যেন বিক্ষুব্ধ বর্ত্তমান কালকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়ত লেখকের এই শান্তিহীন জগতের উপর সুতীব্র বীতরাগ অদৃশ্যভাবে সমুদ্র বর্ণনার মধ্যে আরোপিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই ধরা যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়, বুদ্ধদেব কালের ধাপে আরো অনেক বেশী এগিয়ে গেছেন, এবং সেইজন্য দৃষ্টিভঙ্গীর এত প্রভেদ। প্রচলিত সনাতনী অভ্যাসের ফলে উপরের লেখাটি যদি কারুর নাও ভাল লাগে, তবু তিনি এর বাস্তবতার মূল্য একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন না। লেখকের ভাষার অখ্যাতি যে সব শত্রুপক্ষেরা এতকাল রটিয়েছেন, তাঁরাও এ দু'খানা বই পড়ে বলতে বাধ্য হবেন যে, বুদ্ধদেবের ভাষায় কাব্যের লালিত্য ও গদ্যের ঋজুতা সমানভাবেই বজায় রয়েছে।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

The Novel and the People – by Ralph Fox.
(Lawrence and Wishart)

স্পেনের পক্ষাবলম্বন ক'রে ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিখ্যাত গল্প-লেখক র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স্ এবং 'Illusion and Reality'-র লেখক ক্রিষ্টফার কড্‌ওয়েল নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বাঙালী লেখক এবং পাঠকসমাজ

এখনও যাঁরা আচার ও আদর্শের, theory এবং practice-এর কেমন ক'রে সমন্বয় সাধন করা যায়, তা বুঝ্তে পারেন না—এই ঘটনা আশা করি তাঁদের কাছে এ-বিষয়ে কতকটা আলোকপাত করতে পারবে।

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স যে একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক ছিলেন, তার প্রমাণ এই আলোচ্য গ্রন্থখানি। এই পুস্তকের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, কেমন করে ইংরেজি উপন্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে একদিন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, ধনতান্ত্রিক জগতে আজ কেন উপন্যাস মৃতকল্প অবস্থায় এসে পড়েছে, এবং কি ক'রে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখা পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। বর্ত্তমান যুগে উপন্যাসের অন্তর্নিহিত শক্তি যে অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা বিশদ্‌ ক'রে বলা বাহুল্য এবং কাব্যের চেয়ে উপন্যাসের উপযোগিতা এদিক্‌ দিয়ে যে অনেকাংশে বেশি, সে বিষয়ে বোধ করি মতান্তর নেই।

ইংরেজি উপন্যাসের যে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে, তা বোঝা যায় যখনই আমরা দেখি—এই জগৎ থেকে quality নামক বিশেষ বস্তুটি লুপ্ত হ'তে বসেছে আর তারই পরিবর্ত্তে quantity স্থানলাভ করেছে। অধিকাংশ উপন্যাসেই 'second rate emotions and adolescent relationships' ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এ সবের মূল কারণ হ'চ্ছে, উপন্যাসিকদের মধ্যে 'crisis of outlook' ঘটেছে বলে'। এ সম্বন্ধে লেখক বল্‌ছেন: 'The crisis of outlook is concerned with philosophy, and therefore with form. Since the war the philosophical outlook of most English writers has been deeply influenced by that last of European liberals, Sigmund Freud. Psycho-analysis, as developed by Freud, is the apotheosis of the individual, the extreme of intellectual anarchy. It has certainly affected the English novel in the last twenty years more than any other body of ideas. It has also brought it to a state of almost complete intellectual bankruptcy, even though some strikingly original work also owes much of its force to the revelation of the individual made possible by Freudian analysis। এই কারণেই দেখা

যাচ্ছে, প্রায় অধিকাংশ ইংরেজ ঔপন্যাসিক সামাজিক চৈতন্যকে সহজেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যে জগতে তাঁদের বসবাস করতে হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীন এবং নির্ব্বিকার থাকা এক প্রকার অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইংরেজি উপন্যাস যে অধোগতির পথে নেমে যাচ্ছে, তাকে প্রতিহত করতে হ'লে 'Socialist Realism'-এর প্রয়োজন।

অনেকে মনে করেন, সাহিত্যে কল্পনা এবং বাস্তবের সম্বন্ধ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসীয় সংজ্ঞা হ'লো—'Being determines consciousness,' প্রত্যেক কাল্পনিক সৃষ্টি স্রষ্টার বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছায়া হ'তে বাধ্য। মার্কস্ তাঁর 'Critique of Political Economy'-র ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করছি: 'The mode of production of the material means of existence conditions the whole process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence determines their consciousness. At a certain stage of their development, the material forces of production in society come in conflict with the existing relations of production, or—what is but a legal expression for the same thing—with the property relations within which they had been at work before. From forms of development of the forces of production these relations turn into their fetters. Then opens an epoch of social revolution. With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed. In considering such revolutions the distinction should always be between the material revolution in the economic conditions of production which can be determined with the precision of natural science, and the juridical, political, religious, aesthetic, or philosophic—in short, ideological forms—in which men

become conscious of this conflict and fight it out'। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মার্ক্‌স বিশ্বাস করতেন,—বাস্তব জীবনের ভিত্তিই পরিশেষে জীবনের spiritual process-সমূহকে প্রভাবিত করে। অবশ্য, তা ব'লে তিনি এ-রকম কখনোই মনে করতেন না যে, এই অর্থনৈতিক কারণটাই একমাত্র দিক্। ১৮৯০ সনে জে, ব্লখকে লেখা একখানা চিঠিতে এঙ্গেল্‌স্ এই বিষয়টাই পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বলেছিলেন : 'The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of the class struggle and its consequences, constitutions established by the victorious class after a successful battle, etc. forms of law—and then even the reflexes of all these actual struggles in the brains of the combatants : political, legal, philosophical theories, religious ideas and their further development into systems of dogma—also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their form'। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক কারণসমূহকে মার্ক্‌স্ প্রাধান্য দিলেও এমন কথা তিনি কোথাও বলেন নি যে, শিল্পসৃষ্টির ওপর ধর্ম্ম, দর্শন, প্রথা অথবা "ideal" factors-এর কোনো ছাপ থাক্‌বে না।

বর্ত্তমান কালে সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার ক'রে সত্য এবং বাস্তবকে উপলব্ধি করা। প্রত্যেক বড় লেখকেরই মনে বাস্তবকে কেন্দ্র করে এক ভয়ানক দ্বন্দ্ব চল্‌তে থাকে। জীবনের বহির্ভাগ অথবা জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশকে দেখলেই চল্‌বে না, তাঁকে দেখতে হ'বে এডওয়ার্ড্ আপ্‌ওয়ার্ডের ভাষায় "the fundamental forces at work beneath the surface'। সেই জন্যে আজ প্রত্যেক লেখকেরই 'world outlook'-কে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মানব প্রগতির এই দর্শনের সাহায্য ভিন্ন সত্যকে আবিষ্কার করা কোনো লেখকেরই পক্ষে সম্ভব নয়। লেনিন এ সম্বন্ধে বলেছেন : 'Truth is found out of the totality of all aspects of a phenomenon of reality, and their (mutual) relationship.'

সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের ব্যক্তিত্ব অথবা চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের epic character-ও আর নেই। জীবনকে ভালো ক'রে বোঝার অভাবেই সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ প্রকাশ ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে পড়ছে। সেই জন্যে ব্যষ্টির ইচ্ছার সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিত্বের বিরোধও উপন্যাসের রাজ্য থেকে বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। তার বদলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে 'subjective struggles, sexual intrigues, or abstract discussion।

ঊনবিংশ শতকে "Art for art's sake'-এর পতাকাবাহী লেখকগণ বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত মনে রেখে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের ডায়েলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎকে দেখতে হ'বে। এই থেকেই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে একদিন অনিবার্য্য-রূপে socialist realism-এর উদ্ভব হ'বে। এই হ'ল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

র‍্যাল্‌ফ ফক্সের এই সুচিন্তিত এবং সুলিখিত বইখানি সকল সাহিত্য-সেবীর অবশ্যপাঠ্য।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতী ভবন। দাম এক টাকা চার আনা।

যে মনোভাব বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে সওয়ার হ'য়ে ব'সেছে তা' হ'চ্ছে—"নূতন কিছু কর একটা, নূতন কিছু কর"। সওয়ার এক হ'লেও বাহনের যোগ্যতা অনুসারে তার দৌড় সার্থক হয়। শক্তির অভাব আত্মসচেতন অভিনবত্বের দুরূহ প্রচেষ্টাকে কত বিকৃতির পথে যে নিয়ে চলে তার ভূরিপরিমাণ দৃষ্টান্তে বাঙলা সাহিত্য পরিকীর্ণ। বিমলাপ্রসাদের সদ্য-প্রকাশিত গল্পের বই "পঞ্চমী"তে লেখকের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর আন্তরিক মৌলিকতার সঙ্গে তাঁর সহজ স্বকীয় প্রকাশক্ষমতা যোগ দিয়ে যে গল্পগুলি তৈরী হ'য়ে উঠেছে তাতে অভিনবত্বের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দুই-ই বজায় আছে।

কথা-সাহিত্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাঁদের সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে

ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণী কেবলি বিশ্লেষণ ক'রে খুঁড়ে খুঁড়ে নিহিত রসকে জাগিয়ে তোলেন, আর এক শ্রেণী নেপথ্যের কার্য্যকারণের প্রতি অত বেশী মন সংযোগ না করে বাইরে জীবনের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তারই সকল সৌন্দর্য্য মন ভরে' উপলব্ধি ক'রতে চেষ্টা করেন। বিমলাপ্রসাদ এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। তাঁর গল্পগুলিতে দেখার আনন্দ পরিস্ফুট। লেখক যেন এক একটি ছোট খাটো ঘটনা এক একটি ছোট খাটো চরিত্রের মধ্যে নিজের মনকে সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিয়ে তা' দিয়ে মন ভরে নিচ্ছেন। লেখক কিম্বা পাঠক কারু মনে প্রশ্নই জাগে না—"এরা কেন এমন হলো ?" "এরা যে এই, দেখে উপভোগ কর"—এ ছাড়া অন্য কোনো "কেন" মনে স্থান পায় না ;— They tease us out of all thoughts—যদিও সব গল্পগুলিতেই লেখকের রচনার এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট তবু তাঁর লেখার এ গুণের সব চাইতে ভালো প্রকাশ হ'চ্ছে তাঁর "সূয্যি ঠাকৃরুণ", "দম্পতি" ও "পঞ্চমী"। গল্পের গল্পাংশ হু হু ক'রে ছুটে চ'লেছে, পাঠকের মন তারই আনন্দে মগ্ন, অথচ এদিকে ঘটনার স্রোতে ভেসে-চলা চরিত্রগুলি যে পরিষ্কার রেখায় ক্রমেই ফুঠে উঠছে সেদিকে পাঠকের খেয়াল হয় না যতক্ষণ না গল্প গিয়ে একেবারে শেষে পৌঁছয়। গল্প-শেষে দেখা যায় চরিত্রগুলি একেবারে নিখুঁৎ হ'য়ে ফুটে উঠেছে, কোথাও কিছু ঝাপ্‌সা নেই। বিমলাপ্রসাদের চরিত্র-সৃষ্টির এই মৌলিক পদ্ধতিটি বড় ভালো লাগলো। তাঁর চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে শিল্প-চাতুর্য্য অবলম্বন ক'রেছেন তা' art conceals art এই কথাটা বারম্বার মনে করিয়ে দেয়। পরিষ্কার রেখায় খুঁদে খুঁদে তাঁর চরিত্রগুলি তিনি যখন গ'ড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত থাকেন তখন তারা গল্পের অতিমাত্র সচলতার বেগে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু গল্প-শেষে দেখা যায় যাদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না তারা অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে কখন মনের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বিমলাপ্রসাদ চরিত্র-চিত্রণের এই যে সুন্দর রীতি অবলম্বন ক'রে কৃতকার্য্য হ'য়েছেন তার কয়েকটি কারণ আছে। একটা কারণ বিমলাপ্রসাদের মাথায় অভিনব ভালো ভালো সব প্লট জোগায়। তাদের একটা বিশেষ রস পাঠককে পেয়ে বসে। এ ছাড়া তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর হওয়াতে আর সেই সঙ্গে গল্পের মধ্যে একটা লঘু গতি থাকাতে গল্পগুলি যখন পড়ে যাওয়া যায় তখন চরিত্রগুলিই সব চেয়ে বেশী মনঃসংযোগ দাবী করে না,

দাবী করার আরো অনেক কিছুই থাকে। কিন্তু গল্প-শেষে দেখা যায় চরিত্র-গুলি পরিষ্কার রেখায় মনের মধ্যে ছাপ ফেলে গেল। "পঞ্চমী" গল্পের "পঞ্চমী" "দম্পতি" গল্পের "কল্যাণী" কতটুকু সময়ের জন্যই বা দেখা দিয়েছে! কিন্তু রেখার ঐ স্বল্প আঁচড়ে তাদের যে-চিত্র ফুটে উঠেছে তা' অপূর্ব্ব।

বিমলাপ্রসাদের ভাষা অতি চমৎকার। তাঁর ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার লঘু স্বচ্ছ গতি। ভাষা অতিমাত্র গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও অনুভূতির পরিবর্ত্তায়মান নানা আলো ছায়া সেই গতির মধ্যে কোথাও এতটুকু তলিয়ে যায় নি। ভাষার অতিদ্রুত গতির মধ্যে বিমলাপ্রসাদ তাঁর মনের নানা অনুভূতি যদি যথাযথ ভাবে যথাস্থানে ফুটিয়ে তুলতে না পারতেন তা হ'লে তাঁর গল্পের সৌন্দর্য্য অনেকটা হানি হ'তো। বিমলাপ্রসাদের রচনার পেছনে আছে তাঁর কবি মন, আর স্থানে স্থানে সে মন বাইরে এসে এক একবার দেখা দিয়ে গল্পগুলির অন্তর্নিহিত লিরিক element-টি ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। "ডাক-বাক্স" গল্পটি আগাগোড়াই লিরিক মনের পরিচয়, বিমলাপ্রসাদের প্লট্‌-সৃষ্টির কৌশল, ভাষার সৌন্দর্য্য, সরস রসিকতা ও তাঁর কবিচিত্তের প্রকাশ আর কোনো গল্পে এক সঙ্গে এত সুন্দর ভাবে রূপ গ্রহণ করেনি। "ডাক-বাক্সের" মত উচ্চাঙ্গের গল্প বাঙলা সাহিত্যে সম্প্রতি বড় বেশী লেখা হয় নি, এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে।

পূর্ণেন্দু গুহ

... Leaves and a Bud——Mulkraj Anand

(Lawrence & Wishart)

...নেক বিখ্যাত বিদেশীয় লেখক ভারতীয় প্রচ্ছদপট ... রঞ্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ... ন্তরের ছবি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই। ... পীড়িত জনসাধারণের মনের গতি অনুভব করিতে যে ... ষ্টির আবশ্যক, সেরূপ সমবেদনাময় দৃষ্টির আভাস ... ত্য-রচনা হইতেই পাওয়া সম্ভব, অন্যত্র নহে।

মুল্‌করাজ আনন্দের প্রথম পরিচয় পাই তাঁহার অস্পৃশ্যতার সমস্যা লইয়া রচিত উপন্যাস The Untouchable পুস্তকখানিতে। লিখন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে ও রচনানৈপুণ্যে এখানি সুধী-সমাজে আদৃত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তক "Two Leaves and a Bud" আসামের চা বাগানের কুলী-জীবনের কাহিনী লইয়া রচিত। এ কাহিনীর সহিত আমাদের পরিচিতি আজ নূতন নহে, কিন্তু বর্ণনাকুশলী লেখক আসামের অরণ্যময়, বিপদসঙ্কুল, উষ্ণ, অস্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রকৃতির পটভূমিতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস, স্বচ্ছন্দ, তেজোময়ী ভাষায় যে মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লেখনীর গুণে সে দৃশ্যাবলী যেন আমাদের মানসনেত্রে সজীবতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গল্পটি এই :—

—দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত পাঞ্জাবের অধিবাসী গঙ্গু স্বগ্রামবাসী কুলী-সংগ্রাহকের প্ররোচনায় ভুলিয়া সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া সুদূর আসামের চা বাগানে ভাগ্যোন্নতির আশায় চলিয়া আসিল। সেখানে আসিয়া দেখিল, সে মিথ্যা প্রলোভনে দেশ হইতে এতদূরে আসিয়াছে; কুলীদিগের প্রকৃত অবস্থা ক্রীতদাসের অপেক্ষাও শোচনীয়। সারাদিনের পরিশ্রমের মজুরি গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেই যথেষ্ট নহে, এবং তাহা হইতেও অন্যায় রূপে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থার অভাব নাই; চা বাগানের ম্যানেজার হইতে রসদ যোগাইবার ভারপ্রাপ্ত দোকানী, অফিসের চাপরাসী, কেরাণী, এমন কি প্রভু অনুগ্রহপ্রার্থী কুলী সর্দ্দারেরা অবধি সকলেই এই অশিক্ষিত, অসহায় দিগকে শোষণ করিয়া লইতে ব্যগ্র। স্বদেশে ফিরিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাথেয় সঞ্চয় করাও কঠিন, এবং প্র প্ল্যাণ্টার শ্রেণী তাঁহাদের অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রবৎ ভাগ্যদের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও তাঁ আশঙ্কায় ইহাদের পলায়নের পথ বন্ধ করিবার দিকে সংক্রামক রোগের হাত হইতে কুলীদের বাঁচাইতে প্রতি জন্যে অর্থব্যয়ে ইহারা কুণ্ঠিত, কিন্তু পাহারার বিষ অর্থব্যয়ে কার্পণ্য নাই।

সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা ও ক্ষতি ভাগ্য বলিয়া মানি মত গঙ্গুও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইল

সহানুভূতি দ্বারা এই দুর্ব্বহ জীবনযাত্রা সহনীয় করিয়া লওয়া ভিন্ন আর কোন প্রতিকারের চেষ্টা ইহাদের ধারণায় আসে না। চা বাগানের ডাক্তার De la Havre সহৃদয় লোক, কুলীদের প্রতি এই অবিচার ও অত্যাচার তাহাকে পীড়া দেয়। কুলীদের এই অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সে বাধ্য হইল সমগ্র জগৎব্যাপী ধনিক ও শ্রমিকের অসামঞ্জস্যের কথা ভাবিয়া দেখিতে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ধনিক শ্রেণীর নিকট বিচার পাইবার আশা যে দুরাশা তাহা পদে-পদে তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল। স্বজাতি প্রীতির বাহুল্যে যাঁহারা অন্যায় জানিয়াও সহ-ম্যানেজার Regis Huntএর যথেচ্ছাচারের সমর্থন করিয়া যাইতেছিলেন, সুবিচারপ্রার্থী De la Havreকে তাঁহারা কুলীদের বিদ্রোহে সাহায্যকারী অপবাদে পদচ্যুত করিলেন। কারণ জাতীয় প্রেষ্টিজে আঘাত দিতে পারে এরূপ নির্ব্বোধ আচরণ তাঁহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। অপরাপর স্বজাতির হৃদয়হীন ব্যবহারের সহিত ডাক্তারের মনুষ্যত্বের তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া ম্যানেজার কন্যা Barbara তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু এই স্বজাতির স্বার্থসংরক্ষণ নীতির নিকট সেও পরাজয় স্বীকার করিল। যে-আন্তরিক সহযোগ পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝিতে সাহায্য করে, বারবারার সে অন্তর্দৃষ্টি ছিল না, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার পথে অন্তরায় হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া গঙ্গুর স্ত্রী সজনী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সর্দ্দার ও অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের অত্যাচারের প্রতিকারপ্রার্থী কুলীরা ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী ম্যানেজারের নিকট আবেদন করিতে যাওয়ায়, বিদ্রোহী বলিয়া বিপদের আশঙ্কায় তাহাদের দমনার্থ প্ল্যাণ্টারেরা সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল গোলযোগের হাত এড়াইয়া পুত্র কন্যাকে লইয়া গঙ্গু কোনমতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে Regis Huntএর লুব্ধদৃষ্টি তাহার কন্যা লয়লার উপর পতিত হওয়ার ফলে তাহাকে অতর্কিতে প্রাণ হারাইতে হইল।

এই ত গেল গল্পের সারাংশ। ইহা অবলম্বন করিয়া লেখক যে বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখায় বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে একদিকে অশিক্ষিত কুলীশ্রেণীর গভীর হতাশাচ্ছন্ন মানসিক অবস্থা, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহনশীলতা ও পরস্পরের

প্রতি সমবেদনা ; অপরদিকে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত স্বজাতিপীড়কের দা মনোভাবের প্রাবল্য। অত্যাচার ও অবিচারের বর্ণনায় তাঁহার ভাষা স্বত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অপরদিকের ধনিকশ্রেণীর এই মনোবৃত্তির মূল কোথায়, শিক্ষার কোন্ জাতীয় সঙ্কীর্ণতা শাসক ও শাসিতদিগের মধ্যে সহানুভূতির অভাবের কারণ, অর্থলিপ্সা কি ভাবে মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে তাহাও অনুভব করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা লেখক করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানির চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। একটা অসম্পূর্ণতার ভাব ইহার পাত্র পাত্রীর অধিকাংশের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়, ঘটনাপরম্পরায় কাহিনীর গতির সহিত চরিত্রের পরিণতির সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাদের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস লেখক অনেক স্থলেই করেন নাই। উপন্যাস অপেক্ষা চিত্র-কাহিনী বলিলেই তাঁহার আখ্যায়িকার সঙ্গত নাম দেওয়া হয়, কারণ সমগ্র চিত্রের মধ্যে আংশিক রূপে অবস্থিত থাকা ভিন্ন, পৃথক করিয়া দেখিবার মত সম্পূর্ণতা ইহার কোন পাত্র পাত্রীর চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। পাত্র-পাত্রীদিগের মধ্যে গঙ্গুর চরিত্র অনেকাংশে স্পুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার কন্যা লয়লাকে লেখক এক একবার অন্তরাল হইতে সম্মুখে আনিয়া পরক্ষণেই তাহার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন ; অথচ এই চরিত্রটির নিকট আমাদের আরো কিছু প্রত্যাশা থাকায় তাহা পূর্ণ না হওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। De la Havre ও বারবারার পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হওয়া ও মানসিক ব্যবধানের পরিচয়লাভের ফলে ক্রমে বিচ্ছেদ সংঘটন নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাদের ভিতরেও সেই অসম্পূর্ণতার আভাস থাকিয়া গিয়াছে। অথচ Regis Hunt-এর চরিত্র স্পষ্ট করিয়া তুলিতে লেখক যে সকল দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এত বিস্তারিতভাবে না করিয়া আভাস মাত্র দিলেও যথেষ্ট হইত। রিয়ালিষ্টিক হইবার বাসনা এ-যুগের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রবল, তবু মনে হয় এক্ষেত্রে তাঁহার লেখনী আরও সংযত হইলেই শোভন হইত। প্ল্যাণ্টার-শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে ক্রফ্‌ট কুক ও মিসেস ক্রফ্‌ট কুকের চরিত্র ও আনুষঙ্গিক অপর পাত্র পাত্রীর চরিত্র বেশ মনোমত। মোটের উপর আলোচ্য পুস্তকখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অমলা দেবী